KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৫০৮/২, যোধপুর পার্ক, কল-৬৮
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিভব (BIVAV)	Size : 5.5" x 8.5"
Vol. & Number : 26/4 27/1 27/3	Year of Publication : Oct - Dec 2005 Jan - March 2006 July - Sept 2006
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, তারুণ সেন	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যা

১৪১২

পাটা

প্রধান সম্পাদক ॥ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সম্পাদক ॥ রাহুল সেন

প্রকাশিত হয়েছে
এ-সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য
প্রতিভাস প্রকাশনা

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের নতুন কাব্যগ্রন্থ

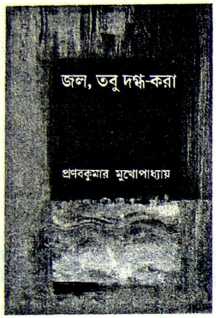

প্রচারের প্রখর আলো থেকে স্বেচ্ছায় সরে থাকা কবির
এই শেষতম কাব্যগ্রন্থে পাঠক অবশ্যই খুঁজে নিতে পারবেন
তরুচ্ছায়ার স্নিগ্ধ শুশ্রূষা,
বেদনাঘন মুহূর্তের শান্ত সান্ত্বনা।

পরিবেশক :
লীনা পাবলিকেশনস
৭২সি মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা - ৭০০ ০০৯

বিনিময় : ৬০ টাকা

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯ *

বিভাব

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক
বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যা
১৪১২

সূচি

সম্পাদকীয়

অপ্রকাশিত কবিতা
ভাস্কর চক্রবর্তী (কয়েকটি কথা ❑ বাসবী চক্রবর্তী) ১

পুনর্মুদ্রণ
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় (গল্প ❑ অজগরী) ৫

প্রবন্ধ
মুখের কথা লেখার ভাষায় ❑ নিত্যপ্রিয় ঘোষ ৪৫
শিশিরকুমার কি আন্তর্জাতিক অভিনেতা হতে পারতেন ? ❑ পিনাকী ভাদুড়ী ৭৭

বিশেষ রচনা
ট্যাবলয়েড সংবাদপত্র ও আজকের সাংবাদিকতা ❑ স্বাতী ভট্টাচার্য ১৮৫

গল্প

সমিরন ❑ সৈয়দ শামসুল হক ২১
যা হয় ❑ দিব্যেন্দু পালিত ২৭
যুধিষ্ঠিরের মিথ্যে ❑ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৩৩
কথোপকথন ❑ সাধন চট্টোপাধ্যায় ৪১
কাঞ্চন অপেরা ও মৃন্ময়ের কবিতা ❑ শচীন দাশ ৫৭
নির্বাসিত ❑ রবিশংকর বল ৬৭
নির্যাতিত হনিমুন ❑ তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৫
স্থিরচিত্র ❑ মানব চক্রবর্তী ১১৫
সহমরণ ❑ কামাল হোসেন ১২৭
জেলখানার জানলা ❑ নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ১৩৫
সিজ ফায়ার ❑ সেলিনা হোসেন ১৪৫
জীবনচক্র ❑ কল্যাণ মজুমদার ১৫৫
বৃক্ষ ❑ অলোককুমার বসু ১৭৫
শূন্য থেকে শূন্যে ❑ অলোক গোস্বামী ১৯৩
দুনিয়ার মজদুর... ❑ দীপঙ্কর দাস ২০৫
অবশেষে রূপান্তরের চিহ্ন ❑ শুভঙ্কর গুহ ২১৫

সাক্ষাৎকার

হ্যারল্ড পিন্টার (কবিতা ও গ্রন্থপঞ্জী সহ) ২২৩

চিত্রনাট্য

ক্রান্তিকাল ২৫১
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : শেখর দাশ

সম্পাদকীয়

বিভাব প্রকাশনার উনত্রিশ বছর পূর্ণ হল। এই বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যাটি পঁচানব্বইতম সংখ্যা। সময়ের এই সুদীর্ঘ পরিসরে আমরা মানুষসাধ্য পরিশ্রমে বিভাবের মান অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেছি। সূচনায় বিভাব ছিল একান্তই প্রবন্ধকেন্দ্রিক পত্রিকা। কিন্তু আমাদের সনির্বন্ধ প্রয়াসেও শেষ দিকে তেমন যোগ্য প্রবন্ধ পাচ্ছিলাম না। তাই পরে গল্প ও কবিতাও প্রকাশিত হতে থাকে। তবে প্রতি সংখ্যায় নয়। আমরা প্রায়শই নানা গবেষণানির্ভর, বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে থাকি। ফলে সব সংখ্যায় গল্প বা কবিতা প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। কবিতার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কবিতা নিয়েই বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিসময়ের কারণে বছরে একবার বা দেড় বছরে একবার সেই কবিতা সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

বাংলা ভাষায় এখন গর্ব করার মতো সাহিত্যকেন্দ্রিক বেশ কিছু অতি উচ্চমানের পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এরই মধ্যে আমরা সব সময়ই একটু ব্যতিক্রমী হবার চেষ্টা করি যা মনস্ক পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। এই অব্যাহত আকর্ষণ আমাদের কৃতজ্ঞ করে রাখে।

বর্তমান সংখ্যাটি প্রধানত গল্প সংখ্যা। সতেরোটি বৈচিত্র্যময় গল্প আছে। একমাত্র শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পটি পূর্ব-প্রকাশিত কিন্তু অগ্রন্থিত। এই সংখ্যার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ বাংলা কাহিনীচিত্র, শেখর দাশ পরিচালিত 'ক্রান্তিকাল' ছবির চিত্রনাট্যের মুদ্রণ। নিত্যপ্রিয় ঘোষ ও পিনাকী ভাদুড়ীর দুটি মননশীল প্রবন্ধও পাঠকের বিশেষ মনোযোগের কেন্দ্রে আসবে আশা রাখি।

এবার সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার পেলেন নাট্যকার হ্যারল্ড পিন্টার। তাঁর অনেক সাক্ষাৎকার ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। যে-সাক্ষাৎকারটি এখানে পুনঃপ্রকাশিত হল তাতে লেখকের শৈশব থেকে শুরু করে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন, ক্যানসার আক্রান্ত হওয়া ও রোগ থেকে মুক্তি এবংবিধ নানা পরিচয় পাঠক পাবেন।

শরৎকালের নীল আকাশ, শাদা মেঘ যতই আমাদের প্রসন্ন করুক, সচল সন্ত্রাসবাদ ও নানা অন্যায্য রাজনীতির ঘন মেঘ এখন আমাদের জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। প্রতি সকালের সংবাদপত্র হয়ে উঠেছে দুঃসংবাদপত্র। আমরা এই নিয়মিত দুঃখপাঠ থেকে মুক্তি চাইছি।

পরিশেষে সমস্ত লেখক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাকে অবিচ্ছিন্ন সহযোগিতার জন্য জানাই কৃতজ্ঞতা।

বিনীত নমস্কারান্তে
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
প্রধান সম্পাদক- বিভাব।

সম্পাদকমণ্ডলী
কলকাতা
পবিত্র সরকার ❖ প্রদীপ দাশগুপ্ত
শান্তিনিকেতন
অরুণ মুখোপাধ্যায় ❖ অনাথনাথ দাশ ❖ স্বপনকুমার ঘোষ

সম্পাদক
রাহুল সেন

প্রধান সম্পাদক
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

যোগাযোগ কেন্দ্র ও লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সম্পাদকীয় দপ্তর
'বিভাব'
৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক (দ্বিতল)। কলকাতা - ৬৮।
দূরভাষ : ২৪৭৩ ৩৬০০
চলমান : ৯৮৩১৩ ০৯৪০৯

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

রূপারোপ : অভিজিৎ নাথ

প্রাপ্তিস্থান : *পাতিরাম*
দে বুক স্টোর্স

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক, কলকাতা -৬৮ থেকে প্রকাশিত,
'বর্ণনা', ৬/৭ বিজয়গড়, কলকাতা - ৩২ থেকে অক্ষরবিন্যস্ত ও
'বর্ণনা প্রকাশনী', ৪/১০এ বিজয়গড়, কলকাতা - ৩২ থেকে মুদ্রিত।

অপ্রকাশিত কবিতা

ভাস্কর চক্রবর্তী

ভাস্কর চক্রবর্তী

ওই মিষ্টি মেয়েটি দেখছেন
বিনুনি দুলিয়ে হাসছে —
ওকে ছেড়ে চলে যেতে হবে!

ওই ভদ্রমহিলা ওই যে
রাঁধুনীকে বলছেন : মাসি, আরো ডালবড়া ভাজুন
ওকে ছেড়ে চলে যেতে হবে!

ছেড়ে যেতে হবে এইসব বাড়িঘর,
রাস্তার চায়ের গুমটি —
সাধের কবিতা লেখা ছেড়ে
চলে যেতে হবে।

তবু একবারো তুমি আজ কেঁপে উঠবে না!

ছেড়ে যেতে হবে যাবো,
এতদিন তবু তো ছিলাম। ১৯.৯.২০০৪

(সকালবেলা)

কয়েকটি কথা

শেষপর্যন্ত ভাস্করের একটি নামহীন কবিতা রাহুলকে দিতে পারলাম। গত বছর অর্থাৎ ২০০৪ সালের ডায়েরিতে ছিল এই কবিতাটা। কাটাকুটিতে ভরা এবং পরিমার্জনাহীন অবস্থায় — হয়তো কবিতাটার স্থান হত বাতিল কবিতার ফাইলে। ভাস্কর সেই সময় হয়তো করে উঠতে পারেননি। অপ্রকাশিত কবিতাটা আবিষ্কার করে 'বিভাব'-এ দেবার কথাই মনে আসে হঠাৎ করে। ২০০৫ সালের প্রথম কয়েকমাস রাহুল প্রায়ই টেলিফোন করত — 'বিভাব-এর জন্যে কবিতা চাই' — এই অনুরোধ জানিয়ে। মনে পড়ে, বেশ কয়েকবার আমিই কথা বলেছি ওর সঙ্গে। তখন ভাস্কর কথা বলতে পারছেন না।

শেষপর্যন্ত অবশ্য কবিতাও আর দেওয়া হয়ে ওঠেনি। তখন আমাদের যন্ত্রণাময় সময়, ভাস্কর নিদারুণ অসুস্থ, অথচ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরেও রোগ ধরা পড়েনি। শেষমেশ ধরা পড়ল কালান্তক ব্যাধি — তারপরের ঘটনা সবাইয়েরই জানা, তাই পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

এই ঘটনার পর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সম্পাদক আমার কাছে ভাস্করের অপ্রকাশিত কবিতা চেয়েছেন, কিন্তু মাস দু-এক আমি ভাস্করের কবিতার খাতা, ডায়েরিতে হাত দিতে পারিনি। কিন্তু কতদিন আর সরিয়ে রাখব হাত? সময় যে বড়ো নির্মম, নিজের নিয়মে সে চলে আর দুঃখ ও যন্ত্রণার মধ্যে মানুষকেও চালনা করে। তাই একদিন অনেক কষ্টে শোককেপাশ কাটিয়ে, চোখের জল মুছে, ভাস্করের কবিতার খাতা, ডায়েরি, মেলে ধরি আমার চোখের সামনে— চমৎকার গোটা গোটা হাতের লেখার মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পাই কবি ভাস্কর চক্রবর্তীকে—'যেন অক্ষরসমুদ্র হয়ে শুয়ে' আছে 'মায়াবী শরীর!'

বাসবী চক্রবর্তী

পুনর্মুদ্রণ

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়-এর 'অজগরী' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল *অগ্রণী* পত্রিকার ষষ্ঠ বর্ষ পঞ্চম সংখ্যায়। প্রকাশকাল ছিল ভাদ্র ১৩৬০। *অগ্রণী*তে প্রথম প্রকাশের পর গল্পটি এ-পর্যন্ত অগ্রন্থিত ছিল। গল্পটির অস্তিত্ব জানা থাকলেও পাঠকদের এই গল্পটি ফিরে পড়বার কোনো সুযোগ ছিল না।

লেখকের ছোটো জামাতা সমীর চট্টোপাধ্যায় গল্পটি *অগ্রণী*-র পাতা থেকে উদ্ধার করে প্রকাশের জন্য, আমাদের হাতে এটির একটি প্রতিলিপি তুলে দেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রসঙ্গত দু-একটি কথা। *অগ্রণী*-র পাতায় প্রকাশিত গল্পটির বানানরীতি প্রাচীন ধরনের এবং প্রকাশিত পাঠ-এ প্রচুর অসঙ্গতি আছে। যতিচিহ্ন নিয়েও (প্রকাশিত পাঠ-এ) প্রচুর সন্দেহের অবকাশ আছে। আমরা বানান বর্তমান রীতি অনুযায়ী পরিবর্তিত করে অসঙ্গতি যথাসম্ভব দূর করার চেষ্টা করেছি। অজস্র গ্রাম্য শব্দ (মুসলিম বাক্‌রীতি অনুযায়ী) লেখক গল্পে ব্যবহার করেছেন। ব্যবহৃত সেই শব্দগুলিতে মুদ্রণপ্রমাদের জন্য (আমরা নিশ্চিত) আমাদের আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও তাই কিছু অসঙ্গতি হয়তো রয়েই গেল। লেখকের অবর্তমানে আজ তা হয়তো পুরোপুরি দূর করা সম্ভবও নয়। কিন্তু আমরা নিশ্চিত গল্পের রসগ্রহণে তা কখনোই বাধা হয়ে উঠবে না। পাঠক সেই প্রতিশ্রুতিটুকু (গল্পটি তাঁর একুশ বছর বয়সের রচনা) চিনে নিতে পারবেন যা পরবর্তীকালে মহীরূহ হয়ে উঠেছিল।

রাহুল সেন

অজগরী

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

নেহালগঞ্জে যখন প্রথম সে ঢোকে তখন কাঁধে ছিল ঝালর পালকি আর মাথায় ছিল সূর্য। পালকি-বেয়ারা জোনাবালির আঁটো গড়ন আর শাপলা মাছের মতো চ্যাপ্টা কাটা পায়ের চলন দেখেই সবাই তাকে ঠেলে দিয়েছিল পেছনে। যেদিকটায় জালার মতো ভুঁড়ি নিয়ে কদম আলী ঠালা চোখে হেলান দিয়ে গোঁপের পোশাকি লালচে রঙের চেকনাইটা আন্দাজ করছিল। তা-ছাড়া জোনাবালির উপায়ও ছিল না। দেনমোহরের পালকির গাওনাগীতের ফুরফুরানিতে সে যে অচল তা জানা ছিল তার। তাই সামনের দিকের ফাতনার মতো এক গণ্ডা ছোঁড়ার অবিচার মুখ বুজে সয়ে একাই বিসমিল্লা বলে পেছনটা কাঁধে তুলে নিয়েছিল। এলেমুদ্দিনের দাওয়ায় যখন পালকি ঢুকেছিল তখন গঞ্জগ্রাম ভেঙে পড়েছিল ওই ছোট্ট উঠোনে।

কিন্তু আজ সে এলেমুদ্দিনও নেই আর কদম আলীর কবর তো ভাটিগা ঝাড়ের আস্তানা। আছে শুধু কদম আলীর বিবি, আক্কেল। হাঁটা পায়ে জোনাবালির ঘরে এসে ঢুকেছিল আক্কেল বিবি, আর সঙ্গে সঙ্গেই যেন বে-আক্কেলা লক্ষ্মীও থুড়ি বলে জোনাবালির পৈঠায় বসে ভুল শুধরে নিয়েছে।

কিন্তু একটানা পঁচিশ বছর কাটিয়েও নেহালগঞ্জের জোয়াল তার ঘাড় থেকে নামল না। টঙ্গি নৌকোয় চুনের চালান দিয়ে পাঁচিল দেওয়া ঘর উঠল। টিনের ছাদের দু-কোণে মোরগ আর বাঁকা চাঁদের নকশা দেখা দিল। মুরগির খোপের মতো ঘর ভাগ হয়ে গেল তিন বিবিতে। জোনাবালি এখন তামাদি-তমসুক হাজা-সুখায় জমির বর্গা-বন্দোবস্ত দেখে। মাঝে মাঝে সদর মহকুমার যায় নাল লাগানো অক্সফোর্ড শ্যু পড়ে। পেশকার বাবুরা হেসে বলেন :

'কী, শেখ সাহেব যে— কী মনে করে?'

'আইজ্ঞা আপনাগো তল্লাটে আইসা পড়লাম, খলিলের গাবতলির ওই ঘেসো জমিনটার ডিক্রি দেলে...'

'আচ্ছা মিয়া সাহেব, এই যে আসো যাও, এতেও তো কম টাকা লাগে না — '

'হে আর ঠেকাই কিসে?'

'কেন, এখানে এসে থাকলে পারো, তোমার তো ফি-হপ্তায় একবার আসতেই হয়।'

'হ, তাইলেই হইছিল — এ আপনাগো তোলা উনান য্যান — বাতার চাল ফুটা — ল-ল ঘরে যাই — ফিন ঘরে ধোঁয়া ঢোকে ল হাইতনায় ল। অমন তিন তিনটা উনান মোর। এট্টায় ধোঁয়া ছাড়ে তো আরটায় ভুট্টুস কইরা নেভে — এ-ছাড়া সত্তর রকমের নাছোড়-পাছোড়, সে হয় না।'

সদর থেকে ডিক্রির কথাবার্তা সেরে সন্ধে নাগাদ গাঁয়ে ফেরবার পথে খলিলের জমিটা দেখবার ইচ্ছে মনে এল জোনাবের। একটু ঘুরপথে এগিয়েই জমিটা। সে অবস্থাপন্ন গাঁতিদার আর খলিল হল সানাই-এর বরকন্দাজ। সারা বছর খাটত আগে যখন কুলসুমের মা ছিল বেঁচে। ওলাবিবি কুলসুমের মাকে তো নিলই আর ওষুধপত্তরের খাই-খরচের জন্যে পুরো জমিটাই জোনাবালির চুনের গোলার খেরো খাতার কবলা-বন্দী হয়ে রইল। জোনাবালি সময়

দিয়েছে, কিন্তু চার চার বছরেও যে দিতে পারেনি, তার পক্ষে সারা জন্মেও শোধ দেওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া বড়ো ছেলে সফিকুল, 'আক্কেল বিবির পুত'—এখন গদিতে বসে। কবলা-বন্দী, লাট-বরখেলাপ সব মাজা-ঘষা ছাপ-সুরত চাই। 'নইলে আকু বিবি ছাড়ব?' শীতের কুয়াশা ভেদ করে চাঁদ ওঠে গোল হয়ে বাবলার মড়া ডালের ফাঁক দিয়ে। জোনাবালি তাকায় শুক্লপক্ষের ছাই-রং আকাশের দিকে। ভেজা ঘাসের সীমার শেষেই কড়াইশুঁটির ঝাড়। পাল দেবার জন্য এক জোড়া পাবনাই মোরগ নিয়ে ফিরছিল জোনাবালি। খলিলের কুঁড়ে থেকে আলো ছিটিয়ে পড়েছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় সে। ছালার চট জড়িয়ে বুড়ো খলিল শীত আটকায় আর কুলসুম গাবকাঠের আগুনে শীত বাঁচায়। মানকচু পাতায় ফেনা ভাতে গুড় মেশানো দু-মুঠো জাউ পড়ে আছে রাতের খোরাক।

'এই যে শেখ সাহেব'— খলিল অযাচিত অসময় উপস্থিতিতে শঙ্কিত হয়ে ওঠে।

কুলসুম ঘরে গিয়ে সেঁধোয়। ছিলিমটাক তামাক সেঁটে তবে জোনাবালি ওঠে।

'এ কী শেখ ছাহেব আপনের মোরগা রাইখ্যা গেলেন?'

'হ থাউক, মোর ওহানে খোঁটবে কী? এহানে তবু কলাই মটর মেলবে।'

চুপ করে যায় খলিল।

গাবকাঠের পুড়তি আগুনে কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এসে বসে কুলসুম। আড়চোখে তাকিয়ে থাকে মিলিয়ে যাওয়া জোনাবালির দিকে।

খলিল যখন চুনের গোলায় গিয়ে পৌঁছাল পরদিন, তখন বিকেল হয়ে এসেছে। শুকনো গাঙপাড়ে চড়াই-এর পাখসাট গ্রাম্য গোধূলিকে আরো মোহময় করে তোলে। সারাদিনের বিক্রিপাটের পর বন্ধ দোকানের পাটাতনের লণ্ঠন জ্বালিয়ে বসে থাকা জোনাবালি শেখকেও কম মোহময় মনে হয় না।

খলিল ঢুকতেই উঠে দাঁড়ায় সে।

'সবিরেই এত্তেলা দিলেন' — খলিল জড়সড় হয়ে পড়ে — 'তা মোর হাতে তো এহন ...'

'তোমাগো লইয়া পারা গেল না। দোস্তে দোস্তে বোলান কহন হয় না? দেখা সাক্ষাতেও কড়ি গোনন!'— খলিলের হাত ধরে বসিয়ে দেয় পাশে। তিন বিবির মহাপাটেশ্বরী আকুবিবিকেও কোনোদিন এত দোস্তি সহেলিয়ত করে কথা বলেনি জোনাবালি।

পালকি-বেহারা ইস্তক ঘাসিলালের মনোয়ারি নৌকো থেকে তেলের টিন মাথায় করে পাতলা কাঠের স্লিপারে সরীসৃপের মতো দুলে দুলে টাল সামলে ডাঙায় পৌঁছলে, তবে দু-পয়সা আর তা থেকেই চুনের গোলা, তিন বিবি। তাই কোথায় কতটা দুলতে হয় তা জোনাবালির অজানা নয়।

'এট্টা যুত সলা আছে।'

জোনাবালির চোখে মুখে চাপা হাসির থিরথিরানি। খলিল চোখ টান করে। জোনাবালি আবার শুরু করে — 'তোমার লাইগ্যা এট্টা শাদির বায়না জোটছে।'

'শাদি?'

'হ।'

'কার?'

'তোমার মাইয়া কুলসুমের।'

বাকিটা বলতে হয় না। খলিল একবার ভাবতে চেষ্টা করে। কাল রাতের আলোতেও দেখেছে — 'জোনাবালির চুল দাড়ি কই এত কালো কচি ছিল না তো?' নুয়ে পড়া খলিলের হাত দুটো ধরে ফেলে জোনাবালি।

'হ তোমার জমিনটা তোমারই, এই লও চিঠা-কবলা খালাস'— নকশি কাঁথার মেরজাইয়ের পকেট থেকেই নকল মহরত বের করে সে — 'আর অর্ধেক আগাম এই যৎকিঞ্চিৎ' — শেষের শব্দটা সদর কাছারিতে বহুবার শুনেছে ওকালতনামায় — কিন্তু আগামের অর্ধেক টাকার পরিমাণটা কিছু কম নয় — পুরোপুরি ছ-কুড়ি।

তারপরের ঘটনা নেহাতই মামুলি। কুলতলার খিড়কিতে যখন পালকি থেকে নাবল কুলসুম, তখন আকুবিবি ছাড়া সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। আতরজান তো আপেলপারা গালের রোশনাই দেখে আঙ্গুল মটকে ডান হাতের কবজিতে থুতু ঘষে নিল।

পেশকার বাবুরা সদরে ধরল জোনাবালিকে। 'মিঠাই কই শেখ?'

জোনাবালি নিয়েই গিয়েছিল চুপড়ি ভরে।

মুনসেফ কোর্টের নাজিরবাবু হেসে ফেলেন। 'মিয়া তিনটাতে কুলাইল না?'

'কুলাইব না ক্যান। তবে ছায়েব ওই তিনে, পাঁচে, সাতে হুজ্জত য্যারদা। জোড়ায় জোড়ায় থাকলে নিজেরা হাতাহাতি করে। মোর পরানডা জখমি কোন্দল থিকা বাঁচে। নইলে বেজোড়ের বাড়তি বিবি মোরে লইয়া পড়ে — তাই...'

'তাই বেজোড়কে চার বানিয়ে পুরো গণ্ডা অ্যাঁ...'

কিন্তু নিজের প্রাণ বাঁচানোর দায়ে কতটুকু কিংবা প্রাণের টানেই যে শেষ কিস্তির বিয়ে তা বোঝা গেল যখন নদীর পাড়ে নতুন চালা উঠল আর টিনের চালায় মিস্ত্রিরা পাতলা টিনে নকশা কেটে কেটে ময়ূর আর গোলাপের পাপড়ির নিশানা তুলল।

পুরানো বাড়ির দাওয়ায় দাঁড়ালেই সব চোখে পড়ে। গোলাপের একটা পাপড়ি ওঠে তো আর বিবিদের এক-একটা শাপমন্যির স্রোত দরগাতলার নিচু বেদিকে ছাপিয়ে উঠতে চায়।

আকুবিবি কিন্তু ভারভার্তিক হেসে বলে—'ফতুজান, তা করলই বা, ওরও তো সাধ আহ্লাদ আছে।'

'আকুবিবি য্যান ক্যামনা!'— নিঃশব্দে বলে বসে ফতুজান।

কিন্তু আকুবিবিই সেদিন সব চেয়ে পেছিয়ে পড়ল। দুধ-কুয়াশা আকাশে পক্ষশেষের ক্ষয়িষ্ণু চাঁদখানাও এক টুকরো বিদ্রুপ হয়ে দেখা দেয়। আজ কুলসুমের দাওয়া থেকে সন্ধে সন্ধে গান ভেসে আসছে। জোনাবালি সদর থেকে একটা কলের গান কিনে এনেছে, সঙ্গে খান কয়েক রেকর্ড। আতর আর ফতুর পেছনে গোড়ালি উঁচিয়ে আকুবিবিও সব দেখে, শোনে। স্পষ্ট গান শোনা যায় :

'ভাবী ও ভাবী
ভাইজান আইছে বাড়িতে
পোলাউ চড়ছে হাড়িতে...'

হ্যাঁ, আরো কিছু চড়েছে। দূর থেকে খুশবাই ভেসে আসছে। আকুবিবি স্পষ্ট দেখে —

ঝালরবাতির আলোয় চক চক করে মাজা সারি সারি বদনা বসানো দাওয়ায়।

'ও আরো দোস্তি, শালা, ফুপার ইয়ারের আমদানি হইছে।'

সবার অলক্ষে ঘরে ঢুকে পড়ে আকু। খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে শুতে শুতে মাঝ রাত। সফিকুল দোকানেই শোয় আজকাল। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, শুয়ে শুয়ে ওদের গান বাজনা ঠুংরি ঠুনুন-এর আওয়াজ পাওয়া যায়। তারপর তাও মিলিয়ে যায়। তাল-পইঠা বিছানো নদীর ঘাট, নেহালগঞ্জের সব চেয়ে উঁচু মাদারগাছের মাথা ছুঁয়ে কুহেলিমাখা আধেক রাতে হিম হাওয়ার দমক ওঠে, আকুবিবির ঘরের কবাট ছিটিকিনি ঠেলে হাঁ হয়ে যায়। শুয়ে শুয়ে সে দেখে, দাওয়ার নীচের স্বল্প-পরিসর জমির কুমড়ো লতায় জ্যোৎস্নাক্লান্ত পাণ্ডু কুমড়োফুলের বেমানান পরিবেশনা। শতাব্দীর চার অংশের পুরো একভাগের বধূ জীবনের ঠালা চোখের সামনে শত-সহস্র আলোর স্তবক হয়ে হেসে লুটিয়ে পড়ে। ওই তো সেই চেনামুখ। চুনের গোলায় তখন আশশ্যাওড়ার জঙ্গলে পথ চলা দায়। কদম আলী বিবি নিয়ে দেশে ফিরবে ফিরবে করেও ফেরা হয়নি। 'নদীতে ডাক লইছে — দুই মাস পার হয় হয়।'

একদিন সকালে আকু দেখে দামাদের লুঙ্গি ঢাকা কোমরে শাদা শাদা পলেস্তরা, ঠিক নদীর পাড়ে বুড়ো এক্রামুদ্দিনের পচা ঘা-এর মতো। রোদ উঠতেই এলেমুদ্দিন জানল সব। গোটা দশেকের ভেতর মৌলা-হাফেজে দাওয়া ভরতি । আর বদরাগী কদম আলী তো প্রশ্নের সরবানে তিন তালাক দিয়ে খালাস। তখন এলেমুদ্দিনের হাত মাথায়। এমন নেড়া গঞ্জে খুঁতো শাদির বিবি কার খেয়া পায়।

খেয়াও পেল, মাঝিও পেল।

দু-জনায় যখন হেঁটে, ওই চুনের গোলা যে জায়গাটায়, ওখানে এসেছে, তখন চিরকেলে পিনিধানি আকুবিবি ওর পায়ের দিকে তাকায়।

'হ সেই শাপলা পায়া — মিয়া না পালকির লগে আইছিলা?'

'হ সঙ্গে লইয়া যামু বইলা!'

কথা অবশ্যি ফিসফিসেই হয়েছিল। কিন্তু তারপর আর লাজলজ্জার প্রশ্ন ওঠে না। — ওই তো আতরজান, ফতুজান, এক এক করে এল। এক একবার, কী জেরবারই না করছে এই আকুবিবির ধকলটা।

'ওই শাপলাপায়া আদেখলা খসমের মোরগা।'

'পান।'

'আকুবিবির হাতের সাজন না য্যান তোষখানার এলাচবাটি। যখন যশরের চিরুনি ওঠল বাজারে।'

তখন ওই তো কাঁচা বয়সের ফতু, না-না তাতে হয় না। 'অর হাত গাঙ্গের কলের নৌকার মতো চলে, চিরুনির দাঁতে লহু ফুইট্যা আসতে চায় — আকুবিবি এট্টু আহো — এই পাশের টেরিটা তোমার হাতে য্যান ময়ূরপঙ্খী হইয়া ছোটতে চায়।'

'বিবি?'

ছোট্ট একটি বউ নদীর পাড়ের মাটির বাঁধের ওপর দিয়ে হেঁটে যায়। পেছনে খড়ম পায়ে শাপলা পায়া।

চুনের গোলার তখন বছর খানেক হল পত্তন হয়েছে।

'এট্টু ধীরে চল, মুই যে পিছাই পড়ি।'

আরো জোরে হাঁটে ফুলপেড়ে কালোকোলো বিবি দমাস দমাস ঢেঁকির পাড় পেড়ে জোনাবালির বুকে।

পেছন থেকে শুনতে পায় আকু চেনা গলায় গান :

'ঠোনা নিয়া ঠোনা নিয়া ননদ গো
দাদায়রে তোমার অজগরায় পাইছে লো
বিবি ছোটে পরান লইয়া ও-ও-ও
হো ভস্মর কৌটা দিলের সনে
জখম হইয়া মরে গো ...ও-ও...'

সেদিন সত্যিই আকু পিছিয়ে গিয়ে জোনাবের হাত ধরেছিল। ঘাটে বাঁধা কেরায়া নৌকোয় শৌখিন বাবরিধারী কে একজন হেসে গেয়ে উঠেছিল —

'ও অজগরী ধরছে এইবার ভস্মর কৌটার ডালা
পরান চাইস তো খসম এইবার আটলুঙ্গিতে পালা —'

তৃতীয়কণ্ঠ কানে বাজতেই সেখান থেকে দু-জনায় দে-ছুট।

শেষরাতের স্বপ্নের ভেতরেই আকুবিবির কালিপড়া চোখের নীচে ধুতরো চামড়া কোঁচকায়। হাসে কি না বোঝা যায় না। হয়তো গত রাতের কলের গানের স্মৃতি সেদিনের নদীর বাঁধের অজগরী ছড়ার পাশে তাচ্ছিল্যের বিদ্রূপে ম্লান হয়ে যায় — 'হঃ, খোদ গলার গাওন আর...'

'আকুবিবি — ওঠো।'

সুখস্বপ্ন দিনের আলোয় খরখরে রোদেও ম্লান হতে চায় না। মোরগগুলো পাঁচিলে উঠে পড়েছে। জামতলায় ছাগল কী খুঁটে খুঁটে ফেরে। 'ওই দ্যাখো জোড়ন চলছে।'— ফতুই দেখায়।

হাঁটু অব্দি লাল মেরজাই, পায়ে অক্সফোর্ড শ্যু, প্রতি পদক্ষেপে বাঁধের নরম মাটিতে দাগ কেটে চলেছে লোহার নালে নালে। হাতে লাঠি। পাশে কুলসুম। বোরখার আদত, ঢাকনা খোলা আপেলমুখে সূর্যের ছয় রঙের ছেনালি — ওই দাওয়ায় ঢুকল।

সবির চৌকি ইদানীং বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে জোনাবালির অভ্যেসে দাঁড়িয়েছিল। তবে একা একাই বেরুত — গোলা তো সফিকুলের জিম্মায়।

শেষরাতের শুভ্র ফেনিল স্মৃতি সাগরের ছোটো ঢেউগুলো মানোয়ারি বজরার পিছল পাটাতনে ভেঙে পড়ে। আকু মুখ ঘুরিয়ে কাজে যায়।

পরের মাঘে ফতুজান তালাক দিয়ে নদীর ওপারে মফেজুদ্দিনের মাঠকোঠায় উঠল। তার আর কী! ঝাড়া হাত-পা। যাবার সময় বলে গেল —

'আকুদিদি, লাজ লজ্জার মাথা খাইয়া দাঁতে দাঁত দিয়া পড়িয়া থাকনের কাম?'

আকুর স্থির মুখচিত্রে এক টুকরো হাসির জোনাকি জ্বলেই নিভে গেল।

কিন্তু আতরজান যাবার সময় কিছু বলে যেতে পারেনি। ফুরসত কোথায়? এক রাতের

ওলাওঠায় যখন শেষবারের মতো চোখ বড়ো বড়ো করে চাইল, তখন আকুবিবি ঝুঁকে পড়েছে মুখের ওপর। কিন্তু কথার বদলে শুধু নিঃসাড় হাতের আঙুল বেঁকে বেঁকে পেছনের নতুন চালা দেখিয়েছিল শুধু।

ফতুজান এসে নিয়ে যায় আঁটকুড়ি আতরবিবির শেষ বয়েসের নুরুন্নেসাকে। সফিকুলই এবার অগ্রণী হয়ে আসে।

'আম্মাজান, চল মোরা চর-মোনাইতেই যাই।'

'হ, ভদর ভদর করিস না, গোলায় যা।'

কিন্তু গোলায় যাবে কী করে। আতর আম্মার নামে গোলার চিঠা। আতরের এন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গেই চিঠার বদল হয়েছে। সানাই-এর বরকন্দাজ খলিল এখন চুনের চুলোর গাঁতিদার। সদর কাছারির নথিতে অদল বদল হয়েছে—

'লাট নেহালগঞ্জ।'

চুনের গোলার স্বত্ব — কুলসুম বানু।

কেঠোয় দাঁড়িয়ে গোঁজ হয়ে সব শুনল আকুবিবি। বিকেলে গরুর গাড়ি এল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বেঁকে বসল —

'তুই-ই যা, হাঁটা পায়ে ঢুকছি, বাইরামু কাফন গায়ে।' সফিকুলের দাঁড়ালে চলে না। মাসে মাসে টাকা আসে আকুর নামে। 'সফিকুল সেয়ানা পোলা।'

খবর যে একেবারে পায়নি জোনাবালি তা নয়। সেদিন নাস্তার পর কুলসুম এসে বাজু ধরে দাঁড়ায়।

'কী বিবি, মতিমালার ছড়া দিমু তো কইলাম?'

একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকে কুলসুম। যেন 'শুনতে পাইনি'— এমন গোছের ভাব। পরে কথাটা প্রকাশ পায়। দাওয়ায় খলিল বসে। আজকাল এখানেই থাকে খলিল। চুনের গোলার কথাটা ওঠে। দু-দিন আখায় ছাই জমে। তারপর সদরে চিঠা পালটায়।

মন্দ লাগে না কুলসুমকে। গাবতলির মাঠের কুলসুম আর নেই। আরো লালচে হয়েছে রঙের চেকনাই। কষ্টিকালো জোনাবালির চোখের কোনাই শুধু লাল হয়েছে নিয়মিত সান্ধ্য আসরের সুরমা-লাঞ্ছনায়।

এই তো সেদিনের কথা।

বিকেল বিকেল সদর থেকে ফেরে জোনাব। পেছনে হাঁটু অব্দি মোজায় ঢাকা পায়ে বাটার রবার শ্যু, খাকি হাফ শার্টে প্যান্টে মোড়া এরফান সাহেব, কলের গান কোম্পানির ট্রায়ালবাবু। কামলা কাহারের মাথায় রেকর্ড আর বাক্সে কলের গানের মেসিন। আগে ভাগেই দোস্তদের 'মাইজবান' দেওয়া আছে। সন্ধে সন্ধে আসবে সবাই। ট্রায়ালবাবু এরফান সাহেব জোনাবালির অনুরোধেই এসেছেন। জোনাবালি স্বীকার করেছে — 'কী জানি, যন্তর কখন বিগড়ায় কে জানে, আপনে চলেন এরফান ছাহেব, সদর থিকা নেহালগঞ্জ এক পহরের রাস্তা।'

এরফান চলেই এসেছে। নেহালগঞ্জের নদীর ঘাটে নামে ওরা।

'এরফান ছাব, এট্টু ত্বরা করেন।'

খুশির দমকে নদীর ঘাট থেকে দাওয়ায় পৌঁছুতে কয়েক পলক। খলিল দিনে দিনেই বাতি জ্বালিয়েছে, তারপর ফুলকাটা মাদুরে বসে এরফান সাহেব কলের গানের হ্যান্ডেল ঘোরান :

'গুড়ুম গুড়ুম দেয়া ডাকে,
ডাকে দেয়া আসমানে।
চপ চপাইয়া পানি পড়ে,
নাগর আসবে কেমনে?'

নেহালগঞ্জের নবতম বিস্ময় এরফান সাহেবের হাতের করিতকর্মায় ক্রীতদাস হয়েছে। মিনাজ, সবুর, জোনাব গালে হাত লাগিয়ে বসে থাকে। ঘরের চৌকাঠে নখ খুঁটতে খুঁটতে সারা মুখে লাল আবির ছড়িয়ে তেড়া কাঁধের নীচের খাকি কাপড়ে ঢাকা লোকটার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কুলসুম। খেতে বসে সবাই বলে এরফান সাহেবের পাতে ; জোনাবালিও এতদিন পরে সাড়া পায় যেন। মাসিক পনেরো টাকা মাইনের শহুরে চাকরি, তাও আবার কলের গান বিক্রি কম হলে তিন মাস পরে একমাসের মাইনেও জোটে না। তাই জোনাবালির অনুরোধে এক কথাতেই রাজি হলেন এরফান সাহেব। খলিলের একজন সঙ্গী চাই তো। এরফান সাহেবও নেহালগঞ্জবাসী হলেন।

খাসজমির আয়ে বেশ চলছিল জোনাবালির। তার ওপরে চুনের গোলার টাকাটাও যোগ হচ্ছিল। রাত নামে নেহালগঞ্জের আকাশে। পুরোনো বাড়ির পাঁচিলে জিন হুরি আটকানো প্রদীপ জ্বলে। নতুন চালার ঝালরবাতি নেভে অনেক রাতে।

কাঁচা-পাকা বুকের লোমে মুখ গোঁজে কুলসুম।

শ্লথ হাতের গাঁথুনি উপচে বিবি উথলায়।

'এরফান ছাহেব আওনে ভালোই হইছে।' কুলসুমকে কাছে টানে জোনাব।

'হ, ড্যাবড্যাবাইয়া চক্ষু পাড়ে । মোর য্যান ক্যামনা লাগে।'— কুলসুম মাখন হয়ে গলে যায়।

'সদরের সহবতই অমন। নইলে আদমি সাচ্চা।'— কথা গড়িয়ে থেমে পড়ে জোনবালির ঠোঁটে।

নেহালগঞ্জের স্বভাবের কালোকোলো মসৃণ চামড়ায় এক পরত মেচেতা পড়েছে। এরফান সাহেব বাদাম গাছতলায় মাটির হাঁড়িতে চা বসান আজকাল। জোনাব সদরে দু-এক ভাঁড় চেখে দেখেনি তা নয়, তবে এখন অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। কুলসুমও আজকাল বেশ চা বানায়। এরফান সাহেব তো বলেন —

'জোনাব ছাহেব, আপনের বিবির চায়ের হাত না য্যান সিরনির ভিয়ানকাঠি। কন তো এট্টা ব্যবসা ফাঁন্দি সদরে; আমি বাজামু কলের গান আর বিবিতে বাঁটবে চা। এই কইলাম, আপনের সাত চুনের গোলায়ও অত টাকা আইব না।' জোনাব শুধু হেসেছে কুলসুমের দিকে তাকিয়ে।

আজকাল দাওয়াতেই মাদুর পড়ে । সন্ধে সন্ধে খাওয়াদাওয়া শেষ। দাওয়ার সামনে বকফুল গাছে জ্যোৎস্নার ফিনিক অজস্র আলোর টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। সদরের গালগল্পে

প্রতিটি খুঁটিনাটি এখন কুলসুমবানুরও মুখস্ত।

টকির গল্পটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শোনে কুলসুম। জোনাবালি গেছে সদরে। হাত-দা দিয়ে ছোটো ছোটো চেলাকাঠ বানিয়ে রাখছিলেন এরফান সাহেব। খলিল গোলা থেকে ফেরেনি। এখন কুলসুম ডাল সম্বরা দিয়ে কাঠের হাতাটা ধুতে বেরিয়েছিল।

'চা হবেনি?'

এরফান ঘুরে বসে। চেককাটা লুঙ্গিটা ঢিলেঢালা করে পরা।

'হ, বিবির যখন মন লইছে — '

'হ, আপনের সকল কথাতেই...'

'ক্যান, কথাটায় বেয়াদবি কী দ্যাখলেন?' কপট হাসি, এরফান সাহেবের চোখে।

'তয় কইলাম আপনের লগে কথা কহম না —'

'এই এই দ্যাখলেন, বোঝতে পারছি, টকির গল্পটা শোনন চাই, ডাইলটা নামাইয়া আহেন, মুই চা বসাইছি, কলাই বাটিটা আনবেন।'

এইই চাইছিল কুলসুম। প্রজাপতি হয়ে ঘরে ঢোকে সে। ডালটাই বাকি ছিল শুধু। দু-বাটি চা ঢেলে খড়ম জোড়ার ওপর উবু হয়ে বসেন এরফান সাহেব। দাওয়ার পৈঠায় হাঁটুর ওপর চিবুক রেখে বসে কুলসুম। উল্লাসিনী সিনেমার দু-আনা টিকিটের গল্প শুরু হয় —

'তয় বাদশা দেখেন রোজ দুফারে চিড়িয়া আসে যায়। আসমানে চিড়িয়া ওড়ে তো হারেমের তিসরা অন্দর ফাঁকা। গুলাস বেগম সাত মহল্লার ছাদে। বাদশার কথার খেলাপ হয়। কামে মন নাই। বিচারে দিশা নাই। বাদশা একরোজ মর্দা বাজ ছাড়েন আসমানে। হয়, মন বোলাইছে, এ ইশক-এর কারবার...'

এরফান সাহেব এক মুহূর্ত থেমে কুলসুমের মুখের দিকে তাকান। কী-এক মোহময় আবেগে নিথর কুলসুম।

'হ্যাঁ, সে বাদশা কী করলেন?'— জানতে চায় কুলসুম।

'তয় বাদশা নহবতখানার জোয়ান বাঁশিওয়ালারে বোলান...'

'বোলাইয়া উপরে কাঁটা নীচে কাঁটা দিয়া...' কুলসুম জুড়ে দেয়।

এরফান সাহেব মাথা নাড়েন — 'উঁহু, সদরের গীত গাওনার ঢঙই আলাইদা। অ্যাঃ, খেল একখানা বটে। হুঃ, বাদশা বলেন— তুমহার ইশক সাচ্চা?'

জোয়ান বাঁশিওয়ালা কয় — 'বাদশার মিজাজ হয় তো সাবুদ লন। বাদশা সাবুদ লইলেন তিন কিস্তি। যখন ইশক-এর টান, সাচ্চা পেয়ার মহব্বতের জোয়ার লাগছে, তখন সাবুদ তো মজুদ হইবেই। তয় বাদশা কইলেন — "লও, ই গুলাপ বেগম তুমহার, আর এই এক কলস মোহর।" সেই চাঁদ আর চাঁদি লইয়া জোয়ান বাঁশিওয়ালা...'

মাঝপথেই থেমে পড়তে হয় এরফান সাহেবকে। ভারী মুখে বুটজুতোর কাদা ঝাড়তে ঝাড়তে দাওয়ায় ওঠে জোনাবালি। তাড়াতাড়ি উঠে বসে বদনা এগিয়ে দেয় কুলসুম। সব বুঝে উঠতে সময় লাগে একটু। জোনাবালিই রাতে বলে —

'ফতুবিবি, আতরজানের এন্তেকালের ফুটকুড়ি আওলাদ নুরুয়েসার খোরপোশের দাবিদার। সদরের হাকিম লুটিস দিছে। অ্যাঁ, সেই ফতু-র লয়া খসম মফেজুদ্দিন শেখের কাঠি নাড়ন চাড়ন। মফেজ্যার তেলতেলানি বাড়ছে।'

জোনাবালি ভাবে— 'সাক্ষী দিতে সকলেই আইল গেল, আকুবিবি আইলেন না।'

মফেজুদ্দিন শেখের কাঠি নাড়া থামাতে গিয়ে জোনাবালির খাসজমিটুকু মুনসিদের ঘরে কবলাবন্দী হল।

চুনের গোলার দু-নম্বর চুলোর কয়লা চুরি যায়। চুনের কাটতিও কমেছে। সন্ধের আসর অনেকদিন হল বসে না। রেকর্ডগুলো সব পুরোনো হয়ে গেছে। কলের গানের চোঙের মুখে মাকড়সার তাঁবু উঠেছে।

কয়লা চুরি যাওয়ার কথা ওঠাতে রাতের বেলা ফুঁসিয়ে ওঠে কুলসুম।

'বাজানরে শ্যাষকালে... হেইলে কোনদিন মোরেও বাদ দিবা না...হয়...'

সারাদিন সদরে হাঁটাহাঁটি। তারপর মামলা খরচের ডিক্রি ওঠেনি। মেজাজ খিঁচড়েই ছিল। মাজায় লুঙ্গি এঁটে চুলের ঝুঁটি ধরে টান মেরে ফেলে জোনাবালি :

'যা মাগি, মনের মাইনষের লগে প্যাচাল পাড় গিয়া!' কুলসুমের নাকের ওপরে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গোঁজ হয়ে মটকা মেরে শুয়ে থাকে সে। এতটা ভাবতে পারেনি কুলসুম। চোখ দিয়ে একটুও কান্না না বেরোনোতে অবাক হয়ে বসে রইল। নিজের ওপর রাগ হয় একবার! জ্যোৎস্না-ভেজা মাঠটার দিকে চোখ পড়ে। কাহারদের ছেড়ে দেওয়া মোষটা মস মস করে ঘাস খেয়ে ফেরে। জোনাবালির শেষের কথাটা যেন সারা গায়ে ছুঁচ হয়ে ফোটে কুলসুমের।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায় এরফান সাহেবের। দরজার কড়া নাড়াতে ঘুম ভেঙে যায়। দরজা খুলেই অবাক হন —

'অ্যাঁ বিবিজান। একী কান্দেন ক্যান?'

'নাঃ, শোন গিয়া আপনে।'— কুলসুম শক্ত হবার চেষ্টা করে।

তবুও দাঁড়িয়ে থাকেন এরফান সাহেব।

'যান, কইলাম শোন গিয়া।'— কুলসুমের গলায় আদেশের আমেজ। সকল অনুসন্ধিৎসার মুখে ছিপি এঁটে শুয়ে পড়েন এরফান সাহেব।

জ্যোৎস্নামোড়া ঠাণ্ডা দাওয়ায় শুয়ে ভাবতে থাকে কুলসুম। এরফান সেদিন কেমন হাসতে হাসতে বলল, সদরে সে বাজাবে কলের গান আর কুলসুমবানু চায়ের মালসায় হাতা নাড়বে।

ভোর ভোর বেরিয়ে পড়ে জোনাবালি। অনেক কাজ রয়েছে। পথে ফতুজানের 'লয়া খসমের' সঙ্গে দেখা।

'কে, জোনাব ছাহেব যে, আইজ সফিকুল আর তার বিবি আইব, পুরানো বাড়ি যান বুঝি?'

মুখ দিয়ে কথা সরে না জোনাবালির। হাঁটুর নীচের পা-টাও যেন ভারী হয়ে ওঠে। অবশ অস্তিত্বটাকে টেনে নিয়ে বাড়ি ফেরে। জুতোর ফিতে খুলতে বসে দাওয়ায়। গা-টাও যেন কেমন ম্যাজমেজে লাগে। আজ আর কাজে বেরুনোর ইচ্ছে নেই।

'এরফান ছাহেব, এট্টু চা লাগান, কাইল ঘুমে যুত হয় নাই; ও বিবি, গেলা কই, তামুক দাওনি।'

পাশের ঘর থেকে খলিল বেরিয়ে আসে। চোখ দুটো ফুলো ফুলো

'গোলায় শোও নাই রাইতে?' — রাগে রাগে প্রশ্ন করে জোনাবালি।

'হ, গোলায়ই শুইছি, বে-টাইমে বোখার আইছে তাই বাড়ি আইছি। সবির সবির এরফান সাব আর কুলসুম নৌকা কইরা সদরে গেল। সাক্ষী আছে কইল। আপনার নামে টঙ্কা লইয়া গেল। চা লাগব? দিতাছি।' — কী যেন বলি বলি করেও খলিল চুপ করে যায়।

হাত দুটো থেমে যায় জোনাবালির। ফিতে আর খোলা হয় না। হাঁটু দুমড়ে দাওয়ায় বসে পড়ে। শীতের মরা মেঘের মতো একটা রিক্ততা, একটা ক্লান্তি যেন হাত পায়ের গাঁটগুলোকে শিথিল করে দিয়েছে। দূরের ঘোড়ানিমের ছায়ায় ছায়ায় ছোটো-বড়ো ঠাণ্ডা মাটির ডাঙা, কালোমেঘ আর অনন্তমূলের চারার এক একটা ঝোপ, সালসার মতো সুগন্ধ ছড়িয়ে শীত - সকালের বাতাসে। ভাঙা শঙ্খের মতো কণ্ঠনালায় একটা ডেঁয়ো পিঁপড়ে উঠি উঠি করেও দাড়িতে আটকে গেছে। ধীরে-সুস্থে পিঁপড়েটাকে নাবিয়ে দেয় দাওয়ায়, সরে বসে রাস্তাও করে দেয়। বেলতলার বোবা ছাগলটা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

ধীরেসুস্থে ফিতেটা খুলে ফেলে জোনাবালি। জুতোজোড়া অনাদৃত দাওয়ায় একলা পড়ে থাকে। ঘরে এসে ফুলকাটা টিনের তোরঙ্গের ডালা খুলে ফেলে সে। কী ভেবে নতুন দেওয়া রঙের গন্ধ নেয় একবার। না। কেমন পুরোনো পুরোনো! নিজেই পছন্দ করে কিনে এনেছিল সদর থেকে, শাদির একমাসের ভেতরে, রোজ রাতে শোবার আগে একবার করে নরম তুলতুলে নাকের ডগা ডালায় ছুঁইয়ে গন্ধ নিত কুলসুমবানু, তার পরেই ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিত আলো।

আলগোছে কাঁথাটা বের করে তোরঙ্গ থেকে। গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ছ্যাঁচা বেড়ার দিকে পেছন ফিরে শুয়ে পড়ে জোনাবালি। শুয়ে শুয়েই খাটের নীচে চোখ পড়ে। কখন এসে চা দিয়ে গেছে খলিল, ঠাণ্ডা হিম হয়ে এক পরত সর পড়েছে।

আস্তে আস্তে কেমন নিঝুম হয়ে গেছে বাড়িটা। একটা মানুষের পায়ে চলার শব্দটুকুও নেই। দরজা ভেজানো, জানালা বন্ধ। ঘর কেমন ছায়াঘন, ঘোলাটে। চোখ তুলেই নাবিয়ে নেয় জোনাবালি।

গোটাকতক চড়ুই পাখি এতক্ষণ দাওয়ায় চাল খাচ্ছিল খুঁটে খুঁটে, তারাও কখন দেওয়ালের ফোকরে বাঁধা বাসার আশ্রয় নিয়েছে।

ভেজানো দরজা একটু আলগা হল, কবাটের কবজার একটু আওয়াজ হল, জোনাবালি মাথা না ফিরিয়েই বুঝতে পেরেছিল।

'চা ঠাণ্ডা করলেন?' — কেমন ছায়াভেজা গলা।

মুখ ফেরাতেই চোখে পড়ে গেল। জোনাব বলল — 'আইসো খলিল।'

খলিল দূরেই দাঁড়িয়ে থাকে। কেমন অবাক মনে হয় খলিলের। নেহালগঞ্জের চুনের চুলোর গাঁতিদার জোনাবালি, কবলাবন্ধকীর জোনাবালি শেখ, কেমন যেন হেলেঞ্চা লতার মতো মিইয়ে গেছে এক লহমায়। ফ্যাকাশে চোখ দুটো তুলে জোনাবালি ডাক দেয় — 'বসো খলিল ভাই, আইজকাল আপনে কহন ধরছ!'

মোচড়ানো কাঁথাটাকে গলা অব্দি টেনে দিয়ে বসে জোনাব। খলিল বসতে পারে না।

'সেকো বোখার দেখা দিছে। যাই আদা দিয়া পানি চড়াই। চুলায় আগুন রইছে এখনো।'

আবার সেই নিঝুম। নিমগাছের ডালে ক-টা কাক চিৎকার করছে ক্রমাগত। সমুখের রাস্তাটা দিয়ে সময় বুঝে ঠিক এখুনি কতকগুলো গরুর গাড়ি হাঁকাচ্ছে গাড়োয়ান।

জোনাবালি চোখ বুঁজে পড়ে রইল। খলিলের দেওয়া গরম জলও ফুরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। গলা শুকিয়ে কাঠ। পাশের ঘরে, খলিলও জ্বরের তোড়ে কেঁপে কেঁপে লেপ মুড়িয়ে শুয়ে পড়েছে। হাঁ-করা দরজাটা দিয়ে শীত-দুপুরের এক চিলতে রোদও মেঝেয় এসে গুড়ি-সুড়ি মেরে শুয়ে। কলসি গড়িয়ে ঠাণ্ডা জলে গলাটা ভিজোয় একবার। বিশৃঙ্খল স্নায়ুর মোড়ে মোড়ে শ্লথ মনের পাহারা বসিয়ে — অনেক কষ্টে ভাববার চেষ্টা করে জোনাবালি। 'সদরে তো কোনো মামলাই নাই! আসর বসাইয়া টকির গল্প। বাদশা চিড়িয়ার কিসসা, চাঁদ আর চাঁদির হাট। পুরা মালুম!' চিড়-খাওয়া ঠোঁট দু-খানাতেও এক টুকরো হাসি মিলিয়ে যায়।

আঁশফলের কালো পাতার ফাঁকে ফাঁকে রোদের কণা আলোর ঝুমঝুমি হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে; — ঠিক যেন ওই দূরের চুনের গোলার ছায়াধরা রূপালি বুক নিয়ে বয়ে যাওয়া খায়ুরি নদীর খুচরো ভেঙে-পড়া ঢেউয়ের মতো, চঞ্চল পানসির হালকা বৈঠার মাথায় মাথায়।

কতক্ষণ শুয়ে ছিল হিসাব নেই, হঠাৎ ঠুন ঠুন শব্দে চোখ মেলল। আবার চোখ দুটো বুজিয়ে নিল। কই কেউ না!

জোনাবালির পা-দুটো থর থর করে কাঁপল একবার, কিন্তু বিছানায় ফিরে গেল না। ফিরে দাঁড়িয়ে অনড় আঙুলগুলো দিয়ে অব্যবহৃত কলের গানের চোঙের মাকড়সার গড়ে ওঠা তাঁবুটা কেটে দিল। এরফান সাহেবের কাছে শেখা পদ্ধতিতে সাউন্ডবক্সে পিন পরালো, রেকর্ড চড়ালো, হ্যাণ্ডেল ঘুরালো। মাথার পেছনটা কেমন চিন চিন করে ওঠায় সাউন্ডবক্সের মাথাটা অসংলগ্নভাবে ঘুরন্ত রেকর্ডের ওপর থেকে তুলে নিল। মসৃণ কালো রেকর্ডে ফ্যাকাশে দাগ ফেলে থেমে পড়ে সাউন্ডবক্সটা। বিছানা থেকে উঠে আসতেই শক্তি অনেকটা ফুরিয়ে গিয়েছিল। যেটুকু বাকি ছিল, সেটুকুও রেকর্ডের দুর্বোধ্য শব্দ-যোজনায় নিঃশেষ। হাত কাঁপে, পা কাঁপে, চোখের পাতা কাঁপে। কোনোরকমে অস্থিহীন অস্তিত্বকে টেনে নিয়ে কাঁথার ঢাকনায় ঢাকা দেয়। বালিশটা চেপে ধরে জোনাবালি। ভন ভন মাছির গানে স্নায়ুতন্ত্রের শিরায় শিরায় অস্বস্তি আর অবসাদের জোয়ার নামে। খাটের নীচ দিয়ে নরম পায়ে কুলসুমের বিড়ালটা হেঁটে যায়। খপ করে ধরে ফেলে, কিন্তু কতকগুলো খসে পড়া রোঁয়ার আড়ালে লাফ দিয়ে জানলার শিক গলিয়ে পালিয়ে যায়। হাত ওঠে না। বিছানায় পড়ে রইল, ঝিম ধরে থামল আর মনে হল ওর নাক, চোখ, গলার ভেতরটা অব্দি শাদা শাদা রোঁয়ায় ঢেকে গেছে।

দূরের দিগন্ত জুড়ে পড়ে রয়েছে আলবাঁধা ঠাসা শাকসবজি। চোখ ফিরিয়ে নেয় জোনাবালি। কলসি থেকে জল গড়াতে গিয়ে হাত কেঁপে উঠেছিল থরথরিয়ে। হঠাৎ এসে বিছানায় গড়িয়ে পড়বার সময় চোখে পড়েনি। জল গড়িয়ে মেঝে থইথই। জোনাবালির পাণ্ডুর মুখ ভরে গেছে রক্তোচ্ছ্বাসে। অবিন্যস্ত চুলগুলো আবিল, রুক্ষ।

শ্রান্ত চোখ দুটো মেলল, কত পরে কতক্ষণ পরে হিসেব নেই, তখনো চেতনা আবিল স্বপ্নাচ্ছন্ন। অনেক বাইরে তাকাল। আঁশফল গাছের মাথায় শীত-কুয়াশা আকাশে আশাদীপ আশীর্বাদ দ্যোতনায় নিলীম। শিরীষ গাছের শুঁটি পেকেছে। সোনালি জ্যোৎস্নায় হালকা বাতাসে মোটা

ঘুঙুরের বোলের মতো বাজে। দূরে দেড়ঘোর আলোয় নদীর ঘাটে কাড়া-নাকাড়ার বোল কানে ভেসে আসে।

কাদের বরণবিবি ঘরে যায় যেন। গা থেকে কাঁথাটা ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল জোনাবালি। ঠিক সেই মুহূর্তে নিমগাছের ডালে সর সর ডানা ঝাপটানি শোনা গেল, জ্যোৎস্নাকাঙাল দুটো কোকিল বুঝি পাতার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে চায়; দূরে কেঁদে উঠল শীতার্ত একটা কুকুর, এক দমক হিম হাওয়ায় দরজাটা দড়াম করে বন্ধ হয়ে হাঁ হল ফের।

আর কিছু ভাবনার প্রয়োজন হল না। নেশালস সম্মোহিতকণ্ঠে জোনাবালি কী যেন বলে উঠল একবার অস্পষ্ট।

মাঠের ঢালু খাড়াই খাদ গর্ত ডিঙিয়ে দৌড়ে চলেছে। দূরের আলোটা ঘোলাটে আলেয়ার মতো কুয়াশায় দপ দপ করছে।

ওই তো সেই পুকুর। আতরজান তখনো আসেনি। আকু দাঁড়িয়ে থেকে কাটিয়েছিল। কেমন ইচ্ছে করে, অবশ গলায় পুরোনো চেনা পুকুরের এক ঢোঁক ঢালতে। মুখটা নাবিয়ে জলে ছোঁয়াল জোনাবালি।

গেরস্তের মুরগি তাড়িয়ে ফিরছিল একটা শিয়াল। নতুন শক্তি যেন ফিরে পায় হাতে। একটা ঢিল কুড়িয়ে নেয়, ছুঁড়ে মারে, শিয়ালটা পালিয়ে যায়।

'হয়, একা একা কদ্দিক সামলাইবে, মুরগি খাইবে না তো কী?'— অস্ফুটে গড়িয়ে আসে জোনাবালির ঠোঁটে।

হঠাৎ বাজনা বেজে ওঠে কানের পাশেই। আকুবিবি ছেলে-বউ বরণ করে ঘরে তুলছে। জোনাব ঘাপটি মেরে মিশে যায় কচুবনে। ঘামতে থাকে। তালুর তলায় জিব দিয়ে শব্দ করে একবার। সবাই দাওয়ায় ঢুকেছে। তারপর আস্তে আস্তে উৎসবের বাতি নিবতে নিবতে চাঁদ ঢল নিল। জোনাবের ফ্যাকাশে চোখে ছায়া নামল। ওই তো, কে যেন বেরিয়েছে দাওয়ায়। নিঝঝুম দাওয়া, সবাই ঘুমিয়ে, অনেকদিন পরে চেনা গলা শুনতে পায় জোনাবালি।

'মুরগিটা গেল কই? ও তোমেজ?'

'এইও!'

আকু পেছিয়ে যায়।

'এইও মুরগি, বিবি!'

হঠাৎ অনভ্যাসের হাতটা শাড়ির ঘের-টোপটাকে মাথায় তুলে দেয়। সবাই ঘুমিয়ে। দুটো পুরোনো ছায়া চেনা দাওয়ায় মিলিয়ে যায়। কোথাও শব্দ নেই।

ঘাড় ফিরিয়ে জোনাবালি তাকায় বাইরে দূরে, ফুটফুটে জ্যোৎস্নাতেও খুঁজে পায় না নতুন চালাটাকে।

মাঝরাতেও শিরীষ বোলে দোল নেমেছে ...

গল্প

প্রবন্ধ

বিশেষ রচনা

সমিরন

সৈয়দ শামসুল হক

গোলাম মোস্তফার কথার নড়চড় কোনোদিন হয় না। মৃত্যুকালেও হয় নাই। জলেশ্বরী বাজারে তার শাড়ির দোকান। তার খদ্দের সকলে, টাউনের মানুষ সকল, পাড়াপড়শি, সকলেই জানে মোস্তফা এক কথার মানুষ। এই শাড়ি টাঙ্গাইলের তো টাঙ্গাইলেরই। এই শাড়ি পাঁচশো পঁচাত্তর তো পাঁচশো পঁচাত্তরই। মোস্তফার দোকানে কথাও পাকা, জিনিসও পাকা। দামও এক দাম। খদ্দের বুঝে বাকিও দেয় সে। কিন্তু বাকি শোধ ঠিক টাইমে করা চাই। তাই বলে মন তার শক্ত নয়, যদিও বাইরে তার ভাবগম্ভীর লম্বা দাড়ি, শোভন মুখ দেখে অচিরে তা ঠাহর হয় না। যদি শোনে মেয়ের জন্যে প্রথম শাড়ি কিনতে এসেছে, বলার আগেই বিশ পঞ্চাশ টাকা কম রাখে। যদি দেখে, কোনো নারীর শাড়িটা পছন্দ খুব, কিন্তু টাকার টান! আমরা এমনও শুনেছি, শাড়িটা সে ওই টাকাতে দিয়েও দিয়েছে। আমরা যদি বলে উঠি, মুখের কথা বিশ্বাস করিলেন, চাচা? মোস্তফা বলে, জবান যদি কাঁইও খারাপ করে তো হিসাব দিবে তাঁই হাশরে!

এক সময়ে মোস্তফার দোকানই ছিল জলেশ্বরীর একমাত্র শাড়ির দোকান। ঈদে পরবে ভালো শাড়ি খোঁজ করছেন? মোস্তফার দোকান! বিবাহের বেনারসি চাই? মোস্তফার দোকানে চলো! হাতে টাকা নাই, মেয়ে এসেছে বাপের বাড়ি। বাকিতে শাড়ি পাওয়া যাবে মোস্তফার কাছে! বাজারে এখন নতুন অনেক শাড়ির দোকান হয়েছে। সেসব দোকান আলোয়, আয়নায় ঝলমল করে। ফিটফাট যুবক দোকানিরা নিজ দেহে শাড়ি জড়িয়ে ঢং করে দাঁড়ায়। কিন্তু মোস্তফার দোকান সেই সাবেক কালের। শান বাঁধা উঁচু মেঝে। তার ওপর ধবধবে সাদা চাদর পাতা। আর সকল দোকানের শোকেসে শাড়ি কাচের ঘেরে ঝরনার মতো শাড়ি ঝোলানো। মোস্তফার দোকানে বড়ো বড়ো ড্রয়ার-বন্দী শাড়ি। কী চাই, শুনে তবে শাড়ি বের করে মোস্তফা। শাড়ির পর শাড়ি মোস্তাফাই মেলন করে ধরে চাদরের ওপর। পুরুষ অঙ্গে শাড়ি জড়ানোর মতো বাচালতা তার কাছে নেই। শান বাঁধানো চত্বরটাই ফুলের বাগান হয়ে ওঠে শাড়িতে শাড়িতে।

মোস্তফার দোকানে আগে জ্বলত হ্যাজাক, এখন ইলেকট্রিকের বাতি। কিন্তু আর সব দোকানের মতো সে আলো তেজি নয়। খদ্দেরদের বসার জন্যে গদি-আঁটা বেঞ্চি বা চেয়ারও তার দোকানে নেই। চত্বরের ওপরেই থেবড়ে বসতে হয়। তবু তার দোকানে এখনো সেই আগের মতোই ভিড়। মোস্তফার কথা, খরিদ্দার টানি আনে ইলেকট্রিকের লাইট নয়, শোকেসের ভুজুং ভাজাং নয়, খরিদ্দার আসে মহাজনের ব্যবহার দেখিয়া! মোস্তফার ভদ্র ব্যবহার কাক পক্ষীও জানে। এটা কাব্যকথা নয়! তার দোকানের সামনে ইলেকট্রিকের তারে নির্ভয়ে দলে দলে কাক বসে। মোস্তফা তাদের মুড়ি ছিটিয়ে দেয় দু-বেলা। তার সত্যবাদিতার কথাও টাউনের নারীসকল জানে। ইন্ডিয়ার শাড়ি বলে বাংলাদেশের শাড়ি সে ঈদের বাজারে বিক্রি করে না।

মোস্তফার শাড়ির দোকান সেই পাকিস্তান আমলের। সেই সেবারের কথা, আমাদের তখন জন্মও হয় নাই। জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতা নিল, মোস্তফাও শাড়ির দোকান দিল জলেশ্বরীর

বাজারে। পাক শাড়িঘর। দোকানের মাঝখানে পাকা কাঠের থাম। সেই থামে ঝুলল আইয়ুব খানের ফটো। তারপর চান্দে চান্দে কত পূর্ণিমা অমাবস্যা যায়। বাংলাদেশ হয়। তখন কিছু নড়চড় হয়। দোকানের নাম বদল হয়। 'মুক্তি শাড়িঘর'! কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মোস্তফা দেখে, নামটির ভেতরে যেন মুক্তিযুদ্ধের গন্ধ। শহরের কোনো কোনো মানুষ আর তার দোকানে আসে না। তখন সে আরো একবার নাম বদল ঘটায় দোকানের। 'নব শাড়িঘর'।

মোস্তফা বলে, নবই তো বাহে, নব কালে নব দোকান, নব শাড়িঘর। আমরা যদি বলি, মুক্তিযুদ্ধটা তবে আপনিও অস্বীকার করিলেন, চাচা? মোস্তফা বলে, রাজনীতির আলোচনা তোমরা করেন, হামাকে হামার দোকান করিবার দ্যান! কিন্তু এ-গল্প রাজনীতির নয়। মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে কে পক্ষে আর কে বিপক্ষে সে-অবতারণা এই গল্পে নয়। এই গল্প মোস্তফার। মৃত্যুকালে তার একটি কথার সূত্রে এই গল্প শাড়ির মতো মেলন হবে আশা করি। শাড়ির অপর পিঠে নকশার মফস্বলটি থাকে আড়ালে। প্রকাশ্যে তা দেখাবার নয়। কিন্তু সেই নকশার অপর পিঠই থাকে অঙ্গের অধিক কাছে, একেবারে গাত্রস্পর্শ করে। শাড়ি যে পরে, সেই শুধু বোঝে। এ-গল্পের সমাপ্তিও কেবল মোস্তফার কাছেই সত্য হয়ে থেকে যাবে। জগতের পৃষ্ঠে এখনো আমরা যারা আছি, আমরা কেবল নকশার সদরটাই দেখি।

আমরা দেখতে পাই, মৃত্যুকালেও মোস্তফার কথার নড়চড় নেই। সে যা বলেছিল তা-ই হয়। আমার আয়ু ঠিক ঠিক চাইর-কুড়ি বচ্ছর! সাবেকি সেই কুড়ির হিসাব মোস্তফা কখনো ভোলে নাই। দোকানের আয় আমদানি জমাখরচ হাজার কি লাখের হিসাবে সে করে বটে, মুখের কথায় কুড়ির হিসাব তার বড়ো স্বচ্ছন্দে ফোটে। চার কুড়ি বছরের অধিক সে বাঁচবে না, এই কথা তার মুখে আমরাও অনেকে শুনেছি। আমরা জানি, কুড়ির হিসাবে যারা সংখ্যা গোনে তারা চার কুড়ির অধিক হিসাব করতে পারে না। জলেশ্বরীতে এ আমরা এখনো বহু বুড়াবুড়ির ভেতরে দেখতে পাই। আমরা ধরে নিই, চার কুড়ি বছরই সে মাত্র বাঁচবে, মোস্তফার এ-কথাটি কুড়ির হিসাব চার পর্যন্ত বলেই। কিন্তু একদিন সত্যি সত্যি নব শাড়িঘরের গোলাম মোস্তফা চার কুড়ি কিনা আশি বছর পুরো করেই এ-জগত থেকে বিদায় নেয়।

মৃত্যুকালে কোনো যন্ত্রণা হয় নাই তার। রোগভোগও এমন কিছুই নয়। তিনদিনের জ্বর। শীতের কাল। বুড়া মানুষের জ্বরজারি হওয়া এ-সময়ে আশ্চর্য কিছু নয়। বাড়ির কেউ মোস্তফার জ্বরটাকে আমলেও আনে নাই। ভাতের বদলে চিনি দিয়ে রুটির ব্যবস্থা মাত্র হয়। শরীরও এমন কিছু টসকায় নাই। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজও তার কাজা হয় নাই। ভরাভরতি সংসার তার। পাঁচ বেটা, তিন বেটি। দুই বেটা তো বাড়িতেই বাস করে বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে। বেটিরাও কোনো দূরবর্তী টাউনেও নয়। জলেশ্বরীতেই তারা। জ্বর এতই সামান্য, বেটি আর জামাইদের খবর দেবার দরকারও কেউ মনে করে নাই। বেটারাও যে যার ধান্দায়। একজনের মনোহারি দোকান, একজনের আলুপটলের পাইকারি কারবার, একজন লেবারের সরদার, বাকি দুইজন বাপের নব শাড়িঘরেই কাজ করে।

মৃত্যুর আগের রাতে মোস্তফা হঠাৎ চঞ্চল হয়ে বেটাবেটির খোঁজ করে। তারা কই? কোন্‌ঠে তারা? মোর সময় যে আর নাই! এ-কথায় সকলেই মনে করে, বুড়ার মৃত্যুভয় ছাড়া

আর কিছু নয়। সামান্য শীতের জ্বরে কী মানুষের এন্তেকাল হয়? রাত বড়ো অস্থিরতার ভেতর দিয়ে কাটে। এক কুড়ি বছর আগে মোস্তফার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছিল। সে যদি বেঁচে থাকত, তবে সে নিশ্চয় টের পেত, স্বামীর এখন শেষ সময়। তার চেয়ে ভালো আর কে জানত যে মোস্তফার যে-কথা সেই কাজ। কতবার এর প্রমাণ সে পেয়েছে। হায়, আজ সে নাই!

তবে, বেটারা ফজর কালেই ছুটে আসে। ছোটো বেটা মজিদ গিয়ে প্রথম খবর দেয় বড়োভাই বশারকে। বশারের বাড়ির পাশেই বড়ো বোন পারুলের বাড়ি। পারুলকে নিয়ে সে বাপের কাছে আসে। আর সব বেটা বেটি জামাইরাও এসে যায়। তখনো ফজরের জামাত বাজার মসজিদে ভাঙে নাই। শয্যাগত গোলাম মোস্তফা বিস্ফারিত চোখ মেলে বেটাবেটি জামাই প্রত্যেকের মুখ দেখে। তারা সকলে ঝুঁকে পড়ে বারবার বলে, বাপজান, কোন্ কষ্ট কন! এত কেনে উতলা হন? মোস্তফা এ-সব প্রশ্ন বা সান্ত্বনার কথা কানেও নেয় না, জবাবও দেয় না। একটিও কথা সে বলে না। তখন বেটাবেটিদের ভয় হয়, এবার বিশ্বাস যেন হয়, মৃত্যু তার আসন্নই, জবান তাই বন্ধ হয়ে গেছে। ক্রমে তার চোখ ছটফট করে ওঠে। একবার ঘরের ছাদের দিকে উলটে যায়, একবার দরোজার দিকে। সেই উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি প্রত্যেকের মুখের ওপর দিয়ে একবার দ্রুত অস্থির ঘুরে যায়। আবার দরোজায়। বেলা বাড়তে থাকে। ঘরের সাবেকি দেয়ালঘড়িতে সকাল আটটার ঘণ্টা বেজে ওঠে। অকস্মাৎ মোস্তফার স্বর ফোটে। ঘরঘর অস্পষ্ট সে-কথা। মৃত্যুপথগামী মানুষের চাপা বিকট সে স্বর। বালিশ থেকে ঈষৎ ব্যগ্রতায় মাথা তুলে মোস্তফা বলে ওঠে, মন পোড়ায়! সমিরনকে খবর দিও!

তারপর তার মাথা ঢলে পড়ে। মুহূর্তের ভেতরে চোখ ঘোলা হয়ে আসে। বড়ো বেটা বশার বাপের চোখের পাতায় হাত রাখতেই চোখের পাতা পড়ে যায়। মোস্তফা তার কথা রাখে। চার কুড়ি বছর পুরো করে সে এ-জগত থেকে চলে যায়। বড়ো বেটি পারুল আছাড় খেয়ে বাপের বুকের ওপর ভেঙে পড়ে। আর বেটা বেটিরাও ডুকরে ওঠে। ঘরময় কান্না আছড়ে পড়ে। কিন্তু জামাইদের তরফে কোনো শব্দ ওঠে না। জামাইদের মুখে আমরা ঘোর ভ্রূকুটি লক্ষ করে উঠি।

এ এমন নয় যে, মানুষজনের সেই প্রচলিত কথা — যম জামাই ভাগনা, এই তিন নয় আপনা! অতএব জামাইরা শ্বশুরের মৃত্যুতে কাঁদছে না! আসলে জামাই তিনটিই খুব ভালো পেয়েছিল মোস্তফা। বড়ো সম্মান করত তারা শ্বশুরকে। কিন্তু তিন জামাইয়েরই মনে এখন অভিন্ন এক বিষম খটকা। বেটাবেটি না হয় বাপের সিথানে আজরাইলের ছায়া দেখে তরাসে কিছু ভালো করে শোনে নাই, তারা তো শুনেছে। এ কী শুনল তারা! মন পোড়ায়? মন পোড়ায় মানে কী? কার জন্যে পোড়ায়? সমিরন? কে এই সমিরন?

কিন্তু নগদ কাজ হাতে। এ- সকল কথার অবকাশ নাই। কাজও কী কম? লাশের গোসল, কাফনের জোগাড়, জানাজা, দাফন। খবরও দিতে হয় বাজারে। গোসলের জন্যে মাতব্বর মানুষ খোঁজ করো। কুতুবুদ্দিনের মাজারের খাদেম সাহেবকে তালাশ করো, জানাজা তিনি পড়াবেন। এর ফাঁকে গোরস্তানে জায়গা পছন্দ করা চাই। তারপরে আছে গোর খোদা। বাঁশের জোগাড়। আছরের আগেই মাটি হওয়া চাই। লাশ বিলম্ব করা ঠিক নয়। বড়ো জামাই পারুলের

স্বামী আকমল মোস্তফার বড়ো বেটা বশারকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়।

তারপর ভালোভাবে সকলই শেষ হয়। জানাজাতেও বাজার ভেঙে মানুষ হয়। হো হো করে কাঁদে অনেকেই। মোস্তফার বিষয়ে ভালো ভালো কথা বলে প্রাচীনেরা। বাইরের মানুষ বড়ো আপশোস করে মানুষটার জন্যে। কিন্তু বাড়ির মানুষের কাছে ওই কথাটা শেষ হয় না। মন পোড়ায়! সমিরনকে খবর দিও!

গোরস্তান থেকে বাড়ি ফেরার পথেই বড়ো জামাই বলে ওঠে, আব্বা এ-কোন সমিরনের কথা কয়া গেইল হে! তার জন্যে বলে মন পোড়ায়! এ বড়ো কেমন কথা!

ছোটো জামাই শিমুলের স্বামী বলে, আরে নয় নয়! মুঁই ভাবিয়া দেখিছোঁ। সমিরন নামে শাড়ি বাইর হইছিল ঢাকা হতে। নারী সকলের বড়ো পছন্দের শাড়ি। শাড়ির দোকানদার তো! সেই সমিরন শাড়ির কথা আব্বাজান ভুলিবার পারে নাই!

পারুলের জামাই এত সহজে রহস্যের সমাধান স্বীকার করার লোক নয়। সে ভ্রু কুঁচকে বলে, সমিরন কী কোনো নারীর নাম হবার পারে না?

মাঝের বেটি বকুলের স্বামী শ্বশুরের প্রতি বড়ো ভক্তিমান। অবসরে গল্পের বই কবিতার বই দু-একখানা পড়ে। সে বলে, হবার তো পারে! কিন্তু এ-কথা নিয়া আন্দোলন না করো। আর কী কইতে কী কইছে আব্বা, তারে বা ঠিক কী? জগত হতে যাবার সময় মানুষের মন পোড়ায়, এটা কোনো আচ্চয্যের কথা নয়। সমিরন মানে হাওয়া বাতাস। এ-সব কথা বাতাসে ভাসিয়া যাওয়ায় ভালো!

যতই সে হাওয়া বাতাস বলুক, কথাটা মিলিয়ে যায় না অচিরে। বরং দিনে দিনে পাথরের মতো ভারী হয়ে ওঠে। বিশেষ করে বড়ো বেটা বশারের মনে। সে অবাক হয়ে যায়, বাপের ওই শেষ সময়ে যদিও পরিবারের তারা ভিন্ন আর কেউ উপস্থিত ছিলো না, কথাটা কী করে বাজারে সবার কানে গেল! সব দোকানে, সব আড্ডায় ওই এক কথা। সমিরন! শাড়ির নতুন দোকানগুলোতে বিশেষ করে খুব হাসাহাসি কানাকানি চলছে। সমিরন? আরে, খোঁজ করি দ্যাখো, সমিরন নামে রসের কেউ ছিল বুড়ার। বউ তো কুড়ি বচ্ছর আগে কব্বরে গেইছে। তা বলিয়া বুড়ার রস তো আর মরে নাই। রস ঢালিবে কোথায়? দ্যাখো কাউকে খুঁজিয়া নিছে। তারে নাম সমিরন!

জামাই তিনজন বাড়িতে এই বিবরণ দেয়। বউদের তারা জিগ্যেস করে, বাপের কোনো অচাল-কুচাল কী তারা লক্ষ করে নাই? পারুল বকুল শিমুল মোস্তফার তিন বেটি শরমে মরে যায়। তারাও তো স্পষ্টই শুনেছে বাপের মুখে কাতর কিন্তু মায়া মাখানো সেই নামটির উচ্চারণ। সমিরন! হতভম্ব তারাও। কার কথা কয়া গেইলো রে বাপজান?

বড়ো বেটা বশার দোকানে গিয়ে ছোটো দুই ভাইকে ধরে। এ রে, হাশেম! সমিরন বলি কাউকে চিনিস?

হাশেম মাথা নাড়ে। না, সে চেনে না। হাশেমের ওপরের ভাই কাশেম, সেও বলে, না! সমিরন বলি কাওকে তো চেনোঁ না!

বশার ধমক দিয়ে ওঠে, দোকানে তোরা বাপজানের সাথে এতকাল! মনে পড়ে না নারী

কোনো কী ঘুরি ঘুরি দোকানে আসিত?

দুই ভাই একসঙ্গে বলে ওঠে, নারী যারা আসিত তারা বাপজানের নাতিনের বয়স। নামও তাদের আপ টু ডেট। সমিরন নামটা তো তোমার আগিলা কালের নাম। এগুলা কথা পুছ করাও ঠিক নয়।

বশার বলে, তবে যে বাজারে এই নিয়া পাঁচ কথা হইছে, তার কী? তোরা কিছু শুনিস নাই?

এ-কথার পিঠে জীবনযাত্রার এক ঘোর কথা বলে ওঠে কাশেম, কত লোকে কত কথায় তো কয়! বাজারের কথা কান দেওয়া ঠিক নয়। তদুপরে চল্লিশ দিনও পার হয় নাই বাপজানের এন্তেকাল হইছে। এই সকল আন্দোলন যারা করে তারা মানুষ নয়।

কিন্তু মানুষ তাই বলে চুপ করে থাকে না। ক্রমে কথাটা ঘন পল্লবিত হয়ে ওঠে। নানা বিচিত্র কাহিনী ছড়ায় বাজারে।

কেউ বলে, সমিরন ছিল মোস্তফার গোপন প্রণয়ী।

কেউ বলে, শাড়ির নাম সমিরন।

সুপারির ব্যাপারী এক মহাপণ্ডিত বলে, সমিরনকে খবর দিয়ো নয়, কথাটা আসলে হইবে কমির অঙ্কে খবর দিয়ো। শাড়ি বিক্রির অঙ্ক কষি যদি দেখা যায় লাভের ভাগ কম, তবে সেই কমির খবর অবিলম্বে দিবার কইছে!

কেউ এক নতুন ব্যাখ্যা দেয়। আরে, তাজহাটের মহারাজার হাতির নাম ছিল সমিরন! সেই হাতিত চড়ি তাঁই আল্লার দরবারে যাইবে বলি শখ! কথায় আছে না, গরিব আমি হরিণ খাই, হাতিত চড়ি হাইগতে যাই!

আমরাও নানা অনুমান শুনি। নানা কথা। কত কথা। এ বড়ো নষ্ট সময়। দুষ্ট কথার আলোচনায় মানুষের এখন বড়ো উৎসাহ। অতীত না বিচার, বর্তমান না বিশ্লেষণ, মানুষকে একবার কোনোমতে মাটিতে আছাড় দিলেই কী যে সুখ মানুষের! গোলাম মোস্তফার পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ তলিয়ে যায়, রমজানের তিরিশ রোজা তলিয়ে যায়, যাকাতের উসুল মানুষ ভুলে যায়, মঙ্গার সময়ে তার দান খয়রাতের কথা বিস্মরণে যায়। রঙিলা মোস্তফার উদয় ঘটে বাজারের দোকানে দোকানে। আমরা আমাদের জলেশ্বরী বাজারের ভেতর দিয়ে হাঁটি। আমরা যেন স্পষ্টই কানে শুনতে পাই গুঞ্জন, সমিরন! সমিরন! সমিরনকে খবর দিয়ো! মন পোড়ায় হে মন পোড়ায়! মোস্তফার মন পোড়ায়!

সমস্ত অনুমান, সকল গুজব আর বিপুল গল্পরাশি ভেদ করে এক নারীমূর্তি ওঠে। নাম তার সমিরন। নব শাড়িঘরের লাল শাড়ি তার পিন্ধনে। সেই নারীটি যে কে, তা কার জানা নাই। নির্ণয়ই নাই। তার চেহারাটিও স্থির কোনো মানুষের নয়। যে যার কল্পনায় গড়ে নেয় নারীটির মুখ। তারই আয়নায় যেন বাজারের গুজবে গল্পে তামাশায় ঠাট্টায় গোলাম মোস্তফা নতুন চেহারা পায়। তার শাদা দাড়িতে কলপ পড়ে। সুতির শাদা পাঞ্জাবি রঙিন হয়ে ওঠে। মাথার কিশতি টুপি হাওয়ায় উড়ে যায়। তাকে কালী মন্দিরের পাশে মাগিপাড়ার দিকে হাঁটতে দেখা যায়। সেখানে সমিরন নামে কোনো বেশ্যা আছে কী নাই, ছিল কী ছিল না, বাজারের

কাছে সেটা কোনো বিষয় নয়। বাজার তাকে গলির ভেতরে সমিরনের কাছে পাঠায়। মসজিদে তারাবির নামাজের ছুতায় গোলাম মোস্তফা এখন লোকের মুখে মুখে সমিরন মাগির কোলে মাথা রেখে তার বগলে সুড়সুড়ি দেয়। সমিরনের খিলখিল হাসিতে ভেসে যায় জলেশ্বরীর বাজার।

এন্তেকালের চল্লিশ দিন পরে বিরাট ফতেহার আয়োজন করে গোলাম মোস্তফার পাঁচ বেটা তিন বেটির জামাই। আমরাও যাই। মৃত্যুর শোক থেকে বেরিয়ে আসবার উপায় তবে মহাভোজ! এই ভোজের অন্নগ্রহণ না করে আমরা জীবনের ভেতরে আবার প্রবেশ করতে পারি না। প্রবেশ করে বাজারের দোকানিরা, মহাজন সকল, প্রবেশ করে জগৎ। ফতেহায় গরুর ঝাল গোশত আর শাদা পোলাও, বুটের ডাল আর মিঠা দই, রগরগে রসালো করে তোলে আমাদের। এখন যদি নিষ্ক্রান্ত আমরা শোক থেকে, তবে আর এত ঢাকাঢাকি চাপাচাপি কেন হে? টিউবওয়েলের পানিতে খলবল করে হাত ধুতে ধুতে, হাতের আঠালো চর্বি সাবানে সরল করতে করতে মৌসুমি শাড়িঘরের যুবক মালিক সর্বজনের শোনার মতো করে বলে, আমার কাছে নিশ্চয় সম্বাদ আছে! কুড়ি বচ্ছর আগে বউ মরি যাবার পর বহুদিন হতেই মোস্তফা চাচা মাগিপাড়ায় যাইত সমিরনের ঘরে।

আমরা শুনেছি, চল্লিশ দিন পরে আত্মা এই জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি পায়। চল্লিশ দিন কবরের মাটির সিন্দুকে থাকে মানুষ। মুনকির নকির তাকে উর্দুতে পুছ করে, বোল্ তেরা রব কৌন? রাসুল কৌন? রব আমার আল্লা, লা শরিক আল্লা। রাসুল আমার মোহাম্মদ মুস্তাফা। জবাব পেয়ে ঠাণ্ডা হয় মাটি। তারপর মাটির গোর সেই সিন্দুকের দরোজা খুলে যায়। বেহেশতের বাগান থেকে মিঠে হাওয়া আসে।

কাফন জড়ানো গোলাম মোস্তফা উঠে বসে। তার স্মরণ হয়, এক কুড়ি বছর আগে স্ত্রীকে সে এই তো পাশেই কবর দিয়েছিল। তার সেই মাটি সিন্দুকের দরোজা সে খোলা দেখতে পায়। সে পাশের কবরে হামাগুড়ি দিয়ে যায়। ঘুম থেকে ডেকে তোলে স্ত্রীকে। এক কুড়ি বচ্ছর হয়া গেইলো, ঘুম যান এলাও? তারপর খলখল করে হাসতে হাসতে চল্লিশ দিনের মুর্দা গোলাম মোস্তফা বলে, হা রে, বশারের মা, কাণ্ড কী দেখিছিস? বশার হইল বাদে তোকে সবায় বশারের মা বলিয়া ডাকে। পারুল হইল বাদে নারীরা তোকে পারুলের মা বলিয়া বোলায়। মুইও একবার বশারের মা একবার পারুলের মা বোলাইতে বোলাইতে তোর আসল নাম বিস্মরণ হয়া যাই। জগত যে বিস্মরণ হইবে ইয়াতে আর আচ্চয্য কী, সমিরন!

যা হয়

দিব্যেন্দু পালিত

শুভা এখনো স্বপ্ন দেখে। সাধারণ স্বপ্ন, যার মধ্যে অভিনবত্ব কিছুই নেই। দু-ঘরের এই একা বাড়ির জানলায় দাঁড়িয়ে রাস্তা, লোকজন, রুচিৎ সাইকেল বা অটো কী ট্যাক্সি, মোটরের যাতায়াত দেখতে দেখতে অন্যমনস্কতার মধ্যে শুভা ভাবে, এই অন্ধ-বন্ধ জীবন থেকে কেউ একদিন তাকে বের করে নিয়ে যাবে। কোথায় তা সে জানে না, তবে নিশ্চিত কোথাও যেখানে বিশ্বনাথের মতো কেউ নেই — শুধু বয়স্ক ও বেরসিক বলেই নয়, শুভাকে যে প্রয়োজন ছাড়া আর কিছু ভাবে না। স্বপ্ন দেখে সেই পুরুষের, যার কাছে নিঃশর্তে সঁপে দিতে পারবে নিজেকে — নিজের শরীর, মন, সব কিছু।

কে সে? সে কী ধীরেশ, নাগালের মধ্যে বলেই যার মুখ মনে করে ইদানীং সে মাঝে মাঝে কল্পনায় ভাসিয়ে দেয় নিজেকে। মাস পাঁচেক আগে দোতলার ছোটো ফ্ল্যাটটায় ধীরেশ ভাড়াটে হয়ে আসবার পর থেকে এরকমও ভাবতে শুরু করেছে শুভা। বাড়িঅলার আত্মীয়, এখনো পাকা চাকরি না পেলেও কলেজে পার্ট-টাইম তো করে, নিজেরটা নিজে দিব্যি চালিয়ে নেয়। তা ছাড়া এখনো যুবক, বিশ্বনাথের মতো বুড়োটে নয়। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে যেদিন শুভার দিকে তাকিয়ে হেসেছিল, সেদিনই ওর শরীর থেকে নিঃসৃত যৌবনের গন্ধ পেয়েছিল শুভা।

কী ভাগ্যিস, বিশ্বনাথ বাড়ি ছিল না। ধীরেশ তাকে 'বউদি ' সম্বোধন করায় একটু বা ভয়-মেশানো বাঁকা হাসি হেসে শুভা বলেছিল,'তবু ভালো, মাসিমা বলেননি!' তারপর ধীরেশের অপ্রস্তুত ভাব দেখে জুড়ে দিয়েছিল , 'আমার নাম শুভা। তবে আপনার বিশ্বনাথবাবুর সামনে ওই নামে ডাকবেন না যেন।' স্বাভাবিকতায় ফিরে ধীরেশ বলেছিল, 'মনে থাকবে—

ভাবনাগুলো কোথাও নিয়ে যায় না। আজও দেয়ালের ঘড়িতে একটা বাজতে বাস্তবে ফিরে আসে শুভা। হঠাৎই খেয়াল হয় বিশ্বনাথের ফেরার সময় হল। এখন বাইরে তাকানো চলবে না, জানলাটা বন্ধ করে ফিরে যেতে হবে গরিব বাবার কাছ থেকে নগদ চল্লিশ হাজার টাকায় কেনা বিশ্বনাথের বিয়ে করা বউয়ের।

এখানে এনে তোলবার পর বিশ্বনাথ বলেছিল , ' নেহাত আগের বউটা মরে গেল বলে আবার বিয়ে করলাম। এই বয়সে শরীর একটু আরাম চায়। তা মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে তোলবার জন্যে মেয়ের বাপকে ক্যাশ টাকা দেওয়া হচ্ছে , এরকম শুনেছ কখনো? একটা খবরের কাগজ আসে বাড়িতে — পড়ে দেখো , পণের টাকা না পেয়ে ক-টা গৃহবধূকে খুন করা হচ্ছে রোজ! তোমার চেহারাটা মনে ধরে গেল, তাই উলটো খেলাটা খেললাম। তবে কোনো বেচাল যেন না দেখি, তা হলে আমিও সোজা খেলব না।'

এক নিঃশ্বাসে বলা বিশ্বনাথের কথাগুলোর প্রতিটি শব্দ এখনো মনে আছে শুভার। বাড়িতে আনতে না আনতেই কেন কথাগুলো বলেছিল বিশ্বনাথ? তাকে ভয় পাওয়ানোর জন্য, নাকি নিজেই ভয় পেয়েছিল? শুভা জানে না। তবে পাঁচ বছর ধরে এসব মনে পড়লে যেমন হয়, আজও তেমনি, বুকের মধ্যে নিঃশ্বাসের ভারটা টের পায় শুভা। বাসি খবরের

কাগজটা তুলে নেয় হাতে। খবরে চোখ রাখে, অনির্দিষ্টভাবেপাতা ওলটায়। বিশ্বনাথ না আসা পর্যন্ত এইভাবেই অপেক্ষা করতে হবে তাকে।

বিশ্বনাথ আসে এবং চলেও যায়। সে বেরিয়ে যাওয়ার পর আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে শুভা। আবার জানলায় গিয়ে দাঁড়ায়। এখনো দুপুর শেষ হয়নি বলেই সম্ভবত গরম লাগছে একটু, বন্ধ পাখাটা খুলে চুপচাপ বসে সহজ করে নেয় নিঃশ্বাস। তবু উথাল পাথাল লাগছে কেমন। বিশ্বনাথ সোজা খেলার ভয় দেখিয়েছিল সেই প্রথম দিনই, কিন্তু এতদিনেও সে কেন সাহসী হতে পারে না একটু! চল্লিশ হাজার টাকার দায় কী পাঁচ বছরেও মেটে না!

এখান থেকে ট্রাম-বাস রাস্তার দূরত্ব বড়োজোর মিনিট পাঁচেক। ঢিকুতে ঢিকুতে হাঁটলেও তা-ই। দুপুরবেলা, ট্রাম যে ঠিক সময়েই আসবে, তার কোনো মানে নেই। না হয় গেল আরো কয়েক মিনিট। বসে বসেই ভেবে নেয় শুভা, বিশ্বনাথ ট্রামে উঠেছে, সেকেন্ড ক্লাসের এক কোণে বসে ঝিমুতে ঝিমুতে পেরিয়ে যাচ্ছে একটার পর একটা স্টপ। ঝিমুলেও ট্রাম বাঁদিকে বাঁক নেওয়ার মুখে চটকা ভেঙে ঠিকই নেমে পড়বে, তারপর পায়ে হেঁটে আরো কিছুটা রাস্তা। এইভাবে কুড়ি মিনিট।

শুভা উঠল। ব্যস্ত হাতে জানলা বন্ধ করে, পোশাক বদলে, চাবি নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। ফেরবার হলে বা তার সম্পর্কে কোনো সন্দেহ দেখা দিলে এর মধ্যেই ফিরে আসত বিশ্বনাথ। আজ তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই। মাসের শুরু, দোকানে কেনাকেটা বেশি। নিজের গরজেই বিশ্বনাথ কিছুটা ব্যস্ত থাকবে।

শুভা এইরকমই অনুমান করেছিল। রোজগারের আগে অন্য কিছুকে স্থান দেওয়া বিশ্বনাথের স্বভাবের বাইরে। মাসের গোড়ায় পকেটে টাকা এলে বদলে যায় মুখচোখের চেহারা। তখন রুটিনমাফিক দুপুরের বিশ্রাম ভুলে চঞ্চল হয়ে ওঠে যুবকের মতো। নিতান্তই পেটে কিছু না পড়লে শরীর থাকে না, সেই জন্যই চার মাইল রাস্তা পেরিয়ে বাড়ি আসা। অবশ্য, শুভা জানে, বিশ্বনাথ যা বলে তা পুরোপুরি সত্যি নয়। খবরদারির বিষ মিশে গেছে ওর রক্তে। মাঝে মাঝেই চাগিয়ে ওঠে সন্দেহ। যুবতী স্ত্রীকে বাড়িতে একা রেখে নিশ্চিন্ত হতে পারে না।

দরজায় তালা লাগানোর পর দীর্ঘ বাতাস ঢুকে পড়ে শুভার বুকে। চঞ্চল হয়ে ওঠে নিঃশ্বাস। কিছু ভয় আর কিছুটা উত্তেজনা বুকে নিয়ে ক-মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে সে পা বাড়ায় ওপরের সিঁড়ির দিকে।

ধীরেশ আছে। বিশ্বনাথ বাড়িতে থাকতেই সিঁড়িতে ওর পায়ের শব্দ শুনেছিল শুভা। তখনই চিনেছিল। আশ্চর্য এই, শব্দের হেরফেরে শুভা আজকাল পরিষ্কার দু-জনকে চিনতে পারে আলাদা করে। নিজের ঘরে বসে এক হেমন্তের দুপুরে হাই তুলতে তুলতে হঠাৎই ধীরেশের পায়ের শব্দ তার কানে আসে, গেঁথে যায় মাথায়, মনে। তারপর আর ভুলতে পারে না।

অবশ্য বিশ্বনাথ তখনো বাড়িতে আছে অনুমান করেই সম্ভবত আজ ধীরেশের পায়ের শব্দ ছিল সতর্ক ও সাবধান। নতুন জুতোর চাপা মশমশানি তবু সে লুকোতে পারেনি।

তখন ঘোলের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে বিশ্বনাথ। কানে কম শোনে, সুতরাং ধীরেশের নিঃশব্দ আগমনে তার সন্দিগ্ধ হওয়ার কোনো কারণ নেই। ব্যাপারটা বেশ কৌতুককর। নিজের মনেই হেসেছিল শুভা।

ঘটনাটা তাকে নিয়েই, তবু ধীরেশ যেন বড়ো বেশি সাবধানী। সে ছাড়াও আরো কেউ তা হলে বিশ্বনাথকে ভয় পায়!

খুশিই হয় শুভা। মনে মনে সমর্থন করে নিজেকে। এখনো তো কিছু করছি না! গৃহত্যাগ নয়, সতীত্বের সর্বনাশও নয়— শুধু এই দৈর্ঘপ্রস্থে মাপা অচলায়তনের বাইরে মুক্ত আলো-হাওয়ায় কিছুক্ষণের নিশ্চিন্ত ভ্রমণ। নিজের ইচ্ছেমতো। বিশ্বনাথের সঙ্গে যেটুকু প্রতারণা তা শুধু সেইজন্যই।

বিশ্বনাথের দ্রুত প্রস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তখন থেকেই শুরু হয়ে যায় তার পরিকল্পিত ব্যস্ততা।

'রোজ রোজ ওইভাবে এসে আবার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়া। এমনকী তাড়া! একটু বিশ্রাম করে গেলেও তো পারো!'

বিশ্বনাথের গোঁফের ওপর সরু ঘোলের রেখা বিজকুড়ি কেটে হারিয়ে যায়। বাকিটুকু এক চুমুকে শেষ করে বলে, 'তাড়া করছি কী আর সাধে! আমি পৌঁছলে রমাপদ যাবে মাল আনতে। দোকান তো আর বন্ধ রাখা যায় না!'

শুভা তবু দমবার নয়। পরবর্তী কথার জন্য যেটুকু সময় লাগে নিয়ে একটু বা উদাসীন হয়ে ওঠে।

'একবেলা দোকান বন্ধ থাকলে কী এমন ক্ষতি!'

এই কথা বা এই ধরনের কথা সচরাচর বলে না শুভা। বললেও তার কথার মূল্য দেবে এমন মানুষ বিশ্বনাথ নয়। সত্যি বলতে, বিশ্বনাথকে যেন এবার একটু সন্দিগ্ধই হয়ে ওঠে।

'খুব যে দরদ দেখছি! গতর খাটিয়ে রোজগার করতে হলে বুঝতে কত ধানে কত চাল!' বিশ্বনাথ থামল একটু। তারপর বলল, 'তোমার আর কী! আমি গেলেই তো নাক ডাকিয়ে ঘুমোবে —!'

শুভার কাতর হওয়ার কোনো কারণ নেই। বরং সে আশ্বস্ত হয়, সবই চলেছে পরিকল্পনামতো। যদি বা একটু দেরি করত বিশ্বনাথ, এই কথার পর আর তা সম্ভব নয়। নিজের দায়িত্ববোধ প্রমাণ করতে বিশ্বনাথের এই চেষ্টায় মাঝে মাঝে করুণা বোধ করে শুভা।

ঘোলের গ্লাস নামিয়ে রেখে বিশ্বনাথ কুলকুচো করতে গেলে নিজেকে তৈরি করতে থাকে শুভা। এখন মুখের ভাবে কোনো আহ্লাদ মাখালে চলবে না। বিশ্বনাথ সন্দেহ করতে পারে। বরং ওকে বোঝানো দরকার, নগদ টাকায় কেনা স্ত্রী বলেই যখন তখন হেনস্থা করতে হবে, সেটা ঠিক নয়। তোমার যে-চুলোয় যেতে ইচ্ছে করে যেতে পারো। খাওয়া দাওয়ার পর পানটা অন্যদিন হাতে হাতে এগিয়ে দেয় শুভা আজ রেকাবে সাজিয়ে টেবিলের ওপরেই রাখল।

ওপর থেকে জল পড়ার ছড়ছড় শব্দ আসছে। ধীরেশ বোধহয় স্নান করতে ঢুকল। অন্যমনস্ক ভাব দেখিয়ে শুভা সেই শব্দ আড়াল করবার চেষ্টা করে। পুরুষ হলে এরকমই হয়— চিন্তার মধ্যে গঞ্জনা দিল ধীরেশকে। সিঁড়িতে পায়ের শব্দের ভয়েই তোমার যত সাবধানতা! সুবিধে এই, কানে কম শোনে বিশ্বনাথ। তা ছাড়া, স্ত্রী সম্পর্কে সন্দেহ হতে পারে, এমন কোনো প্রত্যক্ষ

প্রমাণও তো ওর হাতে নেই। যত হম্বিতম্বি সবই অনুমানের ওপর। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় শুভার, বিশ্বনাথ ধরেই নিয়েছে এই বয়সে ঘরে সুন্দরী স্ত্রী রাখতে হলে কারণে-অকারণে গরম-না হলে চলে না।

সত্যি বলতে, ব্যাপারটা তার গা-সওয়া হয়ে গেছে। বছর পাঁচেক আগে — বিয়ের ঠিক পর পর বিশ্বনাথের ব্যবহার তার দুর্ভাগ্যকে ঘন করে তুলত। চোখের জল ফেলত আড়ালে। পরে ভাগ্য ব্যাপারটা পুরোনো হতে হতে তাকে এমন জায়গায় নিয়ে এল , যেখানে অসহায় লাগলেও, ভাবত বয়স্ক বিশ্বনাথ তার দ্বিতীয় পক্ষের করুণাপ্রার্থী ভিন্ন আর কিছুই নয়।

নিতান্ত অসহনীয় না হলে বিশ্বনাথের ব্যবহারে শুভা এখন প্রায়ই কৌতুক অনুভব করে। আর করুণা। আহা, বড়ো ভুল জায়গায় খুঁটি পুঁতে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে লোকটা!

এই নিয়ে ধীরেশের সঙ্গেও তার কথাবার্তা কম হয়নি। অন্যের দৃষ্টি বাঁচিয়ে রঙ্গ-রসিকতার মুহূর্তে হলেও শুভার দুঃখ অনুভব করতে ভুল করেনি ধীরেশ।

'পছন্দ না হলে বেরিয়ে এলেই হয়।' ধীরেশ একদিন বলেছিল, 'আজকাল তো কতই হচ্ছে এরকম!' 'কার সঙ্গে বেরুব! একা ?' মুখ টিপে হেসেছিল শুভা। এই হাসিটুকুও আয়ত্ত করতে হয়েছে তাকে। ধীরেশ বলেছিল, 'একাই বা মন্দ কী! একা মানেই স্বাধীনতা। আর কিছু না হোক, দমবন্ধ হয়ে মরতে হবে না।'

শুভা জানে, এখন এর বেশি কিছু বলার নেই ধীরেশের। ওকে ভিতু বা গোবেচারা বলা যাবে না। কিন্তু ওর আগাগোড়া ব্যবহারের মধ্যে কোথায় যেন একটু বাধো-বাধো ভাব আছে। পুরুষমানুষ এত কুণ্ঠিত হলে চলে! এমনও মনে হয়েছে শুভার ধীরেশ হয়তো তাকে পছন্দের বেশি আর কিছু করে না। হয়তো শুভা তার কাছে এক পরিপূর্ণ যুবতী নয়, একজনের দ্বিতীয় পক্ষ মাত্র। হয়তো তার আনুগত্যের বেশিটাই সহানুভূতিপ্রসূত।

ব্যাপারটা ওখানেই চাপা পড়ে থাকে।

ধীরেশের সঙ্গে বেরোবার মুখে আজও শুভা এইসব ভাবল। ধীরেশকে সে মিথ্যে বলেছে এমন নয়। তখন নিরুপায় হলেও শেষপর্যন্ত বিশ্বনাথকে বিয়ে করার ব্যাপারে সে নিজেই আপত্তি করতে পারত। বেঁকে বসলে কে আর বাধ্য করত! সেদিন যখন স্বেচ্ছায় ভাগ্য মেনে নিয়েছে, আজ তা নিয়ে আক্ষেপ করে লাভ কী!

ধীরেশ তৈরিই ছিল। শুভা পৌঁছনো মাত্র ওরা বেরিয়ে পড়ে।

ফাল্গুন মাস। রোদ তেমন জোরালো নয়। মাঝে মাঝেই বসন্তের হাওয়া উড়ে আসে খেয়ালি ভঙ্গিতে। অনভ্যাসের জন্যই সম্ভবত, একটু হেঁটেই পায়ে টান ধরে শুভার।

ধীরেশ জিজ্ঞেস করে 'হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে?'

'না।' শুভার মুখে আলগা হাসি লেগেই থাকে। বলে, 'অনেকদিন পরে বেরুলাম। পা ছাড়াতে সময় লাগবে না!'

ধীরেশ তবু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। শুভার অসুবিধের কথা ভেবেই হোক বা অন্য কোনো কারণে, তাড়াতাড়ি একটা ট্যাক্সি ডাকে। শুভাকে ডেকে নেয়।

ট্যাক্সির এক কোণে শুভা, অন্য কোণে ধীরেশ — ইচ্ছে করেই যেন দূরত্ব বজায় রাখে ধীরেশ। অন্যমনস্কভাবে বলে, 'সিনেমার টিকিট কেটেছি। ম্যাটিনি। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে, ট্যাক্সি না ধরলে সময়ে পৌঁছতে পারব না।'

'আবার সিনেমা কেন!' ধীরেশের কথায় শুভা যেন ক্ষুব্ধ, 'আমার ইচ্ছে ছিল বাসে ট্রামে চড়ে অনেকক্ষণ ঘুরব বা ভিক্টোরিয়ায় বা গঙ্গার ধারে বসব খানিক। কাগজে পড়ছিলাম গঙ্গার ধারটা নাকি খুব সুন্দর সাজিয়েছে। সেখানেও যেতে পারতাম—'

'তা কী করে হয়!' অপ্রস্তুত গলা ধীরেশের, 'কলকাতা শহরকে বিশ্বাস নেই। কে কোথায় কখন দেখে ফেলবে!'

'আপনার অত ভয় কিসের!'

প্রশ্ন নয়, শুভার গলায় হতাশা। প্রায় ক্লান্ত ভঙ্গিতে ট্যাক্সির সিটে এলিয়ে দেয় নিজেকে। ধীরেশ ও তার মাঝখানের জায়গায় রাখা হাতটা কোলে টেনে নিয়ে , 'যে দেখলে কিছু হবে, সে এখন কোথায়!'

ধীরেশ জবাব দেয় না। কথাটা তার কানে গিয়েছে বা গেলেও সে কোনো গুরুত্ব দিয়েছে বলে মনে হয় না। শুধু একবার সামনে ঝুঁকে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে আরো একবার গন্তব্যের নির্দেশ দেওয়া ছাড়া ওর মুখে কোনো পরিবর্তন লক্ষ করে না শুভা। হাতে পেয়ে ধীরেশ যেন তার ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে।

অথচ ক্ষুব্ধ যে হবে তারও উপায় নেই। ধীরেশের ওপর দারুণ অভিমান করতে গিয়ে হঠাৎ ওকে কেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় শুভার। বুকের মধ্যে ফেনিয়ে ওঠা আবেগের মধ্যেও ভাবে, তা হলে এই লোকটার সঙ্গে বেরিয়ে এলাম কেন! বিশ্বনাথের সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায়? তা কী শুধু বয়সে? চেহারায়?

কখনো দেখবার সুযোগ না হলেও অন্যমনা শুভার চোখের ওপর দিয়ে এই মুহূর্তে যুবক বিশ্বনাথের মুখ ভেসে যায়। অন্যমনস্কতার ভিতরেই সে খেয়াল করে ট্যাক্সিটা ছুটছে হাওড়ার বিপরীত দিকে।

শুধু অস্বস্তি বা বিরক্তিই নয়, এক ধরনের শঙ্কাও হঠাৎ পেয়ে বসে শুভাকে। ধীরেশ তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? নিজেকে চোখ ঠেরে ওর সঙ্গে বেশি দূর এগোনো কী সমীচীন হবে!

কিছুটা অশোভন হলেও একটা উপায় হয়তো আছে। ট্যাক্সিটা থামিয়ে স্পষ্ট গলায় ধীরেশকে বলা যায়, 'আপনার সঙ্গে গিয়ে কাজ নেই। আমাকে ফিরে যেতে দিন।'

সন্দেহ কী, ধীরেশ খুবই অপ্রস্তুত হবে। অপমানের ধাক্কাটা সামলাতেও সময় নেবে কিছুক্ষণ। কিন্তু, তারপর? ধীরেশও যে বিশ্বনাথের ধরনে পালটা কিছু বলে বসবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়?

বলা যায় না , যদি হঠাৎ বলে, 'যাওয়া না-যাওয়াটা আপনার ইচ্ছে। আমি তো আপনাকে বের করে আনিনি! আপনার দরকারেই আপনি বেরিয়ে এসেছেন—'

না, সে-নাটকীয়তার সুযোগ ধীরেশকে দেওয়া যায় না।

খুব অসহায়ভাবে শুভা ধীরেশের পিছন পিছন সিনেমা হলের অন্ধকারে ঢুকে পড়ে।

বিভাব

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

১৪১১

কমলকুমার মজুমদার সংখ্যা

হার্ডব্যাক - ২৫০ টাকা

আঁকা ছবি

৬০টি অপ্রকাশিত বহুবর্ণ ছবি

বইয়ের রঙিন প্রচ্ছদ

প্রচ্ছদের খসড়া

কয়েকটি শাদা কালো ছবি

আলোকচিত্র

পারিবারিক অ্যালবাম (৪ বছর বয়স থেকে)

যৌবনে কমলকুমার

বন্ধু এবং ভাইবোনেদের সঙ্গে কমলকুমার

হরবোলা পর্বের ছবি

দরিদ্র শিশুদের শিক্ষাদানরত কমলকুমার

দুর্লভ 'উষ্ণীষ' এবং 'তদন্ত' পত্রিকার প্রচ্ছদ

প্রবন্ধ ও গল্প

১৪টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ (ইতিপূর্বে গ্রন্থে অসংকলিত) ও একটি গল্প

তথ্যচিত্র

লিখিত ৩টি তথ্যচিত্রের ভাষ্যের সম্পূর্ণ পাঠ

এ-ছাড়াও কমলকুমার নির্দেশিত নাটকের প্রচারপত্র, প্রবেশপত্র, শিশুপাঠ্য ইংরেজি গ্রন্থের অলংকরণ সহ আরো বহু কিছু।

অঙ্কভাবনা

দুর্লভ অঙ্কবিষয়ক পত্রিকার দুটি সংখ্যার সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রণ।

এখনো পাওয়া যাচ্ছে

যুধিষ্ঠিরের মিথ্যে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

তখন রাজা জনমেজয় অতিশয় বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এ আপনি কী বলছেন, দ্বিজোত্তম; যুধিষ্ঠির মিথ্যে কথা বলবেন?

বৈশম্পায়ন একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

তিনি যা বর্ণনা করছেন, তা তো অবশ্যই ঘটেছিল। এর মধ্যে কল্পিত কিছু নেই। তিনি কিছু বাদ দিতেও পারেন না। তিনি নিচু স্বরে বললেন, নিরূপায় হয়ে যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যে কথা বলতেই হয়েছিল। তা ছাড়া যে আত্মগোপনের কোনো উপায়ই ছিল না।

জনমেজয় বললেন, আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না। বংশানুক্রমে শুনে আসছি, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির আজীবন সত্যপরায়ণ। সত্য রক্ষার জন্য তিনি নিজের রাজ্য, এমনকী ভাইদেরও বিসর্জন দিতে রাজি ছিলেন। সেই তিনি মিথ্যে কথা বলবেন এত সামান্য কারণে?

বৈশম্পায়ন বললেন, সামান্য কারণ নয়। দ্যূতক্রীড়ায় সম্পূর্ণ পরাভূত হবার পর শর্ত ছিল, দ্বাদশ বর্ষ বনবাস এবং এক বৎসর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতবাসে কাটাতে হবে। অজ্ঞাতবাস করতে গেলে অন্য নাম ও অন্য পরিচয় গ্রহণ করতে হয়। সে সবই তো মিথ্যার সৃষ্টি। নিপুণভাবে মিথ্যা বলতে না পারলে যদি ধরা পড়ে যান, তা হলে যে আবার দ্বাদশবর্ষ বনবাসে কাটাতে হবে!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জনমেজয় বললেন, গল্পের মাঝখানে বাধা দেওয়া উচিত নয়। শুনি তা হলে কী রূপ মিথ্যা বললেন, যুধিষ্ঠির?

বৈশম্পায়ন বললেন, অজ্ঞাতবাস শুরু হবার সময় চার ভ্রাতা ও দ্রৌপদীকে নিয়ে যুধিষ্ঠির বেরিয়ে এলেন অরণ্য থেকে। কারণ কৌরবদের গুপ্তচররা তো সমস্ত অরণ্যদেশ চষে বেড়াচ্ছে। সবাইকে নিয়ে যুধিষ্ঠির এলেন বিরাট রাজার রাজধানীতে, দীন হীনের মতন পোশাক ধারণ করলেন সবাই, অস্ত্রশস্ত্র ও রাজবস্ত্র গোপনে লুকিয়ে রাখলেন এক বৃক্ষের কোটরে। তারপর প্রত্যেকে পৃথকভাবে ছড়িয়ে গেল বিভিন্ন দিকে।

যুধিষ্ঠির এসে উপস্থিত হলেন বিরাটরাজের রাজসভায়।

তাঁর ওরকম দেবদুর্লভ কান্তি দেখে বিস্মিত হয়ে বিরাটরাজ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে?

যুধিষ্ঠির বললেন, মহারাজ, আমি ব্যাঘ্রপদী গোত্রসম্ভূত ব্রাহ্মণ। আমার নাম কঙ্ক। আমি দ্যূতক্রীড়া খুব ভালো জানি। আমি আপনার মনোরঞ্জনের জন্য আপনার সভাসদ হতে চাই।

বিরাটরাজ তৎক্ষণাৎ সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন।

জনমেজয় জিজ্ঞেস করলেন, তারপর তিনি পুরো এক বছর এই মিথ্যে পরিচয়ে কাটালেন? নিশ্চয়ই আরো অনেক মিথ্যে কথা বলতে হয়েছিল?

বৈশম্পায়ন বললেন, অবশ্যই। তা ছাড়া তো উপায় ছিল না।

জনমেজয় বললেন, ঠিক আছে। এবার বলুন, অন্যরা কে কী করল।

বৈশম্পায়ন বললেন, এরপর দ্রৌপদী মাথার চুলে বেণী বেঁধে, একটিমাত্র মলিন বসনে

দেহ জড়িয়ে হাঁটতে লাগলেন পথে পথে। সবাই তাঁকে হাঁ করে দেখছে। বুঝতেই পারো, অমন রূপসী তো ছাই ঢাকা থাকে না। একসময় রাজমহিষী সুদেষ্ণা প্রাসাদের ছাদ থেকে দেখতে পেলেন তাঁকে। তিনিও মোহমুগ্ধ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ভদ্রে, তুমি কে?

দ্রৌপদী বললেন, আমি সৈরিন্ধ্রী। আমি চুল বাঁধা, বিভিন্ন ফুলের মালা গাঁথা, চন্দন লেপন, এইসব কাজ ভালো পারি। আমি কাজ খুঁজছি। আগে আমি সত্যভামা ও দ্রুপদকুমারীর সেবা করেছি।

বলাই বাহুল্য, রানি সুদেষ্ণা প্রথমটায় বিশ্বাস করলেন না!

একটু জল খেয়ে নিয়ে বৈশম্পায়ন আবার বললেন, তোমার কাছে আমি দ্রৌপদীর রূপ বর্ণনা আগেও করেছি। তুমি আবার শুনতে চাও? দ্রৌপদীকে দেখে রানি সুদেষ্ণার যা মনে হয়েছিল?

জনমেজয় বললেন, অবশ্যই শুনতে চাই!

বৈশম্পায়ন বললেন, রানি পরম বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, তুমি কাজ খুঁজছ? তোমাকে দেখলেই তো মনে হয় তুমি নিজেই অনেক দাসদাসীর সেবা পাওয়ার যোগ্য। তোমার পায়ের গোড়ালি উঁচু নয়, দুই উরু পরস্পরকে স্পর্শ করে আছে, নাভিপ্রদেশ গভীর, নাসিকা উন্নত, অপাঙ্গ-কর-চরণ-জিভ ও অধর লোহিতবর্ণ, বাক্য হংসের ন্যায় গদগদ, কেশকলাপ অতি মনোহর, অঙ্গ শ্যামলবর্ণ, নিতম্ব ও পয়োধর নিবিড়তম, মধ্যভাগ ক্ষীণ, গ্রীবা কম্বুর মতন, শিরা সকল অদৃশ্য, মুখখানি পূর্ণচন্দ্রের মতন রমণীয়। তুমি কাশ্মীর-তুরঙ্গীর মতো এবং পদ্মপলাশলোচন কমলার মতন অসাধারণ। তুমি তো সাধারণ কেউ হতে পারো না!

দ্রৌপদী তবু বিনীতভাবে কাজ প্রার্থনা করলে রানি আবার বললেন, তোমাকে কাজ দেবো কী, তোমাকে তো মাথায় করে রাখা উচিত। পুরুষের কথা দূরে থাকুক, তোমাকে আমার প্রাসাদের রমণীরাও মোহিত হয়ে দেখছে। এমনকী গাছপালাগুলোও নিচু হয়ে তোমাকে ভালো করে দেখতে চাইছে। হে নিবিড় নিতম্বিনী, বিরাটরাজ তোমার এই অলৌকিক অঙ্গসৌষ্ঠব দেখলে আমাকে পরিত্যাগ করে সর্বান্তঃকরণে তোমারই অনুরক্ত হয়ে পড়বেন। তুমি যে পুরুষের প্রতি সানুরাগ দৃষ্টিপাত করবে কিংবা সতত যার নেত্রপথে থাকবে, সে অবশ্যই অনঙ্গশরে কাতর হবে। মানুষ যেমন আত্মহত্যার জন্য গাছে ওঠে, তোমাকে এই রাজপ্রাসাদে স্থান দেওয়াও আমার পক্ষে তাই হবে। কাঁকড়া যেমন গর্ভধারণ করলেই মারা যায়, তোমাকে স্থান দান করলে তুমিই আমার মৃত্যুর কারণ হবে!

দ্রৌপদী তখন অনেক করে বোঝালেন যে তিনি বিবাহিতা, অন্য কোনো পুরুষ তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। রানি শেষপর্যন্ত তাঁকে রাখতে রাজি হয়ে গেলেন।

এরপর ভীম এসে কাজ পেলেন রন্ধনশালায়। উর্বশীর শাপে অর্জুন তখন নপুংসক, তিনি বৃহন্নলা নামে রাজকন্যাদের গানবাজনা শেখাবার কাজে নিযুক্ত হলেন। নকুল ও সহদেবও কাজ পেয়ে গেলেন অশ্বশালা ও গোশালায়।

মোটামুটি কিছুদিন ভালোভাবেই ওদের দিন কাটল। কিন্তু দ্রৌপদীর রূপের আগুন দেখে কেউ আকৃষ্ট হবে না, তা কি হয়? বিরাটরাজ স্ত্রৈণ ও ভিতু ধরনের মানুষ, তিনি দ্রৌপদীর প্রতি

লোভ করলেন না বটে, তবে একদিন রাজার শ্যালক এবং সেনাপতি কীচক দ্রৌপদীকে দেখে ফেলল। কীচক মহাভোগী ও শক্তিধর পুরুষ, রাজার চেয়েও তার ক্ষমতা অনেক বেশি। তার অনেক রক্ষিতা ছিল, কিন্তু দ্রৌপদীকে একবার দেখামাত্র অন্য সবাই তুচ্ছ হয়ে গেল। দ্রৌপদীর রূপের তুলনায় অন্য সব রমণীকেই বানরীর মতন মনে হয়। কীচক দ্রৌপদীকে যখন তখন কুপ্রস্তাব দেয় ও নানারকম প্রলোভন দেখায়। দ্রৌপদী তাকে বারংবার প্রত্যাখ্যান করলে সে হাত ধরে টানাটানি শুরু করল। দ্রৌপদী প্রতিকার প্রার্থনা করলেন রাজার কাছে, রানির কাছে। কীচকের ভয়ে রাজা তাকে কোনো আশ্বাস দিতে পারলেন না, আর রানি উলটে কৌশল করে দ্রৌপদীকে পাঠাল কীচকের কাছে।

কীচককে আগে থেকে প্রস্তুত থাকতে বলে রানি সুদেষ্ণা দ্রৌপদীকে বললেন, আমার এখানে সুরা ফুরিয়ে গেছে, তুমি চট করে কীচকের কাছ থেকে সুরা নিয়ে এসো তো! আমি খুব তৃষ্ণার্ত। আমি তোমায় পাঠাচ্ছি, তোমার কোনো ভয় নেই।

সে-গৃহে দ্রৌপদীর প্রবেশ করা যেন বাঘের গুহায় পা দেওয়া। কীচক প্রথমে অনুনয় বিনয় করে দ্রৌপদীর শরীর প্রার্থনা করল, তাতে কাজ হল না দেখে সে বললে, হে চারুহাসিনী, হে সু-ভ্রূ, আমিই এই সমুদয় রাজ্যের অধীশ্বর। রূপ, যৌবন, সৌভাগ্য ও ভোগে আমার সমতুল্য কেউ নেই। তুমি কেন রাজবাড়িতে দাসীবৃত্তি করবে। এই রাজ্য আমি তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি, এখনি!

তবু দ্রৌপদী ঘৃণার সঙ্গে তাকে প্রত্যাখ্যান করলে কীচক ধৈর্য হারিয়ে সবলে তাকে ধর্ষণ করতে গেল। এমনকী চুল ধরে টেনে লাথিও মারল। দ্রৌপদী কোনোক্রমে সতীত্ব ও আত্মরক্ষা করে পালিয়ে এলেন সেখান থেকে। অপমানে ও ঘৃণায় তাঁর শরীর জ্বলছে। প্রথমেই তিনি সব কথা জানালেন যুধিষ্ঠিরকে। কিন্তু যুধিষ্ঠির কী করে এর প্রতিকার করবেন। তিনি তো অসহায়।

জনমেজয় বললেন, কেন, তিনি তো ভাইদের বলে দিলেই পারতেন, কীচককে শায়েস্তা করার জন্য?

বৈশম্পায়ন বললেন, তা হলে যদি তাঁদের আসল পরিচয় প্রকাশিত হয়ে পড়ে? সেইটাতেই তাঁর বেশি ভয়। দ্রৌপদী যখন রাজসভায় এসে রাজার কাছে সুবিচার প্রার্থনা করলেন, তখনো রাজা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাইলেন না। সেখানে ভীম আর যুধিষ্ঠির দু-জনেই উপস্থিত। এইসব কথা শুনে ভীম তো মহাক্রোধে দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগলেন। ভীম যদি হঠকারীর মতন তখনই কিছু করে বসে, তাই যুধিষ্ঠির তাকে ইঙ্গিতে নিবৃত্ত হতে বললেন। আর দ্রৌপদীকে বললেন, সৈরিন্ধ্রী তুমি নিজের কাজে যাও। তোমার গন্ধর্ব পতিদের বিবেচনায় এই কাজ ক্রোধের উপযুক্ত নয়, প্রতিশোধেরও সময় নয়। তুমি এখানে নটীর মতন রোদন কোরো না। তাতে এই রাজসভায় যাঁরা দ্যূতক্রীড়া করছেন, তাদের বিঘ্ন হবে। যাও।

জনমেজয় বললেন, অ্যাঁ? ছি ছি। বললেন, নটীর মতন? নিজের স্ত্রীকে?

বৈশম্পায়ন বললেন, হ্যাঁ, যাতে আরো বোঝা যায়, দ্রৌপদীর সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই! তাঁর দুঃখের কাহিনী যুধিষ্ঠিরকে স্পর্শ করেনি!

যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। দ্রৌপদী এরপর বিরলে দেখা করলেন

ভীমের সঙ্গে। সেই তেজস্বিনী রমণী ঘুমন্ত ভীমকে জাগিয়ে বললেন, নাথ, দুরাত্মা কীচক বেঁচে থাকতে তুমি কী করে এখনো নিদ্রা যাচ্ছ? হায়, যুধিষ্ঠির যার ভর্তা, সে নারীর তো অশেষ দুঃখ ও অপমান ভোগ করতেই হবে? সে একটা জুয়াড়ি, নিজের দোষে সর্বস্বান্ত হয়ে আমাদেরও এই দাসত্বের জীবনে বাধ্য করেছে! সমস্ত দেবতা ও মানুষদের যিনি একাই পরাভূত করতে পারেন, সেই অর্জুন এখন নারী সেজে নাচ গানের শিক্ষক। নকুল সহদেবকে সর্বক্ষণ গোরু ও ঘোড়া নিয়ে কাটাতে হয়। আপনি গলদঘর্ম হয়ে রান্না করেন। আর এই দেখুন, রাজা রানির সেবায় চন্দন ঘষতে ঘষতে আমার হাতের কোমলতা ঘুচে গিয়ে এখন কেমন কর্কশ হয়ে গেছে। সবই যুধিষ্ঠিরের দোষে।

ভীম বললেন, প্রিয়ে, তুমি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিন্দে কোরো না। আমরা তো সবই জানি, সবই সহ্য করছি। তোমার মুখে এরকম তিরস্কার শুনলে তিনি নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করবেন। আর তিনি না থাকলে ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবও গতজীবিত হবে। আর এরা কেউ না থাকলে আমিও জীবনধারণ করতে পারব না। তুমি শান্ত হও, আমি অচিরেই কীচককে যমালয়ে পাঠাব!

ঈষৎ শান্ত হয়ে দ্রৌপদী বললেন, নাথ, আমি জানি, আমার পঞ্চ স্বামীর মধ্যে আপনিই আমার প্রধান ভরসা। তাই সব সময় আপনার কাছেই আসি।

কাহিনীতে বাধা দিয়ে জনমেজয় জিজ্ঞেস করলেন, কেন দ্রৌপদী এমন কথা বললেন? তিনি কী অর্জুনকেই বেশি ভালোবাসেন না?

বৈশম্পায়ন বললেন, ভালোবাসার লীলা অতি বিচিত্র। পাঁচজন পুরুষকে সমানভাবে ভালোবাসা কোনো নারীর পক্ষেই সম্ভব নয়। অর্জুনই দ্রৌপদীর প্রিয়তম। স্বয়ংবর সভায় অর্জুন তো তাকে জয় করেছেন। রূপে গুণেও অর্জুন অদ্বিতীয়। তবু, দ্রৌপদী যখনই বিপদে পড়েছেন, ভীমের কাছেই সাহায্য চেয়েছেন। ভীমই তাঁর প্রধান ভরসা। অর্জুনের ধর্মজ্ঞান বেশি, সব সময় অগ্র-পশ্চাত বিবেচনা করেন। কিন্তু ভীম কখনো দ্রৌপদীর চোখে জল দেখলে স্থির থাকতে পারেন না।

জনমেজয় বললেন, এই ঘটনায় অবশ্য অর্জুনের কিছু করার নেই। তিনি তো বৃহন্নলা, কীচককে শায়েস্তা করবেন কী করে? আপনিই তো বলেছেন, কীচকও মহাবীর।

বৈশম্পায়ন বললেন, তা ঠিক। দ্বন্দ্বযুদ্ধে অর্জুন কিছুতেই কীচককে কাবু করতে পারতেন না। ভীমই একমাত্র তাতে সক্ষম। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা, ধরা পড়বেন কি পড়বেন না। পরিচয় ফাঁস হয়ে গেলে আবার বারো বছর বনবাস করতে হবে কি না, এসব কিছুই চিন্তা করলেন না ভীম। দ্রৌপদীর অপমানের শোধ নেবার জন্য তখনই মনস্থির করে ফেললেন। এদিক থেকে ভীমের প্রেম অনেক তীব্র। এর আগেও তো দেখেছ, দ্যূতক্রীড়ার সময় দ্রৌপদীর যখন বস্ত্রহরণ করা হয়েছিল, তখন যে দু-জন দ্রৌপদীকে সব চেয়ে বেশি অপমান করেছিল, সেই দুর্যোধন আর দুঃশাসনের চরম শাস্তির ভার নিজে নিয়ে প্রকাশ্যে তা ঘোষণা করেছিলেন ভীম। দ্রৌপদীর ওরকম লাঞ্ছনার সময়েও অন্য ভাইরা চুপ করে ছিলেন, কিন্তু ভীম সহ্য করতে পারেননি! সেই শাস্তি ওই দু-জনকে ভীম কীভাবে দিয়েছিলেন, তা যথা সময়ে শুনতে

পাবে।

জনমেজয় বললেন, তখন কর্ণও তো কম অপমান করেননি দ্রৌপদীকে। কিন্তু কর্ণ সম্পর্কে অমন কিছু ঘোষণা করেননি ভীম। ভালোই করেছিলেন। কর্ণকে রণে পরাজিত করার ক্ষমতা ছিল না ভীমের, তাই না?

বৈশম্পায়ন বললেন, ভীম একাই যদি কৌরব পক্ষের সবাইকে হত্যা করার দায়িত্ব নেয়, তা হলে অর্জুনের তো কিছুই করার থাকে না। অর্জুনের বীরত্বের খ্যাতি প্রমাণিত হবে কী করে?

জনমেজয় বললেন, সে যাই হোক, তারপর কী হল বলুন!

বৈশম্পায়ন বললেন, ভীম তখনই ছুটে গিয়ে কীচককে যুদ্ধে আহ্বান করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কোনোক্রমে নিজেকে নিবৃত্ত করলেন। তা হলে তো তখুনি সব জানাজানি হয়ে যেত। তার বদলে, দু-জনে যুক্তি করে একটা ফাঁদ পাতলেন। রাজধানীতে একটি নৃত্যশালা আছে, সেখানে সারাদিন বালক-বালিকারা নৃত্য-গীত শেখে। সন্ধ্যার পর সেই নৃত্যশালা ফাঁকা হয়ে যায়, আর কেউ থাকে না। দ্রৌপদী এখন কীচকের সঙ্গে আর বিবাদে না গিয়ে তাকে ঈষৎ ছলাকলা দিয়ে ভোলাবেন। তারপর কীচক তাঁকে পাবার জন্য উন্মত্ত হয়ে গেলে দ্রৌপদী বলবেন, হে বীর, আমিও আপনার কাছে ধরা দিতে চাই। কিন্তু আগেই আপনাকে বলেছি, আমি বিবাহিতা, তাই এই মিলন অত্যন্ত সংগোপনে হওয়া চাই, নইলে যে আমার নামে কলঙ্ক রটবে। আপনি রাজকীয় নৃত্যশালায় রাত্রির প্রথম প্রহরের পর একাকী আগমন করুন। আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করব।

কীচক তাতেই রাজি হয়ে গেল।

যথাসময়ে সে একা চলে এল সেই নৃত্যশালায়। ভিতরটা একেবারে অন্ধকার। কীচক ভাবল, ইচ্ছে করেই বাতি জ্বালানো হয়নি! সে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল। কোনোক্রমে চোখ সইয়ে সে দেখল, একটি পালঙ্কের ওপর শুয়ে আছেন দ্রৌপদী।

কামোন্মত্ত হয়ে কীচক বলতে লাগল, হে গুরু নিতম্বিনী, হে পীন-পয়োধরা, হে চারুহাসিনী, আমি এসেছি। মদনবাণে আমি এমনই কাতর যে আর এক মুহূর্তও ধৈর্য ধরতে পারছি না। এসো, আমার বক্ষে ধরা দাও!

সে ঝাঁপিয়ে পড়ে পালঙ্কে শায়িত মূর্তিটিকে আলিঙ্গন করল, ওষ্ঠের কাছে নিয়ে গেল ওষ্ঠ। তারপরই কেঁপে উঠল তার সারা দেহ।

যাকে সে দ্রৌপদী বলে ভ্রম করেছিল, সে আর কেউ নয়, তার যম। মহাপরাক্রমশালী ভীম। কীচককে এক ধাক্কায় মাটিতে ফেলে দিয়ে উঠে বসল ভীম।

কীচকও কম বলশালী নয়, বেশ কিছুক্ষণ লড়াই হল দু-জনের। শেষ পর্যন্ত ভীম তাকে হত্যা করে, তার হাত-পা ভেঙে একটা মাংসপিণ্ড বানিয়ে দিল।

বৈশম্পায়ন এই লড়াইয়ের বর্ণনা দিলেন সংক্ষেপে। রাত হয়েছে অনেক। দীর্ঘক্ষণ একটানা কথা বললে কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে যায়। দু-জনেরই ক্ষুধা-তৃষ্ণা পেয়েছে। রাজার জন্য দাস-দাসীরা অপেক্ষমান। আজকের মতন শেষ হল বৈঠক।

কিন্তু এ-কাহিনীর এমনই আকর্ষণ যে শেষপর্যন্ত না জানলে রাত্রে ভালো ঘুমও হয় না। পরদিন প্রত্যুষে চোখ মেলেই রাজা ভাবলেন, তারপর, তারপর?

অতি দ্রুত প্রস্তুত হয়ে তিনি চলে এলেন মন্ত্রণা কক্ষে। বৈশম্পায়নকে ডেকে আনার জন্য দূত পাঠিয়ে তিনি বসে রইলেন অধীর অপেক্ষায়।

বৈশম্পায়ন উপস্থিত হবার পর রাজা তাঁর পদ-বন্দনা করেই জিজ্ঞেস করলেন, হে ঋষিশ্রেষ্ঠ, কীচক বধের পর কী পাণ্ডবদের পরিচয় সর্বজ্ঞাত হয়ে গেল? কিংবা দ্রৌপদীর প্রতি আর কেউ...

বৈশম্পায়ন রাজাকে আশীর্বাদ করে বললেন, বৎস, আগে আমাকে আসন গ্রহণ করতে দাও। বলছি, বলছি, সব বলছি।

বৈশম্পায়ন বলতে শুরু করলেন, পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের বৎসর পূর্ণ হতে মাত্র আর কয়েকটি দিন বাকি ছিল। সেই কয়েকটি দিন কোনোক্রমে কাটিয়ে দিতে পারলেই হল। ইতিমধ্যে অবশ্য রাজা কীচকের মৃতদেহের সঙ্গে ভয়ংকরী দ্রৌপদীকেও বেঁধে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলেন, ভীমের পরাক্রমে তাও সম্ভব হয়নি। কীচকের সহচরদেরও ভীম সদলবলে নিধন করে। শোনো, আমি সবিস্তারে বলছি।

এরপর দিনের পর দিন ধরে চলল সেই কাহিনী বর্ণনা। এ তো রাজা জনমেজয়ের শুধু পারিবারিক ঘটনা নয়, এ এক মহাকাব্য, মহা ইতিহাস।

মাঝে মাঝে রাজা জনমেজয় কোনো কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করেন, ঋষি বৈশম্পায়ন তাঁকে বুঝিয়ে দেন। কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষের চূড়ান্ত যুদ্ধের সময় তাঁর মনে বারবারই নানারকম প্রশ্ন জেগেছে, বিশেষত কৃষ্ণের অনেক ব্যবহারেরই তিনি ব্যাখ্যা পান না। যুদ্ধের বিবরণ শুনলে মনে হয় পাণ্ডবদের চেয়ে কৌরবপক্ষই বেশি শক্তিশালী ছিল, কিন্তু তাঁদের পক্ষের বড়ো বড়ো বীরদের পরাজিত করা হয়েছে কূট কৌশলে এবং মিথ্যার আশ্রয়ে। অধিকাংশ সময়েই কৃষ্ণের প্ররোচনায়।

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণের মতন মহাবীরদের স্বাভাবিক যুদ্ধে নিহত করার ক্ষমতা পাণ্ডবপক্ষের ছিল না, তাই ছলনা, অলৌকিকত্ব ও দেবতাদের পক্ষপাতিত্বের সুযোগ নিতে হয়েছে।

রাজা জনমেজয় সব চেয়ে বেশি আঘাত পেলেন দ্রোণ বধের বিবরণ শুনে। অস্ত্রগুরু দ্রোণ এক-একদিন সংহার মূর্তি ধারণ করে সহস্র সহস্র সৈন্য বধ করেন। কেউ তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারে না। কৃষ্ণ বুঝলেন, দ্রোণ বেঁচে থাকতে পাণ্ডবপক্ষের জয়ের আশা নেই। দ্রোণ ইচ্ছে করলে তাঁর পুত্রতুল্য শিষ্যদেরও বধ করতে পারেন। এখন উপায়? ভীষ্ম যেমন অস্ত্র ত্যাগ করেছিলেন, সেই রকম দ্রোণের হাত থেকে অস্ত্রপতন হলেই একমাত্র তাঁকে হত্যা করা যেতে পারে। কিন্তু দ্রোণ অস্ত্র ত্যাগ করবেন কেন?

তখন কৃষ্ণই দিলেন পরামর্শ। সে কী ভয়ংকর এক মিথ্যা! দ্রোণ তাঁর একমাত্র পুত্র অশ্বত্থামার প্রতি স্নেহে অন্ধ। সেই অশ্বত্থামার মৃত্যুসংবাদ শুনলে তিনি চরম অবসন্ন হয়ে পড়বেন। আর অস্ত্রধারণ করতে পারবেন না। অশ্বত্থামাকে আপাতত বধ করা সম্ভব না হলেও এই মিথ্যে সংবাদ দ্রোণের কাছে গিয়ে রটাতে হবে। কিন্তু যুদ্ধের সময় তো সকলেই নানা প্রকার মিথ্যা

বলে। দ্রোণ তা বিশ্বাস করবেন কেন? একমাত্র যুধিষ্ঠিরের মুখ দিয়ে এই বাক্য নির্গত হলেই দ্রোণের কাছে তা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে।

কৃষ্ণের এই অরুচিকর প্রস্তাবে অন্য অনেকেই মত দিলেন, যুদ্ধজয় বিষয়ে হতাশা এসে গিয়েছিল বলে যুধিষ্ঠিরও শেষপর্যন্ত সম্মত হলেন।

মালবরাজ ইন্দ্রবর্মার একটা হাতির নাম অশ্বত্থামা। ভীম গদাঘাতে সেই হাতিটিকে বধ করে উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন, অশ্বত্থামা হত। দ্রোণ সেই ঘোষণা শুনে একটুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে রইলেন। তিনি জানেন যে তাঁর পুত্র অশ্বত্থামা মহাযোদ্ধা, তাকে হত্যা করা ভীমের পক্ষেও সহজ নয়। তা ছাড়া, অশ্বত্থামার পতন হলে কৌরবপক্ষে হাহাকার পড়ে যেত না? সে রকম তো কোনো লক্ষণ নেই। তবু পিতৃহৃদয়, পুত্রের অশুভ চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলেন না। যুদ্ধ করতে করতে একবার যুধিষ্ঠিরের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, বৎস, সত্যিই কি আমার পুত্র হত হয়েছে?

দ্রোণ জানেন যুধিষ্ঠির কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না।

যুধিষ্ঠিরও নত নেত্রে চুপ করে রইলেন।

তখন কৃষ্ণ উদ্বিগ্ন হয়ে অস্ফুটস্বরে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, আপনি এখনো দ্বিধা করছেন? আজ দ্রোণ যদি আর অর্ধদিন যুদ্ধ করতে পারেন, তা হলে আপনাদের সব সৈন্য ধ্বংস হবে। পাণ্ডবপক্ষকে রক্ষা করার জন্য আপনাকে মিথ্যে বলতেই হবে। বলুন, বলুন, আর দেরি করবেন না।

যুধিষ্ঠির তখন উচ্চস্বরে বললেন, অশ্বত্থামা হত।

তারপর অস্ফুটস্বরে বললেন, ইতি কুঞ্জর। অর্থাৎ, ওই নামের একটি হাতি। সে-কথা শুনতে পেলেন না দ্রোণ।

এই অর্ধ-মিথ্যার জন্য যুধিষ্ঠিরের রথ ভূমি স্পর্শ করল। তার আগে সত্যপরায়ণ যুধিষ্ঠিরের রথ বাহনসমেত ভূমি থেকে চার আঙুল উঁচুতে থাকত।

জনমেজয় এই পর্যন্ত শুনে বিমূঢ়ভাবে প্রশ্ন করলেন, কেন, কেন? এর আগেও তো —

বৈশম্পায়ন বললেন, অত বাধা দিও না। তা হলে কাহিনীর স্বতঃস্ফূর্ততা নষ্ট হয়ে যায়। শোনো, যুধিষ্ঠিরের মুখে পুত্র-নিধনের সমর্থনের কথা শুনে দ্রোণের শরীর অবশ হয়ে গেল। তখন আবার ভীম কাছে এসে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে একদা অস্ত্রগুরুকে বলতে লাগলেন, আপনি ব্রাহ্মণ হয়েও জ্ঞান-বিদ্যা চর্চা না করে অস্ত্রশিক্ষা করেছেন। শত-সহস্র সৈন্যদের হত্যা করছেন, এই কী ব্রাহ্মণের কাজ? আপনার লজ্জা করে না? অশ্বত্থামার নিধন ব্যাপারে আমার কথা বিশ্বাস করেননি, এখন স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের মুখ থেকে শুনলেন তো? অশ্বত্থামা রণক্ষেত্রে শুয়ে আছে!

দ্রোণ শরাসন ত্যাগ করলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন রথ থেকে নেমে খড়্গ হাতে ছুটে এসে দ্রোণের মুণ্ড ছিন্ন করে দিল।

বৈশম্পায়ন পরদিন এসে বর্ণনা করলেন যুদ্ধের বাকি বিবরণ। আরো কয়েকদিন লাগল সম্পূর্ণ কাহিনী শেষ হতে। এর মধ্যে আর জনমেজয়কে তিনি প্রশ্ন করার সুযোগ দেননি।

যুধিষ্ঠিরের একাকী সশরীরে স্বর্গারোহণের পথে যে কিছুক্ষণের জন্য নরক দর্শন করতে হল, তার কারণ, তিনি দ্রোণকে ওই অর্ধমিথ্যা বলেছিলেন। কর্ণ, দুর্যোধনরা যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে আগেই স্বর্গে পৌঁছে গেছেন।

এইখানে এসে জনমেজয় আর থাকতে পারলেন না। তিনি বৈশম্পায়নকে জিজ্ঞেস করলেন, হে মহাত্মা, আমাকে এই ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে দিন তো! যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধের সময় এই অর্ধ-মিথ্যাটাই কেন এত গুরুত্ব পেল? এর আগেও তো অজ্ঞাতবাসের সময় তিনি ঝুরি ঝুরি মিথ্যে কথা বলেছেন।

বৈশম্পায়ন বললেন, আগের মিথ্যে কথাগুলো সবাই ভুলে গেছে। বাপু হে, জীবনধারণের জন্য কে না মিথ্যে কথা বলে? সারাজীবনে একবারও মিথ্যাভাষণ করেননি, কিংবা সত্য গোপন করেননি, এমন মহাপুরুষ হয় না। একটু-আধটু মধুর মিথ্যে না থাকলে নর-নারীর প্রেমও নিরস হয়ে যায়। প্রাণরক্ষার জন্য মিথ্যে কথা বলার স্বীকৃতি শাস্ত্রেও আছে। তবে হ্যাঁ, যুধিষ্ঠিরের ওই অর্ধ মিথ্যার কলঙ্ক এত গভীর কেন? অভিনয়ের ছলে, লঘু ক্রিয়ায়, প্রমোদে কিছু কিছু মিথ্যা বলা যেতেও পারে। নিজের প্রত্যক্ষ প্রাণরক্ষার জন্য নয়, যুধিষ্ঠির এই মিথ্যেটা বলেছিলেন নিজের গুরুর প্রাণ হননের জন্য! যুধিষ্ঠিরের এই কলঙ্ক যুগে যুগেও ঘুচবে না!

কথোপকথন

সাধন চট্টোপাধ্যায়

একশো তিন বছরের পরমায়ু আদিনাথ চাক্ষুষ করেননি কোনো শরীরে। শুনেছিলেন এক-আধটা। প্রসঙ্গত এবং পরের মুখে।

বৃষ্টি-থেমে-যাওয়া দুপুরটার খোলসে ক্রমে বিকেল ঢুকে পড়তেই ফোনে বন্ধু অমৃতকে, কী করছেন? — কিছু না। বেরোবেন? — মন্দ হয় না, কোন দিকে? চলুন আজ আশ্রমিক গঙ্গার ধারে। বহুদিন নদী দেখি না। — হুঁ! আদিনাথ তখন বললেন, ফেরার পথে হেমাঙ্গ মিত্তিরকে দেখে আসব। — হেমাঙ্গ মিত্তির? ছকু স্যার, অতীতের খেলাপাগল মানুষটা, ভুলে গেলেন? — তিনি বেঁচে? মরলে নিশ্চয়ই খবর পেতাম, শুনেছি শতায়ু হয়েছেন। — সেঞ্চুরি? অমৃত ও-প্রান্তে হোঁচট খেতেই আদিনাথ, বাউন্ডারি মেরে সেঞ্চুরি! নিরানব্বইতে ভারী জলের বালতি টেনেছেন! একশ একেও টুকটুক করে পাশের মাঠে ফুটবলের দর্শক। ইদানীং বিছনা আর উঠোন।

তা হলে আজ বিকেলটায় পুরোনো অগ্রপাড়ার গঙ্গার ঘাট। যেখানে নানা আশ্রম ও পরিত্যক্ত বনেদিয়ানার পাঁচিলে গঙ্গার কূল জনবিরল। মাঝেমধ্যে দু-একটি ভাঙা ঘাট। দুপুর-সকালে স্নান ও তিথি-নক্ষত্রের বিশেষ কিছু যোগ না থাকলে, বিকেল, সন্ধ্যায় সাহসী ও উঠতি প্রেমিক-প্রেমিকা ছাড়া ও-মুখো কেউ হয় না। মন্দির খোলাবন্ধের সময়টুকুতে বোঝা যায় ভেতরে পবিত্র নিরিবিলি, সযত্ন ফুলের বাগান ও পুরাতন বৃক্ষদের গভীর চুপচাপ।

আজ বিকেলভ্রমণ নতুন জাতীয় সড়কটার উদ্দেশ্যে নয়, ঠিক বিপরীত মুড়োয় — তাদের শহরটায়। দুই অবসরিক, বহুদিনের দুই ঘনিষ্ঠ। রোজ রোজ প্ল্যাটফর্ম; নিরিবিলি হাঁটবার বিলাসিতায় কেবলই নতুনত্ব খোঁজেন। বুঝতে পারেন, জীবনের স্পেসটা বড্ড ছোটো হয়ে পড়ছে।

রিসিভার রেখে ও-প্রান্ত হাসলেন। আদিনাথ তা টের পেলেন না। হাসির রেখায় ঠোঁটজোড়া ইংগিতময় করে, অমৃত বেরুবার আয়োজন করেন। আদিনাথ ঠিক-ঠিক তথ্য জানবেন, তাঁরই স্কুলের গেম টিচার ছিলেন কি না দীর্ঘকাল। ভালোই জানবেন। গেম-টিচার কাম লাইব্রেরিয়ান। কিন্তু অমৃতের মনে স্বর্ণময়ী নামটি চট করে প্রাসঙ্গিক হল কেন? মহিলা-অ্যাথলেট? যখন এ-শহরে পর্দাপ্রথা, নারী-পুরুষের এত অবাধ যোগদান স্বাভাবিক ছিল না, তখন থেকে কী? স্বর্ণময়ী অমৃতদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়া, মস্তিষ্ক পক্ষাঘাতে অখ্যাত হাসপাতালে সাড়ে তিনমাস ঘুমিয়ে আছেন। বন্ধু-স্বজন বর্জিত অবস্থায়। এখন ও-নামটা কারো মনে পড়ে না। শহর থেকে খেলাধুলোর রমরমা চর্চা ক-বে হারিয়ে গেছে। ফাঁকা মাঠ কোথায়? স্বর্ণময়ীর বয়স প্রায় সত্তর।

আদিনাথ স্টেশনে মুখোমুখি বললেন, হেঁটে না অটো ধরবেন? — অনেকটা দূর, তাই না? চলুন অটোতে। তবুও দু-জনের ঘাটে যেতে আধ কিলোমিটার হাঁটতে হল। যখন ফাট-ফাটল ধাপগুলোর নির্জনতায় দাঁড়ালেন, ছমছমে গেরুয়া জলে শেষ বিকেলের মলিনতা ঝুঁকে

পড়েছে। ফাঁপা-ফুলো নদীটার গভীর টানে অনন্ত জল চলছেই। আদিনাথ বিহ্বল আনমনে বন্ধুকে শোনালেন, একেই বলে...! — কী? কী বলে?

বুকের কথা মুখের চাইতেও জোরালো! ... নদী চলছেই।

দেরি করবেন না। ...একশ-তিন বছরের মানুষ সাঁঝ উতরোলেই বিছানায় যাবে! — আচ্ছা আদিনাথ, আপনাদের গেমটিচার মানে তো 'সেই' বলতে?

স্বর্ণময়ীকে নিয়ে অতীতে...

পুরোটা বলতে হল না, হাসলেন আদিনাথ। সে-যুগ কবে ফুরিয়ে গেছে, হাসিটুকু যেন বলছে। হ্যাঁ! ... ছেলেমানুষি! ... সে-সব রোমিওরা আজ বৃদ্ধ। ... স্টেশন বাজারে দু-একজনকে দেখি। ...কুঁজো হয়ে গেছে... মারও দিয়েছিল! একা উনি!

অমৃত বললেন— পুরোটাই নাকি দাঁড়িয়ে সয়েছিলেন? সরেননি?

আদিনাথ আনমনা হুঁ করলেন। স্বর্ণ ঘোষালদের ঘাটের ওপর। তাই তো?

অমৃত সায় দিলেন। তিনিও যে-সে পাত্রী ছিলেন না!

ওঃ! অমৃত মনে মনে হাসলেন। পেছনে তাকালে বোঝা যায়, জীবনের অজস্র কত উত্তেজনা সময় গিলে নিয়ে দু-পয়সাও দাম রাখেনি। ধূসর, লুপ্ত ও চাপা পড়ে যায়। কয়লা যেমন ছাই হয়ে আবর্জনা! পৃথিবীতে নতুন কয়লারা পোড়ে তখন।

— চলুন, কোথাও চা খুঁজি। ... ওখানে নির্ভর করা ঠিক হবে না।

খুঁজে পেতে, ছোট্ট মলিন গুহার একটা দোকান। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাঁড় হাতে তুলতেই নতুন গড়া একটা আশ্রম থেকে ঘণ্টাধ্বনি উঠল। এর সীমানা-পাঁচিলটা কারাপ্রাচীরের মতো উঁচু। তারও ওপরে কাঁটাতার। কীসের মন্দির? পরস্পরের আলোচনা-কৌতূহলে দোকানদার বলে, নতুন? তাই বলুন। পয়সা মিটিয়ে, অমৃত বলে এগিয়ে এসে —কেন বলল বলুন তো? রহস্য কোথায়?

এটাই মিত্তিরপাড়া। ছ-পুরুষের শাখা-প্রশাখায়, অংশ টুকরো টুকরো হয়ে কড়ি-বর্গা ও কোলাপসিবল গেট পিঠোপিঠি। অথচ এখানে একদা কৃষ্ণবর্ণের দুর্গাপ্রতিমা হত। আজ দু-চারটে লোকগবেষক এলে কোনো তথ্য-হদিশই পায় না। দু-জন সংকোচে বাইরের রকে দাঁড়াতেই ছেলে তখন আদিনাথকে চিনতে পারে। খাড়া সিঁড়ি, চিপা গলতাই, টুকরো বারান্দা পেরিয়ে বাবার ঘরে ঢোকাতেই দেখা গেল বহু পুরোনো গড়নের একটা পালঙ্কে ছকু স্যার শুয়ে। লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি। একশ তিন বছরের লম্বা জীবন। মোটা হাড়ের ধাঁচাটা তেমনই চওড়া।

ছাত্রাবস্থায় আদিনাথরা বলতেন শুধু 'গেমটিচার'। সারা গ্রীষ্ম-বর্ষা মাঠে মাঠে রেফারিং, পুরোনো মোহনবাগানের তারিফ এবং দুখে, ল্যাংচা, ছেনো নামক অদ্বিতীয় খেলোয়াড়দের স্মৃতি। তখন লাইব্রেরির বই দেওয়া বন্ধ। বইপোকা আদিনাথের তাই মন খুঁতখুঁত ছিল মানুষটার ওপর। তারপর, মাস্টারিতে একই স্কুলে, স্যার সহকর্মী। ৬৫ বছরে অবসরে বাধ্য বলে, ৮০ পর্যন্ত পার্টটাইম সহকর্মী। জীবন্ত কিংবদন্তি ছিল কিনা।

ছাত্রাবস্থায় এঁদের, এলাকায় তখন ক্লাব মাঠে শীতে ফুটবলের রেওয়াজ থাকত না। শুভ সূচনা দোলের দিন। রংটং খেলে, বিকেলে পরিষ্কার পোশাকে লেস-ঢোকানো বলের গায়ে

আবির ছিটিয়ে শট মারার রীতি। ছকু মিত্তির সত্তর বয়সেও প্রথম লাথিটা মারতেন। বলটা ভেসে যেত বকের মতো। ওই বয়সের একটা কিল জোয়ান ছোকড়াও হজম করতে পারত না।

তপন কানে মুখ ঢুকিয়ে চেঁচাল, আদিনাথ দা এয়েচে। আ-দি-না-থ-দা! তোশকে তাপ ফুটলে যেমন উঠে বসে, ধীর লয়ে, ছকু মিত্তির আসন কেটে বসলেন। কিছু একটা ঘটেছে, কিন্তু কী — টের পাচ্ছেন না যেন। দু-জন আবিষ্কারের রোমাঞ্চে মুগ্ধ। বিস্মিত। যেন আদিম শ্যাওলা ভেজা পুরু-পুরু বাকলের একটি বৃক্ষখণ্ড। ধিকিধিকি খাণ্ডবতাপে অঙ্গার ছাইয়ের আড়ালে শেষ শাঁসটুকু বাঁচিয়ে রেখেছেন। একশ তিন বছর ধরে রক্ত বইছে। রেচন চলছে। ফুসফুস; কোটি কোটি ওঠা-নামায় টন টন অক্সিজেন কার্বন ডাই-এর খেলা খেলেছেন। অল্প চুল, মোটা গোঁফ, বিরল ভুরু — শুভ্র। দুধ মরে মরে যেমন হলদেটে সাদা হয়।

আ-দি-না-থ-দা? চিনতে পাচ্ছ না? তপন ফের চ্যাঁচায় কানের মধ্যে। কে? কে? ছকু মিত্তির আলু-থালু এমন তাকালেন, চোখ দুটোয় কোনো ভাবান্তর হল না।

একশ তিন বছরের জীবন্ত খোলসে দু-জন রহস্যের খোঁজে এসেছিলেন। রাজকোষের দুর্গটা। বন্ধ কপাটের চাবি খোয়া গেছে। মাথা খুঁড়লেও পাওয়া যাবে না। তো-মা-র ছাত্র? ই-স-কু-লে-র স্যার? মনে নেই?

বৃক্ষের কোনো কৃত্রিমতা নেই। আস্তে মাথা নাড়ালেন আনন্দে। চিনতে পারছেন না। ফের তপন কানে মুখ ঢুকিয়ে নামটা উচ্চারণ করল। শেষ বাজি, যদি লেগে যায়। আদিনাথ বলে, ছেড়ে দাও। জিজ্ঞেস করো কেমন আছেন। ফের তপনের আপ্রাণ চেষ্টা। এরপর ছোটো ছোটো সময়ের ব্যবধানে, তপন এই দু-জনের পক্ষ হয়ে, বিশেষত আদিনাথের কৌতূহলে, বন্ধ দুর্গের দেয়ালে ঘা দিতে থাকে।

কেমন আচি? ভা-ল্-লো!

দি-ন-গু-লো কে-ম-ন যাচ্ছে?

অনাবিল হাসি মিলিয়ে উত্তর, যে-ম-ন যায়! দিন যাচ্ছে ... রা-ত আসছে, ফে-র কিনা দিন ... কাণ্ডই হল বটে!

ছকু মিত্তির প্রতি মুহূর্তে হাসছেন নাকি আলগা তৃপ্তি পাশাপাশি মুখমণ্ডলে ফুটে আছ বোঝা দুষ্কর।

আ-রো কত বছর বাঁ-চ-তে ইচ্ছে? জা-ন-তে চাইছে?

বহুদূরের কোনো ইঙ্গিত শুনলেন যেন। চুপ করে রইলেন। তপন ফের প্রশ্নটা রাখে। ছকু মিত্তির আঙুল তুলে দেয়ালটা দেখিয়ে বললেন, নামা না ও-টা।

মলিন মানপত্রটি বাঁধাই অবস্থায় ঝুলছিল। তপন সন্তর্পণে নামিয়ে আদিনাথের হাতে দিল। স্কুল যখন ১২৫ বছর উৎসব করে, স্যারকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। সম্পাদক ছিলেন আদিনাথ। আরে! এ যেন তার-ই হস্তাক্ষর। ভাষা! প্রশস্তির বিশেষণগুলো উঁচু উঁচু সাবলীল পাঠের রাস্তা জুড়ে আছে।

আমারই লেখা! আদিনাথ অমৃতকে বললেন। ফের পড়লেন। সুন্দর হস্তাক্ষর এখন হারিয়ে গেছে। ভাষা খুবই কাঁচা মনে হল। ভুলও আছে। আজ তিনি বাহুল্যকে গুরুত্ব দেন না। নির্মল

আলো চান। ওগুলো মেঘের টুকরো — আড়াল করে কেবল।

তপন ফের টাঙাতে, ছকু মিত্তির জড়িয়ে বললেন, ম-য়-লা মো-ছ! আজ আর কী স্পেস, রং বা বাসনার কোনো আকুতি নেই? আহা! দীর্ঘ বৃক্ষের মধ্যে কী লুকোনো থাকে? বারবার মাথার দিকে তাকিয়ে ভাবেন, চাবিটা পেলে অন্দরে উঁকি দেওয়া যেত। রোজ রোজ কোন অপেক্ষায় শুয়ে বসেও তৃপ্তি?

হঠাৎ, ফাটলভেদের ক্ষীণ রশ্মির মতো বললেন, আ-মা-র কা-লে-ই স্কুলে ইন্দু বাবুর আমল। ...একবার মাইনে আটকেছিল, ক-ত যে কাণ্ড ! উনি যেন টনটনে ব্লাডার খালাসের স্বস্তি পেলেন। কিন্তু ইন্দু বোসের পর, শ্যামাপ্রসাদ সেন, তারপর চূড়ামণি সান্যাল — এমনকী আদিনাথের স্কুল ছাড়ার আগে অনল মিত্র তরুণ প্রধান শিক্ষক হয়ে ঢুকলেন। আদিনাথ সেই ইন্দুবাবুর ছাত্র ছিলেন। বুঝলেন, ছকু স্যারের স্মৃতি স্বচ্ছ পথে আসছে না। হোক! তবু ফাটলের আলো থেকে অধিক রশ্মির আশায় দু-জন অপেক্ষা করছেন। যেন শাঁস কথা বলছে। দুর্গম পথে চলেছে *ঠেলে ঠেলে*। গুণেনবাবু কেমন আ-চে-ন? হি-মাং-শু কী যেন? আদিনাথ চেঁচিয়ে, চৌধুরী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তপন বলো ওনাকে, স-ব বেঁচে আছেন। চলে যাওয়ার খবর দিয়ে কী লাভ? তপন পরপর নামের সঙ্গে হ্যাঁ বলে। যেন লম্বা আয়ুতে সারা পৃথিবী *ঠেলে* গেছে।

ব-ল-চে তোমায়, ডেঁ-ড়-শ বছর বাঁ-চ-বে!

তপন বলে, বাবার কান দুটোই গেছে... সব ঠিক ঠিক আছে। খালি চোখে কাগজ পড়তে পারে! বলো কী? আদিনাথের মধ্যে প্রাণ রহস্যময় ও দুর্জ্ঞেয় হয়ে দেখা দেয়। উনি হেসে, ফাটলের আলো ধরে, কত কাণ্ডই হল! কত কাণ্ডই হল! স্বগতোক্তি করে বললেন। যেন লব্ধ হয়ে যাচ্ছে। উৎসাহ আসতে চেঁচালেন, আ-বি-র। দো-ল! ফু-ট-ব-ল! মনে পড়ে?

দুর্গটা এবার ফাটলের আলো দিয়ে ভেতরের আভাস দিল। কত কাণ্ড যে হল! ...ও-রা...এ-ল...ডাঁ-রিয়ে রইলাম... ফের ও-রা দল নিয়ে... মা-রল আমায়... পে-টা-লে খুব! আদরের হাসি দিলেন। পেটানো শব্দটা যেন সুখের, রোমাঞ্চের। আ-মি নড়ি-নি। তারপর বেলুনের মতো চুপসে যান। কপাট পড়ে যায়। তিনি হাতড়ালেন, ক-ত কা-ণ্ড যে হল! দীর্ঘ বৃক্ষের শরীরে যেন বৃষ্টি পড়তে থাকে। শাঁস যেন নক্ষত্রের জলের আশায় তাপ-ধোঁয়া-অঙ্গার অস্বীকার করে মশারির আশ্রয়ে যেতে চায় একটু পর। আদিনাথ হঠাৎ তপনকে বলে, জিজ্ঞেস করো... কারা মারল... কেন মারল? তপন যথাযথ প্রতিধ্বনি করল। আর দুর্গের ফাটল বেয়ে গলগলিয়ে তরল আলো বেড়িয়ে এল। ওদের আসাটা সার্থক হয়। দুর্গের মধ্যে ঢুকে পড়ে। উনি খানিক স্থির, খানিক লব্ধ উচ্চারণ, কত কাণ্ড যে হল! সারা শরীর ভূমিকম্পের মতো কাঁপতে কাঁপতে, হঠাৎ কাত হয়ে হিক্কা তুললেন। হিক্কার পর হিক্কা। দু-চোখে জল। নীরব এবং টলটলে। যন্ত্রণা কিন্তু মন্দ লাগছে না। কে যেন দরজা *ঠেলে* ঢুকতে চাইছে। দরজা খোলা যাচ্ছে না। তপন ভয়ে বলে, চটপট ডাক্তার পাবো কোথায়?

আদিনাথ বন্ধুকে নিয়ে ফিরলেন। বাকি পরমায়ু নদী আগুন ও একটি পাখি হতে চাইল।

মুখের কথা লেখার ভাষায়

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

রবীন্দ্রনাথের *জীবনস্মৃতি* থেকে আমরা জানি, সভাস্থলে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ পড়া ঘটে বেথুন-সোসাইটির আমন্ত্রণে মেডিক্যাল কলেজের হলে। প্রবন্ধটি ছিল 'সংগীত ও ভাব', পড়া হয়েছিল ১৯ এপ্রিল ১৮৮১, বুধবার (৯ বৈশাখ ১২৮৮); পরে ছাপা হয় জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮ *ভারতী* পত্রিকায়। আমরা এখন ছাপা প্রবন্ধে যা পড়ি, সেটা কতটা বুঝি? বিষয়টি ছিল গান, যার ভাব ও সুর বোঝানোর জন্য কণ্ঠ দরকার, লেখার ভাষায় যেটা ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব। অনেক দিন পরে, রবীন্দ্রনাথ যখন ছন্দ বিষয়ে অধ্যাপক জে. ডি. অ্যান্ডারসনকে বাংলা পদ্যছন্দ বোঝাতে ইংরেজি স্ক্যান করার ধরনে বাংলা কবিতার ছন্দ চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়েছিলেন (১৯১৩ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত কয়েকটি চিঠিতে, যেগুলো উদ্ধৃত হয়েছিল *ছন্দ* গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে এবং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্ররচনাবলীর যোড়শ খণ্ডে, পৃ ১০৭৭-৮২), তখন সেটা তবু বোঝা যায়, কিন্তু 'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধটা? *ভারতী* পত্রিকা জানিয়েছিল প্রবন্ধটি ছেপে, বক্তা গান গেয়ে গেয়ে সুর ও ভাব বুঝিয়েছিলেন, ফলে যেটা ছাপা হল সেটা প্রবন্ধের ভূমিকা ও উপসংহারই মাত্র। রবীন্দ্রনাথ *জীবনস্মৃতি*-তেও বলেছিলেন, প্রবন্ধে লিখিত অংশ কমই ছিল। বিনয়ের সঙ্গে তিনি জানান সেখানে, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি সভাপতি ছিলেন বক্তৃতাসভায়, এবং বলেছিলেন, 'বন্দে বাল্মীকি-কোকিলং', তখন সেটা তাঁর গান শুনে যতটা, বক্তৃতা শুনে ততটা নয় সম্ভবত।

রবীন্দ্রনাথের অনেক প্রবন্ধই প্রথমে ছিল বক্তৃতা, তার পরে ছাপা হয় প্রবন্ধ হিসেবে। তাঁর অন্তত ৮০টি প্রবন্ধই প্রথমে ছিল বক্তৃতা। এই উপলক্ষটা মনে না রাখলে ছাপা প্রবন্ধের শৈলির মূল লক্ষণ আমরা ধরতে পারব না। অনেক সময়েই মনে হয় প্রবন্ধ পড়ার সময়, তিনি যেন কারো সঙ্গে তর্ক করছেন। সত্য সত্যই তর্কের ঝাঁঝেই তিনি বক্তৃতা পড়েছেন, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ অসহযোগ আন্দোলনের সময় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে ১৯২১ সালে পড়া 'সত্যের আহ্বান' আর 'শিক্ষার মিলন'। গান্ধীর আন্দোলনকে আক্রমণ করে 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধটা ১০ আগস্ট থেকে ১৮ আগস্টের মধ্যে তিনি তিনবার পড়েন শান্তিনিকেতনে, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে ও অ্যালফ্রেড থিয়েটারে। শেষের দিনের বক্তৃতা শুনে সীতা দেবী লিখেছেন *পুণ্যস্মৃতি*-তে, 'বলিতে বলিতে শেষের দিকে, অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। মুখ দিয়া যেন অগ্নিস্রোত প্রকাশিত হইতে লাগিল।' 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধের সমালোচনা হলে, রবীন্দ্রনাথ 'সত্যের আহ্বান' পড়লেন ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে। সীতা দেবীর ভাষায়, 'রবীন্দ্রনাথ সময় হইবামাত্র মঞ্চে উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রবন্ধটি তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে পড়িয়া গেলেন। অসহযোগ-আন্দোলনের কিছু কড়া সমালোচনা ছিল ইহার মধ্যে। শ্রোতাদের ভিতর হইতে দুই-তিনবার রব উঠিল, 'গান্ধী মহারাজকি জয়!' কিন্তু একটু ক্ষীণভাবেই, বিশেষ জোরে যেন আপত্তিকারীরা প্রকাশ করিতে পারিলেন না। রবীন্দ্রনাথ সে-সব যেন গ্রাহ্যই করিলেন না।' প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ কিন্তু রম্যাঁ রলাঁকে বলেছিলেন, বিরাট কবিখ্যাতি না থাকলে কবি সেদিন খুন হয়ে যেতে

পারতেন। স্টিফেন হে তাঁর রবীন্দ্র-বিষয়ক গ্রন্থে (*Asian Ideas of East and West*) অমৃতবাজার পত্রিকার রিপোর্ট উল্লেখ করে বলেছেন, বিপিনচন্দ্র পাল উত্তেজিত শ্রোতাদের হাত থেকে রবীন্দ্রনাথকে বাঁচানোর জন্য বক্তৃতাসভার পিছনের দরজা দিয়ে বার করে নিয়ে যান।

বক্তা উত্তেজিত, শ্রোতারাও উত্তেজিত। সব সময়েই যে উদ্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া ঘটত, তা অবশ্যই নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথ চৈতন্য লাইব্রেরিতে ২৮ এপ্রিল ১৮৯৪-তে যখন 'বঙ্কিমচন্দ্র' পড়েন তখন সভাপতি নবীনচন্দ্র সেনের আদৌ ভালো লাগেনি। নবীনচন্দ্র শোকসভা ব্যাপারটাকেই বরদাস্ত করতে পারতেন না, মনে করতেন ইংরেজদের নকল করা অনুষ্ঠান। তা ছাড়া, প্রচার পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের একটি লেখা পড়ে তাঁর মনে হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম সমালোচনা করায় বঙ্কিমচন্দ্র বিরক্ত হয়েছিলেন। তাই সভার উদ্যোক্তারা যখন বঙ্কিমভক্ত নবীনচন্দ্রকে আমন্ত্রণ করেন সভাপতিত্ব করতে, তিনি রাজি হননি। সভাপতি হয়েছিলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। যে প্রবন্ধটি পড়ে তখনকার রবীন্দ্র-সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি আপ্লুত হয়েছিলেন, সেই প্রবন্ধটি শুনে নবীনচন্দ্র খুবই বিরক্ত হয়েছিলেন, 'রবিবাবু বিনাইয়া বিনাইয়া দীর্ঘ শোক করিয়া যখন অশ্রু মুছিয়া বসিলেন' এবং শ্রোতারা যখন 'রবিঠাকুর! একটা গান কর' অনুরোধ করল তখন শোকের বিচিত্র পরিণতি দেখে নবীনচন্দ্র নিশ্চয়ই খুশি হয়েছিলেন। সভাপতি অবশ্য শ্রোতাদের ধমক দিয়ে বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের গলা খারাপ। চোদ্দো বছরের বড়ো নবীনচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আহ্বান করেছিলেন সভাপতি হওয়ার জন্য। কেন নবীনচন্দ্র রাজি হননি জেনে, রবীন্দ্রনাথ অনতিবিলম্বে 'শোকসভা' প্রবন্ধে লেখেন, কেন শোকসভা প্রয়োজন। সেটা অবশ্য বক্তৃতা নয়।

বক্তৃতাগুলো যখন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হত, তখন যে, বক্তৃতা হুবহু অনুসৃত হয়ে ছাপা হত না, বলাই বাহুল্য। রবীন্দ্রনাথ নিজেই প্রবন্ধ হিসাবে ছাপার সময় বক্তৃতা সংশোধন করে নিতেন। সেটার চাইতেও বড়ো কথা, বর্জনও করতেন। এই উদাহরণটা দেখা যাক। 'সাহিত্য' একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ, যেটা আছে *সাহিত্যের পথে* গ্রন্থে। যে সব কথা ছাপা হয়েছিল *বঙ্গবাণী* পত্রিকার বৈশাখ ১৩৩১ সংখ্যায়, সেসব কথাও বাদ গেল গ্রন্থভুক্ত হওয়ার সময়। বর্জিতাংশ এখন ছাপা হয়েছে সরকারি রবীন্দ্র-রচনাবলীর ১৬ খণ্ডে (পৃ ১০২৩-৪)।

ওই বক্তৃতার (এবং মাসিকপত্রে ছাপা প্রবন্ধে) প্রথমেই ছিল একটি ছাত্রের কথা। মনে রাখা দরকার, বক্তৃতাটি ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরপর তিনদিন ধরে দেওয়া বক্তৃতা, অবশ্যই টাকার বিনিময়ে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র-বৈরিতা নিয়ে সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর *তে হি নো দিবসাঃ* স্মৃতিকথায় যত আজগুবি কথা লিখেছিলেন, তা যে কত অসত্য, এই বক্তৃতামালাই তার প্রমাণ। আশুতোষের আগ্রহেই তিনি বক্তৃতা দিতে রাজি হন, তবে টাকা নিয়ে আশুতোষের সঙ্গে দরাদরিও করেছিলেন। সেটা অবশ্য প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের পরামর্শে। প্রশান্তচন্দ্র বলেছিলেন, অবনীন্দ্রনাথ বাগীশ্বরী ৬টি বক্তৃতার জন্য পান ৬০০০, আর রবীন্দ্রনাথকে দেওয়া হচ্ছে ৬টা বক্তৃতার জন্য মাত্র ২০০০? শেষপর্যন্ত কত টাকায় রফা হয়েছিল জানা যায়নি। বিশ্বভারতীর জন্য টাকা রোজগারে ব্যস্ত রবীন্দ্রনাথকে যে আশুতোষের

সঙ্গে দরাদরি করতে হয়েছিল এটাই আশ্চর্যের। যাই হোক, শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ইউনিভার্সিটির রিডার হলেন, সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতার জন্য। রবীন্দ্রনাথ ৬টি বক্তৃতা দেননি, দিয়েছিলেন ৩টি।

বক্তৃতাগুলোর জন্য দরবার করেছিলেন প্রশান্তচন্দ্র। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ প্রশান্তের উপরেও বিরক্ত। শরীরও খারাপ, নীলরতন সরকার হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করে বিশ্রামের পরামর্শ দিচ্ছেন, কাশীর রাণু অধিকারী কবির সান্নিধ্য দাবি করতে করতে সমস্যা হয়ে উঠছে, এই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য' বক্তৃতা দিলেন। তারপর বক্তৃতাটি নিয়ে রাণুকে লিখলেন যে কথা, পরে তাঁর বক্তৃতা নিয়ে সেকথাই বললেন।

'যখন সেনেট হলে গিয়ে দাঁড়ালুম দেখ্‌লুম অত বড় হল ঠাসাঠাসি ভর্তি করে লোক বাইরের বারান্দায় পর্য্যন্ত ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। সবাই বলে চার পাঁচ হাজার শ্রোতা হয়েছিল। মনের মধ্যে ভয় হল, কিচ্ছুই ত তৈরি হয়ে [করে] আসি নি; এক টুকরো কাগজে এক লাইনও নোট লেখা হয় নি। কিন্তু পালাবার পথ ত ছিল না। উঠে দাঁড়ালুম যেমন করে হোক বলতে আরম্ভ করলুম। দেখলুম বলবার কথা তো আপনিই জুটে যাচ্চে। সে সব কথা যেমন অন্যে শুন্‌চে আমি নিজেও শুনচি। সে ত আমারই বানিয়ে বলা কথা নয়।'

'সাহিত্য' প্রবন্ধে শুরুতে ছিল এক ছাত্রের কথা — 'ভারতেরই একটু পশ্চিমের কোনো কলেজের ছাত্র'। ভোরে হাঁটছেন, এমন সময় ছাত্রটি প্রশ্ন করল, 'Is art too good for human nature's daily food?' পরে জানা গিয়েছিল, ছাত্রটি অবাঙালি নয়, খুব পশ্চিমেরও নয়, অন্নদাশঙ্কর রায়। ১৯২৩-এ তাঁর বয়স উনিশ, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। শান্তিনিকেতনে তিনি রবীন্দ্রনাথের পিছু নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত বক্তৃতা সভায় এলে তিনি অন্নদাশঙ্করের প্রশ্নের উত্তর দেবেন। তখন থেকেই ভাবছেন সাহিত্য আর সমাজের সম্পর্কের কথা, যেটা পরে হবে তাঁর বক্তৃতার বিষয়।

প্রবন্ধপাঠের পরে খবরের কাগজে অনুলিখন বের হতে থাকে বিভিন্ন পত্রিকাতে। এইসব অনুলিখনে রবীন্দ্রনাথ ভয় পেতেন, প্রায়শই তাঁর বক্তব্যের বিকৃতিতে। কিন্তু শান্তিনিকেতনেরই ছাত্র সুধেন্দুরঞ্জন হোম রায়কে গুরু স্নেহ করতেন তার প্রতিলিপির দক্ষতার জন্য, এবার তাঁকে করলেন অনুলিপিকার। সুধেন্দুর অনুলিখন পড়ে তাকে জানালেন, 'যা মুখে বলেছিলেম, ঠিক তাই ত দেখলুম ছাপার কাগজে।... কথার পুঁজি শূন্য করে আমার কণ্ঠ যখন হাঁ হাঁ করচে তখন তোমার অনুলিপির নিপুণ পাশ হস্তে আজ কোন বাণীকে শিকার করতে এসেচ, বাজপক্ষী গেল, কোকিলপক্ষী গেল, ধরেচ কি না এক চড়াই পক্ষীকে।'

১৯২৩ সালেই রবীন্দ্রনাথ মনে করছেন, তাঁর কথা পুঁজি শূন্য! যাই হোক, সাময়িক পত্রে রবীন্দ্রনাথ এটা বাদ দেননি, কিন্তু গ্রন্থে বাদ দিলেন:

"আপনাদের মধ্যে কোনো কোনো পরিহাসরসিকের মুখে ঈষৎ হাসির চিহ্ন দেখছি — তবু উপনিষদের বাণী আমি এড়াতে পারলেম না। উপায় যে নেই। বহু শতাব্দীর এইসব মহামন্ত্র। ভারতবর্ষের সমস্ত ভাব ও সাধনার বীজমন্ত্র, আজও যে এরা আমার প্রাণের আশ্রয়।"

রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা দেওয়ার কথা এম.এ.-র ছাত্রদের কাছে। তাদের তিনি আপনি

বলছেন, অথবা সামনের সারিতে বসা অধ্যাপক ও আমন্ত্রিত শ্রোতাদের বলছেন, বলা মুশকিল। তবে উপনিষদ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া তাঁর দীর্ঘদিনের অভ্যাস, সাহেবদের কাছে বক্তৃতা দেওয়ার সময়েও। সংস্কৃত তিনি খুব ভালো জানতেন কি না, এমনকী উপনিষদও, এমন সন্দেহ করার লোকও ছিল। বলা হয়েছে তিনি ততটুকু উপনিষদই জানতেন যেটুকু দেবেন্দ্রনাথ আহরণ করেছিলেন, দেবেন্দ্রনাথের আহৃত ভুল-সহ শ্লোকও তিনি ব্যবহার করতেন তাঁর রচনায়। একবার, ১৯১৭ সালে, তিনি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন,

'আমি কোনো উপায়ে ইংরেজি অনুবাদ করতে পারি বলে সংস্কৃত অনুবাদ করতেও পারব এমন আশা করলেন কি করে? আমি বাংলা লেখাতেই যে সমস্ত কুকীর্ত্তি করি তাতে রাজেন্দ্র শাস্ত্রী যদি নামমাত্র রাজা না হতেন তাহলে আমাকে কোন্‌কালে উহ্য করে দিতেন। আপনি আমাকে বৈয়াকরণিক মহাপাতকে উৎসাহিত করবেন না। বিধুশেখর শাস্ত্রীকে যদি অনুরোধ করেন তবে তিনি অতি সহজেই ঐ গানটিকে সংস্কৃত করে দিতে পারেন। আমি ওকে সংস্কৃত রেলপথের প্রায় লিলুয়া পর্য্যন্ত এগিয়ে রেখেছি — অনুস্বার বিসর্গের যোগে আর একটা স্টেশন পার হলেই যাত্রা সমাপ্ত হয়।' রামানন্দ 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানটির সংস্কৃত অনুবাদ চেয়েছিলেন।

সাহিত্য প্রবন্ধ রচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ রাণুকে-যে কথা বলেছিলেন, সাময়িকপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধেও সেটা ছিল, পরে উহ্য হয়ে যায়:

'যখন মুখে বলি তখন অনেক সময়ই চিন্তা করে বলতে পারি নে — তার কারণ আমার স্মরণশক্তির দুর্বলতা। লোকে যাকে পয়েন্ট বা ব্যাখ্যানসূচী বলে সে-সব আমি মনে ধারণ করতে পারি নে। বলবার সময় সূচী হারিয়ে তারপরে সেই হারাধনের পিছনে পিছনে মনকে হঠাৎ দৌড় করতে পাঠালে, আসল কাজটার বড়ো ব্যাঘাত ঘটে। তাই দুর্দ্দৈবক্রমে বক্তৃতাসভায় আমার ডাক পড়লে আমার রসনাকে আমার ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করে দিই। অর্থাৎ সেই সময় যেমন চিন্তার ধারা আসে তারই অনুবর্তন করে যাই। এ ছাড়া অন্য উপায় আমার হাতে নেই।'

বক্তৃতা লিখে কাছের লোকজনের কাছে পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ যাচাই করে নিতেন, তাঁর নিজের বক্তব্যে কোনো ফাঁক, শৈথিল্য, ভ্রান্তি আছে কি না। এটা তাঁর চিরকালের অভ্যাস। 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধটি রচনা করে তিনি 'অসহায়ভাবে একলা বসে ঐ লেখাটিকে নিয়ে অনেক চিন্তা তর্ক পরিবর্ত্তন সংশোধন' করেছিলেন, এমন জানাচ্ছেন প্রমথ চৌধুরীকে যিনি তখন পাহাড়ে আর অপর এক নির্ভরযোগ্য বন্ধু লোকেন পালিত বিলেতে। তিনি লিখছেন, '— এবং শেষপর্য্যন্ত ঐ লেখাটার ভালোমন্দ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলুম না। একবার কেবল বঙ্কিমবাবুকে শোনাতে হয়েছিল — তাঁর প্রশংসাবাক্যে অনেকটা নিরুদ্বিগ্ন হয়েছিলুম।' চৈতন্য লাইব্রেরিতে যে সভায় তিনি 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' পাঠ করেছিলেন, সেই সভার সভাপতি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁকে 'পড়াতে হয়েছিল' কেন? বক্তৃতার বিষয়টি নামকরণ থেকে অনুমান করা যায় — বিষয়টি রাজনৈতিক। আগের বছর তিনি 'রায় বাহাদুর' উপাধি পেয়েছিলেন। তাতে বিক্ষুব্ধ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সাহিত্য পত্রিকায় 'উপাধি উৎপাত' প্রবন্ধে

জানালেন, বঙ্কিমচন্দ্রের এই সামান্য রাজ অনুগ্রহ নেওয়া ঠিক হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র বা তাঁর কোনো অনুরাগী সাহিত্য সম্পাদককে জানান, বঙ্কিমচন্দ্র উপাধি প্রার্থনা করেননি, সরকার নিজের থেকেই উপাধি দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথও বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষ নিয়ে লেখেন তাঁর *সাধনা* পত্রিকায়। সরকার উপাধি দিয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্রের সরকারি কাজের জন্য, সাহিত্যকর্মের জন্য নয়। উপাধি না-নেওয়া অশোভন হত। এইসব কথা ১৮৯২ সালের। ১৯১৫ সালে নাইট উপাধি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এমনই বিড়ম্বনায় পড়লেন। কিন্তু ১৮৯৩ সালে বঙ্কিমচন্দ্রকে আগেই 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' শোনাতে হল কেন? পেনশনভোগী বঙ্কিমচন্দ্র সিডিশন-এর আশঙ্কায় আগেই জানতে চেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ইংরাজকে আক্রমণ করবেন কি না, করলে কতটা করবেন, কী ভাষায়?

সব প্রবন্ধই, আগে বক্তৃতা দেওয়ার সময়, রবীন্দ্রনাথ যে লেখার ভালোমন্দ বিবেচনার জন্য কাউকে শুনিয়ে নিতেন, তা বোধহয় নয়। তর্কের উত্তেজনায় বক্তৃতা দিয়ে এসেছেন এবং প্রবন্ধ ছেপে প্রকাশ করেছেন, তার একেবারে প্রাথমিক উদাহরণ, 'একটি পুরাতন কথা'। নবীনচন্দ্র যে বঙ্কিম-রবীন্দ্র তর্কে বিরক্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথের বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধানের সভায় পৌরোহিত্য করতে রাজি হননি, এটা সেই বক্তৃতা/প্রবন্ধ। নবীনচন্দ্র অবশ্য রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি, যেটা বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বক্তব্যের সমালোচনা, পড়েননি। সমালোচনার উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র যেটা লিখেছিলেন সেটাই পড়ে রবীন্দ্র-বিরূপ হন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধটি পড়ে তৎক্ষণাৎ রবীন্দ্রনাথ যে সমালোচনাটি, 'একটি পুরাতন কথা' লিখেছিলেন, তা নয়। সমালোচনা করতে দেরি হল কেন? *প্রচার* পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যা ছাপার পরে, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখা হয়েছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গটি কেন তোলেননি, নিশ্চয়ই আদি ব্রাহ্মসমাজের প্ররোচনায় 'একটি পুরাতন কথা' লিখেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র এমন কথা লেখায়, রবীন্দ্রনাথ কিছুটা লঘু স্বরে দেরি হওয়ার কারণ বলেছেন, তর্ক-বিতর্কের পরবর্তী লিখিত প্রবন্ধ, 'কৈফিয়ত'-এ। দেরি করার নানা কারণ থাকতে পারে, চক্ষুলজ্জা হতে পারে, সমালোচনা বঙ্কিমবাবু সহ্য করতে পারেন না এমন জানার জন্য সামনাসামনি আলোচনা না করা হতে পারে। বাড়িতে *প্রচার* এলেই কাড়াকাড়ি পড়ে যায়, ফলে বাড়ির *প্রচার*-এর সেই সংখ্যাটি তিনি দেখতেই পাননি। দোকানে তাড়াহুড়ো করে পড়েছিলেন, ভালো বুঝতে পারেননি। বহু পরে তিনি প্রবন্ধটি পড়েন। সেই জন্যই দেরি। আদি ব্রাহ্মসমাজের প্ররোচনা নয় — এই কথা জানালেন রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্রের যে-উক্তিটি তাঁকে উত্তেজিত করেছিল, সেটা হল এই : শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যদি লোকহিতার্থে মিথ্যা প্রয়োজন, সেখানে মিথ্যাই সত্য। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল সত্য সব সময়েই সত্য, লোকহিত নামক সঙ্কীর্ণ কারণে তার ব্যত্যয় হতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা-প্রবন্ধের প্রথম ছিল ১৮৮১ সালে 'সংগীত ও ভাব', তারপরে ১৮৮৪ সালে 'অকাল কুষ্মাণ্ড', 'হাতে কলমে' আর 'একটি পুরাতন কথা'। ১৮৮৫ সালে, 'রামমোহন রায়' আর 'সাকার ও নিরাকার'। রবীন্দ্রনাথ পরে বহুবার বলবেন, পত্রপত্রিকার চাপে তিনি বহু লেখা লিখতে বাধ্য হয়েছেন, খ্যাতির বিড়ম্বনায়; কিন্তু সেইসব লেখাই খাঁটি যেগুলো

ভিতরের চাপে তৈরি হয়।

'একটি পুরাতন কথা' বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা পড়ে উত্তেজিত বক্তৃতা হলেও 'অকাল কুষ্মাণ্ড' আর 'হাতে কলমে' সম্ভবত চাপে পড়েই লেখা বক্তৃতা। ১৮৭৯ সালে তৈরি হয় সাবিত্রী লাইব্রেরি, বউবাজারের অক্রুর দত্ত লেনে। প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দলাল দত্ত, যাঁর পরিবারের কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী স্বর্ণকুমারী দেবীর বন্ধু ছিলেন। এই লাইব্রেরির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ কলকাতার বিদ্বজ্জনের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠেন। লাইব্রেরির বার্ষিক অধিবেশনে প্রবন্ধপাঠ, আলোচনা, গান হত। ১৮৮৩ সালে এই লাইব্রেরির আয়োজিত একটি মেয়েদের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় বিচারক ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সঙ্গে তরুণ রবীন্দ্রনাথ। ২২ বছরের রবীন্দ্রনাথ তখন 'কবিকাহিনী', 'বনফুল', 'ভগ্নহৃদয়', 'বাল্মীকি-প্রতিভা', 'সন্ধ্যাসংগীত', 'রুদ্রচণ্ড' কাব্যগ্রন্থের ও নাটকের রচয়িতা। পারিবারিক গণ্ডি কাটিয়ে তাঁকে দেখা যাচ্ছে 'সমালোচনী সভা' তৈরি করতে, ইন্ডিয়া ক্লাবে গান শোনাতে। সাবিত্রী লাইব্রেরির পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ পড়লেন, 'অকাল কুষ্মাণ্ড' — তাঁর প্রশ্ন বাংলা ভাষায় এত পত্রিকা, এত লেখক, এত সাহিত্য কেন, এরা সব অকাল কুষ্মাণ্ড। বলা বাহুল্য, উপস্থিত পাঁচ ছয়শো শ্রোতাদের অনেকেরই এই বক্তৃতা পছন্দ হয়নি, আলোচনায় স্বপক্ষ ও বিপক্ষে বক্তা ছিলেন, সভাপতি চন্দ্রনাথ বসু জানালেন সব রচনা ও সব লেখকই অসার নন, কোনো দেশেই সব লেখা সার্থক হয় না। প্রবন্ধটি *ভারতী*তে ছাপা হলে হিন্দু পেট্রিয়টে বলা হয়েছিল এমন প্রগল্‌ভ (frivolous) রচনা *ভারতীর* চরিত্র নষ্ট করেছে, *সাধারণী*-তেও বিরূপ সমালোচনা বের হয়।

রবীন্দ্রনাথ সমালোচনায় মুষড়ে অবশ্যই পড়েননি। পাঁচ মাস পরেই ওই সাবিত্রী লাইব্রেরিতেই আর একটি বক্তৃতা দিলেন, এবার সমালোচনার বিষয়, 'হাতে কলমে' কাজ না করে শুধু সভায় বক্তৃতা দিয়ে দেশপ্রেম দেখানো। রবীন্দ্রনাথ পরে দীর্ঘকাল আবেদন-নিবেদনের ব্যর্থতার কথা বলবেন, তার শুরু হল এই বক্তৃতায়। যথারীতি এই বক্তৃতা-প্রবন্ধেরও সমালোচনা হল। ঠাকুরবাড়ির বিভিন্ন পত্রিকায় এর আগে দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্ঞানদানন্দিনী, স্বর্ণকুমারী সমালোচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের নানান সামাজিক এবং রাজনৈতিক মতের, এবার বাইরের লোকেরাও যোগ দিলেন। রবীন্দ্রনাথের পক্ষ নিলেন গোবিন্দলাল দত্ত, বিপক্ষে গেলেন বিজয়চন্দ্র মজুমদার, *নব্যভারত* পত্রিকায়।

১৮৮৫ সালে যখন দুটি বক্তৃতা-প্রবন্ধ রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ, তখন তিনি নবনিযুক্ত সম্পাদক, আদি ব্রাহ্মসমাজের। এর আগে দীর্ঘকাল তিনি সমাজের জন্য গান লিখে আসছিলেন, গান গাইছিলেন, এখন তিনি উপাসনায় পৌরোহিত্য করছেন। 'রামমোহন রায়' আর 'সাকার ও নিরাকার' প্রবন্ধদুটো পড়ার সময় এই সম্পাদকীয় ভূমিকাও মনে রাখতে হয়। প্রথমটি পড়া হয় ব্রাহ্মদের সিটি কলেজে, দ্বিতীয়টি আদি ব্রাহ্মসমাজ হলে। ব্রাহ্মদের তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ ছিল, সেটা প্রত্যক্ষ হত তাদের বিবাহপদ্ধতিতে পার্থক্যের জন্য। আবার ব্রাহ্মসমাজের বিরোধ ছিল হিন্দু সমাজের সঙ্গে। দুই পক্ষেই গোঁড়া মতাবলম্বী ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মধ্যপথবর্তী। নিরাকার উপাসনায় ব্রাহ্ম পদ্ধতির সমর্থনে তিনি জানালেন, নিরাকার উপাসনাও

হিন্দুধর্মের অঙ্গ, শাস্ত্রসম্মত, এতে হিন্দুদের রেগে যাওয়ার কোনো কারণ নেই। সীমা ও অসীম, কল্পনা ও সত্য, জ্ঞানে ও ভাবে সাকার ও নিরাকার-এর মধ্যে তেমন কোনো দ্বন্দ্ব থাকার কথা নয়, কিন্তু নিরাকারে, অসীমে, সত্যে, ভাবে যাঁরা প্রবণ, তাঁদের উপর সাকারবাদীদের খড়্গহস্ত হওয়ার তেমন কারণ নেই।

এমনই তর্ক থেকে উঠে আসে হিন্দুবিবাহ বক্তৃতা-প্রবন্ধটি। বাল্যবিবাহ উচিত কি অনুচিত, বিবাহযোগ্য বয়স বাড়ানো উচিত কি উচিত নয়, কলকাতায় যে সময় এমন তর্ক প্রবল তখন রবীন্দ্রনাথও নেমে পড়লেন তর্কবিতর্কে। বাল্যবিবাহ তখনকার দিনে প্রচলিত ব্যবস্থা, যুক্তির নিরিখে রবীন্দ্রনাথ বাল্যবিবাহবিরোধী হলেও, নিজের জীবনে তিনি এই বাল্যবিবাহে এমন জড়িয়ে পড়েছিলেন যে তাঁর আচরণ এবং মতামতের মধ্যে দুস্তর ফারাক গড়ে ওঠে। এর জের তাঁকে টানতে হয়েছিল ১৯২৭ সাল পর্যন্ত, ক্যাথারিন মেয়োর Mother India প্রকাশ পর্যন্ত। বক্তৃতাটি এতই দীর্ঘ হয়েছিল যে খেই রাখতে বক্তাকেই সূত্রাকারে বক্তব্যটি গ্রথিত করতে হয়েছিল। ব্রাহ্মদের হয়ে নয়, হিন্দুদের হয়েই রবীন্দ্রনাথ এই তর্কটা জুড়েছিলেন। যথারীতি সমালোচনাও হল। সাবিত্রী লাইব্রেরির সাবিত্রী সভার উদ্যোগে বউবাজারের সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন হলে প্রবন্ধটি পড়া হল, সভাপতি মহেন্দ্রলাল সরকার। আলোচনায় অংশ নেন চন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, রমেশচন্দ্র দত্তের মতো প্রবীণ বিদ্বজ্জন। বাল্যবিবাহের সমর্থক চন্দ্রনাথ বসুকেই রবীন্দ্রনাথ বিরোধীপক্ষের মুখ্য গণ্য করেছিলেন, চন্দ্রনাথ এর জবাব দেবেন সাবিত্রী লাইব্রেরির পরবর্তী সভায়। *বিভা* পত্রিকায় প্রশ্ন করা হয়, রবীন্দ্রনাথ তো নিজেই বাল্যবিবাহ করেছেন, তিনি কীভাবে বাল্যবিবাহের বিপক্ষে যাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য সাফাই গেয়ে রেখেছিলেন, সচ্ছল একান্নবর্তী পরিবারে বাল্যবিবাহ সমস্যা তৈরি করে না। তিনি সচ্ছল একান্নবর্তী পরিবারেরই লোক, এটাই বোধহয় তাঁর আচরণ সমর্থন করে। যদিও সমালোচনার উত্তর তিনি দেননি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তৃতায় মেয়েদের বিবাহযোগ্য বয়স কত সেটা শরীরতত্ত্বের পণ্ডিত ডাক্তার কার্পেন্টারের মত জানিয়ে বলেন, 'সুশ্রুত সংহিতার সহিত এ বিষয়ে পাশ্চাত্য শাস্ত্রের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে।' *বিভা* পত্রিকার লেখক জিজ্ঞাসা করলেন, সুশ্রুত-সংহিতার কোথায় আছে? রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় কোনো গোবৈদ্যের কাছে কথাটা শুনে থাকবেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য তাঁর বক্তৃতায় আগেই বলে দিয়েছিলেন, তিনি সংস্কৃতভাষায় ব্যুৎপন্ন নন, শাস্ত্রজ্ঞান যথেষ্ট নেই তাঁর, এই বিষয়ে তাঁর যে জ্ঞান তা 'মুখে ও লেখায় ও অনুবাদে শাস্ত্রচর্চা' থেকে।

ডাক্তার কার্পেন্টারের যে মত রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করেছিলেন, সেটা হল, ১৩ থেকে ১৬ বছরে মেয়েদের যৌবনলক্ষণ প্রকাশ পায়, যেমন শীতপ্রধান দেশে তেমন গ্রীষ্মপ্রধান দেশে। তার আগে বিয়ে দেওয়া উচিত নয়ই, উচিত যৌবনলক্ষণ প্রকাশ হওয়ারও পরে, যখন দৈহিকভাবে মেয়েরা সন্তানধারণে সক্ষম হয়। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছেন বাঙালি হিন্দু শিক্ষিত সমাজে একদল আছে যারা পুরুষদের ২৪ থেকে ৩০ এবং মেয়েদের ৮ থেকে ১২-এর মধ্যে বিয়ে দিতে চায়, আর একদল ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে বাল্যাবস্থায় বিয়ে দিতে চায়। রবীন্দ্রনাথ দুইয়েরই বিরোধী। এই কথা তিনি যখন বলছেন, তখন তিনি বিবাহিত। তিনি বিয়ে করেছেন

সাড়ে বাইশ বছর বয়সে, স্ত্রীর বয়স সাড়ে দশ। তিনি সচ্ছল একান্নবর্তী পরিবারের, কিন্তু যখন নিজের মেয়েদের বিয়ে দেন, তখন তিনি একান্নবর্তী পরিবারে থাকেন না। বেশি বয়সের ছেলেদের সঙ্গে অল্প বয়সের মেয়েদের তিনি বিয়ে দিতে চান না, কারণ সেক্ষেত্রে মেয়েদের বিধবা হওয়ার সম্ভাবনা। বড়ো মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলেন কার্পেন্টার নির্ধারিত বয়সের মধ্যেই। মাধুরীলতার বিয়ে হয় সাড়ে পনেরো বছর বয়সে, কিন্তু পাত্রের বয়স তখন একত্রিশ। মাধুরী অবশ্য বিধবা হননি, তাঁর স্বামী শরৎচন্দ্র দীর্ঘজীবী ছিলেন। কিন্তু মেজো মেয়ে রেণুকার বিয়ে দিলেন সাড়ে দশ বছর বয়সে। পাত্রের বয়স কত ঠিক জানা যায়নি, তবে পাত্র তখন পাশ করা অ্যালোপাথ ডাক্তার, বাইশ-তেইশের কম হতে পারে না। রেণুকাও বিধবা হয়নি, রুগ্না কন্যাই অল্প বয়সে মারা যায়। ছোটো মেয়ে মীরার বিয়ে দিলেন সাড়ে তেরো বছর বয়সে, যদিও সাড়ে এগারো বছর বয়সেই তার পাত্র খুঁজছেন তিনি। এই ক্ষেত্রে অবশ্য পাত্র অল্পবয়সী সাড়ে সতেরো। রবীন্দ্রনাথের হিসেবে দু-জনেই বালক-বালিকা। আত্মপক্ষ সমর্থনে রবীন্দ্রনাথ হয়তো ভাবছেন, রেণুকা-সত্যেন্দ্র আর মীরা-নগেন্দ্রকে তিনিই আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাঁর অভিভাবকত্বে মেয়ে-জামাইরা ছিল। আর বড়ো মেয়ের বিয়ে হয়েছিল সচ্ছল একান্নবর্তী পরিবারে এবং বড়ো মেয়ের বিবাহিত জীবন সুখের হয়েছিল। বাবার সঙ্গে মনান্তর হয়েছিল বড়ো মেয়ের, তবে সেটা অন্য প্রসঙ্গে, বিবাহিত-জীবন সম্পর্কিত নয়।

১৮৮৬ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হলে পারিবারিক ও ব্রাহ্মসূত্রে (অনেক ব্রাহ্ম প্রতিনিধি এসেছিলেন কলকাতায়) রবীন্দ্রনাথ গান লিখছেন, গান গাইছেন এবং কংগ্রেসের রাজনীতি লক্ষ করছেন। রাজনৈতিক প্রস্তাবের সমর্থনে তিনি পড়লেন ১৮৯০ সালে 'মন্ত্রি-অভিষেক'। ১৯৪০ সালে *শনিবারের চিঠি*-তে তিনি বললেন, তখন রাজনীতি ছিল 'ভিক্ষার দাবি', কিন্তু সেই সময়েও ইংরেজের চোখরাঙানির জবাব তিনি দিয়েছিলেন গরম ভাষায়, 'মন্ত্রি-অভিষেক' বক্তৃতায়। বক্তৃতাটি তখনকার সময় মনে রাখলেও তত গরম মনে হয় না, বরং ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় *নবভারত* পত্রিকায় লিখেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারছেন না, ইংরেজ শাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য ভারতের উন্নতি নয়, নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করা। এর পরে সিডিশন বিল পাশ হওয়ার আগের দিন বিলের বিরুদ্ধে তিনি পড়লেন 'কণ্ঠরোধ'। সেটাও তেমন গরম মনে হয় না। বঙ্গভঙ্গ পর্যন্ত কংগ্রেসি নেতারা আইন মেনেই চলছিলেন, তাঁরা চাইছিলেন শাসন ব্যাপারে প্রতিনিধিত্ব। রবীন্দ্রনাথও একই পথের পথিক, যেজন্য রানি ভিক্টোরিয়া মারা গেলে মাঘোৎসবে তিনি তাঁর 'সাম্রাজ্যেশ্বরী' বক্তৃতাপাঠ করতে সঙ্কোচ অনুভব করেননি।

'বাংলা জাতীয় সাহিত্য' প্রবন্ধটি পড়া হয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে। প্রায় চারশো শ্রোতা এসেছিলেন মহারাজ কুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের বাড়িতে, যেখানে পরিষদের প্রথম দিককার অধিবেশনগুলো বসত। প্রায় উৎসবের চেহারা নিয়েছিল এই অধিবেশন। সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্ত। সহ-সভাপতি তিনজন, নবীনচন্দ্র সেন, চন্দ্রনাথ বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য বিষয়ে নবীনচন্দ্র কী ভেবেছিলেন, জানা যায়নি। এই সভায় বলার জন্য রবীন্দ্রনাথ যে-বক্তৃতা তৈরি করেছিলেন, সেই বক্তৃতা বিষয়ে ইন্দিরা দেবীকে

তিনি জানাচ্ছেন : 'আজও সমস্ত দিন সেই বক্তৃতাটা নিয়ে পড়েছিলুম। বাংলায় নিজের মনের ভাবটি ঠিক মনের মতো করে প্রকাশ করা এমনি শক্ত যে, লেখাটা একটা লড়াই-বিশেষ। শক্ত হবার কারণ কেবল ভাষার অক্ষমতা নয় — যারা লেখাটা শুনবে তাদের সাধারণত কোনো বিষয়ে কোনো কথা ভালো করে ভাবা অভ্যাস নেই, সেইজন্যই সব কথাই ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে বিস্তারিত করে লেখা দরকার হয়ে পড়ে। যে কথাটাকে সংহত সংক্ষিপ্ত করে লিখলে তার ওরিজিন্যালিটি, তার উজ্জ্বলতা, পরিস্ফুট হতো সে কথাটাকে জল মিশিয়ে ব্যাখ্যা করে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর করে তুলতে হয় — তার পরে নিজের মনে ভারী একটা অসন্তোষের উদয় হয়।' বক্তৃতার বিষয়টিও তা-ই ছিল, বাংলা সাহিত্যের উপরেই জোর ছিল, জাতীয় সাহিত্যের কথা তেমন ছিল না। ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি সাহিত্যানুরাগীদের মধ্যে বাংলায় চিন্তা করা প্রকাশ করা দরকার, সেই ঐতিহ্য গড়ে তোলা দরকার, যেটা ইংরেজি সাহিত্যের পাঠকদের আছে, দীর্ঘ চর্চার ফলে। সাহিত্য পরিষদের সভায় যাঁরা আসবেন, তাঁদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের খুব একটা উচ্চ ধারণা ছিল না, এই চিঠিতেই সেটার প্রকাশ। সাহিত্যের উপর ততটা নয়, ভাষার উপরে জোর পড়েছে বক্তৃতাটিতে, যেজন্য রামমোহন রায়ের কথা সশ্রদ্ধভাবে উচ্চারিত হয়েছে বাংলা গদ্যের পথিকৃৎ হিসেবে, বঙ্কিমচন্দ্রের নাম উল্লেখ করাই হল না।

শ্রোতাদের 'ভালো করে ভাবা অভ্যাস নেই', এই ধারণা রবীন্দ্রনাথের হয়তো মনে হয়েছিল হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নদের মতো লোকের জন্য। 'বাংলা জাতীয় সাহিত্য' পড়ার পাঁচ ছয় মাস আগে তিনি পড়েছিলেন 'মেয়েলি ছড়া' যেটা বর্তমানে *লোকসাহিত্য* গ্রন্থে 'ছেলেভুলানো ছড়া : ১' নামে নেওয়া হয়েছে। মিনার্ভা থিয়েটারে সেদিন রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনতে এক হাজারেরও বেশি শ্রোতা ছিলেন। তিনি মেয়েলি ছড়া নিয়ে বক্তৃতা দিলে হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন বলেছিলেন, তুচ্ছ উদ্দেশ্যহীন বিষয় নিয়ে বক্তৃতা করা কেন! এঁর কথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ইন্দিরাকে চিঠিতে। তবে, বক্তৃতায় 'মেয়েলি ছড়া' *সাধনা*-য় ছাপার সময় হয়ে গেল 'ছেলেভুলানো ছড়া'। মেয়েলি বললে শুধুই মেয়েদের জন্য, একটু অবজ্ঞাবাচক ভাব এসে যায়, 'ছেলে' বললে তার মধ্যে মেয়েরাও এসে যায়, তাই হয়তো নাম পরিবর্তন।

বক্তৃতা হিসেবে প্রবন্ধগুলো পাঠ করার জন্যই হয়তো রবীন্দ্রনাথ সাধুভাষায় লিখলেও কথ্যভঙ্গি নিতেন, মুখের কথা ব্যবহার করতেন। এটা শুদ্ধপন্থীদের ভালো লাগবে না, বলাই বাহুল্য। জগদীশচন্দ্র বসুর পাঠানো Letter of John Chineman পড়ে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়ে পড়লেন 'চীনেম্যানের চিঠি'। তার ভাষা লক্ষ করে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন, 'হনলুলুর ভাষা'। ওই চিঠিগুলোর লেখক যে কোনো চৈনিক নন, একজন সাহেব, গ্রন্থটির আলোচনা করার সময় রবীন্দ্রনাথ বা তাঁর শ্রোতা-পাঠকেরা জানতেন না।

রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা-প্রবন্ধ : ১৮৮১-১৯০২

সংগীত ও ভাব : মেডিক্যাল কলেজ হল, বেথুন সোসাইটির উদ্যোগে,
১৯ এপ্রিল ১৮৮১ (৮ বৈশাখ ১২৮৮)
ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮

অকাল কুষ্মাণ্ড : সাবিত্রী লাইব্রেরি, লাইব্রেরির পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন,
২৩ মার্চ ১৮৮৪ (১১ চৈত্র ১২৯০)
ভারতী, চৈত্র ১২৯০

হাতে কলমে : সাবিত্রী লাইব্রেরি, সাবিত্রী-সভার অধিবেশন
২৪ আগস্ট, ১৮৮৪ (৯ ভাদ্র ১২৯১)
ভারতী, ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯১

একটি পুরাতন কথা : আদি ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরি হল
অক্টোবর (?), ১৮৮৪ (কার্তিক ১২৯১)
ভারতী, অগ্রহায়ণ ১২৯১

রামমোহন রায় : সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, মাঘোৎসব
১৮ জানুয়ারি ১৮৮৫ (৬ মাঘ ১২৯১)
ভারতী, মাঘ ১২৯১

সাকার ও নিরাকার : আদি ব্রাহ্মসমাজ
২৬ জুলাই ১৮৮৫ (১১ শ্রাবণ ১২৯২)
ভারতী, শ্রাবণ ১২৯২

হিন্দুবিবাহ : সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন হল
৪ সেপ্টেম্বর ১৮৮৭ (১৯ ভাদ্র ১২৯৪)
ভারতী ও *বালক*, ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৪

মন্ত্রি-অভিষেক : এমারেল্ড থিয়েটার
২৬ এপ্রিল ১৮৯০ (১৪ বৈশাখ ১২৯৭)
ভারতী ও *বালক*, বৈশাখ ১২৯৭

ইংরাজ ও ভারতবাসী : জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ অ্যাসোসিয়েশন হল, চৈতন্য লাইব্রেরি ও
বিডন স্কোয়ার লিটারারি ক্লাবের অধিবেশন,
সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ (আশ্বিন ১৩০০)
সাধনা, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩০০

বঙ্কিমচন্দ্র : স্টার থিয়েটার, চৈতন্য লাইব্রেরির বিশেষ অধিবেশন
২৮ এপ্রিল ১৮৯৪ (১৬ বৈশাখ ১৩০১)
সাধনা, বৈশাখ ১৩০১

ছেলেভুলানো ছড়া : মিনার্ভা থিয়েটার, চৈতন্য লাইব্রেরির অধিবেশন
১ অক্টোবর ১৮৯৪ (১৬ আশ্বিন ১৩০১)
সাধনা, আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১

বাংলা জাতীয় সাহিত্য : মহারাজকুমার বিজয়কৃষ্ণের বাড়ি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম
বাৎসরিক অধিবেশন
৭ এপ্রিল ১৮৯৪ (২৫ চৈত্র ১৩০১)
সাধনা, বৈশাখ ১৩০২

কণ্ঠরোধ : টাউন হল
১৭ ফেব্রুয়ারি১৮৯৮ (৬ ফাল্গুন ১৩০৪)
ভারতী, বৈশাখ ১৩০৫

বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
২৮ সেপ্টেম্বর ১৯০১ (১২ আশ্বিন ১৩০৮)
সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৮ম ভাগ ৩য় সংখ্যা

বাংলা ব্যাকরণ : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
১০ ডিসেম্বর ১৯০১ (২৪ অগ্রহায়ণ ১৩০৮)
বঙ্গদর্শন, পৌষ ১৩০৮

সাম্রাজ্যেশ্বরী : মাঘোৎসব
জানুয়ারি ১৯০১ (মাঘ, ১৩০৭)
ভারতী, ফাল্গুন ১৩০৭

নববর্ষ : শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম
১৪ এপ্রিল ১৯০২ (১ বৈশাখ ১৩০৯)
বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩০৯

ব্রাহ্মণ : মজুমদার লাইব্রেরির আলোচনা সমিতি
মে ১৯০২ (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯)
বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩০৯

চীনেম্যানের চিঠি : মজুমদার লাইব্রেরির আলোচনা সমিতি
মে ১৯০২ (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯)
বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩০৯

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য : মজুমদার লাইব্রেরির আলোচনা সমিতি
মে ১৯০২ (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯)
বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১৩০৯

ভারতবর্ষের ইতিহাস : মজুমদার লাইব্রেরির আলোচনা সমিতি
মে ১৯০২ (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯)
বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১৩০৯

বদ্বীপ

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

১৪১১

শরৎকালীন সংখ্যার সূচি

বিশেষ আকর্ষণ

বৃটিশ আমলে রামকৃষ্ণ মিশন ও বাংলার বিপ্লববাদ
সম্পর্কে দীর্ঘ, অতি চাঞ্চল্যকর মূল গোয়েন্দা রিপোর্ট
যা প্রকাশমাত্র আলোড়ন তুলবে। এ-বিষয়ে
গবেষণামূলক বিস্তৃত নিবন্ধ লিখেছেন
ল্যাডলীমোহন মুখোপাধ্যায়।

উপন্যাসিকা : তপন বন্দ্যোপাধ্যায়।
গল্প : প্রফুল্ল রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়,
সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত মুখোপাধ্যায়,
সুব্রত সেনগুপ্ত, রবিশঙ্কর বল, নবকুমার বসু,
বিজনকুমার ঘোষ, সুনীল দাশ, অলোককুমার বসু
ও আরো অনেকে

এখনো পাওয়া যাচ্ছে

কাঞ্চন অপেরা ও মৃন্ময়ের কবিতা

শচীন দাশ

কাঞ্চন তাকিয়েছিল জায়গাটার দিকে। বেলা ন-টার কলকাতা। হুড়মুড় করে ভিড় বাড়ছে। স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়ে থেকে বিভিন্ন পেশার যুবক-যুবতী। প্রৌঢ়ও আছে কিছু। কিংবা হাফ বৃদ্ধ। পান অথবা সিগারেট ঠোঁটে এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে হন্তদন্ত হয়ে অটো কিংবা মিনিবাসে ওঠার অপেক্ষায়। ফলে অপরিসর রাস্তায় জ্যাম। রিকশা, সাইকেল, মারুতি আর স্যান্ট্রো। মাঝেমধ্যে দু-একটা অফিস-চার্টার্ড। যে যার মতো গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় একটানা হর্ন দিয়ে যাচ্ছে। এরই ভেতরে অনতিদূরে কাঞ্চন। মেইন রাস্তা থেকে পঁচিশ কী তিরিশ মিটারের দূরত্বে হরেন দত্ত-র ভাঙা বাড়ির সামনে। দেশভাগের পর পঞ্চাশের কোনো এক সময়ে, পূর্ববঙ্গ থেকে উৎখাত হয়ে এখানে এসে ইউ.সি.আর.সি.-র সহায়তায় ওই প্লটটা দখল নিয়েছিল হরেন দত্ত। কিন্তু স্বাধীনতার প্রায় আটান্ন বছরের মধ্যেও ওই জমিতে এক-আধটা ইট গাঁথতে পারেনি সে এবং আগামী পঞ্চাশ বছরেও পারবে না জেনে এরপর নিয়মিত শুরু হয়েছিল কাঞ্চনের শক-থেরাপি : — ছেলেরা তো দাঁড়াল না। রোজগারপাতিও নেই তেমন। বাড়িটা যে দিন দিন কোমর ভেঙে পড়ছে মেসোমশাই। তার চে টাকা দিচ্ছি, ফ্ল্যাটও দেবো একটা। জমিটা আমাকে দিয়ে দিন। বলতে বলতে, বোঝাতে বোঝাতে অবশেষে একদিন রাজি। কিছু টাকা দিয়ে, একটা ভাড়া বাড়িও এরপর ঠিক করে দিয়েছে কাঞ্চন। এখন কাল কিংবা পরশু থেকেই শুরু হবে ভাঙা। তারপর চুন দিয়ে মার্কা মেরে মাটি কাটা। কাটলেই বিজ্ঞাপনও ফেলবে এরপর : বাড়ি খুঁজছেন? আসুন না, হাত বাড়ালেই হাতের কাছে পেয়ে যাবেন এক স্বপ্নের জগত। নীলিমায় নীল ও সবুজে ঘেরা এক মায়াময় পৃথিবী। ধুলো নেই, ধোঁয়া নেই, এক দূষণমুক্ত পরিবেশ। তা বাদে, ওপেন স্পেস? হ্যাঁ — তাও আছে। প্রায় ষাট শতাংশের কাছাকাছি। উপরন্তু, বাড়তি পাওনা সকালে-বিকেলে পাখির কূজন আর দশ মিনিটের ব্যবধানে মেট্রো। নীচে নেমে এসে রাস্তায় একবার দাঁড়ালেই হল, ঝপ করে তুলে নিয়েই হাওয়া।

অ্যাডটা অবশ্য নিজের নয়। বাল্যবন্ধু মৃন্ময়ের। মৃন্ময়ই লিখেটিখে দেয় আর কী।

এক সময়ের দুর্দান্ত ছাত্র। মাধ্যমিকে এইট্টি সেভেন পারসেন্ট। ছ-ছটা লেটার। উচ্চ-মাধ্যমিকেও প্রায় সেরকম এবং গ্র্যাজুয়েশনে হাসতে হাসতেই অনার্সে ফার্স্ট-ক্লাস। কিন্তু তবুও কোথাও কিছু না হওয়ায় এখন ওই টিউশনই ভরসা। আর টিউশন ছাড়া উদ্বৃত্ত সময়ে কখনো-কখনো কবিতায় ঘোরাফেরা।

একদিন কবিতায় শরীর ডুবেছে, এই সময়ে দরজায় বেলের শব্দ। উঠে গিয়ে খুলতেই দেখে কাঞ্চন। হাতে এক গোছা কার্ড। তার থেকে বেছে বেছে একটা তুলে নিয়ে এগিয়ে দেয় মৃন্ময়ের দিকে।

— বিয়ে করছি। অবশ্যই আসবি। তবে ফুল ছাড়া কিছু নয় —

হাসি পেয়ে গিয়েছিল মৃন্ময়ের। ওর বোন মানালির বিয়েতে গিয়েছিল বছর দুই আগের এক সন্ধ্যায়। জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' মার্বেল পেপারে মুড়ে মানালির হাতে তুলে দিতে গেলে পাশে বসা মানালির পিসি ধাঁ করে সেটা চালান করে দেয় নীচে রাখা একটা বাজে কাগজের ঝুড়িতে। এবং প্রায় তখনই শাড়ি, প্রেসার কুকার ও ঘড়ি উপহার দেওয়া নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে হইহই করে মানালির পরিচয় করাতে থাকে। মৃন্ময় দেখেছিল, কার্ডের ওপর ভুল বানানে ইংরেজিতে তার নামটা লেখা। পরে বিয়েবাড়িতে গিয়ে ফুল হাতে দাঁড়ালে কাঞ্চনই এগিয়ে আসে। পরিচয় করিয়ে দেয় বউয়ের সঙ্গে।

— এই যে মৃন্ময়। আমার অ্যাড-রাইটার। মৃন্ময় লক্ষ করে 'বন্ধু' শব্দটা ইচ্ছে করেই যেন তোলে না কাঞ্চন। মৃন্ময়ের খারাপ লাগে।

এক বিকেলে পড়াতে যাচ্ছে, রাস্তায় হঠাৎই কাঞ্চন : — তোকে বোধহয় আর বিরক্ত করতে হবে না, বুঝলি। বর্ষা দারুণ লেখে। তোর মতো কবিতায়ও হাত আছে। আয় না একদিন।

মৃন্ময় গিয়েছিল। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়েই স্থির। ওপরে কীসের যেন হুল্লোড়। চাপা হাসি ও জড়ানো গলায় গান। উঠবে কিনা ভাবছিল এই সময়েই কাঞ্চন : — আরে মেঘ না চাইতেই জল। আয় আয়। বউয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি। সেদিন তো ভালো করে কথাই হয়নি। কিন্তু মৃন্ময় ওঠেনি। কিছু একটা অনুমান করে তখনো সিঁড়ির মাঝামাঝি থমকে দাঁড়িয়ে: আজ না হয় থাক।

— না না, থাকবে কেন? কাঞ্চন মোবাইল হাতেই নেমে এসেছিল হুড়মুড় করে। অগত্যা কী আর করা। ওপরে উঠে গিয়েছিল আস্তে আস্তে। কিন্তু যাবার মুখেই তাকিয়েছে এপাশে-ওপাশে। কাঞ্চন বুঝতে পেরেই হেসে ফেলেছিল। বলেছিল — নেই কেউই। মা-বাবাকে নিয়ে টুটুন পুরীতে গেছে। সঙ্গে টুটুনের এক বন্ধু। আয় এ ঘরে —

মৃন্ময় সে ঘরে পা রাখতেই দেখেছিল, নেই নেই করেও চার-পাঁচজন ভেতরে। দুই মহিলা ও দুই পুরুষ। একজন কালো ধুমসো মতো লোক গেলাস হাতে কাঞ্চনের বউয়ের পাশে। কাঞ্চনের বউ ভদকার বোতল হাতে দাঁড়িয়ে। শেষ হতেই ঢেলে দিয়ে লিমকার বোতল তুলে নিচ্ছিল হাতে। পাশের একটা বড়ো সেন্টার টেবিলে প্লেট ভর্তি কাজু, স্ন্যাকস আর চিজ। কাজের মাসি মানদার-মা প্লেট পালটে পালটে যাচ্ছিল মাঝেমধ্যে। এবং সেই সময়ই মৃন্ময়ের দিকে একটা লাইম উইথ ভদকা বাড়িয়ে ধরেছিল কাঞ্চনের বউ। বর্ষা। মৃন্ময় মাথা নাড়তেই বর্ষা চোখ নাচিয়েছিল মুহূর্তে।

— সে কী, খান না —!

মাথা আবারও নেড়েছিল মৃন্ময়।

বর্ষার চোখের তারায় বিস্ময়, — তা হলে কবিতা লেখেন কী করে —

— লিখি না তো। ওই এক-আধটু...

— বললে হবে! বর্ষা কাজুর একটা প্লেট বাড়িয়ে ধরে মৃন্ময়ের দিকে।

এই সময়েই কাঞ্চনের মোবাইলে 'সা রে জাঁহাসে'-র মিউজিক। মৃন্ময় দেখল, মোবাইলটা

তুলে নিয়ে নম্বর দেখতে দেখতে একটু দূরে সরে যাচ্ছে কাঞ্চন।

বর্ষা চোখ নাচিয়ে হাসল আবারও, — আচ্ছা আপনার প্রিয় কবি কে বলুন তো!

— কেউ নয়।

— সে কী! তা হলে প্রোজেক্ট করেন কাকে? কাউকে প্রোজেক্ট না করে কি লেখা যায়?

মৃন্ময় হাত জোড় করেছিল সঙ্গে সঙ্গে, — আচ্ছা আসি তা হলে।

— এখনই যাবেন! কিন্তু কথাই তো হল না আপনার সঙ্গে —

বর্ষা তাকিয়ে থাকে স্থির চোখে। মৃন্ময় বলে, — তা সে না হয় হবে আর একদিন। পালিয়ে তো যাচ্ছি না —

মৃন্ময় লক্ষ করেছিল, সে চলে যাওয়ার কথা তুলতেই কালো ধুমসোর মুখে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস। এক মুঠো কাজু তুলে নিয়ে নতুন একটা পেগ লাইম দিয়ে আবার ভর্তি করে নিচ্ছিল। তারপর তাতে আবার চুমুক।

মচ্ছব চলেছিল নাকি গভীর রাত পর্যন্ত। একসময় বর্ষা আউট হলে ধুমসো মতো কালো লোকটা নাকি বর্ষাকে কোলে পেঁচিয়ে নিয়ে পাশের বেডরুমে চলে যায়। কাঞ্চনের তখন আর হুঁশ নেই কোনো। কে যেন চিৎকার করছিল। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কে কাকে কষিয়ে গালাগাল করছিল আর তারপরেই প্লেট ভাঙার শব্দ। গেলাস ভাঙার আওয়াজ। এবং এর পরেই টের পেয়ে পাড়ার লোকের উঠে আসা ও জমায়েত। তীব্র প্রতিবাদ ও ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল ক্লাবের ছেলেরা। খিস্তি টিস্তি দিয়েছিল কাঞ্চন ও বর্ষাকে টেনে তুলে। পরে ট্যাক্সি ডেকে মদে চুর হয়ে থাকা নারী ও পুরুষ ক-জনকে প্রায় ঘাড় ধাক্কা দিয়েই ট্যাক্সির ভেতরে। গাঁইগুঁই করলেও ট্যাক্সিওয়ালা আর আপত্তি করেনি শেষপর্যন্ত। মধ্যরাতের জোয়ারে ট্যাক্সি ভাসিয়ে দিয়েছিল। পরের দিনই সন্ধেয় নাগরিক কমিটি। পাড়ার সুনাম নষ্ট হচ্ছে। অতএব বিহিত একটা না করলেই নয়। আশ্চর্য, ঘরের বউ। একজন জাতীয় শিক্ষকের পুত্রবধূ। তা ছাড়া ছেলেটাই বা কী বলুন তো? নিজের বউটাকেও লেলিয়ে দিলি। না লেলিয়ে উপায় আছে! অফিসারকে সাজিয়ে-গুছিয়ে কিছু দিতে না পারলে টেন্ডার গেল যে। কিন্তু এখন?

কাঞ্চনকে দেখা গেল না ক-দিন লোকসমুখে। বর্ষাও যেন গৃহবন্দী। কেবল পুরী থেকে ফিরে সব শুনে লজ্জায় যেন মাথা হেঁট করে রইলেন জাতীয় শিক্ষক। এমনকী ছোটো ছেলে টুটুলও যেন চোখ তুলতে পারে না। কিন্তু নড়েচড়ে বসেন সাধনা। জাতীয় শিক্ষকের স্ত্রী। — ছি ছি ছি, বউ হয়ে শেষ পর্যন্ত কিনা এইসব। মানদার-মা তো থাকতেই চাইছে না। আমিও আর থাকব না এক মুহূর্ত। তুমি কাঞ্চনকে বলো আলাদা হয়ে যেতে। তুমি না পারো আমিই বলবখন।

কিন্তু বলতে আর বুঝি হল না। তার আগে নিজেই এক সকালে বর্ষাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল সে। তারপর আর খবর নেই কোনো কাঞ্চনের। কাঞ্চন কোথায় উঠল কেউ জানল না। তবে মাস কয়েকের ব্যবধানেই দেখা গেল হরেন দত্তর প্লটে পেল্লাই সাইজের এক বাড়ি। বাড়ির গেটে বড়ো একটা মার্বেল বসিয়ে লেখা হল : 'আগামী'। আগামী শব্দটার নীচে কাঞ্চন ও বর্ষার নাম। তারপর তাদের ঠিকানা। কিন্তু হরেন দত্ত? উৎসাহী দু-চারজনের খোঁজখবরে

জানা গেল, শেষ পর্যন্ত ফ্ল্যাট পেতে আর আগ্রহ দেখায়নি হরেন দত্ত। বরং আরো কিছু টাকা বেশি নিয়েই সে উধাও তার বউ, ছেলে মেয়ে নিয়ে। অতএব কাঞ্চন আবার খবরের শিরোনামে। বাড়ি হল। গাড়ি হল। ঘটা করে সে-সবের উদ্বোধনও হল একদিন। উদ্বোধনের তারিখে বাড়ির সামনে ও মেইন রাস্তায় ছোটো-বড়ো দশ-বারোটা গাড়ি। মারুতি, মার্তিজ, জেন ও ইন্ডিকা। পাড়ার ছেলেরা ভড়কে গিয়ে দু-চারদিন ঘোরাঘুরি করে অবশেষে কাঞ্চনকে 'দুর্গোৎসব কমিটি'-র প্রেসিডেন্ট বানিয়ে দিল। চাঁদা ধার্য হল : পাঁচ হাজার এক। কিন্তু পেছনের এক-টাকে ঠিক রেখে কাঞ্চন সেটা ডাবল করে দিল। ক্লাবের ছেলেরা আপ্লুত। একজোট হয়ে একদা ওদের কৃতকর্মের জন্য কাঞ্চনের কাছে গিয়ে দুঃখপ্রকাশ করে এল একদিন। কাঞ্চন হেসে ওদের পিঠ চাপড়ে দিল হালকা হাতে। এবং এরপরেই পাড়ার ফুটবল টুর্নামেন্ট থেকে রক্তদান শিবির ও বিজয়া সম্মেলন পর্যন্ত শুধু কাঞ্চন আর কাঞ্চন। ভূমি, চন্দ্রবিন্দু ও বাইচুং ভুটিয়াকে নিয়ে আসা থেকে রক্তদান শিবির ও বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষার আয়োজনেও কাঞ্চন।

একদিন সন্ধের পর অটো থেকে নেমে মৃন্ময় স্তম্ভিত। ঠিক রাস্তার পাশেই একটা ঝলমলে অফিস। ক-দিন ধরেই দেখছিল চটে ঘেরা জায়গাটা। বুঝতে পারছিল ভেতরে কোনো কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে। কিন্তু আজ ঘেরাটা তুলে নেওয়ায় বিস্মিত। ভেতরে মনোরম পেস্তা কালারের দেওয়ালে অসাধারণ এক বনভূমি। ফুল ফুটে আছে। ফুলের ওপরে মৌমাছি আর প্রজাপতি। এবং তারই ওপরে ভাসমান, সুপার-ইমপোজ করা একটি বহুতল বাড়ির নকশা। ভেতরে ওভাল শেপের একটা গ্লাসটপ। একটা শ্বেতপাথরের পরী ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে টপটা ধরে আছে। টপের ওপরে একটা পেনস্ট্যান্ড। পেনস্ট্যান্ডের মাথায় একটা স্ফটিকের পৃথিবী। তাকে ঘিরে গ্লাসটপের চারপাশে ভেলভেটে মোড়া চারটে সুদৃশ্য বসার জায়গা। বাইরে পলি ভিনাইলের আলোকরশ্মিতে ফুটে উঠেছে 'অ্যা ক্রিয়েশান'।

দেখছিল মৃন্ময়। হঠাৎই কাঁধে মৃদু চাপ : — কেমন লাগছে। ঘাড় না ঘুরিয়েও মৃন্ময় টের পেয়েছিল কাঞ্চন। — অফিস একটা করে ফেললাম। যা কাজের চাপ। একসঙ্গে তিন-চারটে সাইট চলছে। একা আর পারছি না। ভালো কথা, তোর কোনো ছাত্রী-টাত্রী আছে, কাজ চায়। থাকলে এ-অফিসে বসতে পারে। মাইনে ভালোই দেবো। তবে সুন্দরী হওয়া চাই —

— সুন্দরী কেন?

— বাহ্, এ-অফিসের সঙ্গে মানানসই হতে হবে না —

কাঞ্চন পকেট হাতড়ায়। চওড়া ও পাতলা সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে মৃন্ময়ের দিকে এগিয়ে ধরে। মৃন্ময় মাথা নাড়ে। — না, খাচ্ছি না। ক-দিন হল গলায় একটা প্রবলেম হচ্ছে।

— হবে না। কাঞ্চন কাঁধ ঝাঁকায়। খাবি সব বাজারের ঝড়তি-পড়তি মাল। নে চল্ তো?

— কোথায়?

— আহা চল্ না। এখন আর আমার সঙ্গে গেলে কেউ তোকে অচ্ছুত বলবে না —

স্কুটারের পেছনে বসিয়ে দু-একবার এপাশে-ওপাশে ঘুরেই সোজা 'আগামী'-র সামনে।

— আয়, ভেতরে আয়। বউ আবার কাল কবিতা পড়তে গেছে শান্তিনিকেতনে। গাড়ি নিয়েই গেছে। এখুনি এসে পড়বে। ফোন করেছিল।

বলতে না বলতেই গাড়ির আওয়াজ। একটু পরে মার্বেলের সিঁড়িতে মৃদু পায়ের শব্দ। আর তারপরেই মৃন্ময়কে আবিষ্কার করে যেন উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে বর্ষা — একী আপনি? ভাবতেই পারিনি আজই দেখা হবে। জানেন, কাল শান্তিনিকেতনে আপনার একটা কবিতার খুব প্রশংসা হচ্ছিল। আচ্ছা, আপনি এত কম লেখেন কেন?

চুপ করেই থাকে মৃন্ময়। বলে না কিছুই। ওই তখনই আবার উচ্ছ্বাস বর্ষার মুখে : — দাঁড়ান, আমার একটা কবিতার বই বেরিয়েছে নালন্দা থেকে। আপনাকে দেবো —

— এবং তারপরেই ঘুরে দাঁড়িয়ে : — কী খাবেন! হুইস্কি না বিয়ার। ও হো, আপনি তো আবার...

শাড়ির আঁচলে বাতাস উড়িয়ে, উত্তুঙ্গ দুই স্তনে যেন আগুনের ঢেউ তুলে হালকা পায়ে যেন মেঘের ভেতরে উড়ে গেল বর্ষা।

বর্ষা যেতেই শীত এল। হাওয়া ছুটল হু হু করে। আর সে-হাওয়ার ভেতরে এক সকালে হঠাৎ এসে হাজির কাঞ্চন। পরনে সরু পাজামা ও গায়ে কাজ করা পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির ওপর আড়াআড়ি ভাঁজ করা শাল একটা জড়ানো। সঙ্গে দশ-বারোজন। বাইরের রোদে, কাগজ হাতে টুলের ওপরে বসে তখন প্রকৃতি থেকে উত্তাপ নিচ্ছিল মৃন্ময়ের বাবা। কাঞ্চন এসে তার শরীরে ছায়া ফেলল।

— মেসোমশাই।

ঘুরে তাকিয়ে চোখ তুলতেই কাঞ্চন নিচু হল : — আশীর্বাদ করবেন। ভোটে দাঁড়িয়েছি।

মৃন্ময়ের বাবা ব্যাপারটা বোঝার আগেই আশেপাশের মুখগুলি ঘিরে ধরল ওঁকে।

— হ্যাঁ মেসোমশাই। কাঞ্চনদাই দাঁড়িয়েছে। না দাঁড়িয়ে আর উপায় কী বলুন? পরিষেবার হাল দেখেছেন। রাস্তা ভাঙা। ড্রেনে মশা ভনভন করছে। জলের লাইনে প্রেশার নেই। কুড়ি বছরে করলটা কী বলুন তো? এবার তাই ঘরের ছেলেকেই আমরা সুযোগ দিচ্ছি। আপনার আমার কাউন্সিলার। দেখবেন, ভোটটা যেন ওর বাক্সেই পড়ে। —

পড়বে কিনা জানে না, তবে জানলার পরদার ফাঁক দিয়ে মৃন্ময় দেখছিল তখনও কাঞ্চনকে। সেই ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে, একই স্কুলে। মাঝে সেকশন বদলেছে। তবু যোগাযোগ বন্ধ হয়নি। এ-পাড়া থেকে ও-পাড়ায়, দুই বাড়ির মধ্যে বেশ খানিকটা দূরত্ব থাকলেও মৃন্ময় খুবই জনপ্রিয় ছিল ওদের বাড়িতে। বিশেষ করে প্রত্যাশী ছিল মানালি। কখন মৃন্ময় আসে। এক সন্ধের মুখে, মাঠ ফেরত,, ঘাম চকচকে শরীরটা নিয়ে কাঞ্চনদের সিঁড়ির নীচে বল রাখতে গিয়েই ফ্রক পরা মানালি হঠাৎই মৃন্ময়কে জড়িয়ে ধরেছিল গভীর আবেগে। ভালো-লাগা শুরু হয়েছিল তখনই। এরপর প্রেম। কিন্তু টিকল না। শেষপর্যন্ত মৃন্ময়ের কিছু না হওয়ায় পিছু হটল মানালি। কাঞ্চন ততদিনে ফেল মারতে মারতে একদম তলানিতে। পড়াশোনা ছেড়ে দিল একদিন। মৃন্ময় তখন কলেজে। কলেজ থেকে এরপর বিশ্ববিদ্যালয়। পড়ছে ও নিজে পড়াচ্ছে। কাঞ্চনের সঙ্গে দেখা হয়, কিন্তু কথা-টথা হয় না বিশেষ। হঠাৎই এরপর আচমকা যাতায়াত। কাঞ্চনের হাতে তখন মোবাইল ও সঙ্গী বলতে সেকেন্ড-হ্যান্ড একটা স্কুটার। মন ও মানসিকতায় অনেক দূরের হলেও কী জানি কেন অ্যাভয়েড করতে পারত না মৃন্ময়। ছোটোখাটো চিঠি

লেখা থেকে টেন্ডার ফরম ভর্তি করা ও বিজ্ঞাপন লেখা সব ব্যাপারেই বিনা বাক্যব্যয়ে সে। একদিন কী একটা ব্যাপারে বাইরে থেকে ডাকাডাকি করায় সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই টের পেয়েছিল মদের গন্ধ। ওই সে-বছরই বোধহয় কাঞ্চনের বাবা জাতীয় শিক্ষক। সম্মাননা দেওয়া হয়েছিল দিল্লিতে নিয়ে গিয়ে।

মনে আছে মৃন্ময়ের। দেখা করতে গিয়ে নিচু হয়ে পায়ে হাত ছোঁয়াতেই বুকে টেনে নিয়েছিলেন সূর্যাংশুবিকাশ।

— তোমার জন্য সত্যিই খুব কষ্ট হয়। এলেবেলে কত ছেলেমেয়েই তো কত কিছু করে বেড়াচ্ছে।

হাসি এসে গিয়েছিল মৃন্ময়ের। কী একটা বলতে যাচ্ছিল মৃন্ময়, ওই তখনই আবার সূর্যাংশুবিকাশ।

— দুনিয়াটা এখন কাদের জানো তো?

মৃন্ময় তাকাতেই দেখেছিল মাথা নাড়ছেন সূর্যাংশুবিকাশ, — দুনিয়া এখন যত ছলচাতুরে আর ধড়িবাজদের। দু-নম্বরে দু-নম্বরে ভরে গেছে দেশটা —

দুপুরে সেদিন বেরিয়েছে, চোখে পড়ল দুটি ছেলে। রং-তুলি নিয়ে দেওয়ালে বড়ো বড়ো করে কাঞ্চনের নাম লিখছে। সন্ধেয় আবার একদিন মোড়ের মাথায় যেতে গিয়েই থমকে দাঁড়াল। একটা মঞ্চ করা হয়েছে। মঞ্চের পেছনে ফেস্টুন। ফেস্টুনে কাঞ্চনের নামের ফ্লুরোসেন্ট কালারটা আলো পেয়ে যেন এই মুহূর্তে গিনি সোনা। ফিরে আসছিল, আচমকা রাস্তার একপাশে সূর্যাংশুবিকাশ। ছোটো ছেলে টুটুন তাকে ধরে সাবধানে রিকশায় তুলছে।

— কী হয়েছে মাস্টামশাই —

কাঞ্চনের বাড়িতে এত ঘন ঘন যাতায়াতেও মৃন্ময় তাকে কখনো মেসোমশাই বলে ডাকতে পারেনি। ফলে ওই মাস্টামশাই।

মৃন্ময় রিকশার গা ঘেঁষে দাঁড়ায়।

— কে, মৃন্ময়!

সীটে বসতে বসতেই সূর্যাংশুবিকাশ মুখ ফেরান, — এই যাচ্ছি একবার ডাক্তারের কাছে। চোখটা ক-দিন বড়ো গোলমাল করছে। মাঝে মাঝে যেন অন্ধকার দেখছি। হঠাৎ হঠাৎই ভিশন হারিয়ে যাচ্ছে —

— সে কী! মৃন্ময় চমকে ওঠে। আজই প্রথম দেখাচ্ছেন নাকি?

মাথা নাড়ে টুটুন, — নাহ্, দু-জনকে দেখানো হয়ে গেছে। দু-জনেরই বক্তব্য, ভালো কোথাও অপারেশনটা হওয়া দরকার। প্রয়োজনে সাউথ। দেখি এখন ইনি কী বলেন —

— তা হলে! মৃন্ময়ের দুই ভুরুর মাঝে পরপর কতগুলো ভাঁজ। টুটুন চুপ। বুক থেকে বুঝি একটা দীর্ঘশ্বাসও বেরিয়ে আসে।

সূর্যাংশুর মুখে মলিন হাসি — আর কী, দেখা তো হল অনেক। এবার কিছুদিন না হয় না-দেখেই থাকি। ওর প্রাইভেট ফার্মের চাকরি। মাইনে সামান্যই। আর আমার পেনশনের প্রায় সবটাই তো ওর মায়ের ওষুধের পেছনে।

মৃন্ময় ঠোঁট কামড়ায়, বলে, — আচ্ছা কাঞ্চনকে জানিয়েছ? মৃন্ময় তাকায় টুটুনের দিকে।

কিন্তু টুটুন কিছু বলার আগেই সূর্যাংশুবিকাশ, — না না না, একদম নয় —

বলতে বলতেই রিকশাঅলার দিকে মুখ ঘোরায় সূর্যাংশু, কই হে চলো।

রিকশা এগিয়ে চলে এবং ওই তখনই ঝপ করে অন্ধকার। আলো যখন এল আবার, চিৎকার শুরু হয়েছে মাইকে : বন্ধুগণ, ৯২ নং ওয়ার্ডের প্রার্থীর সমর্থনে আমাদের নির্বাচনী সভার কাজ এখনই শুরু হচ্ছে। আপনারা আসুন। এসে আমাদের এই সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলুন। বন্ধুগণ...

শুনতে শুনতে মৃন্ময় একটা বই টেনে নেয়। বাড়ি ফিরে, সপ্তাহের এই একটা দিনই, সন্ধের পরের সময়টা তার একান্ত নিজের। কোনো পড়ানো নেই, শুধু আছে পড়া। পড়তে পড়তে লেখা। লিখতে লিখতে কবিতায় যাওয়া। কবিতা থেকে একসময় আবার গান। কিন্তু আজ বুঝি সেসবও গেল। যেভাবে মাইকে গলা চড়ছে : বন্ধুগণ, এবার আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন, এ-অঞ্চলের জনপ্রিয় তরুণ তুর্কি, সৎ ও নির্ভীক, আপনাদেরই স্নেহধন্য, আপনার-আমার ঘরের ছেলে কাঞ্চন মিত্র।

মৃন্ময় উঠল। কবিতার একটা লাইন যেন মাথার ভেতর এসেও হারিয়ে যাচ্ছে। মৃন্ময় বেরোল। বন্ধুগণ... মৃন্ময় হাঁটতে থাকল। হেঁটে চলল যেন অনন্ত নক্ষত্রের নীচে। মৃন্ময়ের মাথার কোথাও যেন একটা কবিতার লাইন। লাইনটা কি এসেও আবার হারিয়ে যাবে? মৃন্ময় বিড়বিড় করতে থাকে : মানুষের পাশে আজ মানুষ দাঁড়িয়ে নেই, /যে আছে সে ঘাতক নিশ্চয়ই ...। নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে অন্ধকারের ভেতরেই মাঠ ভাঙতে থাকে মৃন্ময়। যেন নিজের অজান্তেই ওর কবিতার জন্ম হয় : এ পাপ তোমার শুধু নয়, আমারও /আমাদের এক অন্তর্গত বিষাদ অশ্রু। মৃন্ময় হাঁটতে থাকে। হাঁটতে হাঁটতেই এরপর একসময় ফেরা।

একদিন ফিরছে এভাবেই, একসময় হঠাৎই দেখা বর্ষার সঙ্গে এবং মুখোমুখি হতেই বর্ষা, — উপ্‌স, কী লিখেছেন ভাবা যায়! বর্ষা আপ্লুত, — কী করে অমন কবিতা আসে বলুন তো? আচ্ছা, আমার বইটা উলটেছেন?

কী বলতে যাচ্ছিল। ঝিনচাক শব্দে সেই বলতে-চাওয়া কথাটা যেন হঠাৎই ডুবে গেল। মিছিল আসছে একটা। বিজয়মিছিল। সে-মিছিলে সবুজ রঙের আবির। উড়ছে সবুজ ঘাসের মতো। সেই সঙ্গে চিৎকার। জনতার কাঁধে চড়ে কাঞ্চন সে-চিৎকারে বেসামাল।

চিৎকার উঠল। পেটো ফাটল। পাইপগানও বেরোল। এবং এভাবেই দু-দুটো বছর। বছর দুই বাদে দেখতে দেখতে কাঞ্চন এবারে এম.এল.এ.। এম্লে সাহেব। অঞ্চলের বিধায়ক। তখন তার বাড়ির সামনে গরিব-গুর্বোর লাইন। ঠিকাদারদের আনাগোনা। এবং বলাই বাহুল্য, হাতা-গোটানো কিছু টেটিয়া যুবক। এর ওপর আবার চাকরির লোভ দেখিয়ে এক অষ্টাদশীর পেট বানানো। ব্যাপারটা অবশ্য সামাল দিল কাঞ্চন নিজেই। নার্সিংহোম থেকে খালাস করিয়ে এনে মেয়েটির হাতে প্রচুর টাকা গুঁজে দিল। কিন্তু দিলেও চাপা রইল না। ফাঁক-ফোকর পেয়ে কী করে তা ছড়িয়ে পড়ল। ছড়াতেই কাঞ্চনের হুঁশিয়ারি : ষড়যন্ত্র। এসব ষড়যন্ত্র। তা ষড়যন্ত্রকারীদের দেখে নেবে সে। অমন পার্টির মুখে...

কিন্তু বাইরে বললেও ঘরে সে রেহাই পেল না বর্ষার হাত থেকে। অবশ্য বর্ষাকেও ছাড়ল না কাঞ্চন। আর দু-জনে দু-জনের দূষিত ক্ষতগুলো আঙুল দিয়ে দেখাতে দেখাতে একসময় ক্লান্ত হয়ে ভদকা ও হুইস্কির ভেতরেই অবসন্ন হয়ে পড়ল তারা। এবং তারপরেই আবার পরস্পর পরস্পরকে সন্দেহ। কাঞ্চন তবুও হারতে রাজি নয়।

এক বিকেলে কী ভাবতে ভাবতেই আসছিল, আচমকা রাস্তার ওপার থেকে একটা ছেলে দৌড়ে এল : — মৃন্ময়দা।

— কে! মৃন্ময় দাঁড়াতেই ছেলেটি রাস্তার ওপারে ইশারা করে, আপনাকে ডাকছে।

থমকে তাকিয়ে, ছেলেটার দৃষ্টি অনুসরণ করতেই টের পায় কাঞ্চন। পার্টি ভবনে বসে রাস্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে ওরই দিকে তাকিয়ে।

মৃন্ময় পা বাড়ায়। — কী রে?

— বোস।

— বসলে হবে না। টিউশানি আছে।

— তা কী টিউশানি করছিস বল্ তো। কী পড়াচ্ছিস ছাত্রদের?

— মানে? মৃন্ময় অবাক। কী খোঁজে সে কাঞ্চনের চোখের চারপাশে।

কাঞ্চনের মুখ থমথমে, — তুই নাকি কী কবিতা লিখেছিস! আমি অবশ্য পড়িনি —

— তবে?

— একজন বলছিল —

— কে!

— বর্ষা নয় অবশ্যই।

মৃন্ময় চুপ। কাঞ্চনের গলায় যেন ক্ষোভ ঝরে পড়ছে : — ব্যাপারটা তো ওরাই প্রথমে শুরু করল। ট্রেনের কামরায় আগুন ধরাল। বেছে বেছে মানুষ মারল। তা ওরা করলে কি এরা চুপ করে থাকবে?

— তোর কথা শেষ!

— না হয়নি এখনো। যদিও অন্য কেউ হলে অ্যাকশান নিতাম। কিন্তু... ছি ছি ছি, এটা কি কবির কাজ?

মৃন্ময় অবাক কাঞ্চনের দিকে তাকিয়ে, — কবিদের কী কাজ — তোর জানা আছে?

— সেটা আমি বলার থেকে বর্ষাই না হয় ভালো বলবে —

মৃন্ময় ঘুরে দাঁড়ায়। প্রায় সন্ধে হয়ে আসছে। বাবাকে ওষুধ দিয়ে আবার ছাত্র ঠেঙাতে যেতে হবে। ফেরার সময় তারক চক্রবর্তীর সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার। ছোটো বোন মালবিকার জন্য সম্বন্ধ দেখে রেখেছে। ছেলেটা ভালো। চাহিদাও কিছু নেই তেমন।

মৃন্ময় বেরিয়ে পড়ে। একটু জোরেই এবার পা চালায়।

রাতের দিকে ফিরছিল, হঠাৎই এক সময় কী মনে পড়ে যায় মৃন্ময়ের। কাল সূর্যাংশুবিকাশ ফিরে এসেছেন দক্ষিণভারত থেকে। অনেক কষ্টে, প্রায় চাঁদা তুলেই মৃন্ময়রা তাঁকে পাঠিয়েছিল দক্ষিণ ভারতে। কিন্তু ফেরার পর, এই চব্বিশ ঘণ্টায় এখনো একবার দেখা হয়নি তাঁর সঙ্গে।

মৃন্ময় দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর বেলে হাত রাখে।

— কে!

দরজা খুলতেই টুটুন। হাসে, — এসো, এসো মৃন্ময়দা। বাবা তোমার কথাই বলছিল —

সিঁড়ি ধরে উঠে দোতলায় সূর্যাংশুবিকাশ। মৃন্ময়কে দেখেই আপ্লুত তিনি, — এসো, এসো মৃন্ময়। বাবা কেমন আছে?

— আছে। শরীরটাই আছে আর কী। কিন্তু মন তার...

— তা তো হবেই। মনের আর দোষ কী বলো। একে একে এত শোক। তোমার মা গেলেন। বড়ো ছেলেটা আলাদা হল। তোমারও কিছু...

— আমার কথা থাক। আপনি কেমন আছেন মাস্টামশাই?

— ভালো। বেশ ভালো মৃন্ময়। সূর্যাংশুবিকাশের চোখেমুখে যেন শিশুর মতোই উচ্ছ্বাস, তোমাদের কল্যাণে দৃষ্টিটা বোধহয় আবার ফিরেই পেলাম মৃন্ময় —

মৃন্ময় দাঁড়িয়েই ছিল। টুটুন বলল, — বোসো না মৃন্ময়দা। আমি মাকে ডাকি —

মৃন্ময় বসতে যাচ্ছিল, এই সময়েই ঘরে ঢুকলেন সাধনা।

— বোসো, বোসো মৃন্ময়। বাড়ির সব ভালো তো? মৃন্ময় মাথা নাড়তেই সাধনার গলায় অনুযোগ : — দ্যাখো না, কাল এসে থেকেই শুধু ছাদে যাবার বায়না ধরেছে। কিন্তু যা গরম। এই গরমে গেলে চোখের ক্ষতি হবে না, বলো?

মৃন্ময় তাকায়।

— আসলে খোলা আকাশ তো অনেকদিন দেখেননি, তাই...

— ঠিক। ঠিকই ধরেছ মৃন্ময়। সূর্যাংশুবিকাশের গলায় আক্ষেপ, — কতদিন খোলা আকাশটা দেখিনি স্পষ্ট চোখে। কতদিন দেখিনি আকাশে পাখিদের ওড়াউড়ি। কতদিন দেখিনি অনন্ত নক্ষত্রমালা। কতদিন দেখিনি কালপুরুষ আর সপ্তর্ষিমণ্ডল...

— এখন যাবেন?

— এখন!

মৃন্ময় উঠে দাঁড়ায়, — হ্যাঁ চলুন না... আমি নিয়ে যাচ্ছি —

অতঃপর দাঁড়িয়ে ছাদের মাঝখানে। সূর্যাংশু চোখ রাখেন আকাশের দিকে, — মনে আছে মৃন্ময় কতদিন এই ছাদে দাঁড়িয়ে আমি তোমাদের নক্ষত্রমালা চিনিয়েছিলাম। কিন্তু —

সূর্যাংশুবিকাশ চুপ করে গেলেন।

— কী হল মাস্টামশাই?

সূর্যাংশুবিকাশ মুখ নামিয়ে নিলেন, — সে আকাশ কোথায় মৃন্ময়! চারদিকে এত বাড়ি, এত ইট-কাঠ আর পাথর! আকাশ কি তবে দখল হয়ে যাচ্ছে?

মৃন্ময় নিরুত্তর।

সূর্যাংশু আস্তে আস্তে আবার চোখ ফেরালেন। কিন্তু চোখ তার বাধা পেল বড়ো বড়ো বাড়িতেই, যেখানে এখন কাঞ্চনরা দখল করে নিচ্ছে আকাশ। আকাশ থেকে ভূমি। এই পৃথিবীর জল, বায়ু ও পরিবেশ।

তাকিয়েই ছিলেন। একটু পরেই আবার বললেন সূর্যাংশুবিকাশ, — নাহ্ চলো, নীচেই নেমে যাই মৃন্ময়।

— আর একটু থাকবেন না?

— নাহ্। সূর্যাংশুবিকাশ এগিয়ে যান। অতঃপর মৃন্ময়ও নীচে। সূর্যাংশুবিকাশকে দোতলায় পৌঁছেই নেমে আসে।

রাত হয়েছে অনেক। হলেও তেমন একটা নয়। কিন্তু ইদানীং এমন রাতেই বড়ো ভয়। মানুষের অধিকার বড়ো তাড়াতাড়ি দখল হচ্ছে এ-সময়েই, কাঞ্চনদের হাতে।

মৃন্ময় পা ফেলে আস্তে আস্তে। তার হারাবার কিছু নেই। কিন্তু পাওয়ার আছে অনেক কিছু এবং তা কবিতার কাছেই।

অনন্ত নক্ষত্রের নীচে, একটি কবিতার জন্যই মৃন্ময় আবার হাঁটতে শুরু করে।

নির্বাসিত

রবিশংকর বল

বাণীবাবু বলেছিলেন, স্টেশনে মাত্র দু-তিনজন লোক নামে। সজলকে খুঁজতে হবে না। স্টেশনে নেমেই ওকে দেখতে পাবেন।

সত্যিই তাই। ট্রেনটা যেন জঙ্গলের মাঝে কোথাও এসে দাঁড়াল। এক ফালি স্টেশন। নামলও আক্ষরিক অর্থেই দু-তিনজন। অতীন দেখল, কিছু দূরেই সজল তার দিকে হাত নাড়তে নাড়তে এগিয়ে আসছে।

এক স্টেশন আগেই বারুইপুর। জমজমাট মফস্বল শহর। তার হাতার মধ্যেই তো এই কৃষ্ণমোহন — স্টেশন নয়, আসলে হল্ট। সিঙ্গল লাইন, এক ফালি স্টেশন, মাথায় শেড নেই, দু-পাশের বনজঙ্গল, সকালে হয়ে যাওয়া বৃষ্টির পর এখন অনেক বেশি সতেজ স্বাস্থ্যে ভরা, তবু কেমন অন্ধকার-অন্ধকার একটা ভাব আছে, হয়তো এত গাছপালার জন্যই।

ছোট্ট একটা ঘর দেখিয়ে সজল বলল, 'এই হচ্ছে টিকিটঘর, মাস্টারবাবুও এখানেই বসেন। রাতে কিন্তু হ্যারিকেন জ্বলে।'

'বিদ্যুৎ নেই?'

'না। সন্ধে নামলে সব অন্ধকারে ডুবে যায়।'

'তেলেনাপোতা নাকি?' নিজেকে অস্ফুটে প্রশ্ন করে অতীন।

'তেলেনাপোতাই বটে।'

'তুমি জানো তেলেনাপোতার কথা?'

' প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প। কাকাবাবু পড়িয়েছিলেন।'

বাণীবাবুকে সজল কাকাবাবু বলেই ডাকে।

অতীনের চোখের সামনে দিয়ে হঠাৎ একে একে সেই দৃশ্যগুলো সরে গেল : 'আকাশে তখন কৃষ্ণপক্ষের বিলম্বিত ক্ষয়িত চাঁদ বোধহয় উঠে এসেছে। তারই স্তিমিত আলোয় আবছা বিশাল মৌন প্রহরী যেন গাড়ির দু-পাশ দিয়ে ধীরে-ধীরে সরে যাবে। প্রাচীন অট্টালিকার যেসব ধ্বংসাবশেষ — কোথাও একটা থাম, কোথাও একটা দেউড়ির খিলান, কোথাও কোনো মন্দিরের ভগ্নাংশ, মহাকালের কাছে সাক্ষ্য দেবার ব্যর্থ আশায় দাঁড়িয়ে আছে।'

সজল অনেক কথা বলে যাচ্ছিল, 'পনেরো বছর আগে আমাদের কৃষ্ণমোহন তৈরি হয়েছিল। তখন তো যাত্রী ছিলই না বলতে গেলে। সকালে-বিকেলে মাত্র দু-জোড়া ট্রেন থামত। এখন এখানে হাজার দুয়েক নিত্যযাত্রী। এই লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনে রোজ তেইশ জোড়া ট্রেন চলে, কৃষ্ণমোহনে থামে মাত্র একুশটা। রেলের বড়ো বড়ো বাবুদের জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। অনেক সময়ই ট্রেন ধরতে আমাদের যেতে হয় বারুইপুর। শিয়ালদা থেকে ফেরার সময়েও বারুইপুরে নামতে হয়। কৃষ্ণমোহন থেকে বারুইপুরের অটো ভাড়া সাড়ে চার টাকা। ক-জনের ট্যাকের এত জোর আছে বলুন?'

'তোমাদের ট্যাক নিয়ে কার ভাবার সময় আছে, বলো?'

' তা তো ঠিকই।'

রেল লাইন পেরিয়ে তারা রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। কয়েকটা অটো দাঁড়িয়ে আছে। একটু দূরেই, অনেকটা জায়গা জুড়ে পাঁচিল-ঘেরা ঝাঁ-চকচকে একটা বাড়ি।

'ওটা কী সজল?'

'জলকে আর্সেনিক-মুক্ত করার প্ল্যান্ট।'

'তোমরা তা হলে আর্সেনিক-মুক্ত জল পাও?'

'না।'

'কেন?'

'ডিপোজিট রাখতে হয় পাঁচশো টাকা। মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা। কৃষ্ণমোহনে ক-জনের এই ক্ষমতা আছে?'

'একটু চা খেয়ে অটোতে উঠি, কী বলো?' অতীন বলে।

'চলুন।'

চা খেতে খেতে সজল এবার অন্য কথা পাড়ে, 'আমরা এবার *বেকার* করছি অতীনদা।'

'*বেকার* ?'

'আমাদের নাটকের দলটা আছে না — এবারের প্রোডাকশন *বেকার*।'

'কার লেখা? অরুণ দে না?'

সজল একটু ভাবে, তারপর বলে, 'না-না, অগ্রদূত। আপনাকে কতবার বললাম, আমরা নতুন কিছু করতে চাই। আপনি আমাদের একটা নতুন আইডিয়া দিন।'

পার্ক সার্কাসে বাণীবাবুর বাড়িতে বেশ কয়েকবার সকলের সঙ্গে দেখা হয়েছে তার। প্রতিবারই সজল বলেছে, আমরা নতুন কিছু করতে চাই, আপনি বলুন না, কী নাটক করা যায়?

'দেখি, আমি একটু ভাবি।' অতীন বলে।

'দিবাকর মিত্র — আপনি নিশ্চয়ই চেনেন —'

'দিবাকরদাকে চেনো তুমি?'

'সূর্যপুরে একটা কম্পিটিশানে জাজ হয়ে এসেছিলেন। তখন আলাপ হয়েছিল। ফোন নাম্বার দিয়েছিলেন। ফোন করেছিলাম জানেন। একবার ফোন ধরেছিলেন, তারপর আর ধরেন না। অতীনদা, একটা সত্যি কথা বলি? আমরা, গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা, আপনাদের চোখে বড়ো ফালতু।'

'সেন্টিমেন্টাল হোয়ো না সজল।' অতীন সজলের পিঠে হাত রাখে।

'সেন্টিমেন্টালিটির কথা নয় দাদা। আমাদের এই জায়গাটা আপনারা বুঝবেন না।

'কেন?'

'সন্ধের পর শুধু অন্ধকারের জন্য আমাদের ঘুমিয়ে পড়তে হয় অতীনদা। বিছানায় শুয়ে ছটফট করি, কত কিছু করতে ইচ্ছে করে। বই পড়তে ইচ্ছে করে। পারি না। তখন আপনারা

যদি একটু সাড়া না দেন — ফোন না ধরেন — বিশ্বাস করুন, খুব কষ্ট হয়।'

'তোমাদের পরের নাটকটা আমি ঠিক করে দেবো সজল।'

'আপনারা একটু সাহায্য করলে —'

'কিচ্ছু হবে না সজল। আমি গ্রাম, মফস্বলের অনেক নাটকের দল দেখেছি। শহরের মানুষদের সাহায্য নিয়ে তারা তারপর শহরেই গেঁড়ে বসতে চায়। অ্যাকাডেমি-রবীন্দ্রসদন-মধুসূদন-শিশিরেই তাদের মোক্ষ। গ্রামের মানুষদের কাছে তারা আর নাটক করতে যায় না। সজল, তোমাকে একটা সত্যি কথা বলি। আজ আর আমরা তোমাদের কিছু দিতে পারব না, তোমরাও আমাদের কিছু দিতে পারবে না, এতটাই দূরত্ব আমাদের। কয়েকটা বিজনেস ডিল হতে পারে শুধু। তোমাদের দলকে আমরা শহরের নাট্যোৎসবে পুরস্কার দেবো, তার বদলে তোমরা আমাদের জন্য গ্রামে কল শো-এর ব্যবস্থা করে দেবে।'

'আপনি ভুল বলেননি অতীনদা — আমিও তো অনেককে দেখলাম —'

'কিচ্ছু করার নেই সজল।' অতীন একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে, 'কালচার একটা ইন্ডাস্ট্রি। সেখানে লেনদেনের অন্য হিসেব আছে। আমি কি মনে করি জানো, সজল? সত্যিকারের সৎ মানুষ আর কালচার করবে না — কবিতা, গল্প-উপন্যাস লিখবে না, নাটক করবে না, ছবি আঁকবে না — তার চেয়ে তোমাদের এই অন্ধকারে শুয়ে থাকা — বিছানায় ছটফট করে শেষ হয়ে যাওয়া ভালো।'

'আপনি আমার ওপর রেগে গেছেন অতীনদা?'

'না। কালচারের এই জগৎটাকে এত অ্যাবসার্ড লাগে — এত ক্লান্তিকর লাগে — কিন্তু আমি যে কোথায় শান্তি পাব, তাও জানি না সজল। চলো ওঠা যাক। বাণীবাবু কোথায় থাকবেন?'

'মন্দিরে আছেন। কাকাবাবু তো কাল রাতেই এসেছেন। চলুন, আপনার জন্য হয়তো মেন রাস্তায় এসে ঘোরাঘুরি করছেন এতক্ষণে।'

সূর্যপুর হাট ছাড়িয়ে কিছুটা এগোলেই সেই বটগাছ। অটো থেকে ওরা সেখানেই নামল। এই জায়গার কথা উঠলে, বাণীবাবু একবার বটগাছটার কথা বলবেনই। একটা ডাল রাস্তার ওপর দিয়ে এমনভাবে ছড়িয়ে গেছে, দেখে মনে হবে বটগাছটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কত বয়স এই বটগাছের? কত শতাব্দী এখানে দাঁড়িয়ে আছে? কেউ কেউ বলেন, হুসেন শাহের শাসনকালে নীলাচল যাত্রার জন্য আদিগঙ্গার তীর বরাবর হাঁটাপথে ও নদীপথে যাত্রার সময় শ্রীচৈতন্যদেব বারুইপুরের আটিসারায় অনন্ত পণ্ডিতের আশ্রমে একরাত্রি নামগান করেন, তারপর ছত্রভোগ থেকে স্থানীয় প্রশাসক রামচন্দ্র খাঁর সাহায্যে নৌকাযোগে নীলাচলের দিকে যাত্রা করেন। শ্রীচৈতন্যদেব কি এই বটগাছটা দেখেছিলেন? হয়তো এই বটগাছের ছায়ায় এসে দাঁড়িয়েও ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। ভাবলেই মনে হয়, ২০০৫-এর চামড়া ফুঁড়ে ১৫১০ খ্রিস্টাব্দের হাওয়া এসে তোমাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। আশ্চর্য এই বটগাছ। অতীন সম্মোহিতের মতো দেখছিল। কত শিকড়, ডালপালা, ঝুরি নামিয়ে সময়কে ছুঁয়েও সময়াতীতের মতো দাঁড়িয়ে আছে । একটি গাছ কত ইতিহাসের সাক্ষী হয়। মানুষ ইতিহাসকে সামান্যই ছুঁতে পারে। তবু ইতিহাস নিয়ে

মানুষের কত বড়াই। একটা কুমড়োফুলও আলো-বাতাস-শিশিরের কথা যতটুকু জানতে পারে, মানুষ কি তা পারে?

'এই বটগাছকে দেখে শেষ করতে পারবেন না অতীনদা,' সজল বলে।

'এর বয়স কত তুমি জানো, সজল?'

'না।'

'বটগাছটার কোনো নাম নেই?'

'নাম? গাছের? কে দেবে বলুন?'

'তোমরা দিতে পারতে।'

'অতীনদা —'

'বলো।'

'মাপ করবেন, ছোটো মুখে বড়ো কথা। একটা কথা বলব?'

'বলো না —।'

'আপনারা — শহরের মানুষরা — গ্রামে এসে এত সেন্টিমেন্টাল হয়ে যান। আপনার বাড়ির সামনে কোনো গাছ আছে?'

'খুব পুরোনো একটা কদম গাছ।'

'তার কোনো নাম দেননি?'

অতীন হাসে। —'ঠিক বলেছ,সজল। আমরা বড়ো সেন্টিমেন্টাল হয়ে যাই। এর মধ্যে হয়তো এক ধরনের ভণ্ডামি আছে। তবে সবটাই ভণ্ডামি নয়, সজল। এইরকম এক-একটা জায়গায় এসে আমরা কিছুক্ষণের জন্য তো অনেক ধান্দাবাজি ভুলে যাই। এইসব মুহূর্ত আমাদের অন্তত কয়েকটা দিন অন্যরকম ভাবে বাঁচিয়ে রাখে।'

'আমি আপনাকে ব্যথা দিতে চাইনি, দাদা।'

'আমি ব্যথা পাইনি সজল। এই যে তুমি শব্দটা বললে — 'ব্যথা — কতদিন কারুর মুখে শুনিনি, কেউ বলে কষ্ট, কেউ বা বলে hurt, কিন্তু ব্যথা শব্দটা তো এখানে না এলে শুনতে পেতাম না — তুমি বললে — শুধু এই শব্দটাকে আমার ভালোবাসতে ইচ্ছে করবে না, বলো?'

'দাদা।' সজল তার দুই হাত চেপে ধরে।

'চলো একটু চা খাই।'

'বিভাস আপনার জন্য দাঁড়িয়ে আছে, দাদা।'

'কোথায়?'

'এই বিভাস —' সজল হাঁক পাড়ে।

কিছুদূর থেকে একটি তিরিশ-বত্রিশ বছরের ছেলে মোটরবাইক টানতে টানতে তাদের দিকে এগিয়ে আসে।

'বিভাসই আপনাকে বাইকে করে নিয়ে যাবে।' সজল বলে।

'নমস্কার দাদা।' বিভাস হাত জোর করে নমস্কার জানায়।

'একটু চা খেয়ে যাওয়া যাক।'

'চলুন।'

সজলের সঙ্গে এত কথা বলার পর এই কৃষ্ণমোহনে আসাটা নিজের কাছেই অ্যাবসার্ড লাগে অতীনের। বাণীদার সঙ্গে আলাপ আগেই ছিল, কিন্তু সম্পর্কটা জমেছে মাস কয়েক হল। কৃষ্ণমোহনকে ঘিরে — আসলে বাণীদার জন্মস্থান দুর্গাগ্রামকে ঘিরে ষাটোর্ধ্ব মানুষটির স্বপ্নের কথা শুনতে শুনতে অতীন তার নিজের জীবনের অনুর্বর হয়ে আসা ছবিটা দেখতে পাচ্ছিল। বছর তিনেক হয়ে গেল সে আর কোনো গল্প লেখে না। খবরের কাগজে চাকরির সুবাদে — অফিসের চাপে পুজোয় বছরে একটা উপন্যাস লিখতেই হয়। কিন্তু এই লেখার প্রতিও আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে অতীন। ঘুরে ঘুরে সেই একই কথা — প্রেম, অপ্রেম, দাম্পত্য, বিশ্বাস, বিশ্বাসঘাতকতা — মাংসের নানা ক্লান্তির কথা লিখে যাচ্ছে। সত্যি বলতে কি, নতুন এক কাহিনীর খোঁজেই সে কৃষ্ণমোহনে চলে এসেছে। কিন্তু অতীন, তুমি তো এভাবে কাহিনী খোঁজায় বিশ্বাস করতে না, অভিজ্ঞতাবাদী লেখকরা কখনো তোমাকে টানেনি।

এবার তাহলে সেই ফাঁদেই পা দিচ্ছ? যে-অ্যাবসার্ডিটিকে তুমি আমর্ম ঘৃণা করেছ, সেই অ্যাবসার্ডিটিরই শিকার হচ্ছ? আমি জানি না। তবে আমার জীবনের একটা নতুন গল্প তৈরি হোক সেটুকু আমি চাই, সে-গল্পটা কোথায়, কবে শুরু হবে আমি জানি না, তবে যে-গল্পের ভিতরে আমি এখন বেঁচে আছি, যেখানে প্রেম-অপ্রেম, এমনকী শারীরিক আকাঙ্ক্ষার রক্ত-মাংসময়তাও নেই, সেই গল্প থেকে আমি বেরিয়ে আসতে চাই। কৃষ্ণমোহনে আমার জীবনের অজানা গল্পটা অপেক্ষা করে আছে কিনা জানি না।

বাণীদা একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'পৃথিবী কখন ছোটো হয়ে আসে বলুন তো?'

কখন? বাণীদা হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'সবাইকে নিজের মতো করে উত্তরটা খুঁজে নিতে হয় স্যার।'

একবার ছোটো হয়ে গেলে পৃথিবী কি আবার বড়ো হতে পারে? এক্সপ্যান্ডিং ইউনিভার্সের তত্ত্ব কি মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে খাটবে?

'চা নিন অতীনদা।' সজল তার দিকে চায়ের ভাঁড় এগিয়ে দেয়।

'দাও।'

'কেমন লাগছে দাদা, আমাদের কৃষ্ণমোহন?'

'খুব ভালো বিভাসবাবু। অনেকদিন এমন জায়গায় যাইনি।'

'আমাকে বিভাস বলেই ডাকবেন, দাদা।'

'তুমি কী করো বিভাস?'

'ব্যবসা। বিল্ডার্সের ব্যবসা। ওই ইট-বালি-সিমেন্ট সাপ্লাই দেওয়া। তা বাদে কাকাবাবুর সঙ্গে আছি। মন্দিরটাকে ঘিরে কীভাবে দুর্গাগ্রামের উন্নতি করা যায়, তারই চেষ্টা করছি আমরা।'

'লোকজন আসে মন্দিরে?'

'খুবই কম। এখনো তো সেইভাবে প্রচার হয়নি। তার ওপর দুর্গাগ্রামে মুসলিমদের বাসই বেশি। মাত্র সতেরো ঘর হিন্দু। একটা চাপ তো আছেই দাদা। আগেকার মতো তো পরিস্থিতি

নেই — দু-পক্ষেই নানারকম উসকানি আছে — সারা পৃথিবীটাই ভাগ হয়ে গেছে, আপনি তো জানেনই দাদা।'

'চলো, যাওয়া যাক।' অতীন চায়ের দোকানের বাইরে পা বাড়ায়। এইসব ভাগাভাগির গল্প তার আর ভালো লাগে না। ভাগাভাগির একটাই পরিণাম। সারা পৃথিবী জুড়ে নির্বাসিত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। যেন এক ধূ ধূ হেমন্তের ভিতরে বেঁচে থাকা, যেখানে গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-শীত-বসন্তের খবর এসে পৌঁছয় না। নির্বাসিতের জীবনের ক্যালেন্ডার অন্যরকম। যাযাবর, কেন্দ্রচ্যুত, তার জীবনের সুর সম-এ এসে পৌঁছয় না। এই জীবনের গোপন ফিসফিস সে শুনেছিল প্যালেস্তাইনের নির্বাসিত কবি মাহমুদ দারুইশের কবিতায়। অতীন এখন সেই কবিতার গহীন চোরাস্রোতে ডুবে যাচ্ছিল :

আমি তো সেই নির্বাসিত।
আমাকে ঢেকে রাখো তোমার চোখের ভিতরে।
যেখানেই থাকো আমাকে গ্রহণ করো —
তুমি যেই হও আমাকে গ্রহণ করো।
মুখের রং আমাকে ফিরিয়ে দাও
ফিরিয়ে দাও শরীরের উত্তাপ
হৃদয় আর চোখের আলো,
রুটি আর ছন্দের লবণ,
পৃথিবীর সেই স্বাদ ... মাতৃভূমি।
তোমার চোখের ভিতরে আমাকে বাঁচিয়ে রাখো।
দুঃখের প্রাসাদ থেকে আমাকে স্মৃতিচিহ্নের মতো গ্রহণ করো।
আমার ট্র্যাজেডি থেকে কবিতার মতো গ্রহণ করো আমাকে।
আমাকে গ্রহণ করো খেলনার মতো, বাড়ির কোনো ইটের মতো
যাতে আমাদের ছেলেমেয়েরা ফিরে আমার কথা ভাবতে পারে।

এই কি তার জীবনের নতুন গল্প শুরু হওয়ার রাস্তা?

বিভাসের বাইকের পিছনে চেপে দুর্গাগ্রামের এবড়োখেবড়ো ইট ফেলা রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে অতীনের চোখ ঝাপসা হয়ে এল। কেননা এখন আবার ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বাঁশবাগান, পীরের থান, ঘন বনজঙ্গল, পুকুর, মজা ডোবা, চাষের জমি দু-পাশে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে ছায়াচ্ছন্ন পথ; আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বৃষ্টি পড়ছে, তবু এ-পথ সবসময় ছায়াচ্ছন্নই থাকে, সবুজের শামিয়ানা টাঙানো থাকে সারা বছরই। রাস্তার মধ্যিখানে একটি ছাগশিশু 'ম্যা-ম্যা' করে চিৎকার করে লাফাচ্ছে, বৃষ্টি পড়ছে, তবু তার খোঁটা খুলে কেউ বাড়ি নিয়ে যায়নি। একদল হাঁস পুকুর থেকে উঠে প্যাঁক প্যাঁক করতে করতে হেঁটে যাচ্ছে আশ্রয়ের দিকে। বাইক মোড় ঘোরার সময় অতীন দুটি কবর দেখতে পেল। কবরের গায়ে মৃতদের নাম লেখা

আছে: কচিমন বিবি আর হালিমা বিবি।

অতীনের মনে হল, সে যেন কোনো দ্বীপে এসে পৌঁছেছে। সন্ধেয় যখন অন্ধকার নামবে, চারপাশের জগতের সঙ্গে আর কোনো যোগ থাকবে না এই দ্বীপের। প্রায় দশ বছর আগে, নর্মদার বুকে পাড়ি দিয়ে পাহাড়ে ওপর মণিবেলি গ্রামে পৌঁছনোর কথা মনে পড়ল তার। সর্দার সরোবরের ছাড়া জলে ডুবে গিয়েছিল মণিবেলির একাংশ; নর্মদার জলস্রোত ফুঁড়ে জেগে আছে নিষ্পত্র, মৃত কত গাছ; মণিবেলির অবশিষ্ট মানুষ অপেক্ষা করছে, কবে তারাও একদিন ডুবে যাবে। সে-ও তো কিছু নির্বাসিতেরই জীবন। যেমন এখানে, এই দুর্গাগ্রামে যারা বেঁচে আছে, তাদেরও একই নির্বাসিতের জীবন; স্বদেশের বুকেই নির্বাসিত — সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলে যাদের আর কোনো দেশ থাকে না, শুধু ঘুম থেকে গভীর ঘুমের জগতে চলে যাওয়া। সে-ই ঘুমে কি কোনো স্বপ্ন থাকে? অতীন জানে না। জানার চেষ্টাও করবে না। সেইসব স্বপ্ন-দুঃস্বপ্নের কাছে সে কখনো পৌঁছতে পারবে না। দুর্গাগ্রামের এই পথে যদি তার জীবনের নতুন গল্পও শুরু হয়, তবুও পারবে না। সে, শহরের আটশো স্কোয়্যার ফুট ফ্ল্যাটের বাসিন্দা, নির্বাসিতের জীবন বোঝার স্পর্ধা সে কখনো দেখাতে যাবে না। সে তাই অভিজ্ঞতাবাদীদের বার বার বলেছে, অভিজ্ঞতা এক জিনিস, আর বেঁচে থাকা অন্য জিনিস; এই কৃষ্ণমোহনে এসে সে যদি সত্যিই কোনো গল্প পেয়ে যায়, তা অন্য কারুর গল্প নয়, তার অজানা জীবনেরই গল্প; অন্যের জীবনের গল্পকে লিখবে, এমন ক্ষমতা তার কোথায়; কারই বা আছে?

বছর দশেক আগে হলে, অতীন হয়তো মনে মনে ভাবত, এইরকম একটা গ্রামে যদি সারা জীবন বেঁচে থাকা যায়। এখন সে জানে, কৃষ্ণমোহনের মতো গ্রামে থাকার জন্য অনেক কিছু ছাড়তে হয় — বেঁচে থাকাটাকে খাওয়া-ঘুমোনো-কাজ করার চক্রের ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে হয়। এই চক্রের ভিতরে একজন মানুষ কি ভাবে? ভাবে তো বটেই। কিন্তু সেই মানুষের ভাবনা কীরকম? আমরা কোনোদিন জানতে পারব না। তাই অভিজ্ঞতাবাদী সাহিত্য উঁচু ধরনের রিপোর্টাজ ছাড়া আর কিছু নয়।

ভাঙা ভাঙা ইট ফেলা রাস্তাও শেষ হয়ে গেল। এবার মাটির কর্দমাক্ত পথে বিভাসের বাইক চলে।

'দুর্গাগ্রামের প্রতি বোধহয় কোনো দলেরই নজর নেই।'

বিভাস হাসে। — 'কেন থাকবে দাদা? এখানে বেশির ভাগ মুসলমান। মোল্লা-মৌলবিরা এদের অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখেছে। লেখাপড়া শিখলে তো মানুষ দাবি করতে শেখে। সব পার্টির দাদা-দিদিরা মোল্লা-মৌলবিদের তুষ্ট রাখে। ভোটব্যাঙ্ক নিয়েও চিন্তা নেই। দুর্গাগ্রামের কথা বাদ দিন। আপনি বারুইপুর হাসপাতালেই যান। চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থাই নেই। কলকাতায় যখন যাই — বিরাট বিরাট ওভারব্রিজ, নতুন নতুন পার্ক — বিশ্বাস করুন দাদা, ইচ্ছে করে বোমা মেরে উড়িয়ে দিই।'

'সন্ত্রাসবাদী হোয়ো না বিভাস।'

'সন্ত্রাসবাদী না হয়ে উপায় কী বলুন!' বিভাস বাইক থামিয়ে দেয়। অতীন দ্যাখে, তার

সামনেই সিমেন্টের একটি তোরণের ওপর লেখা 'দুর্গামন্দির'।

'আসুন, আসুন স্যার।' বাণীবাবু দু-হাত তুলে এগিয়ে আসছেন।

'এ তো একেবারে সাম্রাজ্য।' অতীন বলে।

'আসতে কোনো কষ্ট হয়নি তো?'

'আপনার এত বাহিনী। কষ্ট পাওয়ার সুযোগ কোথায়?

'আসুন, আগে হাত-মুখ একটু নাটমন্দিরে বসুন।'

টিউবয়েলের ঠান্ডা জলে অতীন অনেকক্ষণ ধরে মুখ-হাত ধুল, ঘাড়ে-গলায় জল দিল। কী ঠান্ডা জল। মাটির কত গভীর থেকে উঠে আসছে? কত গভীরে এত ঠান্ডা, এত শান্তির স্বাদ?

নাটমন্দিরের চাতালে বসে অতীন বলল, 'এবার বলুন তো, রহস্যটা কী?'

'কীসের রহস্য?' বাণীবাবু হাসেন।

'হঠাৎ এখানে মন্দির বানালেন কেন?'

'আমি তো বানাইনি। সংস্কার করেছি মাত্র।'

'আপনি মজিদ মিয় হচ্ছেন নাকি?'

'কে মজিদ মিয়া?'

'*লালসালু* পড়েননি?'

'ওয়ালীউল্লাহ। সত্যিই, অমন উপন্যাস বাংলায় খুব কমই লেখা হয়েছে। কিন্তু আমাকে হঠাৎ মজিদ ঠাউরালেন কেন স্যার?'

'আচ্ছা, আপনি এই স্যার বলাটা ছাড়বেন? আর আপনি বলাটা?'

'আপনি বলাটা আমার অভ্যেস। আর স্যার বলতে বেশ ভালো লাগে। মনে হয়, কারুর অনুগত হয়ে আছি।'

'অনুগত হয়ে থাকতে ভালো লাগে?'

'এ আপনি বুঝবেন না স্যার। আমার মতো বয়স হোক। তখন বুঝবেন অনুগত হওয়ার আনন্দ। অনুগত না হলে দয়া পাবেন কী করে? আর দয়াই তো একমাত্র, যা নিঃশেষ হয় না।'

'এখন মন্দিরের কথা বলুন।'

'আগে চা-বিস্কুট খান।'

'পরে হবে। চা-বিস্কুট খেতে তো আসিনি। আপনার দুর্গামন্দির দেখতেই এসেছি।'

দুর্গামন্দির ঘুরিয়ে দেখাতে দেখাতে বাণীবাবু পুরাণ-ইতিহাস-বর্তমানের মধ্য দিয়ে এমন অবলীলায় চলাচল করেন, অতীনের মনে হয় সে যেন এক গোলকধাঁধার ভিতরে ঢুকে পড়েছে। বাণীবাবু এমনভাবে কাহিনী বলে যান, যেন তাঁর ভিতরে এক প্রাচীন পুঁথির পাতার পর পাতা খুলে যাচ্ছে: 'শ্রীমন্ত সদাগরের নাম শুনেছেন তো? চাঁদ সদাগরের মতোই একজন সদাগর ছিলেন। ধনপতি সদাগরের পুত্র। খুল্লনা তার মা। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর অভয়ামঙ্গলে পিতা ধনপতিকে খোঁজার জন্য শ্রীমন্ত সদাগরের সিংহল যাত্রার কথা লেখা আছে। এই যে যজ্ঞডুমুর গাছ দেখছেন — দেখুন, গাছের গায়ে দুটো খোঁচ দেখতে পাচ্ছেন — গঙ্গাপথে সিংহল যাওয়ার সময় এখানেই জাহাজ বেঁধেছিলেন শ্রীমন্ত সদাগর। এখানে নেমে দেবী দুর্গার পুজো

দিয়েছিলেন। তখন হয়তো ছোটোখাটো কোনো মন্দির ছিল, পরে শ্রীমন্ত সদাগর বড়ো মন্দির তৈরি করে দেন। তারপর অনেক ইতিহাস আছে। বহুবার মন্দির ভেঙেছে, গড়া হয়েছে, কিন্তু দেবী দুর্গার অধিষ্ঠান কখনো সরেনি। এ অনেক বড়ো ইতিহাস, স্যার। আমার ইতিহাসও এর মধ্যে রয়ে গেছে।' বাণীবাবু হাসলেন।

'কীরকম?'

'দুর্গাগ্রামেই আমার জন্ম। ছোটোবেলায় এখানে মন্দির দেখেছি। আমার দাদামশাই মন্দিরের সামনে বসে তাঁর পাঠশালা চালাতেন। মনে আছে, কোলে বসে তাঁর দাড়ি নিয়ে খেলা করতাম আমি। তারপর এই জায়গা ছেড়ে চলে গেলাম। বহুদিন পরে — বুড়ো বয়সে ফিরে এসে দেখি, মন্দির ভেঙে গেছে, জঙ্গলে ঢেকে গেছে চারপাশ, তবু কেউ কেউ আসে, পুজো দিয়ে যায়। রোখ চেপে গেল। দুর্গামন্দিরের সংস্কার করতেই হবে। কেন জানেন? ঠাকুর-দেবতার কথা পরে। মনে হল, আমার শৈশব-স্মৃতি এমন জঙ্গলে ঢাকা পড়ে থাকবে?'

'অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা?' অতীন হাসে।

'বলতে পারেন। তবে কি জানেন — ওই ফলকটাতে আমার নাম লেখা আছে ঠিকই — কিন্তু ঠাকুরের কাছে যারা আসে, তারা ওই নাম-টাম ভুলে যায়। দেবীই বড়ো কথা।'

মন্দিরের ভিতরে দেবী দুর্গার কোনো মূর্তি নেই। পূর্বদিকের দেওয়াল ঘেঁষে দেড়ফুট উঁচু একটি অলঙ্কৃত বেদি; বেদির ওপর ডানদিকে কালো ব্যাসাল্ট পাথরের ত্রিস্তর পাদপীঠ। এখানে একসময় বসানো ছিল দেবী দুর্গার মূর্তি। এখন পাদপীঠের ওপর বসানো আছে তিনটি শিলাখণ্ড। স্বপ্নাদেশ পেয়ে মন্দিরের পাশের 'বামনে পুকুর' থেকে তুলে আনা হয়েছিল ওই শিলাখণ্ডগুলি। তিনটি শিলাখণ্ড দুর্গা, কালী ও শিব হিসাবে পূজিত হন।

'একটা স্বার্থের কথা আছে।' বাণীবাবু অতীনের পিঠে হাত রাখেন।

'আমি জানি।' অতীন বলে।

'এ গ্রাম তো একদিন আমাদেরই ছিল। এখানকার মাটি খুঁড়লে অনেক ইতিহাস বেরুবে, স্যার। কিন্তু কে সেই কাজ করবে?'

সুফল মণ্ডলের সঙ্গে আদিগঙ্গার মজাখাতের সামনে এখন দাঁড়িয়ে আছে অতীন। দুর্গাগ্রামের সতেরো ঘর হিন্দুর এক ঘর সুফলদের। সুফল বি. এ. পাশ করেছিল, চাকরি পায়নি, এখন সূর্যপুর হাটে সবজি বিক্রি করে। এছাড়া দুর্গামন্দিরের দেখভালের কাজ করে সে।

এই নাকি আদিগঙ্গা? এখন নর্দমা বলাই ভালো। এই গঙ্গাপথে শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচলে গিয়েছিলেন? হবেও বা। কিংবদন্তি থাকার সুবিধে এই যে বেঁচে থাকা কিছুটা সহনীয় মনে হয়।

দূরের দিগন্তে কালো মেঘ ফুলে ফেঁপে উঠছে।

'দাদা—'

'কী সুফল?'

'মহাপ্রভুকে সত্যিই কি খুন করা হয়েছিল?'

'তুমি জানো?'

'শুনেছি।'

'কেউ কেউ বলে। তাঁদের জীবনের কথা আমরা কতটুকু জানি সুফল?'

'মহাপ্রভুকে খুন কেউ করতে পারে? কেন করবে?'

'যিশুকে খুন করেনি? গান্ধীজিকে খুন করেনি? মহাপ্রভুকে খুন করতে বাধা কোথায়?'

'দুর্গাগ্রামে থাকতে খুব ভয় করে দাদা।'

'কেন?'

'আমরা তো সংখ্যালঘু হয়ে গেছি এখানে। যারই একটু পয়সা হয় সে বারুইপুরের দিকে চলে যায়। সতেরো ঘরে এসে ঠেকেছি আমরা।'

'কিন্তু ওরাও তো গরীব।'

'সব ঠিক দাদা। দশ বছর আগেও আমরা মিলেমিশে থেকেছি। এখনো যে খুব কাজিয়া হয় তা নয়। তবু ভয় করে।'

সাড়ে পাঁচ ফুটের ওপর লম্বা সুফল কথা বলতে বলতে কুঁজো হয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে, অতীন দেখছিল।

'দুর্গামন্দির সংস্কারের পর —'

'কিছু হয়েছে?'

'ওরা যেন আমাদের আর বিশ্বাস করতে পারছে না। আজানের আওয়াজ বেড়ে গেছে, কারা যেন মাঝে মাঝে এসে বক্তৃতা করে। খুব ভয় করে দাদা।'

সুফলের কথা মুছে দিতে দিতে সোঁ সোঁ গর্জন ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। অতীন মুখ তুলে দ্যাখে, একটি এরোপ্লেন মেঘ ছিঁড়তে ছিঁড়তে এগিয়ে চলেছে। কোথায় যাচ্ছে ওই বিমান? নিউ ইয়র্ক, না লন্ডন? নাকি এই দুর্গাগ্রামে ভেঙে পড়বে হঠাৎ?

রাতে বাড়ি ফিরে ডায়েরিতে কয়েকটি কথা লিখেছিল অতীন : 'এখানে যারা সংখ্যালঘু, তারা ভয়ে ভয়ে থাকে। সংখ্যালঘুদের মধ্যে যে-সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘু হয়ে থাকে, তারা ভয়ে ভয়ে থাকে। এই ভয়ের নামই কি সন্ত্রাসবাদ? এই ভয়ই কি মানুষকে নির্বাসিতের জীবনে ঠেলে দেয়?'

অতীন এখনও জানে না, কৃষ্ণমোহন ভ্রমণ থেকে তার জীবনের অজানা গল্পটা শুরু হয়ে গেছে কিনা।

শিশিরকুমার কি আন্তর্জাতিক অভিনেতা হতে পারতেন?

পিনাকী ভাদুড়ী

প্রাক্-প্রস্তাবনা

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে দুই কিশোর কলকাতার অধুনালুপ্ত শ্রীরঙ্গম মঞ্চে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর 'আলমগীর' নাটক দেখতে গিয়েছিল। তখন শিশিরকুমার পড়তির মুখে। হলের অবস্থা ভালো নয়। এখানে-ওখানে দৈন্য ফুটে বেরোচ্ছে। তাঁর দলে ভাঙন ধরেছে।

'আলমগীর' নাটকটি নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ যেভাবে শুরু করেছিলেন, শিশিরকুমার সেভাবে শুরু করতেন না। অনেক পরের একটি দৃশ্য তিনি গোড়ায় নিয়ে আসতেন। পরদা উঠলে দেখা যেত রাজসিংহ ও ভীমসিংহ পরস্পরের মুখোমুখি তরোয়াল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, fencing শুরু হচ্ছে। আলমগীর প্রথম প্রবেশ করেন বেশ কয়েকটি দৃশ্যের পরে। এক উইংস থেকে উলটোদিকের উইংস পর্যন্ত তরতর করে হেঁটে যান আলমগীর-বেশী শিশিরকুমার, আপনমনে বেশ গর্বের সঙ্গে বলতে থাকেন — 'মন্দ কী! কাশ্মিরি বাইজির দম্ভটা একবার চূর্ণ করে দেওয়া যাক না।' তাঁর সহজ, সুস্পষ্ট এবং সজোর স্বরনিক্ষেপ মুহূর্তেই আশ্চর্য করে দিয়েছিল ওই দুই কিশোরকে। একজন বলে উঠেছিল — 'এত সহজ হয়ে গেছে সংলাপ!' ঐতিহাসিক নাটক বলতেই তখন এক ধরনের কৃত্রিম ভঙ্গির প্রচলন ছিল — একটু ভারী গলায়, ঘাড়টা একটু তেরছা করে হেলিয়ে কথা বলত সবাই, বিশেষত যাঁরা প্রধান প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন। শিশিরকুমার সেই রীতিটা ভেঙে দিয়ে অভিনয়শৈলিতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মাত্রা যোজনা করলেন।

ওই নাটকেই, যেখানে দোবারি গুহায় আটকে পড়েছেন আলমগীর — সেখানে জল খেতে না পেয়ে তাঁর কণ্ঠস্বরে শিশিরকুমার এমনভাবে পিপাসার আর্তি প্রকাশ করতেন যে দর্শক বিচলিত বোধ করত। যে-মুহূর্তে তিনি জল খেতে পেলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর কণ্ঠস্বর হয়ে যেত স্বাভাবিক। এটাও অবাক হয়ে লক্ষ করেছিল কিশোর। এ ছাড়া, একটি দৃশ্যে আলমগীর আর উদিপুরী, এই দুটি মাত্র চরিত্র প্রায় ৪৫ মিনিট একটানা পারস্পরিক সংলাপ বলতেন, তাও অনেক সময়েই শুধু বসে বসে।

ক্ষীরোদপ্রসাদের সংলাপ রচনার প্রসাদগুণ বর্তমান ছিল এখানে। শিশিরকুমার এবং উদিপুরী (সেদিন রেবাদেবী ছিলেন) তাঁদের স্বরের প্রক্ষেপণে, চোখের ভঙ্গিতে, মুখের পেশির প্রসারণ সংকোচনে দর্শকদের বিমোহিত করে দিয়েছিলেন। তাঁদের অভিনয়ে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, কৌতুক, অভিমান, রাগ, অনুরাগ — সব কিছুই ঝিলিক দিয়ে উঠত। সেই অভিজ্ঞতা কিশোরটি ভুলতে পারেনি।

'প্রফুল্ল' নাটকের অভিনয় দেখতে গিয়েও কিশোরটি ওইরকম অভিভূত হয়েছিল। সেবার সে তার মা-কাকিমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল নাটকের কম্বিনেশন নাইট দেখতে। অর্থাৎ, সে-

রাত্রে শিশিরকুমারের দলের সঙ্গে কয়েকজন বিশিষ্ট নট-নটী অভিনয় করেছিলেন। সেই সম্মিলিত রজনীতে শিশিরকুমারের সঙ্গে নরেশচন্দ্র মিত্র, ছবি বিশ্বাস, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, অনুপকুমার, রাণীবালা, সরযূবালা, এঁরা ছিলেন।

শ্রীরঙ্গমের দোতলায় বসে মাটির ভাঁড়ে লেমনেড ঢেলে খেতে খেতে নাটকটি দেখেছিল ওই কিশোর। যোগেশের ভিক্ষা চাওয়ার দৃশ্যে শিশিরকুমার যে চুপি চুপি পয়সা চাইছেন পথিকের কাছে — নিজের কৌলিন্য ভুলতে পারছেন না — সেটি খুব নতুন লেগেছিল তার। সেই সঙ্গে ছবি বিশ্বাসের নেপথ্য থেকে বলা সংলাপের সহজতা তার কানে লেগে রয়েছে।

তারপরে মঞ্চ ছেড়ে দিতে হল শিশিরকুমারকে। যিনি নাট্যাচার্য বলে স্বীকৃতি পেয়েছেন, তাঁর অভিনয়ের জন্য নিয়মিত মঞ্চ নেই। এখানে-ওখানে 'ভাড়াটে কেষ্ট' সেজে বেড়াচ্ছেন। ওই সময়ে কলকাতার মহম্মদ আলি পার্কে 'বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন'-এ শিশিরকুমারের 'মাইকেল' ও 'সধবার একাদশী' দেখেছিল কিশোরটি। সেখানে সাদাসিধে মঞ্চ, কোনো সজ্জা নেই, কেবল সংলাপ পরিবেশন ও দৈহিক অভিনয়ে মাইকেল এবং নিমচাঁদ জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। ষাট বছর বয়স হয়ে গিয়েছে তখন শিশিরকুমারের, তবু দেবকীর গান শুনে প্রেমিক মধুসূদনের চাঞ্চল্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল সবাই। আগে একবার মাইকেলের অভিনয় দেখেছিল সে — দু-দুবারই নাটক দেখতে দেখতে তার মনে হয়েছিল শিশিরকুমার আজ যেন অসুস্থ হয়ে পড়ছেন — ক্রমশ মৃত্যু এল যখন তখন তাঁকে মনে হচ্ছিল আর যেন শক্তি নেই। অথচ দু-বারই সে দেখেছে নাটক শেষ করে যখন শিশিরকুমার বেরিয়ে যাচ্ছেন, তখন একেবারেই স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ। মাইকেলের দীর্ণ হয়ে যাওয়াটাই নাটকে ধাপে ধাপে দেখিয়েছিলেন তিনি।

'সধবার একাদশী' নাটকে শিশিরকুমারের মজলিসি চেহারা বেরিয়ে এসেছিল। বৈদগ্ধ্যে, ব্যঙ্গে, বিদ্রূপে, রসিকতায়, বাচনভঙ্গিতে তিনি বাঙালির সংস্কৃতিকে ক্ষুরধার করে তুলেছিলেন। পরিশীলিত কথকতা করছেন, কৌতুকে টুকরো হয়ে যাচ্ছেন, ঠাট্টা করছেন কেবল মজা করার জন্য — কিন্তু তারই মধ্যে আশ্চর্য চাবুক চালাচ্ছেন তদানীন্তন বাঙালির সাহেবিয়ানার চেষ্টাকে। শিশিরকুমারের অভিনয়ের এইসব সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য সবটুকু দর্শক কি অনুধাবন করত, কিশোরটি এইরকম ভেবেছিল সেদিন।

প্রস্তাবনা

পাঠক হয়তো বুঝতে পেরেছেন, সেদিনের ওই কিশোরটি আজকের প্রবন্ধটি লিখতে বসেছে। প্রথম থেকেই আমাদের মনে হয়েছিল শিশিরকুমার বাংলা নাটকের যে মোড় ফেরালেন তার আবেদন কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে সেটি অনুধাবনযোগ্য। কালান্তরের কথা বলছি না, বলছি দেশান্তরের কথা। মঞ্চাভিনেতা তাঁর সময়টুকুতেই আবদ্ধ থাকেন, তাকে অতিক্রম করার ক্ষমতা তাঁর নেই। পরবর্তীকাল তাঁর কথা পড়তে পাবে বা শুনতে পাবে, কিন্তু দেখতে পাবে না। এইটেই তাঁর ভাগ্য, যে দৃশ্যমানতায় তিনি তাঁর স্বকালেই সীমাবদ্ধ। যদিও এটাও ঠিক যে,

তাঁর সময়ের কাজের মধ্য দিয়েই তিনি নতুন কালকে এগিয়ে নিয়ে আসেন। গিরিশ ঘোষ এসেছিলেন বলেই বাংলা নাট্যমঞ্চে শিশিরকুমারের আগমন সম্ভব হয়েছিল, আবার শিশিরকুমারই খুলে দিয়েছিলেন শম্ভু মিত্র প্রমুখের সম্ভাবনা।

এক কালের অভিনেতা অন্য কালে সশরীরে উপস্থিত হতে পারেন না, তবে সেই সময়ে তিনি স্বদেশের সীমা পেরোতে পারেন কিনা তার একটি বিশ্লেষণ সম্ভব। অনেকের ধারণা আমাদের দেশে যে অভিনয় হত তাঁর মূল্যায়ন বিশ্বের কাছে উপযুক্ত বিবেচিত হওয়ার নয়। অবশ্য আমাদের অভিনেতারা বিদেশের মঞ্চে হাজির হতে পারেননি, কেবল শিশিরকুমার একবার অভিনয় করার জন্য সদলবলে আমেরিকা গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁকে বহু বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। ওই বিদেশযাত্রার আর্থিক প্রশাসনিক চুক্তির মধ্যে অনেক ফাঁক ছিল, সেজন্য তাঁকে ভুগতে হয়েছিল প্রচুর। শিশিরকুমার মূলত শিল্পী, তিনি ব্যবসায়ী ছিলেন না, তার ওপরে এ-ব্যাপারে পেশাদারি পরামর্শও নেননি তিনি — সবদিক আটঘাট বেঁধে নেওয়া হয়নি।

তথাপি, পরাধীন দেশের অভিনেতা সুদূর বিদেশে সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়ে পৌঁছেছিলেন, এই পটভূমিটি মনে রাখলে এটুকু জেনে আশ্চর্য হতে হবে যে, সে-দেশে শিশিরকুমার অবজ্ঞাত হননি, বরং সম্মানিত হয়েছিলেন। সেইটি আমরা আবিষ্কারের চেষ্টা করব। এও জেনে নেব, বিদেশে ওই বিরূপতা — যা অসাধুজনের চুক্তিভঙ্গের দরুন ঘটেছিল — শিশিরকুমার তার মুখোমুখি হয়েছিলেন কীভাবে। পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ, বিশেষত নাট্যমোদীরা এগুলি জানতে পারলে উপকৃত হবেন, গৌরবান্বিত হবেন, উৎসাহিত হবেন।

তবে তার আগে স্বদেশে শিশিরকুমারের উত্থানের ইতিহাসও একবার উত্থাপন করা প্রয়োজন, স্মরণ করা প্রয়োজন তাঁর জীবননাট্যে ওই নাট্যজীবন কতদূর পর্যন্ত তাঁকে অভিষিক্ত করেছিল। আজকের নাট্যানুরাগীদের কাছে এগুলি হয়তো কিছু কিছু পরিচিত, তবু সেগুলিও একবার ঝালাই করে নিয়ে আরো দূর প্রজন্মের জন্য সাজিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। শিশিরকুমার জনতার শ্রদ্ধা এবং আবেগ পেয়েছিলেন, সমাজের সর্বস্তরের বিশিষ্ট মানুষ তাঁর গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁর নাটকের মহলা অনেককে আনন্দিত ও শিক্ষিত করেছে।

এই পটভূমিটা বুঝতে পারলে এই সূত্র ধরেই শিশিরকুমারকে বিদেশের মাটিতে বিদেশি দর্শকদের সামনে প্রক্ষেপ করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশের আর কোনো অভিনেতা-প্রযোজক এভাবে নাটকের দল নিয়ে বিদেশে উপস্থিত হননি। এ-ব্যাপারে তাঁর কোনো পূর্বসূরি নেই, হয়তো উত্তরসূরি পাওয়াও কঠিন হবে।

প্রকৃতপক্ষে শিশিরকুমার আমাদের সামনে একটা ঐতিহাসিক সুযোগ এনে দেন। স্বদেশে তিনি প্রবলভাবে সম্বর্ধিত, নতুন যুগের প্রবর্তক, নাট্যচেতনার মধ্যে পরিবর্তনের বাতাবরণ সৃষ্টিকারী। আমাদের নিজস্ব সেই নবনাট্য দেশ পেরিয়ে যেতে পারে কিনা, বা পেরেছিল কিনা, তার খতিয়ান সংগ্রহ, সংকলন, সম্পাদন করা প্রয়োজন ছিল। ঠিক সেভাবে তা করা হয়নি।

বিদেশের মাটিতে শিশিরকুমারের পরীক্ষা তেমন সরল হয়নি, বা সেজন্য তিনি সমান

সুযোগ পাননি। তবু ওরই মধ্যে তিনি যা পেয়েছেন, যা হয়েছেন, তার নথিপত্র বিচার করে দেখা চলে। অন্তত তথ্য সংগ্রহের কাজটি করে রাখা দরকার। বিচ্ছিন্নভাবে এগুলি বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো আছে, তাদের একত্র করে একটি ইতিহাস প্রস্তুত করা হয়নি। আমরা তার শুরুটা করতে চাই।

আমাদের মনে হয়েছে যে, শিশিরকুমার বাংলা মঞ্চ-প্রযোজনায় নতুন যুগ সৃষ্টি করেছিলেন, সেই শিশিরকুমারের আন্তর্জাতিক মূল্যায়নের অবকাশ এসেছিল স্বল্পমাত্র। সেগুলি পরীক্ষা করে দেখা যেতেই পারে। অবশ্য এগুলির প্রত্যেকটিই হবে তথ্যভিত্তিক — শুধু তথ্যই হবে আমাদের সম্বল, কারণ তাঁর প্রযোজনার বা অভিনয়ের কিছুই আমরা উপস্থিত করতে পারব না। কিন্তু আলোচনাটি হবে ইতিহাসসম্মত, ইতিহাস থেকেই নথিভুক্ত তথ্যাদি আমরা পেশ করব। এসবের মধ্যে স্মৃতিচারণ, সংবাদ, বিশ্লেষণ, প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি থাকবে। তাদের সাহায্যেই আমরা বিষয়টিতে প্রবেশ করব।

আরো বিশেষ করে এটি করা প্রয়োজন বলে মনে হয়েছে কারণ সম্ভবত একমাত্র শিশিরকুমারই তুলনামূলকভাবে সরাসরি বিদেশিদের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন। এবং সেটি এমন সময়ে ঘটেছিল যখন সংবাদ বিনিময় বা যোগাযোগ প্রযুক্তির ছিল শৈশবকাল। নিয়তি তাঁর প্রতি সদয় ছিল না, এজন্য সেই উপস্থিতির মধ্য থেকে উজ্জ্বল উদ্ধারটুকু ছেঁকে নেওয়া যায়নি। কিন্তু সংবাদ প্রবাহের সীমাবদ্ধতা পার হয়ে ইতিহাসের সেই অধ্যায় পরবর্তী প্রজন্মকে কিছু কিছু উৎফুল্ল উচ্ছ্বাস পাঠিয়ে দিয়েছে। সেদিনের সেই মঞ্চ, সেই অভিনয়, সেই প্রযোজনা এ-যুগে চলে আসতে পারেনি বটে, কিন্তু সেদিনের ঘ্রাণ, শ্রুতি, স্মৃতি, সেদিনের বসন্তগানের মতো এ-দিনের বসন্তদিনে পৌঁছে গিয়েছে। নাটকের অনুরাগী যাঁরা, যাঁরা ইতিহাসকে রক্ষা করতে চান, তাঁরা সেইসব অতীতচারণকে বয়ে নিয়ে যাবেন বর্তমান থেকে ভবিষ্যৎ যুগে।

পরবর্তী যুগে এবং সাম্প্রতিক কালেই, কেউ কেউ বা কোনো কোনো নাট্যদল বিদেশে অভিনয় করতে গিয়েছেন এবং যাচ্ছেন। মনে রাখা দরকার, তাঁরা যান প্রবাসী বাঙালি বা ভারতীয় অভিবাসীদের আমন্ত্রণে। যাঁরা বিদেশে থাকেন, তাঁরা স্বদেশের স্বাদ পাবার জন্য Performing artiste-দের নিয়ে যান। তার মধ্যে বিদেশের আমন্ত্রণও থাকে না, সুযোগও থাকে না। যেসব এদেশি মানুষ বিদেশেই পড়ে আছেন, তাঁরাই প্রধানত এগুলি দেখেন এবং শোনেন। এসব দলের নির্বাচনের মধ্যে বিশেষ বিচার বিবেচনা থাকে না, শুধুমাত্র কারো তাৎক্ষণিক জনপ্রিয়তা অবলম্বন করেই এঁদের বেছে নেওয়া হয়। জনপ্রিয়তা অবশ্যই কোনো দোষ নয়, তাকে গুণই বলতে হবে, তবে শুধু জনপ্রিয়তা উৎকর্ষের মানদণ্ড নয়। এটা গোড়াতেই বুঝে নেওয়া দরকার।

শিশির যুগের পরেও বাংলা নাটকে আরেকবার মোড়-ফেরা দেখা গিয়েছিল। শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, বিজন ভট্টাচার্য, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় যুদ্ধোত্তর সময়ে বাংলা নাটকের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছিলেন। এঁরা অনেকেই শিশির যুগের — সবটা না হলেও, অনেকটাই

— প্রত্যক্ষদর্শী এবং উত্তরসূরি।

কিন্তু যে কারণেই হোক — তার বিশ্লেষণ আমাদের বিষয় নয় — বাংলা নাটক আপাতত মিডিয়োক্রিটি বা মধ্যমেধায় আচ্ছন্ন। শুধু নাটক নয়, অন্যান্য শিল্প সম্পর্কেও এমন ধারণা করলে ভুল হবে না। সেজন্য আজকের দর্শক অভিনয়ের জগৎকে অনেক সীমাবদ্ধ অবকাশে দেখতে পাচ্ছেন। উৎকৃষ্ট প্রযোজনার সংখ্যা এখন তুলনামূলকভাবে কম, যদিও একেবারে নেই এমন নয়। এও সত্য, নতুন যুগে প্রযোজনার আঙ্গিকে, অভিনয়ে, মঞ্চসজ্জায়, পরিবেশনায় অনেকেই নতুন পরিকল্পনা করছেন। তাঁদের প্রযোজনার গুণগত মান যা-ই হোক না কেন, তাঁরা বাংলা নাটকের প্রবাহকে সচল রেখেছেন। সেটুকু এখানে স্বীকার না করলে অন্যায় হবে।

শিশিরকুমার বা সে-যুগের অন্যান্য বিশিষ্ট শিল্পীদের প্রযোজনার পরিচয় এ-যুগে পাওয়া যাবে না। আর, তেমনটি পাওয়া যাবে না বলেই সেকালের অভিনয়ের মান সম্পর্কে বিচার করা আজকের দর্শকের পক্ষে সম্ভব নয়। তবু, তাঁরা যদি ইতিহাস লক্ষ করেন, তা হলে কোনো একটা পরোক্ষ পরিচয় তাঁরা পেয়ে যেতেই পারেন। তাতে ঠিক কী লাভ হবে, সে আলোচনার পরিসর এখানে নেই। কিন্তু এটুকু বুঝে নেওয়া যেতে পারে যে কেবল বিনোদনই নয়, নাটক-মূল্যায়নের উৎকর্ষ ঘটানোর জন্য কী দরকার। আজকের প্রজন্ম সে ইতিহাস জানে না — তাদের জানা উচিত যে শুধু তথ্যের খাতিরেই নয়, এসবের মধ্যে আমাদের সংস্কৃতির যে আবেগ, আকাঙ্ক্ষা এবং পথনির্দেশের সংকেত আছে, সেগুলো না জানাটা অপরাধ। Performing Art ক্রমশ outdated হতে পারে, শিশিরকুমারের বেলাতেও তা অসম্ভব নয়। তথাপি তাঁর সময়টাকে বোঝা দরকার।

আগমন

শিশিরকুমার যখন প্রেসিডেন্সিতে এম.এ. পড়ছেন, তখনই তিনি অভিনয়শিল্পে মাদকতার আস্বাদ পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশোত্তম জন্মোৎসব উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ টাউন হলে তাঁকে সংবর্ধনা দেন। তার পরের দিন (১৫ মাঘ, ১৩১৮) পরিষৎ মন্দিরে একটি সান্ধ্য সম্মিলন হয়। সেখানে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের জুনিয়র মেম্বাররা 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনয় করেন। শিশিরকুমার কেদারের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এ-অভিনয় দেখে ২৩ মাঘ, ১৩১৮ তারিখে অমল হোমকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন, 'তোমার ইনস্টিটিউটের বন্ধুদের জানিয়ো যে তাঁদের অভিনয় আমার খুব ভালো লেগেছিল। এমন সুনিপুণ অভিনয় এক আমাদের বাড়িতে গগন অবনদের ছাড়া আর কারুরই পক্ষে সম্ভব ছিল না। কেদার আমার ঈর্ষার পাত্র। একদা ওই পার্টে আমার যশ ছিল।'

শিশিরকুমার তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে। এ কাজে তাঁর নামও হচ্ছিল, কিন্তু কেবল অধ্যাপক হবার জন্য নিয়তি তাঁকে নির্বাচন করেননি। সেই নিয়তিই তাঁকে টেনে নিয়ে গেল নটের জীবনে। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে পরপর কয়েকটি নাটক অভিনয় করার পরে তাঁর খ্যাতি এতদূর বিস্তৃত হল যে অধ্যাপনার সম্মাননীয় বৃত্তি ছেড়ে

অভিনয়ের নিরাপত্তাহীন জীবনে তিনি ঝাঁপ দিলেন। গর্গ্যা কেন ছবি আঁকতে এসেছিলেন,এই প্রশ্নের জবাবে গর্গ্যা বলেছিলেন, I have got to — শিশিরকুমারও জীবন দিয়ে সেই জবাবই দিয়ে গিয়েছেন।

এর আগে অবশ্য আরেক অধ্যাপক এসেছেন নিয়মিত নাট্যকার হয়ে। তাঁর নাম ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। ম্যাডান থিয়েটারে শিশিরকুমারের সঙ্গে ক্ষীরোদপ্রসাদের পরিচয়। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলমগীর' নাটকে আলমগীরের ভূমিকায় নামলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী, এম.এ. বিদ্যার অভিঘাত অভিনয় শিল্পকে দিল মর্যাদা। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে শিশিরকুমার অনেকগুলি নাটক পরিবেশন করে প্রয়োগকল্পনা, পরিচালনা এবং অভিনয়ের জন্য খ্যাতি পেতে শুরু করলেন। অতীতের বহু নাটককে তিনি সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে প্রযোজনা করায় দর্শকরা মুগ্ধ হয়ে গেল। সমাজের বিদ্বৎমণ্ডলী তাঁকে অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাল।

জে.এফ.ম্যাডান নামে এক পারশি ধনকুবের বাংলা থিয়েটারে টাকা ঢেলে ব্যবসা করার জন্য এসেছিলেন এই সময়ে। শিশিরকুমার সেখানে (ম্যাডান থিয়েটার) 'আলমগীর', 'রঘুবীর' অভিনয় করে বিখ্যাত হন। এ-ছাড়াও বিভিন্ন ভাড়া করা মঞ্চে তখন তিনি এইসব নাটক করছেন। তাঁর নিজস্ব নাট্যমঞ্চ তখনো হয়নি। তবে তার আগে, ১৯২৩ সালে ইডেন গার্ডেনে একটি একজিবিশনে শিশিরকুমার তাঁবু খাটিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' অভিনয় করেন। সম্ভবত বারো রাত অভিনয় হয়েছিল, কিন্তু অভিনয়ের মান হল উচ্চস্তরের। ওই 'সীতা' নিয়েই মনোমোহন থিয়েটারে শিশিরকুমার দর্শকদের অভিবাদন করবেন স্থির করলেন বটে, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী আর্ট থিয়েটার 'সীতা' নাটকের অধিকার দিলীপকুমার রায়ের হাত থেকে নিয়ে নেওয়ায় সে নাটক মঞ্চস্থ করতে পারলেন না। তিনি নিবৃত্ত হলেন না, যোগেশচন্দ্র চৌধুরীকে দিয়ে নতুন 'সীতা' নাটক লিখিয়ে নিয়ে স্টেজে নামলেন। বাংলা নাটকের ইতিহাস রচিত হল। আশ্চর্য সেই অভিজ্ঞতা — দর্শকরা প্রায় উন্মাদ হয়ে গেল। এ-বিষয়ে দু-একটি কথা পরে বলা যাবে, এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে নাটকটিতে রচনাসৌকর্যের অভাব ছিল, কিন্তু শিশিরকুমারের প্রযোজনায় এটি হয়ে উঠল অসাধারণ। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' প্রায় হারিয়ে গেল প্রযোজনার তালিকা থেকে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, এই নতুন 'সীতা' নাটকটি সম্বন্ধে — 'এটি নাটকই নয়, ...কিন্তু শিশিরবাবু নিজের ক্ষমতার জোরে এ বইটিকেও চালিয়ে দিতে পেরেছেন।' ওই চিঠিতেই বললেন, 'শিশির ভাদুড়ীর প্রয়োগনৈপুণ্য সম্বন্ধে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে।' সত্যি কথা বলতে কি, এই নতুন নাটকেই শিশিরকুমার তাঁর নৈপুণ্য প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে নিতে পেরেছিলেন।

শিশিরকুমার এই সময়ে তাঁর নিজস্ব নাট্যসংস্থা গড়েছিলেন, নাম দিয়েছিলেন, 'নাট্যমন্দির'। কলেজের অধ্যাপনায় তিনি পেতেন দেড়শো টাকা, ম্যাডান কোম্পানি দিয়েছিল সাতশো টাকা। অর্থ, জনপ্রিয়তা এবং সম্মান। উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন — Every profession is honourable.

শিশিরকুমার আর পিছন ফিরে তাকাননি। তাঁর নাট্যমন্দির, নব-নাট্যমন্দির ও শ্রীরঙ্গম, এই তিনটি মঞ্চে তিনি ইতিহাস গড়লেন। তার সবটুকু আজকের প্রজন্ম জানে না, হয়তো

জানার উৎসাহও নেই তাদের। তথাপি, এখনো অনেকেই থিয়েটার করছেন, থিয়েটার নিয়ে পড়াশুনোও করছেন। শুধু তাঁরাই নন, অনাগত যুগেও নিশ্চয় কোনো প্রযোজক-অভিনেতা আসবেন, যিনি মিডিয়োক্রিটিতে আবদ্ধ থাকবেন না, অতীতকে জানতে চাইবেন। তিনি এই আলোচনার শিখা থেকেই তাঁর প্রদীপ জ্বালিয়ে নেবেন।

শিশির যুগ

বাংলা নাটকের একটা যুগকে শিশিরকুমারের যুগ বলা হয়। কিন্তু কেন? কীভাবে এই নবযুগ চিহ্নিত হয়েছিল!' শিশিরকুমারই বা কী নতুনত্ব এনেছিলেন?

পরবর্তী যুগের বিশিষ্ট প্রযোজক-অভিনেতা শম্ভু মিত্র আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'এইরকম অনেক প্রশ্নের যথোচিত মীমাংসার চেষ্টা হয়নি। অথচ ইতিহাস না জানলে নতুন শিল্পসৃষ্টি কি সম্ভব?'

বাংলাদেশে শিশিরযুগের সফলতা, সার্থকতা এবং ব্যর্থতা, তার আনন্দ ও বেদনা আমাদের উত্তরাধিকার। সে-যুগের অভিজ্ঞতা পরের যুগকে শেখাবে, সতর্ক করবে। এজন্য সে-যুগের কাহিনী আমাদের জানা দরকার।

শিশিরকুমার একদিক দিয়ে ভাগ্যবান ছিলেন। তিনি গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল বসু, এঁদের অভিনয় দেখেছেন তাঁর কৈশোরে। সেই গৌরবময় যুগ থেকেই তাঁর ধ্যানধারণা তৈরি হয়েছে। কী ধরনের প্রযোজনা তিনি করবেন, কেমনভাবে অভিনয় করবেন, তার একটা রূপরেখা সম্ভবত তাঁর অগোচরেই নিজের মনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। কণ্ঠস্বরের অনাবশ্যক নাটকীয়তা, মঞ্চসজ্জার অতিরিক্ত আধিক্য, এসব হয়তো শিশিরকুমারকে নতুন করে ভাবিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ যেমন রঙ্গমঞ্চে চিত্রপটের চেয়ে চিত্তপটের ওপরেই জোর দিতে চেয়েছিলেন — শিশিরকুমারও তেমন মনে করেছিলেন, 'আলোকপ্লাবিত মঞ্চের উপরে নয়নাভিরাম সৃষ্টি করার খরচ অনেক।' এর 'একটা কুফল হচ্ছে' — নাট্যের যে প্রাণ অভিনয়, তার চেয়ে দৃশ্যপটের জাঁকজমকে দর্শক বেশি মুগ্ধ হয়, এতে 'নাট্যের ক্ষতি'। শিশিরকুমার রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব প্রযোজনাও দেখেছিলেন, ফলে একই সঙ্গে উৎকৃষ্ট পেশাদার রঙ্গমঞ্চ ও অনুপম শৌখিন রঙ্গমঞ্চের তুল্যমূল্য নিদর্শন তিনি পেয়ে গিয়েছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন তাঁকে কী করতে হবে।

এক সময়ে রেওয়াজ ছিল, এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বলো। শিশিরকুমার সে-পন্থা পরিত্যাগ করলেন। কথা যখন বলতেন, তাঁর কণ্ঠস্বর যেমন শেষ পর্যন্ত পৌঁছত, তেমন স্বাভাবিক ছিল সেই প্রক্ষেপণ। আবার প্রয়োজনে তিনি নির্বাক অভিনয়েও অভিভূত করতে পারতেন। ছোটো ছোটো প্যান্টোমাইম — 'ষোড়শী'তে জীবানন্দ, 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে চাণক্য — এসব অভিনয় অবশ্যই সবাক, তবে ওরই মধ্যে কোনো একটা বিশেষ সিচুয়েশনকে ফুটিয়ে তোলার জন্য কোনো কথা না বলে প্রায় সমস্ত অঙ্গ দিয়েই ভাব প্রকাশ করতে পারতেন। যখন কথা বলতেন, তখনও যেমন, তেমনি আবার নীরবে শরীর সঞ্চালনের মধ্য দিয়েও বিভিন্ন ধরনের ভাব ব্যক্ত করতে পারতেন।

বিদ্বান, বুদ্ধিমান, রুচিমান শিশিরকুমার বাংলা মঞ্চকে যা যা দিয়েছিলেন, তার অনেকগুলিই এখন বাংলা নাটকের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে — যদিও তাদের উৎস এখনকার অনেকেই জানেন না, কিংবা খেয়াল করেন না। যেমন, শিশিরকুমার পাদপ্রদীপ (রঙ্গমঞ্চে অভিনেতার পায়ের কাছে যে আলো স্থাপন করা হয় অর্থাৎ ফুটলাইট) তুলে দিলেন। এই আলো নীচে থেকে ওপরে ওঠে, কিন্তু স্বভাবত আলো আসে ওপর থেকে নীচে এবং পাশ থেকে। শিশিরকুমার যেগুলি দিয়ে গেছেন সেগুলি হল —

১. অধ্যয়ন স্পৃহা।
২. প্রয়োগকর্তা আবিষ্কার।
৩. আমেরিকায় বাঙালি শিল্পীদের দিয়ে বাংলা নাটক অভিনয়।
৪. মাতৃভাষার প্রাধান্য প্রদান। রঙ্গমঞ্চের ইংরেজি নামকরণের বদলে বাংলা নাম (উদা: নাট্যমন্দির) —নাটকের টিকিট বাংলায় ছাপা শুরু (উদা: 'ক' পঙ্‌ক্তি, বাংলায় নির্দিষ্ট আসনসূচক সংখ্যা)।
৫. পাদপ্রদীপের বিলোপসাধন — স্পটলাইটের প্রবর্তন, ত্রিমাত্রিক দৃশ্যের অবতারণা, মঞ্চপীঠের সমতলের তারতম্য বিধান।
৬. নির্বাক অভিনয়ের ব্যবহার।
৭. মঞ্চের পশ্চাৎ থেকে প্রবেশ — 'সীতা' নাটকের প্রথম দৃশ্যে দুর্মুখ, শেষ দৃশ্যে সীতা স্বয়ং।
৮. সাজসজ্জায় কালোপযোগিতা আনয়ন, মঞ্চসজ্জায় প্রামাণিক স্থাপত্য নির্মাণ।
৯. নাট্যরস অনুযায়ী আলোর প্রয়োগ।
১০. প্রেক্ষাগার সম্পূর্ণ অন্ধকার করা।
১১. থিয়েটার দেশের পরিচয় (A Nation is known by its stage) এই ঘোষণা করা।
১২. ঐকতান বাদন (concert) বন্ধ করে প্রাসঙ্গিক সংগীতের ব্যবস্থা।
১৩. সংলাপের অর্থ অনুধাবন করে তবে তার উচ্চারণ।
১৪. মঞ্চের উপরে উপস্থিতির সময়ে সংলাপ না থাকলেও, উপযোগী ভাবাভিনয়।
১৫. নাটকের সুসম্পাদনা।
১৬. নাটকে দর্শক ও অভিনেতার ব্যবধান ঘুচিয়ে দেওয়া ('শেষরক্ষা', 'রীতিমত' নাটক)

শিশিরকুমারের প্রয়োগকলার নতুনত্ব সম্পর্কে শম্ভু মিত্র কিছু আলোচনা করেছিলেন। সেখানে তিনি বলেছেন —

> ...নাটককে, দৃশ্যপটকে, অভিনয়কে, শব্দকে, সব কী ক'রে এক সঙ্গে নাট্যের মধ্যে ব্যবহার করতে হয় তার শিক্ষা আমরা শিশিরকুমারের কাছ থেকেই পেয়েছি। তিনিই আমাদের প্রথম নির্দেশক। এ-বাঙলাদেশের, আমার অনুমানে সমগ্র ভারতবর্ষের, প্রথম নির্দেশক,

> যিনি মঞ্চের ছবি কল্পনা করেছেন।...কিন্তু প্রথম ব'লেই বোধহয় তাঁর অনেক সূক্ষ্ম কারুকাজ তেমন ক'রে নজরে পড়েনি লোকের, তেমন ক'রে আদর পায়নি। কারণ তেমন ক'রে নাট্য দেখার দেখবার অভ্যাস যে তৈরী হয়নি মানুষের । তার ওপর দর্শককে গুলিয়ে দেবার জন্যে অন্য ধরনের থিয়েটারও তো ছিলো!

শম্ভু মিত্র প্রয়োগকলার কথা বলতে গিয়ে শিশিরকুমার প্রযোজিত 'দিগ্বিজয়ী' নাটকের কথা বলেছেন — 'আর-একটা জিনিস শিশিরবাবুর দেখে শিখেছি সেটা হ'লো, নাটক কীভাবে কাটতে হয় বা গাঁথতে হয়' —এই নাটক দেখেই তিনি শিখেছিলেন—'যেটুকু লেখা থাকে সেটুকু অতি সামান্য...আর যেটা চোখে দেখা যায় এবং কানে শোনা যায় তার প্রাচুর্য অসামান্য।' বাংলা থিয়েটারের পৌরাণিক বীরদের যে গদাইলস্করি চলন বলন তার সঙ্গে যে এর কোনো সাদৃশ্যই নেই, পরিচালকের চিন্তা যে প্রত্যেকটি চরিত্রাভিনেতার খুঁটিনাটি পর্যন্ত বিস্তৃত, এটাও বুঝেছিলেন তিনি। শম্ভু মিত্র নিজেও স্বীকার করেছেন যে, তাঁকে এসব দেখিয়ে দেবার মতো 'একজন' (শম্ভু মিত্র তাঁর রচনায় 'একজন' বলেছেন, নাম উল্লেখ করেননি) মানুষ ছিলেন যিনি বলতেন —

> ভাদুড়ীমশায়ের মুড দ্যাখো যেন সুইচ বোর্ডে বাঁধা আছে। যখনি যে - মনোভাব দরকার, তখনই সেগুলো যেন পরপর পটাপট চ'লে আসছে, তার সঙ্গে সঙ্গেই গলার modulation যেন আপনা থেকে হ'য়ে যাচ্ছে। এর জন্যে কতোখানি প্র্যাকটিস আর কতোখানি ডিসিপ্লিন দরকার বুঝতে পারো! অ্যাকটিং এমনি হয় না।

'দিগ্বিজয়ী' নাটকের মঞ্চসজ্জা নিয়ে আরো বলেছেন শম্ভু মিত্র — আমরা খানিকটা তুলে দিচ্ছি —

> 'দিগ্বিজয়ী'র তৃতীয় অঙ্কে নাদির শাহ যখন দিল্লী ধ্বংসের আদেশ দেয় তখন নেপথ্যে বিউগল্ ড্রাম ইত্যাদি বেজে উঠতো, বিস্ফোরণের শব্দ হ'তো মুহুর্মুহু, আর তার মধ্যে সৈনিকদের চীৎকার ও আক্রান্তদের আর্তনাদ শোনা যেতো। পিছনের পট লাল আলোয় রক্তিম হ'য়ে যেতো, আর পাকিয়ে পাকিয়ে ধোঁয়া উঠত সেই লালের মধ্যে।
>
> যতোক্ষণ দিল্লি ধ্বংসের এই তাণ্ডব চলতো নেপথ্যে, ততোক্ষণ মঞ্চের সামনের দিকের আলো নিভে থাকতো, আর একেবারে পিছনে, ছাতের পাঁচিলের সামনে, নাদির শাহ দাঁড়িয়ে থাকতেন ছায়ার মতো, দর্শকের দিকে পিঠ ক'রে।
>
> তারপর ক্রমশ যুদ্ধের আওয়াজ ম'রে যেতো। সৈন্যদের মার্চ ক'রে যাওয়ার Kettledrum বাজতো, আর দিল্লীর সাধারণ লোকের হাহাকার ও গোঙানি শোনা যেতো।

এরপরেই শম্ভু মিত্র যে-কথাটা বলেছেন তাতেই বোঝা যাবে যে শিশিরকুমারের প্রয়োগকলা কীভাবে তাঁর যুগ থেকে পরের যুগে চলে আসছে —

> এই নাট্যাভিনয় যদি না-দেখতুম তাহ'লে 'নবান্ন'র প্রথম দৃশ্যের কল্পনা করা যে সম্ভব হ'তো না এ-কথা অনস্বীকার্য।

এইভাবেই একটা নবযুগ আরেকটা নবযুগের সম্ভাবনাকে আসন্ন করে দেয়। যুদ্ধোত্তর বাংলায় নবনাট্যের যুগ রচিত হয়েছিল ভারতীয় গণনাট্য সংঘের 'নবান্ন' নাটকের অভিনয়ে। বিয়াল্লিশের দুর্ভিক্ষ বা পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে লেখা বিজন ভট্টাচার্যের এই নাটক পরিচালনা করেছিলেন শম্ভু মিত্র। সঙ্গে ছিলেন সুধী প্রধান। নাটকটি শিশিরকুমারের শ্রীরঙ্গম মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল এবং শিশিরকুমার নিজে কয়েক রাত সেই অভিনয় দেখেছিলেন। তিনি নিজেও কিছুদিন পরে সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে তুলসী লাহিড়ীর লেখা 'দুঃখীর ইমান' নাটক প্রযোজনা করেন।

শিশিরকুমারের সম্পাদনার কথা 'নাচঘর' পত্রিকার ৩০ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ সংখ্যাতে এইভাবে লেখা হয়েছিল। 'সাজাহান নাটকের অনাবশ্যক বাহুল্য দোষ নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলুম... শুনে সুখী হলুম... শিশিরকুমারের বিখ্যাত কাঁচির গুণে ''সাজাহান'' সম্পূর্ণ অভিনব মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে... এ সাজাহান সমস্ত পুরাতন সাজাহানকে একেবারে ম্লান করে দিয়েছে...'।

'আলমগীর' নাটকের সু-সম্পাদনার কথা বলেছেন দেবনারায়ণ গুপ্ত, বলেছেন অভিনেতাদের সুর বর্জন করে স্বাভাবিক স্বরে সংলাপ উচ্চারণের বিস্ময়ের কথা। 'সীতা' নাটক শুরু হত অন্ধকার মঞ্চে — একটি ফোকাস পড়ত মাঝখানে — সেখানে একজন মহিলা 'কথা কও অনাদি অতীত' কবিতাটি আবৃত্তি করতেন — আলো মিলিয়ে যেত, মঞ্চ খুলে যেত। শচীন সেনগুপ্ত লক্ষ করেছেন, শিশিরকুমার রোমান্টিসিজম আর র‍্যাশনালিজম দিয়ে অভিনয়কে স্বাভাবিকতার চূড়ান্ত পর্যায়ে তুলতে পেরেছিলেন।

শিশিরকুমার যেমন বড়োমাপের giant চরিত্রকে জীবন্ত করেছিলেন, একইভাবে তিনি প্রেমিক চরিত্রেরও উত্তরণ ঘটিয়েছেন। জীবানন্দ, রমেশ, রাম প্রভৃতি চরিত্রের প্রেমিকসত্তা উন্মোচিত করেছিলেন তিনি। এর জন্য দুটি উপকরণের প্রয়োজন — সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ও বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গি। দৃষ্টিতে যাঁর কামনা, বাসনা, মান, অভিমান, আনন্দ, বেদনা নেই তিনি প্রেমিক হতে পারবেন না। ঠিক এই গুণগুলো ছিল বলেই প্রেমিকের ভূমিকাতেও তাঁর জুড়ি ছিল না। জীবানন্দের মতো wretched চরিত্রকে তিনি এইজন্যই dignity দিতে পেরেছিলেন।

রাম চরিত্রে বাল্মীকি যে-বেদনা দেখিয়েছেন, শিশিরকুমার তাকে বাণীময় করেছিলেন। শুধু সে-অভিনয় দেখে লোকের তৃপ্তি নেই। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন, 'রাম নয়, তারা শিশিরকুমারকে দেখবে।' ওই বেদনাবহ ব্যঞ্জনাময় অভিনয় দেখেই অচিন্ত্যকুমার একটি কবিতা লিখে ফেললেন —

> 'দীর্ঘ দুই বাহু মেলি আর্তকণ্ঠে ডাক দিলে : সীতা, সীতা, সীতা —
> পলাতকা গোধূলি প্রিয়ারে —'

কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তিতে বললেন —

> 'তুমি শুধু নট নহ, তুমি কবি, চক্ষে তব প্রত্যূষ স্বপন
> চিত্তে তব ধ্যানের মহিমা।'

প্রেমিক রামের প্রশস্তি গাইলেন আরেকটি পঙ্‌ক্তিতে —

> 'তারে ডাকো — ডাকো তারে — যে প্রেয়সী যুগে যুগে চঞ্চল চরণে
> ফেলে যায় ব্যগ্র আলিঙ্গন।'

শিশিরকুমার তাঁর অভিনয়ে এই নতুন ব্যঞ্জনা আনতেন, তা শুধু অভিনয়েই নয়, তাঁর আবৃত্তির মধ্যেও ধরা আছে। রবীন্দ্রনাথের 'আশা' কবিতার (ধন নয়, মান নয়, একখানি বাসা) একটি শব্দ তিনি বদলে নিয়েছিলেন — 'গাছটির স্নিগ্ধ ছায়া' পঙ্‌ক্তিটিতে তিনি বলতেন, 'তরুটির স্নিগ্ধ ছায়া'। বুদ্ধদেব বসু শিশিরকুমার সম্বন্ধে লিখেছেন — 'সীতা, আলমগীর, ষোড়শী — এই তিনটি নাটক অভিনীত হবার পরেই এই সত্যটি অনুভূত হল যে নাট্যমন্দির একটি রঙ্গমঞ্চ মাত্র নয়, নয় কোনো প্রমোদভবন যা থেকে বেরিয়ে এলে তার কথা আর বেশিক্ষণ মনে রাখতে হয় না; তা হয়ে উঠেছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার সঙ্গে সংযোগ রেখে চলা বুদ্ধিজীবী প্রতি বাঙালির অবশ্যকৃত্য।'

আমরা আগেই বলেছি জনপ্রিয়তা উৎকর্ষের মানদণ্ড নয়। তবে এটাও ঠিক যে জনপ্রিয়তা একটি অন্যতম সুযোগ, যার সাহায্যে কেউ তাঁর কর্মধারাকে উৎকৃষ্ট করে তুলতে পারেন। জনপ্রিয়তায় আটকে থাকলে তাঁর চলবে না, তাকে উন্নত করার সাধনাতেই তিনি উৎকর্ষকে স্পর্শ করবেন। সেই জনপ্রিয়তা শিশিরকুমার ক্রমান্বয়ে তিন দশক ধরে রাখতে পেরেছিলেন। পরের দশকে, অর্থাৎ নাট্যজীবনের চতুর্থ দশকেও তার উৎস নির্বাপিত হয়নি, যদিও তাতে ম্লানতা এসে গিয়েছিল। তার কারণ অবশ্য কিঞ্চিৎ ভিন্ন ছিল, সেকথা শেষে বলার চেষ্টা করব।

জনপ্রিয়তার একটি নিরীক্ষা করেছিল তদানীন্তন বিশিষ্ট পত্রিকা *নাচঘর*। ২৭ ভাদ্র ১৩৩১ তারিখে পত্রিকাটি একটি অভিনব ভোট-কুপন প্রকাশ করে। সেই অভিনব ভোট-কুপনে *নাচঘর* পত্রিকার পাঠকদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে তাঁদের পছন্দ অনুযায়ী বর্তমানে (সেই আমলে) ক্রমানুযায়ী বাংলা নাট্যমঞ্চে প্রথম তিনজন অভিনেতা কে কে? নিরীক্ষাপত্রটি ছিল এইরকম —

> বাংলাদেশের বর্ত্তমান রঙ্গালয়ের সহিত এখন যাঁহারা সংশ্লিষ্ট আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কোন্ তিনজন অভিনেতাকে সাধারণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন তাহা নিরূপিত করিবার জন্য নিম্নলিখিত ভোট কুপন প্রকাশ করা হইতেছে। পাঠকবর্গ এই কুপনে নিজেদের নির্বাচিত তিনজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতার নাম লিখিয়া নাচঘরের কার্য্যালয়ে ফেরৎ পাঠাইলে বাধিত হইব। পূজার সংখ্যা নাচঘরে ইহার ফলাফল বাহির হইবে।

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা কে?

১ ... ...

২ ... ...

৩ ... ...

স্বাক্ষর _____

ঠিকানা _____

দু-সংখ্যা পরে *নাচঘর*-এ, এই ভোটের ফল ঘোষিত হল এবং অবশ্যই প্রাপ্ত ভোটের বিচারে শীর্ষস্থান পেলেন শিশিরকুমার। তিনি ২২১১টি ভোট পেয়েছেন; দ্বিতীয় হয়েছেন সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, তাঁর প্রাপ্ত ভোট ২১৮২। বিশেষ কারণে একজন অতিরিক্ত অর্থাৎ মোট চারজনের নাম ঘোষিত হল। তৃতীয় শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র এবং চতুর্থ শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী। এঁদের প্রাপ্ত ভোট যথাক্রমে ২০৭৪ ও ২০৭০। ক্রমান্বয়ে আরো তেরো জন অভিনেতার একটি নামের তালিকাও একই সঙ্গে প্রকাশিত হল।

নির্দ্বিধায় বলা যায় শিশিরকুমারের এই জনপ্রিয়তা অবশ্যই গ্ল্যামার-সর্বস্ব ছিল না।

আমেরিকায়

আমরা এবারে আমাদের মূল বিচার্য বিষয়ে প্রবেশ করব। এতক্ষণ যা লিপিবদ্ধ হল, তার সংবাদ অনেক জায়গায় অনেকবার বলা হলেও, নতুন কালের সামনে সেই ইতিহাসটি আরো একবার পর্যবেক্ষণ পর্যালোচনা করার যোগ্য। এইগুলিই শিশিরকুমারের আমেরিকা যাত্রার পটভূমি রচনা করেছে।

এই যাত্রা কীভাবে ঘটেছিল সেটি একবার জেনে নেওয়া যেতে পারে। ১৯৩০ সালে এই যাত্রা হয়েছিল, তার বছর দুই আগে নিউইয়র্ক থেকে একটি cable শিশিরকুমারের নামে আসে। তাতে জানতে চাওয়া হয়েছিল তিনি সেখানে তাঁর দল নিয়ে গিয়ে অভিনয় করতে রাজি কি না। তাতে স্বাক্ষর ছিল, সা-টু-সেন, ল্যাবরেটরি থিয়েটার, নিউইয়র্ক। সা-টু-সেন কে বা কী, এ-নিয়ে একটু ঠাট্টা তামাসা হয়, তবে তাঁকে জবাব দিয়ে বিস্তারিত সংবাদ জানতে চাওয়া হয়েছিল। তার উত্তর আসে, তবে তাতে কোনো নাম ছিল না বলে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কিছুদিন পরে এরিক এলিয়ট নামে এক ইংরেজ অভিনেতা কলকাতায় শিশিরবাবুর থিয়েটার দেখে মুগ্ধ হয় এবং তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। এইরকম আলাপ পরিচয়ের মধ্যে সে আমেরিকার প্রস্তাবের কথা শুনতে পায়। এর পরে এরিক বিলেতে চলে যায় এবং শিশিরকুমারের সঙ্গে

তার পত্রালাপ চলতেই থাকে। সে নিউইয়র্কে গিয়ে সা-টু-সেনের খোঁজ করে প্রস্তাবটা সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়। পরে নিজেই সে, এই আয়োজনের ভার নিয়ে নিয়েছিল।

মিস মারবারি বলে নিউইয়র্কের এক বর্ষীয়সী মহিলা ওখানকার লোকেদের দেখাবার জন্য ভারতবর্ষের নাট্য-সাধনার পরিচয় ওদেশে নিয়ে যেতে চান এবং তিনি সা-টু-সেন-এর মারফৎ শিশিরকুমারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে চাইলেন। এরিক, মারবারি এবং কার্ল রীড নামে আরেকজনের সঙ্গে সোজাসুজি যোগাযোগ করে নেয়। সা-টু-সেন আসলে একজন বাঙালি, নাম সতু সেন। রীড এবং মারবারি এরিকের মাধ্যমে শিশিরবাবুর সঙ্গে চুক্তি করে।

এরপরে এরিক কলকাতায় যখন এল তখন শিশিরকুমারের নিজের থিয়েটার বলে কিছু নেই। এদিক-ওদিক অভিনয় করছেন, তাঁর নিজস্ব উৎকৃষ্ট প্রযোজনাগুলো কিছুই হচ্ছে না। এরিক হতাশ হল। যেসব নর্তকীদের সে এর আগে দেখে গিয়েছিল, তারা কেউ নেই। নতুন নর্তকীর দল গড়ে তোলা দরকার এবং সে নিজেই এই সখী-সংগ্রহের ভার নেয়। যারা এল তারা শুধু বিদেশে যেতে পারবে বলে এল,যদিও সে-সময়ে তাদের অভিনয় ক্ষমতার কোনো খ্যাতিই ছিল না। শিশিরকুমার যে এতে রাজি হলেন, এটা তাঁর প্রথম ভুল। দ্বিতীয় ভুল হল তাড়াহুড়ো করে যেতে রাজি হওয়া। এতে নাটকের প্রয়োজনীয় অন্যান্য অনেক দিকে দৃষ্টি দেওয়া গেল না।

'সীতা' নাটকটি বিদেশের জন্য প্রধান ভরসা ছিল। কিন্তু ততদিনে তাঁর থিয়েটার বন্ধ থাকায় এর দৃশ্যপটগুলি খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সেইগুলিই জাহাজে তোলা হল, এরিক বোঝাল যে ওখানে ওগুলি ঠিক করে নেওয়া হবে। নিউইয়র্কে পৌঁছে জানা গেল, যা এসেছে তাতেই অভিনয় করতে হবে, নতুন কিছু হবে না। মঞ্চ যিনি তৈরি করছিলেন তাঁর কোনো জ্ঞানগম্যি ছিল না। কলকাতায় 'সীতা' নাটকের প্রথম দৃশ্যে নানারকম সিঁড়ি ও দেওয়াল থাকত। তা ছাড়া সমস্ত দৃশ্যটি ঘিরে থাকত একটি কালো পরদা। সেটি পাওয়াই গেল না — অসম্পূর্ণ দৃশ্যপটে অভিনয়ের মহলা হল। গানের সময়ে নিউইয়র্কে গিয়ে কেনা হারমোনিয়ামটির বেলো গেল নষ্ট হয়ে। বাঁশি, ক্ল্যারিওনেট, তবলা-সহ প্রতিটি সহযোগী বাদ্যযন্ত্রই ক্রমাগত অসহযোগিতা করছিল। 'মঞ্জুল মঞ্জরী' বলে যে বিখ্যাত নাচটি ছিল, তা নাচবার উপযুক্ত মেয়েরা ছিল না। একজন এসে বললেন, আমেরিকানরা sex starved, যৌনোন্মত্ত। মেয়েদের বেশভূষা অনাবৃত রাখাই ভালো হবে।

দুটি ভাগে এই নাট্যদলটি রওনা হয়েছিল। 'নাট্যমন্দির লিমিটেড থিয়েটার' দলের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল পঁচিশ। প্রথম দল ১৯৩০-এর ৮ সেপ্টেম্বর কলকাতা থেকে করাচি রওনা হয়। সেখান থেকে তাঁরা জাহাজে ওঠেন। এই দলে এরিক ছিল, আর ছিলেন শিশিরকুমার, রাধাচরণ ভট্টাচার্য, অরবিন্দ বসু, শরৎচন্দ্র চন্দ্র, কঙ্কাবতী দেবী, প্রভা দেবী, ঊষারানী দেবী, সরলা দেবী, বেলারাণী দেবী, কালিদাসী দেবী, কমলা দেবী, হেমাদেবী, পরিমল দেবী ও ভিখারী নায়েক। দ্বিতীয় দল রওনা হয় ১০ সেপ্টেম্বর। এই দলে ছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, পান্নালাল মুখোপাধ্যায়, অমলেন্দু লাহিড়ী, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, তারাকুমার ভাদুড়ী, শৈলেন্দ্র

চৌধুরী, শীতলচন্দ্র পাল, রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মণিমোহন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আর একবার অভিনয়ের প্রসঙ্গে আসি। মহলার ব্যাপারটা খুবই জটিল হয়ে যাচ্ছিল। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য তাঁর বর্ণনার মধ্যে এত ক্লেশের ভেতরেও কৌতুক সঞ্চার করে লিখেছেন — 'শ্রীমতী প্রভা সীতা, আমি বাল্মীকি। ... তফাতের মধ্যে প্রভার পেটে ছেলে এবং আমার পেটে শূলব্যথা।'

শিশিরকুমার একা সব সামলাচ্ছেন, তাঁর কণ্ঠস্বর সেদিন 'অমৃত নির্ঝর'। কিন্তু গোলমাল অনেক রকম। রাম-লব মিলনের পরে যখন রাম 'ফিরাও বালকে, ফিরাও বালকে' বলে মূর্ছিত হয়ে পড়েন, তখন হঠাৎ আলো নিভে যাওয়ায় যে effect হয় এদেশের দর্শক তার সঙ্গে পরিচিত। দর্শক সে-সময়ে রামের সঙ্গে সমাত্ম হয়ে যেন লবশূন্য গৃহ অন্ধকার দেখেন। 'এই আলো নেবানোর প্যাঁচটি সাহেবদের বোঝানো এক কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো'। শিশিরকুমার সজ্ঞানে মূর্ছা গেলেন।

মহলার এত গোলমালে অভিনয় স্থগিত হয়ে গেল অনির্দিষ্টকালের জন্য। পুরো দলটি নিরাশ্রয় হয়ে পড়ল। এরিকের নির্বুদ্ধিতা বা স্বার্থপরতার জন্যই এমনটি হল। নতুন জিনিসপত্র তৈরির টাকাও সে ওখান থেকে পেয়েছিল কিন্তু এ-বাবদ সংগৃহীত অর্থ সে শিশিরবাবুকে দিল না। পরিণামে তার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গেল।

নালিশ করার কথাও ভাবা হয়েছিল, কিন্তু বোঝা গেল, ওখানে থেকে নালিশ করে টাকা আদায় করতে ন্যূনপক্ষে তিন বছর সময় লাগবে। ততদিন এই পঁচিশজন কুশীলব কপর্দকশূন্য হয়ে থাকবে কীভাবে? সতু সেন খুব সাহায্য করলেন — তাঁর চেষ্টাতেই নতুন চুক্তি হয়ে অভিনয়ের ব্যবস্থা হল। অক্টোবর ১৯৩০-এ আমেরিকা পৌঁছে অবশেষে ১৯৩১-এর ১২ জানুয়ারি অভিনয় হতে পারল। দৃশ্যপটগুলো নতুন করে তৈরি হয়েছিল।

সবাই শঙ্কিতই ছিলেন, বিশেষত তাঁরা পরাধীন দেশের অপরিচিত নাট্যদল। তার ওপরে শোনা গেল স্বাধীন চীনের বহু লোক নিউইয়র্কে থাকা সত্ত্বেও সুপ্রসিদ্ধ চীনের অভিনেতা মেই-ল্যাঙ্-ফ্যাঙ্ আগের বছর ওখানে অভিনয় করে গেছেন এবং আশি হাজার ডলার লোকসান দিয়েছেন।

তবে শিশিরকুমার একা আশ্চর্য মনোবল দেখিয়েছিলেন। সহ-অভিনেতারা মঞ্চে তাঁকে দেখেই মনোবল পেতেন। যোগেশ চৌধুরী লিখেছেন, 'শিশিরবাবু যেরূপ সাহসের সহিত এই আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অপূর্ব মনুষ্যত্ব এই অগ্নিপরীক্ষায় প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।' (অধোরেখ লেখক-কৃত)

আসলে পরাধীন দেশ বলেই এতটা অবহেলা পেতে হয়েছিল। যে চীনা অভিনেতার কথা বলেছি, তাঁকে তাঁর দেশের রাজদূত সাহায্য করেছিলেন। আর, নাট্যমন্দিরের দল একেবারে নিঃসঙ্গ, বিপন্ন ও প্রবঞ্চিত।

মিস্টার মছ্ নামে একজন কোটিপতি ইহুদি এঁদের সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। বাংলা অভিনয় খানিকটা তিনি দেখলেন, শিশিরকুমারকে ইংরেজি আবৃত্তি করতে বললেন। শেকসপিয়ার

থেকে আবৃত্তি শুনে মছ্ বলেন, 'আপনারা ইংরেজিতে অভিনয় করুন।' এজন্য তিনি প্রচুর খরচ করবেন, স্টেজে হাতি ঘোড়াও নামিয়ে দেবেন। শিশিরকুমার এই প্রস্তাবকে তামাশা বলে মনে করেন এবং অর্থাগমের সম্ভাবনা সত্ত্বেও এ-প্রস্তাবে রাজি হলেন না।

এর পরে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য খুব গৌরবের সঙ্গে বলেছেন, এ-প্রস্তাবে রাজি হলে হয়তো অর্থশালী হওয়া যেত, কিন্তু ঋণী হয়ে ফিরলেও সে-দেশের সুরসিকেরা যে-মত দিয়েছিলেন — 'বিদেশি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে মস্কো আর্ট থিয়েটারের নীচেই যে আমাদের স্থান', এ গৌরব নিয়ে ফিরে আসতে পারতেন না। (অধোরেখ লেখক-কৃত)

এতক্ষণে আমরা নাট্যমন্দির দলটিকে বিপর্যয়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলাম। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য লিখেছেন যে দর্শকরা ছিল নিশ্চল ও নিঃশব্দ এবং মনোযোগী। নিউ ইয়র্কের *গ্র্যাফিক* পত্রিকায় এই বলে প্রশংসা বেরিয়েছিল যে সম্পূর্ণ অপরিচিত ভাষায় অভিনয় করেও হিন্দু নাট্য সম্প্রদায় যে তাঁদের অভিনয় বস্তুকে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন, তা বিশেষ করে লক্ষ্য করার বিষয়, এবং অনুরোধ করেছিলেন যে সেখানকার অভিনেতা অভিনেত্রীরা যেন বিশেষ করে এই কারণেই এঁদের অভিনয় দেখে যান। (অধোরেখ লেখক-কৃত)

আমেরিকায় গিয়ে যে প্রতিকূল পরিবেশে এই নাট্যদলটি পড়েছিল, তার কিঞ্চিৎ পরিচয় আমরা দিয়েছি। থাকা, খাওয়া, অভিনয়ের ব্যবস্থা, সমস্ত দিক দিয়েই এঁরা বিপদে পড়েছিলেন। পরাধীন দেশ থেকে গিয়েছিলেন তাঁরা, সম্পূর্ণ অপরিচিত, তাঁদের নাম কেউ জানে না, তাঁদের প্রযোজনার খবরও সে-দেশে পৌঁছয় না। আয়োজনে এত ত্রুটি ছিল, তা সত্ত্বেও এইখানেই এই প্রবন্ধ-শিরোনামের সম্ভাব্য আবিষ্কারটি ঘটে যায়। কারণ এই প্রবল বিরূপ প্রতিবেশেও নাট্যমন্দির দলটির প্রতি সমালোচকেরা বিমুখ হননি। বরং অভিনন্দন জানিয়েছেন। ওই দূর বিগত কালে, দূর দেশে এই নাট্যদলটি বিপর্যয়ে পড়লেও, তাঁদের আসল যে কাজ, অর্থাৎ সু-অভিনয় এবং সু-প্রযোজনা — সেটিতে ভুল করেননি। প্রশংসা নিয়েই তাঁরা ফিরেছিলেন। অবশ্য আর্থিক সুবিধে তাঁদের কিছুই হয়নি, সেদিক দিয়ে বিপাকে পড়ে নিঃস্ব হয়েই তাঁদের ফিরতে হয়েছিল।

আমরা নিউ ইয়র্কে ওই সময়ে এঁদের অভিনয় সম্পর্কে যে সব সমালোচনা বেরিয়েছিল, সেগুলির পরিচয় নিলেই দেখতে পাব ইতিহাস রক্ষা করতে না পারায় এই অভিযান এখনো আমাদের কাছে ব্রাত্য হয়েই আছে। একটি সৌভাগ্যকে আমরা দুর্ভাগ্য হিসেবে জেনে রেখেছি এতদিন। দুর্গ্রহ এঁদের জন্য যে কালো পটভূমিটি ঝুলিয়ে রেখেছিল, সেই কালিমার ওপরেই এঁদের performance-এর ঔজ্জ্বল্য ফুটে উঠেছে। জয়ের গৌরবই এঁরা সেদিন সেখানে অর্জন করে ফিরেছিলেন। যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর রোজনামচা থেকে জানা যায় —

> *তেরই, মঙ্গলবার* — গত রাত্রে বহু শঙ্কিত অপেক্ষার পর অভিনয় হইল। ভাল অভিনয় হইয়াছে। দর্শক গ্রহণ করিয়াছে। সকালে প্রায় সমস্ত সংবাদপত্রেই আমাদের কথা বাহির হইয়াছে। কোনো কাগজে নিন্দা করে নাই। ...'But even the meanest player last night can boast of an enunciation and intonation for excelling that of

most American stars'. শিশিরবাবু ও শ্রীমতী প্রভার খুব সুখ্যাতি করিয়াছে।

চৌদ্দই — আরো অনেক কাগজে ... উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছে। ওই সমস্ত সমালোচকের এদেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠা আছে।

পনেরই — দেশের ও নিজেদের সম্মান রক্ষা হইয়াছে।

.....

সতেরই — আজ এই সপ্তাহের শেষ অভিনয় ... তিনি বলিয়াছেন — These men have been mishandled indeed. They deserve better luck.

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি ভ্যান্ডারবিল্ট থিয়েটারে 'সীতা'র প্রথম অভিনয় হয়েছিল। নিউইয়র্কের বিভিন্ন সংবাদপত্রের মন্তব্য এইখানে উদ্ধৃত করি —

১. The Hindu players made a very good impression. Their acting compares favourably with the acting of any foreign troupe. I can think of, excepting of course, the Moscow Art theatre players, who to me at least, are the best actors in the world. The Hindu players are so graceful in their movements that their many gestures are never awkward. They speak their lives clearly and distinctly... And the star Mr. Bhadury who plays Rama, is an emotional actor of considerable power... There is a certain nobility inherent in this play, and this nobility even pervaded the acting. Doubtless this was because the love theme is on such a high plan. One had the feeling that love of Rama and Sita would persist all through eternity.

(The New York Sun)

২. Novelty came to the current theatrical season at the Vanderbilt theatre last night is perhaps the most ancient play that has ever been shown on Broadway... This company of Hindu actors, speaking in language so distinctly foreign to American ears, succeeded in vitalising this story to such an extent that scarcely a person left before the final curtain... There is a universal language, and art their sole medium of expression...

Sisir Kumar Bhadury is an actor of the finest rank. Last night play kept him in two contrasting moods — lyric and emotion. He seemed to excel in the latter... The supporting cast was almost equally strong, particularly the women.

(New York American)

৩. ... So superb was their pantomime, so illustrative was a shrug of their shoulders, a flash of the eye, and a lifting of the hands or arms, that one would follow the story with little trouble ... It was a treat to watch Sisir Kumar Bhadury as Rama. His voice was bell-like, his pantomime, which told the story as clearly to the audience which understood not a single word, was so perfect that the words would have been anyway unnecessary. Excellent too was Srimati Prova as Sita, the queen. All the others were interesting...

It may not harm many who take the stage as their profession to drop into Vanderbilt to see how strangers in a strange land, speaking a strange language to their patrons, can through their pantomime, interpret a story so that... the verbal picture is unnecessary. You'll enjoy Sita as something unique.

(The Evening World)

৪. The star of this company is undoubtedly an actor of great ability and his supporting company seem to take their work very seriously... there is something quite musical and pleasant about the sound of the language... Sita further arouses one's curiosity about India and at least presents a picture of what goes on in Sisir Bhadury's theatre in Calcutta.

(The Evening Graphic)

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেক অসুবিধে, ছলনা, বঞ্চনার শিকার হলেও শিশিরকুমার শেষপর্যন্ত প্রতিকূল অবস্থাকে অনুকূল করে তুলতে পেরেছিলেন। কিন্তু অর্থাভাব মেটেনি। যেসব নর্তকীকে ওখান থেকে নিয়োগ করা হয়েছিল তাদের বেতন দেওয়া যায়নি। তবে একসময়ে যে-কোম্পানি মহলার পরে আর টাকা দিতে চাননি, তাঁরাই এগিয়ে এসে ফেরার ব্যবস্থা করে দেন। সতু সেন দেনার ভার কাঁধে নিয়েছিলেন। ২৯ জানুয়ারি দলটিকে বিদায় ভোজও দেওয়া হয়। ৩ ফেব্রুয়ারি দেশে ফেরার জন্য সকলে জাহাজে ওঠেন। ৬ মার্চ করাচিতে জাহাজ পৌঁছল। ইতিমধ্যে দিল্লিতে অভিনয়ের প্রস্তাব এল — দলটি ২৪ মার্চ দিল্লি পৌঁছলেন।

১৯৫১ সালের ১০ ডিসেম্বর শিশিরকুমার তাঁর আমেরিকার অভিজ্ঞতার কথা সংক্ষেপে বলেছিলেন। এটা তাঁর 'বিবৃতি নয়, কৈফিয়ৎ'। শিশিরকুমার সেখানে বলেছিলেন, আমেরিকায় গিয়ে তিনি দেখলেন যে সেখানে যাবার দু-মাস আগে থেকে প্রচার করা হয়েছে ভারতের লোক অসভ্য, অশিক্ষিত, ... এসবের প্রতিবাদ করলেন তিনি। তখন আমন্ত্রণকারীরা দোষ স্বীকার করলেন। কোম্পানির প্রচারসচিব যিনি ছিলেন তিনি একসময়ে ভারতে ছিলেন, ভাঙা ভাঙা হিন্দি বলতেন, তিনি শিশিরকুমারকে 'তুম তুম' বলছিলেন, শিশিরকুমার তাতে আপত্তি করায় ঝগড়া হয়ে যায় এবং তাঁরা আর কোনো দায়িত্ব নিতে চাইলেন না। মামলা করার কথা

ভাবলেও ওই বিদেশে দীর্ঘকাল মামলা চালানো সম্ভব ছিল না। তখন এক ইহুদি সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। অভিনয় হল এবং কাগজে প্রশংসা বেরোল যে মস্কো আর্ট থিয়েটার ছাড়া এত ভালো অভিনয় আর কেউ করতে পারে বলে তাদের জানা ছিল না। তা সত্ত্বেও আমেরিকায় খরচের বহর খুব বেশি বলে থাকা সম্ভব হয়নি। আসার সময়ে তাঁদের খাবার কষ্ট হয়েছিল, এ-প্রচারটা কিন্তু মিথ্যা।

'আমেরিকা থেকে ফিরে দিল্লিতে বড়লাটের সঙ্গে দেখা করি।' আমেরিকার *Sun* পত্রিকার প্রশংসা পড়ার পরে দিল্লিতে ভাইসরিগাল হাউসের মঞ্চে অভিনয় হয়। বড়লাট খুশি হয়েছিলেন।

দিল্লিতে, ফেরার পথে

শিশিরকুমার দিল্লি আসার পরে সেখানে তৎকালীন ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ধীরেন্দ্রকুমার লাহিড়ি চৌধুরীর সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ হয়। তিনিই বড়োলাটের সঙ্গে সাক্ষাতের আয়োজন করে দেন। বড়লাটের নির্দেশে দিল্লির ভাইসরয় হাউসে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান হিসেবে 'সীতা'র অভিনয় হল। বড়োলাট আরউইন খুশি হয়েছিলেন, মঞ্চে শিশিরকুমারের সঙ্গে করমর্দন করলেন। তিনি শিশিরকুমারকে ইংল্যান্ড যাবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু আমেরিকার তিক্ত অভিজ্ঞতার পরে আর এ-প্রস্তাব শিশিরকুমার গ্রহণ করেননি। ২০ মার্চ এই অভিনয় হয়েছিল, পরের দিন শিশিরকুমার বড়োলাটের মিলিটারি সেক্রেটারির কাছ থেকে যে-চিঠিটি পেলেন সেটি এই —

Do. no 1882

Military Secretary
to the Viceroy

The Viceroy's House
New Delhi
The

21st March, 1931

Dear Mr. Bhadury,

I am desired by their Excellencies to tell you how much they enjoyed your performance last night. It was a consummate piece of acting and the greatest praise is due not only to you yourself who took the principal part, but also to all the rest of your cast.

The fact that we were able to follow the play although we could not understand a word of the language in itself says much for the acting. Their Excellencies were quite thrilled with it ans desire me to offer you their warm congratulations.

Yours faithfully
Sd/- Lt. Col. C.O.Harvey
M.S.V.

কলকাতায়, বিদেশি দর্শক

১৯৫১ সালে রাশিয়ান কালচারাল মিশন-এর ডেলিগেট হয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক পুডভ্‌কিন ও খ্যাতনামা মঞ্চাভিনেতা চেরকাশভ। কলকাতায় তাঁরা ১৭ জানুয়ারি শ্রীরঙ্গমে 'ষোড়শী' নাটক দেখলেন। তখন তাঁর মঞ্চের দৈন্য প্রকট হয়ে পড়েছে। শিশিরকুমারের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই, অভিনয় করতে তাঁর কোনো কুণ্ঠা নেই। ওই দু-জন বিদেশি শিল্পী শিশিরকুমারকে দেখে অভিভূত হলেন। সাজঘরে গিয়ে দেখা করলেন তাঁরা শিশিরকুমারের সঙ্গে। পুডভ্‌কিন বললেন —

> You are a great artiste. Do you know why you are great? The moment you come on the stage you capture the attention of the audience... Then they relax somewhat... As the play proceeds however, your every gesture and intonation strike at them. ...They become completely fascinated as it were and then, like some master magician, you can present them with any character you choose to depict and they will accept it as completely authentic.

চেরকাশভ বললেন —

> You are a great actor. Your acting is just in the line of our acting that is realism. You captivated us when speaking. You are as great an actor as Stanislavsky of Moscow Art Theatre. We found in your acting, the character in person before us. Your acting is great and details are marvellous. We are charmed with your acting. You are a Master.

চেরকাশভ মঞ্চের অবস্থা দেখে আশ্চর্য হলেন, এবং এই অবস্থার মধ্যে শিশিরকুমার অভিনয় করছেন কী করে তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল তাঁর। শিশিরকুমার তাঁকে বললেন, এদেশের জনতা তাঁকে ভালোবাসে, তাই তিনি থিয়েটার করতে পারছেন। এই দেশের দারিদ্র্য তাঁর থিয়েটারেও সঞ্চারিত হয়েছে। রাশিয়ায় রাষ্ট্র মঞ্চকে সাহায্য করে, এখানে সেরকমটি হয় না।

১৯৫১ সালের শেষের দিকে পুলিট্‌জার পুরস্কার বিজয়ী আমেরিকান নাট্যকার পল এলিয়ট গ্রিন কলকাতায় এসে শিশিরকুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অভিনয়, নাটক, মঞ্চ ইত্যাদি বহু বিষয় নিয়ে তিনি শিশিরকুমারের সঙ্গে আলোচনা করেন। শিশিরকুমারের পাণ্ডিত্যে ও প্রখর ব্যক্তিত্বে গ্রিন অভিভূত হন। ১২ ডিসেম্বর ১৯৫১ তারিখের *American Reporter* কাগজে এই বিষয়ে যে-খবরটি বেরিয়েছিল সেটি এইরকম — Mr. Greene said after the meeting that he was highly impressed by the 'inspiring personality' of Mr. Sisir Kumar Bhadury and thought 'he symbolises the hope of future India'.

আর একটি ঘটনা। আমেরিকা থেকে এক বিদুষী মহিলা ভারতবর্ষে এসেছিলেন, যে-বছরে শিশিরকুমার দল নিয়ে আমেরিকা যাচ্ছেন। মহিলার খুব ইচ্ছে তিনি শিশিরকুমারের সঙ্গে

আলাপ করবেন, যিনি আমেরিকায় যাওয়ার সাহস করেছেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত শিশিরকুমারকে সেকথা বলায় তিনি সানন্দে রাজি হলেন মহিলার সঙ্গে দেখা করতে।

নির্ধারিত দিনে অচিন্ত্যকুমার মহিলাকে নিয়ে গেলেন শিশিরকুমারের বাসস্থানে। মহিলাকে বারান্দায় দাঁড় করিয়ে রেখে অচিন্ত্যকুমার ভেতরে গেলেন খোঁজ করতে। কিন্তু ভেতরে গিয়ে দেখলেন বোধহয় কোনো মহলা চলছে। নানা বাদ্যযন্ত্র ছড়ানো, অনেকরকম লোকজনও রয়েছেন। ওদিকে শিশিরবাবু অসুস্থ, পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছেন।

অচিন্ত্যকুমার বিপন্ন বোধ করলেন, বললেন সব কথা অভিনেত্রী কঙ্কাবতীকে। তিনি আশ্বাস দিলেন, ব্যবস্থাও করলেন। ঘরের ফরাসটা তুলে দিলেন, যন্ত্রটন্ত্র আর লোকজনদের সরিয়ে দিলেন। গোটাকতক চেয়ারও এসে গেল। বিদেশিনীকে নিয়ে এসে বসালেন অচিন্ত্যকুমার। তবু একটু ভয় ভয় করছে, কী জানি কেমন দেখবেন মহিলা শিশিরকুমারকে।

গায়ে ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে শিশিরকুমার প্রবেশ করলেন। অনিদ্রাক্লান্ত মুখেও সৌন্দর্য-স্নিগ্ধ সৌজন্য। কথা শুরু হল। অজস্র কথা, অমূল্য বিকিরণ। আমেরিকান সাহিত্যের অনুপুঙ্খ, জীবন ও জীবনাদর্শ। থেকে থেকে প্রাসঙ্গিক আবৃত্তি। মহিলা অভিভূত হলেন।

অচিন্ত্যকুমার লিখলেন —

> চলে আসবার পর জিগগেস করলাম, 'কেমন দেখলে?'
> 'চমৎকার। মহৎ প্রতিভাবান — নিঃসন্দেহে।'

শিশিরকুমারের শ্রীরঙ্গম আর চলছিল না। বাড়িভাড়া বাকি পড়ায় তাঁকে মঞ্চ ছেড়ে দিতে হল ১৯৫৬ সালের ২৮ জানুয়ারি। এর পরে চুপ করে বসে থাকা তাঁর পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল। ওরই মধ্যে কিছু উৎসাহী তরুণকে নিয়ে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমার কয়েক রাত্রি অভিনয় করলেন 'জীবনরঙ্গ'।

এক মার্কিন মহিলা তাঁর এই অভিনয় দেখতে এসেছিলেন। অভিনয় শেষে তিনি শিশিরকুমারকে বললেন, My dear Bhadury, you are one of the greatest actors of the world. শিশিরকুমার ধন্যবাদ দিলেন মহিলাকে, জানতে চাইলেন তাঁর নাম। নামটা শুনে শিশিরকুমার বললেন 'তবে আপনি নিশ্চয় আমেরিকার *Theatre Art* পত্রিকার সম্পাদিকা?' ভদ্রমহিলা তো অবাক। শিশিরকুমার যে সেই দূর মার্কিন মুলুকের মঞ্চ-পত্রিকার খবর রাখেন, এতটা তিনি ভাবতে পারেননি। সম্পাদিকা রোজামন্ড গিলডার বললেন, 'আমার বয়স চৌষট্টি, এর মধ্যে এমন অভিনয় আমি খুব কমই দেখেছি।' ফিরে গিয়ে তিনি তাঁর পত্রিকা নিয়মিতভাবে শিশিরকুমারকে পাঠাতে লাগলেন।

১৯৫৪ সালে বিখ্যাত শিল্পী-দম্পতি স্যর লুই ক্যাশন ও ডেম সিবিল থর্নডাইক কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁরা শ্রীরঙ্গমে শিশিরকুমারের 'মাইকেল' দেখলেন। অভিনয়ের পরে শিল্পী-দম্পতি মঞ্চে উঠে শিশিরকুমারকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন যে, Irish Abbey Theatre ছাড়া আর কোথাও তাঁরা এমন free acting দেখেননি।

লক্ষ করতে হবে যে, এইসব বিশিষ্ট বিদেশি দর্শক যখন তাঁর অভিনয় দেখছেন, তখন

শিশিরকুমারের মঞ্চের সে-জৌলুস আর নেই। তবুও, কিংবা হয়তো সেইজন্যই, অভিনয়ের মহিমা তাঁদের কাছে আরো বেশি প্রতিভাত হতে পেরেছিল।

বিদেশে এবং স্বদেশে, বিদেশি দর্শকদের কাছে শিশিরকুমার যে স্বীকৃতি এবং খ্যাতি পেয়েছিলেন, সেগুলি থেকে আমরা যদি এমন অনুমান করি যে শিশিরকুমারই একমাত্র বাঙালি মঞ্চাভিনেতা ও প্রযোজক, যিনি আন্তর্জাতিক আসনে বসতে পারেন, তবে কী সেই অনুমানই প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায় না? দুঃখের কথা এই যে, বিদেশে তাঁর প্রযোজনার কোনো ছবি বা সেখানকার দর্শক ইত্যাদির কোনো ছবি আমরা দেখতে পাইনি। শুধু এ-বিষয়ে কিছু সংবাদপত্রের কর্তিকা, দুটি স্মৃতিচারণ আমাদের হাতে রয়েছে। এমনকী, কলকাতায় তাঁর অভিনয় যেসব বিশিষ্ট বিদেশিরা দেখেছেন, শিশিরকুমারের সঙ্গে তাঁদের আলোচনার কোনো ছবি সম্ভবত নেই। এগুলির আর্কাইভ্যাল মূল্য আছে, আমাদের অন্যমনস্কতার জন্য ইতিহাসের এইসব সম্পদ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। অবশ্য এঁদের মূল্যবান মন্তব্য, সৌভাগ্যক্রমে থেকে গেছে। তা থেকেই বিষয়টি আমরা গড়ে নিতে পারি। সেই চেষ্টাই আমরা করলাম। হয়তো কোনো উৎসাহী আরো কিছু অনুসন্ধান এবং আবিষ্কার করতে পারবেন।

শিশিরকুমার নিজেও এসব ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। সম্ভবত তাঁর একটা নির্বেদ এসে গিয়েছিল। এইসব প্রশংসার কথা শুনে তিনি বলেছেন, These pattings mean nothing to me. I am what I am. যে নাট্যসাধনায় তিনি বাংলা মঞ্চকে গৌরব দিয়েছিলেন, সম্মান দিয়েছিলেন, তার পরিণতিতে তিনি ক্রমশ নিজেকে নির্বাসিত হয়ে যেতে দেখেছেন। তাঁর জাতীয় নাট্যশালার জন্য আকাঙ্ক্ষা ছিল, যেখানে অর্থের জোগান নিয়ে তাঁকে ভাবতে হবে না, নাটকটা ভালো করার জন্যই শুধু সময় ও শ্রম দেবেন — এমনটা হতে পারেনি। দেশ, রাষ্ট্র, কেউই তাঁকে এটুকু করে দেয়নি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কথা দিয়েছিলেন যে এই আয়োজন তিনি করে দেবেন, কিন্তু অকস্মাৎ তাঁর জীবনাবসান হয়ে যাওয়ায় সে কল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি।

কিছু কিছু স্মরণযোগ্য প্রতিক্রিয়া

শিশিরকুমারের প্রযোজনা, পরিচালনা, অভিনয় ইত্যাদি বিষয়ে বহু গুণিজন বিভিন্ন সময়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁদের মতামত জানিয়েছিলেন। বাংলা নাটকের সে বড়ো সুখের সময়। সেই মতামতগুলির কয়েকটি মাত্র আমরা এখানে সাজিয়ে দিচ্ছি।

সেদিনের সেই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করতে পারবে বলেই মনে হয়। মতামতগুলি এইরকম —

> শিশির ভাদুড়ীর প্রয়োগনৈপুণ্য সম্বন্ধে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে...
> *রবীন্দ্রনাথ*

> বাস্তবিক কী চমৎকার অভিনয় করে শিশির। আরো চমৎকার তার শেখানোর পদ্ধতি।
> *শরৎচন্দ্র*

বাংলাদেশে একবার ঝড় আসে... আজকের বাংলায় তার চিহ্ন নেই। সে ঝড়ের প্রথম সওয়ারি ... মাইকেল... শেষ সওয়ারি... শিশিরকুমার।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

কোন শিশিরকুমার বড়, প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চের বিশেষ ভূমিকায় অভিনেতা শিশিরকুমার, না অপ্রকাশ্য মহলায় একাধারে বহু ভূমিকায় নাট্য-শিক্ষক শিশিরকুমার?

হেমেন্দ্রকুমার রায়

যেমন তিনি অভিনয়ে অনন্য, তেমনি তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতা অভিনেতা সৃষ্টি করে নেবার।

বুদ্ধদেব বসু

সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন রবীন্দ্রনাথ, অভিনয়ের ক্ষেত্রে তেমন শিশিরকুমার, একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে।

বিজন ভট্টাচার্য

তাঁর নাট্যপ্রযোজনায়, তাঁর অভিনয়ে, তাঁর বাচনভঙ্গিতে, তাঁর উচ্চারণে আমরা প্রথম বুদ্ধির দীপ্তি স্পষ্টত অনুভব করলাম।

শম্ভু মিত্র

শিশিরবাবুর অভিনয় সাবলাইম — নিরুত্তাপ নিরুদ্বিগ্ন অভিনয় করছেন, আবার নিজের ওপর নজরও রাখছেন — Greatest master of Technique — বাংলা আবৃত্তি অত ভালো আজ পর্যন্ত কেউ পারবেন না। স, শ, ষ—এই তিনটের পার্থক্য কী সহজে ফুটিয়ে তুলতেন।

উৎপল দত্ত

You are a great actor... you captivated us... great as Stanislavsky... We are charmed.

চেরকাশভ

আজকে যাঁরা নাটক করতে চান, শিশিরকুমারকে জানা তাঁদের একান্ত প্রয়োজন।

দেবনারায়ণ গুপ্ত

শেষজীবন

শিশিরকুমার তাঁর জীবনের শেষ দশকে বিপাকে পড়েছিলেন। একটার পর একটা নাটক তৈরি করছেন, তাতে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করছেন। বাণিজ্যিক মঞ্চে নাট্যপ্রয়োগে তাঁর মতো এক্সপেরিমেন্ট কেউ করেননি। কিন্তু তখন দেশের আবহাওয়া কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং জীবনযাপনে আদর্শের আবেগ লুপ্তি — শিশিরকুমারের মঞ্চে দর্শকের অভাব ঘটাতে লাগল। 'বিশাল পাবলিকের সামনে খাঁটি মুভমেন্ট শিশির ভাদুড়ী ছাড়া কেউ সাহসই পাবেন না। শম্ভু মিত্রও পারেননি, উৎপল দত্তও নন। ... শিশির ভাদুড়ীর কিন্তু এই সাহস ছিল অসামান্য।'

শিশিরকুমারের বেশ কিছুকাল পরের অভিনেতা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এমনটাই বলেছিলেন। বোঝাই যাচ্ছে, যখন scope তৈরি হয়েছে তখনো কেউ সেভাবে এক্সপেরিমেন্ট করার ঝুঁকি নিতে পারেননি। শিশিরকুমারের বেলায় তা আরো কঠিন ছিল, তবু উনি তা করে

চলেছিলেন। তাঁর যতটা গ্রেটনেস তা ওখানেই। একসময়ে দর্শক তাতে মুগ্ধ হত। কিন্তু ক্রমশ বদলে গেল পটভূমি। রাজনীতি, দাঙ্গা, লোভ, অশিক্ষা সমস্ত কিছুর সর্বনাশ ঘটাল। শিশিরকুমার সেজন্য আপস করেননি। অন্য থিয়েটারগুলি যেখানে সস্তা বিনোদনের নাটক চালাচ্ছে হাউসফুল মঞ্চে — সেখানে তাঁর থিয়েটার দর্শক টানছে না।

সমঝদার যাঁরা তাঁরা তাঁকে সহায়তা দিতে চেয়েছিলেন। শম্ভু মিত্র একসময়ে বেশ কিছুকাল শিশিরকুমারের দলে ছিলেন। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য তো শিশিরকুমারের দলে অভিনয় করেই মহর্ষি আখ্যা পেয়ে যান। এঁরা তখন 'বহুরূপী' নাট্যগোষ্ঠী গড়েছেন। মহর্ষি ছিলেন তাঁর সঙ্গে বহুরূপীর যোগসূত্রস্বরূপ। শিশিরকুমার মহর্ষির কাছে স্বীকার করেছিলেন যে শম্ভুকে ছেড়ে দিয়ে তিনি ভুল করেছিলেন। কিন্তু 'ও তো আর এলই না।' আবার উৎসাহও দিয়েছেন, 'আমি হেরে গিয়েছি, শম্ভুকে বলবেন ও যেন কখনও কম্প্রোমাইজ না করে।' আমরা জানি শম্ভু মিত্রকেও হারতে হয়েছে, তাঁরও শেষ জীবন অভিনয় না করেই কেটেছে।

শ্রীরঙ্গমের যখন দুরবস্থা তখন শিশিরকুমার একদিন সক্ষোভে বলেছিলেন, 'শম্ভু তো আর আমার কাছে অভিনয় করবে না।' এই কথা শুনে বহুরূপী থেকে শিশিরকুমারকে কয়েকটি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, যা শেষপর্যন্ত আর বাস্তবায়িত হয়নি। সেই প্রস্তাব গৃহীত হলে হয়তো আর একরকম সম্ভাবনা উন্মুক্ত হয়ে যেত। প্রস্তাবগুলি ছিল এইরকম —

১. যদি 'বিসর্জন' করেন তবে রঘুপতি হবেন শিশিরকুমার, মহর্ষি গোবিন্দমাণিক্য আর শম্ভু মিত্র জয়সিংহ।

অথবা,

২. শ্রীরঙ্গমের অর্ধেক ভাড়া দেবে বহুরূপী, রবিবারগুলো পাবেন শিশিরকুমার, সপ্তাহের অন্য বা ছুটির দিনগুলো ভাগ করে নেওয়া যাবে।

প্রস্তাবগুলো ভালোই ছিল, এখনো সেইরকমই মনে হয়। কিন্তু শিশিরকুমারের ভাই হৃষি ভাদুড়ীর আপত্তিতে কোনোটাই বাস্তব হতে পারেনি। সম্ভবত তিনি তাঁর অধিকার খর্ব হবার ভয় পেয়েছিলেন। একটি পেশাদার-অপেশাদার দলের যুগ্ম প্রকল্প সম্ভাবনার ইতি ঘটে গিয়েছিল ইতিহাসের অগোচরে।

শ্রীরঙ্গম ছেড়ে চলে যাবার পরেও নরেশ মিত্রের মাধ্যমে তাঁকে বিশ্বরূপায় আহ্বান করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি আসেননি। নরেশ মিত্র বলেছিলেন, 'তুই আয়, তোকে ওরা যথাযোগ্য সম্মান দিয়েই রাখবে।' কিন্তু তিনি সম্মত হননি। বলেছিলেন, 'শ্রীরঙ্গম আমার দেওয়া নাম। এই নাম আমি কাউকে দেব না এবং অন্য কোথাও, অন্য কারও কাছে গিয়ে আমি দাসত্ব করতে পারব না।' টেলিফোনের অপর প্রান্তে এই ঘটনার সাক্ষী ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। ফোনে কথোপকথন হয়েছিল তাপস সেনের সামনে। (*আলোছায়ার পথিক* : তাপস সেন)

এই আত্মসম্মানবোধ চিরকাল জাগ্রত ছিল শিশিরকুমারের মনে। এই জন্যই প্রথম জীবনে তিনি ম্যাডান কোম্পানি ছেড়েছিলেন। শেষজীবনে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির ডিন হবার

জন্য বিধানচন্দ্র রায়ের আহ্বান ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, কারণ তিনি বুঝেছিলেন এখানে তাঁর স্বাধীনতা থাকবে না। সরকারি আমলাদের নির্দেশে তাঁকে চলতে হবে। অথচ এ-কাজ নিলে তাঁর নিশ্চিন্ত নিরাপদ অর্থাগম নিশ্চিত হত।

দিল্লির সঙ্গীত নাটক আকাদেমির ফেলোশিপও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ও-সব তাঁর দরকার ছিল না। তাঁকে নিয়ে তথ্যচিত্র নির্মাণের প্রস্তাবও তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

সঙ্গীত নাটক আকাদেমির প্রস্তাব নিয়ে তৎকালীন সম্পাদক শিশিরকুমারের কাছে এসে সভাপতির চিঠি তাঁকে দিয়েছিলেন। শিশিরকুমার চিঠিটি উলটেপালটে দেখে বললেন, 'ইনি কে? অভিনেতা, না সঙ্গীতজ্ঞ, না নৃত্যবিদ?'

'উনি হাইকোর্টের বিচারপতি।'

'উনি অভিনয়ের মান বুঝলেন কী দিয়ে? জীবনে কতক্ষণই বা তিনি এইসব রসোপলব্ধির জন্য ব্যয় করেছেন?'

সম্পাদক ফিরে গেলেন। শিশিরকুমার তাঁকে বলেছিলেন, ব্যক্তিগত সম্মান দিয়ে নাটকের উন্নতি হয় না। নাটকের জন্য কিছু করতে হয়।

শ্রীরঙ্গম উঠে যাবার পরে যখন শিশিরকুমারের অর্থসঙ্কট চলছে তখন তৎকালীন নিউ থিয়েটার্স-এর হিন্দি চলচ্চিত্রের একজন বিখ্যাত অভিনেতা (সম্ভবত পৃথ্বীরাজ কাপুর?) তাঁর বিখ্যাত পুত্রকে নিয়ে কলকাতায় অভিনয় করতে এসেছিলেন। তাঁর মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি শিশিরকুমারের জন্য অর্থসাহায্য চাইলেন দর্শকদের কাছে। টাকা উঠল অনেক।

সে-টাকা যখন তিনি শিশিরকুমারকে দিতে গেলেন তখন ক্রুদ্ধ শিশিরকুমার জানালেন ভিক্ষা নেবার মতো অবস্থা তাঁর তখনো হয়নি। টাকা নিলেন না তিনি।

১৯৫৯ সালে ২৬ জানুয়ারি সকালে কাগজ খুলে শিশিরকুমার দেখলেন সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি দিচ্ছেন। সরকার তাঁর অনুমতিও নেয়নি এ-বিষয়ে। ২ ফেব্রুয়ারি শিশিরকুমার প্রস্তাবিত শিরোপা প্রত্যাখ্যান করে চিঠি দিলেন, তাতে লিখলেন —

> ...By its acceptance I shall mislead the lovers of theatre into believing that the government are aware of the importance of drama in the life of the nation...

শিল্পীর অভিমানই বটে, উপযুক্ত তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে অভিষিক্ত। সম্পূর্ণ চিঠিটি একটি ঐতিহাসিক দলিল হতে পারে।

এই অসাধারণ প্রাণশক্তি ছিল বলেই শিশিরকুমার জীবনের সঙ্কটকালেও এভাবে সম্মানের চাপরাশ প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছিলেন। এরকমটি এখনো আর কেউ পারেননি। শম্ভু মিত্র বলেছেন সেকথা —

> ...এইরকম একটা বন্যার মত দুর্দমনীয় শক্তি ছিল বলেই শেষদিন পর্যন্ত তিনি জীবনের মাথায় পা দিয়ে বেঁচে গেলেন। এবং যেদিন যাবার সময় এলো সেদিন তুড়ি দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

কিংবদন্তির পরিহাস

শম্ভু মিত্র একবার কোথাও বলেছিলেন যে কিছুদিন পরে তো আমরা কিংবদন্তি হয়ে যাব। তা-ই হয়েছিলেন তিনি, দীর্ঘকাল অভিনয় করতে পাননি, অথচ নানা ভাবে, নানা সময়ে, নানা উপলক্ষে তাঁর নাম নেওয়া হয়েছে। দেখেছি যে, তিনি কে, এই কথাটা বুঝতে বর্তমান প্রজন্মের অনেকে দ্বিধায় পড়েছে। কারণ তখন শম্ভু মিত্র অভিনয় করছেন না।

ওদিকে, শিশিরকুমার তখনো অভিনয় করছেন, যদিও তাঁর মঞ্চে দর্শক হচ্ছে না। এ-বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য স্মৃতিচারণ করেছেন পরিমল গোস্বামী। ১৯৫৫ সালের ২ এপ্রিল তাঁর কাছে দুটি সদ্য এম. এ. পাশ তরুণী এসেছিলেন, তাদের নিজস্ব প্রয়োজনে। ওই সময়ে শিশিরকুমারও তাঁর কাছে এলেন খানিকটা পরে। নানা বিষয়ে আলাপ করতে লাগলেন। মেয়ে দুটি চুপ করে বসে আছে, উসখুসও করছে। পরিমলবাবু হঠাৎ তাদের বললেন, 'তোমরা এঁকে চেন?' মেয়ে দুটি অসহায়ভাবে বলল — 'না তো।'

'এঁর নাম শিশিরকুমার ভাদুড়ী।'

দু-জনেই তৎক্ষণাৎ তাঁকে প্রণাম করল।

এইভাবে তাঁর সময়েই শিশিরকুমার কিংবদন্তি হয়ে গিয়েছিলেন। মেয়ে দুটি হয়তো তাঁর অভিনয় দেখেনি, দেখলেও নাটকের চরিত্রটাই দেখেছে, সামনাসামনি তাঁকে কল্পনা করতে পারেনি। পরে অবশ্য জানা গেল যে ওরা তাঁর অভিনয়ই দেখেনি। ওদের মনেও হয়নি শিশিরকুমারের অভিনয় দেখা উচিত। অথচ ওরা জানে শিশিরকুমার প্রণম্য ব্যক্তি।

এই হল নতুন যুগের দুর্ভাগ্য, নতুন যুগের রুচি। কিন্তু তারা লজ্জিত হয়েছিল বটে। বেঁচে থাকতেই কিংবদন্তি হয়ে যাওয়াটা তাই একটি পরিহাস শিশিরকুমারের জীবনে। অর্থাৎ রুচিবদল ঘটেছে। এ-বিষয়ে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন —

> ... বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে শিশিরকুমারের বিপুল দানের অনেকখানিই যে অনায়ত্ত রয়ে গেছে তার কারণ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাবোধের অভাব। ... তরুণদের মধ্যে শতকরা কতজন শিশিরকুমারের অভিনয় দেখেছেন... (তাঁর) থিয়েটার দেখাটা যে জীবনের কর্তব্য — বর্ণপরিচয় হলে যেমন রবীন্দ্রনাথ পড়াটা কর্তব্য — এ-কথা স্কুলে কলেজে পড়া বহু বাঙালির সম্ভবত বোধেরই বাইরে। ...অন্য দেশে যেমন নিয়মিত আলোচনার দ্বারা অভিনয়কীর্তি সংরক্ষিত হয় শিশিরকুমারের ক্ষেত্রে তা হয়নি। ...এ-ছাড়া যুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশবিভাগের ফলে... দর্শকদের জীবন... বিপর্যস্ত হয়ে উঠল...

ন্যাশনাল থিয়েটার

জাতীয় নাট্যশালা শিশিরকুমার চেয়েছিলেন। তার মূল কথাটি তিনি যা বলেছিলেন, ...while the main object of a commercial theatre is to make money, whether it produces good play or not, the National Theatre should produce only good plays, whether every such play fetches money or not.

এ-বিষয়ে তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন, তা লিখিত আকারে আছে — এই থিয়েটারের পাঠাগারে রাখার জন্য কয়েকটি বইয়ের নামও করেছিলেন তিনি। সেগুলি এইরকম —

B.Shaw — *Dramatic opinion and Essays*
P.P.Home — *Criticism*
Ashby Dukes — *Youngest Drama*
Grannille Barker —*The Exemplary Theatre*
William Archer — *The Old Drama and New*
St.John Irvine — *The Organised Theatre*
R.Balmforth — *The Ethical and Religious Values of Drama*
John Drinkwater — *The Gentle Art of Theatre going*
Malcolm Morley — *The Theatre*
E.A.G. Strong — *Common sense about drama*
Norman Marshall — *Other Theatre*
Eric Bently — *Modern Theatre*
J.C.Trewin — *The English Theatre*
W.A.Darlington — *The Actor and his Audience*

এই ন্যাশনাল থিয়েটার যদি হতে পারত, তা হলে শিশিরকুমারের মতো প্রযোজক, অভিনেতা ইন্টারন্যাশনাল অবকাশ আরো পেতে পারতেন, এই দীর্ঘ আলোচনার পরে, সে-বিষয়ে বোধহয় অনেকেই অনুরূপ ধারণা করতে পারবেন। সে-সুযোগ তাঁর দেশ তাঁকে দেয়নি। 'পদ্মভূষণ' প্রত্যাখ্যানের চিঠিতেও তিনি সে-কথা বলেছিলেন — ... a more befitting tribute would have been the gift of a public stage... এ-ছাড়া তিনি বাংলা নাটকের থিয়েটার এডিশন চেয়েছিলেন, পাননি।

দেহপট

বারে বারেই শিশিরকুমার মঞ্চ হারিয়েছেন জীবনে। তবে আবার নতুন গড়েও নিয়েছেন। তাঁর নিজস্ব ত্রুটি নিশ্চয় ছিল। তিনি বেহিসাবি ছিলেন, মদ্যপান তাঁকে অস্থির করে রাখত, যদিও শেষজীবনে তা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছিলেন। আসলে যুদ্ধোত্তর জীবনযাপন, দেশভাগের পরিণাম, সর্বোপরি মানুষের উদাসীনতা শেষ দশকে আর তাঁকে দাঁড়াতে দেয়নি। তিনি নিজেই বলেছিলেন, 'যে দিন মারা যাব দেখবে এই রাস্তায় কী ভিড়। ... যিনি থিয়েটারের কিছুই বোঝেন না ... তিনি এসে বক্তৃতা দিয়ে প্রমাণ করবেন, শিশিরকুমার একজন অভিনেতা ছিলেন।' বলেছেন, 'টিকিট বিক্রির ওপর নজর রেখে নাটক নামাতে চাই না।' তবুও দীর্ঘকাল তাঁর নাটকে অভাবিত টিকিট বিক্রি হয়েছে, তিনি তা রাখতে পারেননি। সমাজের বিদগ্ধ মানুষ তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে, উন্মুখ জনতা তাঁর থিয়েটার দেখার জন্য উন্মাদ হয়ে গিয়েছে — তবু শেষরক্ষা হয়নি। তাঁর অভিনয় ছিল cerebral, মস্তিষ্কপ্রসূত, হয়ত বাংলা নাটকের দর্শকের বোধবুদ্ধির সীমানার বাইরে।

শিশিরকুমারকে নিয়ে কোনো আর্কাইভ গড়া হয়নি। শুধু রাস্তা আর মঞ্চের নামকরণেই আমরা কর্তব্য সাধন করেছি। সমকালীন তথ্য, আলোচনা, ছবি, পত্রিকার কর্তিকা — এসব

দিয়ে তাঁর কীর্তিশালা পুনর্নির্মিত হতে পারে। উত্তর-প্রজন্ম জানতে পারবে তাঁর যুগকে তিনি কী মহিমা দিয়ে গেছেন। তাঁর রচনা খুব অল্পই আছে, তবু সেটুকুও কাজে লাগতে পারে।

শিশিরকুমার চলে গেছেন বহুকাল। 'নটরাজের কাছে ফিরে গেছেন রাজনট।' তিনি শুধু শিল্পী ছিলেন না, জীবনশিল্পী ছিলেন। নীলকণ্ঠ (দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল-এর ছদ্মনাম) লিখেছেন, ক্ষীর ত্যাগ করে নীর নিয়েই যাঁর সৃষ্টির উল্লাস, তিনিই হলেন আর্টিস্ট। 'মঞ্চে তাঁর মহাপ্রবেশের মুহূর্ত থেকে মহাপ্রস্থানের মোমেন্ট পর্যন্ত' তিনি মন জুগিয়ে চলার অসন্তোষের কণ্টকে বিদ্ধ হয়েছেন। কর্তৃপক্ষের মন জোগাননি বলে তিনি কষ্ট পেয়েছেন, কিন্তু বিধাতার মন ভুলিয়েছেন বলেই তিনি ইতিহাসে রয়ে গেলেন। 'কষ্ট আর কদিন, যে কদিন বাঁচব এই তো', এই বলে মরণোত্তর ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন শিশিরকুমার। তবু এও ঠিক, আমাদের দেশের সামনে এখনো পর্যন্ত যে পরম সুযোগ এসেছিল, তাকে চরম অবহেলায় নষ্ট হতে দিয়েছি আমরা। গ্যারিকের অভিনয় এখন কেউ দেখতে পাবে না, পাবে না স্ট্যানিসলাভস্কিকেও, শিশিরকুমারের ভাগ্যও তাই। প্রথম দু-জনের ক্ষেত্রে না হয় সুযোগ ছিল না কিন্তু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও (সীমিত হলেও) শিশিরকুমারের অভিনয়রীতির কোনো সংরক্ষণ আমরা করিনি। তিনিও তাই মেনে নিয়েছিলেন। নিজে কয়েকটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করলেও, তাতে তিনি স্বস্তি পাননি। সত্যজিৎ রায় তাঁর জীবনসায়াহ্নে যখন তাঁকে চলচ্চিত্রে নামার জন্য আহ্বান করেন, আরেকবার জ্বলে ওঠার এই হাতছানিতে তিনি ভোলেননি। বলেছিলেন, 'ছবিতে তো তুমিই সব করবে, তবে আমাকে আর তোমার প্রয়োজন হচ্ছে কেন?' ঠিক এই কথাই কয়েক বছর পরে সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক' ছবির সংলাপে শোনা গেল। সিনেমার জন্য যে পা বাড়িয়েছে, তাকে তার মঞ্চগুরু বললেন — সিনেমায় তুই পরিচালকের হাতের পুতুল, তোর নিজের কিচ্ছু করার নেই। (মূল সংলাপ নয়)

মনে হল শিশিরকুমার-সত্যজিৎ রায় সংলাপের প্রতিধ্বনি শুনছি। শিশিরকুমার যেন সিনেমার অমরতাকে তুচ্ছ করছেন।

'দেহপট সঙ্গে নট সকলি হারায়' — মঞ্চের ওপরে তার struts and frets শেষ হয় — He is heard no more.

তবু ইতিহাস তো থাকে। যদি তা আমরা রাখতে চাই।

সহায়ক সূত্র :

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার — শঙ্করলাল ভট্টাচার্য
বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার — হেমেন্দ্রকুমার রায়
শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার — মণি বাগচি
সন্মার্গ সপর্যা — শম্ভু মিত্র
আমেরিকায় শিশিরকুমার — যোগেশচন্দ্র চৌধুরী

আমেরিকার ডায়েরি — মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (বহুরূপী ৪৭)
কল্লোল যুগ — অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
শিশির সান্নিধ্যে — দেবকুমার বসু
Bengali Theatre — Kironmoy Raha
Satyajit Roy : Inner Eye — Andrew Robinson
শিশিরকুমার ভাদুড়ী — বুদ্ধদেব বসু (বহুরূপী ৭২)
শিশিরকুমার স্মৃতি — পরিমল গোস্বামী (বহুরূপী ৭২)
যবনিকাপতন — নীলকণ্ঠ (নির্বাচিত নীলকণ্ঠ)
আলোছায়ার পথিক — তাপস সেন (চতুরঙ্গ ৬০ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০৭)
চারণিক (শিশিরকুমার সংখ্যা) ১৯৯০
বহুরূপী ৪৫-৪৭
বহুরূপী ৭২
অন্যমনে — তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ১৩৭৮
বহুরূপী — স্বপন মজুমদার (১৯৪৮-৮৮)

নির্যাতিত হনিমুন

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক দূরে, দু-জনে একদম একা হয়ে যাব এমন একটা রোমান্টিক ভাবনা বহুকাল ধরে বারবার বায়নাক্কার মতো বলছিল শ্রাবণী। 'আমাদের হনিমুন পর্যন্ত হয়নি, তিন বছর কেটে গেল!' শুনে শুভব্রত 'যাব, যাচ্ছি' বলে কালহরণ করছিল কেন না কোথায় যাবে, কী অলৌকিক প্রক্রিয়ায় সেই আলাদিনের প্রদীপ হাতে তুলে আনা যায় তা ভেবে তল পাচ্ছিল না। অথচ কলকাতার এই বিতিকিচ্ছিরি, হ্যাকনিড ভিড় থেকে পালিয়ে বাঁচা, তা দু-চারদিনের হলেও তো মন্দ নয়। তারও তো ইচ্ছে করে একটু নিরিবিলি হতে! কলকাতার ছোট্ট ফ্ল্যাটটির কলকোলাহল এখন তাদের কর্ণকুহরে প্রায় জেনারেটারের শব্দের মতোই চরম বিরক্তিকর।

বোধহয় মাস ছয়েকের প্রাণান্ত চেষ্টায় মেদিনীপুর জেলার এই প্রত্যন্ত এলাকায় ফরেস্টের ডাকবাংলোটি সংরক্ষণ করতে পেরেছে শুভব্রত। তখনো ঠিক অনুমান করতে পারেনি বাংলোটা কীরকম। শ্রাবণী একটু খুঁতখুঁতে। তার রুচির সঙ্গে খাপ না খেলে হয়তো তক্ষুনি বলবে, 'ধুর, এখানে মানুষে থাকতে পারে নাকি! চলো, চলো। ফিরে যাই কলকাতায়।' এরকম হলে তো শুভব্রতর দফারফা। কিন্তু এবার এই বাংলোটির খোঁজ পেতে, ফরেস্টের অফিসে গিয়ে বারবার করে শুনে এসেছে, 'একবার গিয়ে দেখুন না। তিন দিন থাকলে মনে হবে ছ-দিন থাকি। তারপর মনে হবে সারাজীবন থাকি। বাংলোর ভিতরে রং করে নতুন করে সাজানো হয়েছে বাংলোটা। প্রায় থ্রি স্টার হোটেলের মতো আদব কায়দা।' তো সেই আশ্বাসে ভর করে তাদের দু-জনের একা হতে আসা এই নিরালা নির্জনে।

ঘণ্টা তিনেকের ট্রেন-জার্নি, তারপর আরো দেড় ঘণ্টার বাস-জার্নি হজম করে যখন তাদের গন্তব্যে পৌঁছোল তখনই শ্রাবণীর মুখ ভার। একা হতে চাওয়ার ধকল যে কম নয় তা তার মুখ দেখে অনুমান করছিল শুভব্রত। শ্রাবণীর এক বান্ধবীর স্বামী টানা ড্রাইভ করে বউকে নিয়ে পৌঁছেছিল কোন একটা দূর বাংলোয় তা ট্রেনে বসে একবার শুনিয়েছে শুভব্রতকে। শুভব্রত নাচার মুখে শুনেছে সেই সীসে-পোড়ানো কাহিনী। তার চাকরি হরিপদ কেরানির একধাপ উপরের। গাড়িতে করে বউ নিয়ে ভ্রমণ তার কাছে অলৌকিকতা। তার ভাগ্যে ট্রেন-বাস ঠেঙিয়ে আবার একটা রিকশ। পাঁচ টাকার রিকশ-রাস্তা পার হয়ে কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা একটা বাংলোর মুখ দেখতে পেয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত। ততক্ষণে শ্রাবণীর মুখ প্রায় শ্রাবণের মেঘ।

বাংলোর দরজা বন্ধ দেখে ডাকাডাকি-হাঁকাহাঁকিতে বেরিয়ে এল পাকাচুলো চৌকিদার। তার ও তার হাতের চাবিগুচ্ছের জরাজীর্ণ চেহারা দেখে শুভব্রত ভাবছিল বাংলোর ভিতরটাও এরকম হবে কি না! বাংলোর ভিতরের চেহারার উপর নির্ভর করছে শ্রাবণীর মুখে আলটপকা ঝুলে থাকা মেঘের ভবিতব্য। সেই মেঘে বৃষ্টি হবে কি না তা নির্ণয় করতে শুভব্রত যখন টস করবে ভাবছে, তখনই মেঘ-ভাঙা রোদে ঝলমল করে উঠল শ্রাবণীর ফরসা ডিম ছাঁদের মুখ। তার বাসন্তী রঙের সিফন শাড়িতে উচ্ছ্বাস সাজিয়ে বলল, দেখে যাও, কী দারুণ!

শুভব্রতর দেখার দরকার ছিল না। শ্রাবণীর পছন্দেই তার পছন্দ। তবু তার হাতছানিতে সাড়া দিয়ে এগিয়ে গেল। চৌকিদার ততক্ষণে ঘর খুলে দিয়েছে, তার ভিতরের রূপ ও ঐশ্বর্য দেখে মুগ্ধ শ্রাবণী। এমন চমৎকার রংচঙে বাংলো সে দেখেনি কখনো। ভিতরে দুটো ঝকঝকে বেডরুম, পাথর বসানো মেঝে, ধবধবে বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়। ডানলোপিলোর গদি এমন নরম যে, বসতেই কোমর পর্যন্ত ডুবে গেল শ্রাবণীর। আপাতত এরকম একটা সাংঘাতিক ঐশ্বর্যবান বাংলো তাদের দখলে, হোক না মাত্র তিনদিনের জন্যে। বিয়ের তিন বছর পর এই তার প্রথম বেড়াতে বেরোনো। কলকাতা থেকে শ-দেড়েক মাইল দূরে এক মফস্বল শহরের উপান্তে এমন মনকাড়া একটা আস্তানা পাওয়া যাবে, তা বেরোনোর আগে একবারও ভাবতে পারেনি। তার একটা রোমান্টিক ভাবনা রূপায়িত হতে চলেছে বিয়ের পর অন্তত এক হাজার দিন অপেক্ষার শেষে।

— কী, পছন্দ হয়েছে জায়গাটা?

— গ্র্যান্ড! প্রায় ছেলেমানুষের মতো ছোটাছুটি করছে শ্রাবণী, দেখে যাও এ-ঘরে কী সুন্দর একটা ডাইনিং টেবিল, সানমাইকার রংটা যা চমৎকার না?

শ্রাবণীর দু-চোখ ভরে উল্লাস দেখে শুভব্রত খুশি হল, সত্যিই চমৎকার বাংলো, কলকাতার ঘিঞ্জিঘরের মধ্যে দমবন্ধ অবস্থায় থাকার পর চারদিকে এমন খোলামেলা পরিবেশ আর চোখ-জুড়ানো ঘর পেয়ে ওদের পলক আর পড়ছে না। বারান্দার সামনে দু-পাশে ছ-টা করে মোট বারোটা প্রমাণ সাইজের ডালিয়ার টব, সামনে সবুজ লন, তার চারদিকে সিজন-ফ্লাওয়ারের বাগান। একদম সিনেমার মতো টেকনিকালার।

শ্রাবণী শুভব্রতর খুব কাছে এসে ফিস ফিস করে বলল, উফ, হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম মনে হচ্ছে।

ঘটনা এই যে, বাড়িতে যা ভিড়, দু-তিনটে ঘরে এতগুলো লোক, চলতে ফিরতে গায়ে-গায়ে লাগে। চারপাশে যা নোংরা পরিবেশ, তার থেকে মুক্তি পাওয়াটা, বুক ভরে নিঃশ্বাস নেওয়াটা খুব জরুরি ছিল। কলকাতার সেমি-যৌথ পরিবারে দু-জনে একান্তে দু-চারটে কথা বলবে, দু-জনে মুখোমুখি পরম দুখে দুখী হবে সে- পরিস্থিতি রাতে দরজা বন্ধ করার আগে ঘটেই না। আর বন্ধ করার পর ভালোবাসাবাসি করবে, না কথা বলবে, না কেউ সারাদিন খাটাখাটুনির পর 'ঘুম পাচ্ছে' বলতে বলতে উধাও হয়ে যাবে ঘুমপরীদের দেশে! ওদের এখনো বাচ্চা হয়নি, হয়নি বলে শ্রাবণীর হাতে কিছু অতিরিক্ত সময়। আসলে প্রথম দু-বছর বাচ্চা চায়নি ওরা, তৃতীয় বছরে 'এবার একটা হওয়া উচিত' বলে চেষ্টা-চরিত্র চলছে, কিন্তু শ্রাবণী কনসিভ না করায় সামান্য ভয় ঢুকে গেছে ওদের দু-জনের মনে, যদিও ডাক্তার টেস্ট-মেস্ট করে বলেছেন, 'কারো কোনো দোষ নেই। হবে হবে। চেষ্টা চালিয়ে যান', অতএব শুভব্রত বলছিল 'ধুস, কলকাতার জনকল্লোলে এত ব্যস্ততার মধ্যে কনসেনট্রেট করা যায় নাকি! বাচ্চা হবে কী করে! তিনি এত হট্টগোলের মধ্যে আসতেই পারছেন না।' শ্রাবণী শুনে হাসতে হাসতে বলেছিল, 'তাই তো বলছি, চলো, কোথাও একটা বেরিয়ে পড়ি, আমার এক বান্ধবী শেষে মানালি বেড়াতে গিয়ে বাঁধিয়ে আসে, মেয়ে হতে তার নাম রেখেছে মানালি।'

অতএব কনসিভ করার জন্যই এরকম একটা বেপরোয়া ভ্রমণ চাইছিল শ্রাবণী। হয়তো এবার বেড়াতে এসে বেঁধে যাবে এমন বলাবলি করেছে ওরা।

এর মধ্যে শ্রাবণী কখন রান্নাঘরে চলে গেছে। ফিরে এল ছুটতে ছুটতে। শুভব্রতর হাত ধরে টানতে টানতে বলল, কী মজা, দেখবে চলো, শিগগির চলো।

শ্রাবণীর ছেলেমানুষী দেখে শুভব্রত হাসতে থাকে, কী, ব্যাপার কি?

— চলোই না, টানতে টানতে রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে এক ঝটকায় আলমারির পাল্লা খুলে ফেলে, দ্যাখো।

তা দেখার মতোই। কত রকমের ক্রকারিজ। সাদা কড়ির বড়ো-বড়ো খান বারো প্লেট, ঝকঝকে প্রেসার-কুকার, স্টোভ, চমৎকার ডিজাইনের কাপ-প্লেট, স্টিলের কাঁটা চামচ। সরকারি ডাক-বাংলো যে এত সাজানো-গোছানো হতে পারে, তা শুভর জানা ছিল না। শ্রাবণীর তো নয়ই। শুধু জানত বাংলোয় একজন চৌকিদার আছে, বললেই বাজার করে এনে লাঞ্চ বা ডিনার সবই বানিয়ে দেবে মুহূর্তে।

— ঠিক আছে, এবার গোছগাছ করে নাও। আমি খাওয়ার ব্যবস্থা করি। কী খাবে বলো এ-বেলা, ভালো মাছ পাওয়া যায় এখানে, হয়তো সস্তাও হবে। রাতে মুরগি।

— বাহ্, কী মজা। আমি নিজে রান্না করব কিন্তু। শ্রাবণী ডগমগ হয়ে উঠল আনন্দে।

— কেন, চৌকিদার আছে কী করতে? তুমি ওকে ডিরেকশন দাও, ও-ই সব করে দেবে। দু-তিনটে দিন রেস্ট নাও না!

হাঁক দিতেই চৌকিদার চলে এল। তার কথাবার্তা শুনে বোঝা গেল সে দারুণ চৌখস। টাকা পয়সা নিয়ে তৎক্ষণাৎ ব্যাগ নিয়ে বাজারের দিকে রওনা হল। এখান থেকে আট-দশ মিনিটের পথ। যাওয়ার আগে তার এগারো-বারো বছরের মেয়েটাকে বলে গেল উনুন ধরিয়ে ঠিকঠাক করে রাখতে। মেয়েটার নাম শোভনা। সে গড় গড় করে এমন গল্প শুরু করল শ্রাবণীর সঙ্গে, যেন সে একটা পূর্ণ যুবতী।

খুব চটপট ফিরে এল চৌকিদার। তার ব্যাগে তেল-চুবচুবে পারশে, কয়েকটা বড়ো গোঁফঅলা তপসেও, দুটো বাগদা চিংড়ি। কলকাতায় এতসব মাছ, এত সস্তায় ভাবাই যায় না। শ্রাবণী কোমরে আঁচল জড়িয়ে ফিট। পটাপট হুকুম করতে শুরু করে, 'এটা করো, ওটা কোটো, উঁহু ওইভাবে নয়', এবং ঘণ্টা দু-একের লেবার দিয়ে যখন ঝকঝকে ডাইনিং টেবিলটা ভরিয়ে তুলল রকমারি প্লেট ও বাটিতে, তখন শুভব্রতর চোখে শ্রাবণী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। ভাতের প্লেটের পাশে তিন রকম মাছ এবং অপর্যাপ্ত। সত্যিই মিরাকল।

— এবার নিজেকে রাজা-রাজা মনে হচ্ছে, শ্রাবণী।

মাছের ঝোল ও ঝালের গন্ধে তখন গোটা ঘর রিমরিম। খাওয়ার পাট চুকলে চৌকিদার আর মেয়ে বিদায় হল। পাশেই ওদের আস্তানা। দরজা বন্ধ করে শুভব্রত একেবারে ছেলেমানুষ হল, 'কতদিন তোমার দুপুরবেলার রূপ দেখিনি।'

শ্রাবণী চোখ পাকিয়ে আঁচলের ঝাপট মারে, লক্ষ্মীছেলের মতো দিবানিদ্রা লাগাও। শরীর ভালো থাকবে।

আঁচলটা ধরে ফেলল শুভ। এক-ঝটকায় ওকে কাছে এনে বলল, দিবানিদ্রার জন্য এরকম একটা রোমান্টিক জায়গায় এসেছি নাকি? ঠিক আছে, আগে একটা রবীন্দ্রসংগীত হোক। আমার প্রিয় সেই গান 'বঁধু কোন আলো' — কিংবা যেটা তুমি প্রায়ই গাও, 'বসন্ত তার গান লিখে যায়।' এমন হইচই দুপুর, রবীন্দ্রসংগীত ছাড়া মানায় না।

কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতের কী একটা জাদু আছে! রবীন্দ্রসংগীত শুনলে মনটা পবিত্র-পবিত্র হয়ে যায়! তখন আর দিনের বেলা বিছানায় ওইসব কাজ করতে অস্বস্তি লাগে! খান কয়েক গান শোনার পর শুভব্রত বলল, ঠিক আছে, এসো একটু ঘুমিয়েনি। এতখানি জার্নি করে সত্যিই টায়ার্ড লাগছে। বরং ঘুমিয়ে গায়ে জোর করেনি। রাতের বেলা হবে ও সব। বলে এক লাইন কবিতা আবৃত্তি করে ফেলল, আমি পরানের সাথে খেলিব আজিকে মরণখেলা —

যখন ঘুম ভাঙল দু-জনের তখন বেলা গড়িয়ে বিকেলের মনমরা আলো। শ্রাবণী আগেই ঘুম-ভাঙা ফোলা চোখমুখ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সিজন-ফ্লাওয়ারের থইথই বাগানে। রোদ-রং শাড়িতে ওকে একটা প্রজাপতির মতো দেখায়। রোদ-রং-এর কিনার ঘেঁষে চওড়া মিনে করা কালো পাড়। পাশে শোভনা। আগের মতোই কলকলায়মান। শুভকে উঠতে দেখে শ্রাবণী হইহই করে ওঠে, দেখে যাও, কী চমৎকার হলিহক।

সারা বাগান জুড়ে এমন হলিহক, ক্রিসানথিমাম — দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু শুভকে এখন রাতের খাবার জোগাড় করতে হবে। বলল, আমি চৌকিদারকে নিয়ে একটু বেরোচ্ছি গাঁয়ের দিকে, মুরগির খোঁজে। অনেকদিন দিশি মুরগি খাইনি। দারুণ টেস্ট!

বাংলো থেকে বাজার। বাজার পেরিয়ে গাঁ। দু-একটা বাড়ি ঘুরে মার্কেট যাচাই করে শুভ। তেমন সস্তা মনে হল না। গাঁয়ের লোক বেজায় চালু হয়ে গেছে আজকাল। বুঝে গেছে কলকাতার বাবুরা যখন বাংলোয় ফুর্তি করতে আসে, তাদের রেস্ত ভারী থাকে। বেছেবুছে একটা নাদুসনুদুস মুরগি চৌকিদারের হাতে ঝুলিয়ে বীরদর্পে ফিরে এসে বলে, দ্যাখো শ্রাবণী, আজ রাতে উৎসব।

শ্রাবণী বারান্দার সোফায় গা এলিয়ে বসেছিল। মুরগিটাকে দেখে তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠল না। হইচই করে লাফ দিয়ে পড়ল না। শুভর কথা শুনে আরো ঝিমিয়ে রইল।

— কী হল? শরীর খারাপ নাকি? মাথা ধরেছে?

শ্রাবণী সামান্য ঘাড় নাড়ে। কিন্তু কথা বলে না। কেমন অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকে শুভর দিকে।

শুভ হতভম্ব। এমন চোখ-জুড়োনো দৃশ্যের ভেতর কীভাবে মাথা ধরে কে জানে। মেয়েরা এইরকমই, মাথা ধরার কোনো স্থান-কাল-পাত্র থাকে না। কারণে-অকারণে ফিউজ।

— তা হলে রান্নাটা চৌকিদারের হাতেই ছেড়ে দাও। চলো, বেতের চেয়ার দুটো নিয়ে লনের ওপর দু-দণ্ড বসি। দেখবে মাথা ধরা-ফরা কোথায় হাওয়া।

চৌকিদারের পিছু পিছু শ্রাবণী কিচেনের দিকে গেল। এটা-ওটা নির্দেশ দিয়ে একটু পরেই ফিরে আসে। আবার ঝিম মেরে বসে সোফায়। তার রকমসকম দেখে শুভ বোঝে এটা মাথা-ধরা নয়। কলকাতায় সে মাঝেমধ্যে এমন ফিউজ হয়ে থাকে। কিন্তু এমন চমৎকার ডাকবাংলোয়, এই খোলামেলা পরিবেশে তার নিবে যাওয়াটা একেবারে ধারাপাতের বাইরে।

— কী হয়েছে শ্রাবণী? মাথা ধরার কোনো ওষুধ কী তোমার কাছে নেই?

কিন্তু শ্রাবণীর মুখে আবার শ্রাবণের মেঘ। সকালে ভিড় বাসে ঝাঁকুনি খাওয়ার সময় যেমন জমেছিল। না গর্জায় না বর্ষায়। এমন গুমোট থাকলে তো তিনদিনের উৎসব নয়ছয়। কলকাতা থেকে বেরোবার আগে এমন কথা ছিল না। শ্রাবণী কেন যে শুধু শুধু গম্ভীর।

রাতের খানায় মুরগি, কোনো স্বাদ চারাতে পারল না ওদের জিবে। শুভব্রতর ডাকে ঘন ঘন চমকে উঠছিল শ্রাবণী। ভালো করে না খেয়েই উঠে পড়ল চেয়ার থেকে। থতমত বসে রইল শুভ। একা। অবাক। আধ-খাওয়া ভাত ফেলে উঠে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, কী হয়েছে তোমার? কলকাতায় তো ঠিক এমন করো না। খুব শরীর খারাপ!

শ্রাবণী মুখে রা-টি কাড়ে না, চোখে কীরকম শঙ্কার ছাপ।

আকাশে এক টুকরো চাঁদের ইলিবিলি দেখে শুভ তার বউকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করে, চলো, তা হলে বরং জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে যাই দু-জনে। বেশ মজা হবে।

শ্রাবণী চমকে উঠল ঘোরতরভাবে, বলল, কেন, জঙ্গলে কেন?

শুভব্রত মুখে দুষ্টুমি ফোটায়, খুব জমে যাবে জঙ্গলে। একদম দু-জনে একা। কেউ কোথায় থাকবে না। আমরা কী করছি কেউ দেখার নেই।

শ্রাবণীর চোখে শঙ্কা ঘোরতর হয়।

— কী হল? একদম ম্যাদা মেরে গেলে যে! কলকাতা থেকে বেরোবার সময় তোমার কত নাচানাচি! ফরেস্ট বাংলো শুনে বললে দু-জনে জঙ্গলের ভিতর হারিয়ে যাব। সারা রাত বাংলোয় ফিরব না। একদম আদিম হয়ে যাব দু-জনে। ঘাসের বিছানায় শুয়ে থাকব সারা রাত আর ওই সব করব। কলকাতায় যা-যা করা যায় না, সব করব এই তিনদিনে। আর এখন জঙ্গলে যাওয়ার নাম শুনে একদম ফিউজ!

শ্রাবণী সেই আগের মতো চুপচাপ। দু-চোখে ভয়ার্ত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে শুভব্রতর দিকে। শুভব্রত কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। রাতের বেলা যার জঙ্গলবাস করার প্রতিশ্রুতি ছিল, ঘাসের বিছানায় পাগলের মতো গড়াগড়ি খাওয়ার কথা ছিল, সে এখন পুরোপুরি অন্য মানুষ। জঙ্গলের নাম শুনলেই চমকে উঠছে বারবার। কলকাতার কথোপকথন আর মনেই থাকল না।

শুভব্রতর দীর্ঘশ্বাসে বাতাস কাঁপে। বাইরে সামান্য জ্যোৎস্না ঝিরঝিরে আলো ফেলেছে সবুজ লনে। কিন্তু আজ জ্যোৎস্নারাতে কেউ আর বনে যাওয়ার নেই।

— ঠিক আছে, জঙ্গলে যেতে ভয় পাচ্ছ বুঝেছি। আ রে বাবা, এ-জঙ্গলে কোনো বাঘ ভালুক নেই। রিজার্ভ ফরেস্ট। যাই হোক, জঙ্গলে আজ না-ই বা গেলাম। কাল না হয় পরশু যাওয়া যাবে। কিন্তু বাংলোয় দরজা বন্ধ করে তো আমরা যা খুশি করতে পারি। সেরকমই তো কথা ছিল, আমরা দু-জনে দিওয়ানা হয়ে যাব। এরকম নিরালায় দু-জনে ভালোবাসাবাসি করব।

যতই শুনছে, শ্রাবণী সাড়া করছে না একটুও। ঘরে পায়চারি করছে, আর মাঝেমধ্যে জানালা দিয়ে তাকাচ্ছে বাইরে। কী দেখছে ও! যা দু-চার টুকরো জ্যোৎস্নার কারিকুরি দেখা

যাচ্ছে, তাই কী।

— তা হলে কী করবে এখন? দু-জনে ঘুমিয়ে পড়ব যেমন কলকাতায় বিছানা পেলেই ঘুমিয়ে কাদা হই!

শ্রাবণী ফ্যাসফেসে গলায় বলল, তোমার ঘুম পেলে ঘুমিয়ে পড়ো। আমার ঘুম পাচ্ছে না।

— ঘুম কী আমারও পাচ্ছে! তুমি অমন ল্যাদোসের মতো মিইয়ে গেছ বলেই ভাবছি ঘুমিয়ে পড়া ছাড়া আর গত্যন্তর কী! তা হলে এসো দু-জনে গল্প করি সারা রাত। কলকাতায় মন খুলে গল্প পর্যন্ত করতে পারি না, পাছে পাশের ঘরের লোক শুনে ফেলে আমাদের প্রেমালাপ।

শ্রাবণী একই রকম নির্বিকার থেকে বলল, তুমি ঘুমোও না। আমি পরে ঘুমোব।

শুভব্রতর একটু রাগ হয়ে গেল শ্রাবণীর এরকম অনন্ত উদাসীনতায়। 'ঠিক আছে, আমি তা হলে একটু ঘুমিয়ে নিই। কিছু যখন করা যাবেই না, তখন ঘুমোনোই বুদ্ধিমানের কাজ।'

বিছানাটি ভারি চমৎকার। ধপধপে বিছানা দেখলে সত্যিই শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়।

বিছানায় গা এলাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল শুভ। তখন কত রাত কে জানে! হঠাৎ শ্রাবণীর চিৎকারে চমকে উঠে বসল। লাইট জ্বেলে দেখল বিছানায় উঠে বসে দরদর করে ঘামছে শ্রাবণী। হাঁপাচ্ছে প্রবলভাবে। শুভ ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে?

শ্রাবণী অনেকক্ষণ কথা বলতে পারে না। শুভব্রত বুঝে উঠতে পারে না বিছানায় বসে আছে কেন শ্রাবণী! ও কী কোনো কারণে ভয় পেয়েছে! এতক্ষণে মনে হল তার, ফরেস্ট বাংলো শুনে আসতে লোভ হয় ঠিকই, কিন্তু রাত একটু নিবিড় হয়ে এলে এই মাইল-মাইল জঙ্গলের পরিবেশে এমন অখণ্ড নির্জনতার মধ্যে কারো কারো পক্ষে বাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ওদিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে শ্রাবণী — তুমি আমার গলায় হাত দিয়ে কী করছিলে?

শুভ আশ্চর্য হল — আমি? কী জানি হয়তো ঘুমের ঘোরে তোমার গায়ে আমার হাত লেগে থাকবে।

কেমন য়েন সন্দেহের চোখে শ্রাবণী তাকিয়ে রইল। তখনো শ্বাস নিচ্ছে জোরে জোরে। শুভ একগ্লাস জল এগিয়ে দিয়ে বলল, বোধহয় কোনো খারাপ স্বপ্ন দেখেছ। জল খেয়ে শুয়ে পড়ো।

ঢক ঢক করে এক নিঃশ্বাসে জলটা খেয়ে নিল শ্রাবণী। কিন্তু শুলো না। বলল, এই ঘরে আমার ভীষণ ভয় করছে।

শুভ বলল, চলো, তা হলে বারান্দায় একটু ঘুরে আসি। বাইরে জ্যোৎস্না ফাটাফাটি পেখম মেলে ডাকছে। বেড়াতে এসে এই চাঁদনি রাত মিস করার কোনো মানে হয় না।

বারান্দায় যাওয়ার পরিকল্পনাটা বোধহয় মনঃপূত হল শ্রাবণীর। বারান্দায় বেরিয়ে এল দু-জনে। শুভব্রত তার কাব্য ছড়াতে শুরু করে শ্রাবণীকে চাঙা করার জন্য। বুঝলে সখী, চারপাশে এমন রুপোরঙের ঝরনা আলোর ছড়াছড়ি, বিছানায় শুয়ে থাকা মানে ডাহা লস। কলকাতায় কেন, কোটি টাকা দিলে আমেরিকাতেও কোনো হোটেলঅলা এরকম জ্যোৎস্না ভেজা রাত তোমাকে এনে দিতে পারবে না।

বারান্দায় সেই রুপোরঙে ভিজতে ভিজতে শ্রাবণীর মনে বোধহয় সামান্য চাঞ্চল্য। বারান্দা থেকে নেমে গেল সামনের পথে। বাংলো থেকে লাল সুড়কির পথ বেয়ে ওরা নেমে এল লনের ঘাসে লুটোপুটি খেতে থাকা জ্যোৎস্নায়। একটু বোধহয় প্রকৃতিস্থ হয়েছে শ্রাবণী। শুভব্রত তাকে আরো চাঙা করতে বলল, তোমাকে যা সুন্দরী লাগছে না এখন। একদম পরীর মতো লাগছে রুপোরঙে ভিজে।

শ্রাবণীর খুব একটা ভাবান্তর হল না তবুও, আস্তে আস্তে বলল, বাংলোর বাইরেটাও বেশ সুন্দর, তাই না?

বাংলোর বিশাল লনটিতে কিছুক্ষণ এলোমেলো ঘুরে বেড়াল দু-জনে। এখন সমস্ত পৃথিবী ঘুমোচ্ছে। কেবল ওরা দুটি প্রাণী ঘুরে ঘুরে স্নান করছে জ্যোৎস্নায়। শ্রাবণী আগের মুডে থাকলে আজ শুভ একটা কাণ্ড করে ফেলত। কিন্তু পারল না। তবু শ্রাবণীকে উত্তেজিত করতে বলল, চারপাশে এরকম জঙ্গল নিয়ে রাত কাটাচ্ছি ভাবা যায়!

শ্রাবণী তার দিকে তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে।

— বুঝলে, চারপাশে জঙ্গল, তার মাঝখানে এরকম একটা ঘাসের পটভূমিতে বসে মনে হচ্ছে আমরা দুই আদিম মানব মানবী। বহু লক্ষ বছর আগের কোনো একটা দিনে পৌঁছে গেছি টাইম মেশিনে।

শ্রাবণী তার প্রতিটি কথা শুনছিল গভীর মনোযোগ দিয়ে। কেন যেন মাপছে তাকে।

— কলেজে পড়তে একটা ইংরেজি সিনেমা দেখেছিলাম, কী যেন নাম ছিল সিনেমাটার, 'গার্ডেন অফ ইডেন' বোধহয়। সেখানে আদম আর ইভ আবিষ্কার করেছিল পরস্পর পরস্পরকে। কারো কোনো জামাকাপড় পরা ছিল না। যাকে বলে উদোম শরীর। কী যে উত্তেজনা হয়েছিল সিনেমাটা দেখতে দেখতে! কতকাল আগের ঘটনা, এখনো দৃশ্যগুলো মনে আছে। মনে আছে ইভের আপেল খাওয়ার দৃশ্যটি। সেই আপেল খেয়ে ইভ প্রথম অনুভব করেছিল তার নগ্ন হয়ে থাকার লজ্জা। কী আশ্চর্য তার সেই অভিব্যক্তি! একটা ঝোপের মধ্যে গা ডুবিয়ে বসে আছে, কিছুতেই আদমের সামনে বেরোতে পারছে না। তারপর অনেকক্ষণ পরে সে যখন বেরোল তখন তার শরীরের লজ্জাস্থানগুলো বড়ো বড়ো পাতায় আবৃত।

শুভব্রত নিজেই বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল গল্পটা বলতে গিয়ে। এর আগে আরো বহুবার গল্পটা শ্রাবণীকে শুনিয়েছে রাতে মিলিত হওয়ার আগে। এরকম দু-চারটে হাফ-পর্নো গল্প মাঝেমধ্যে শ্রাবণীকে শুনিয়ে সে নিজেও উত্তেজিত হয়, শ্রাবণীকেও উত্তেজিত করে সহবাসের ফোর-প্লে হিসেবে। কিন্তু আজ শ্রাবণী যাকে বলে একদম ফ্রিজিড। উত্তেজনা দূর অস্তু, বরং শঙ্কিত দেখাচ্ছে তার অভিব্যক্তি। কিন্তু এরকম দুর্ধর্ষ চাঁদনিরাতে শুধু গল্প করে কাটাতে শুভব্রতর মন সায় দিচ্ছিল না। সে আরো একটু বেপরোয়া হয়ে উঠতে চাইল। শ্রাবণী বসে আছে দু-হাঁটু ফ্লাইওভারের মতো মুড়ে, সেই ফ্লাইওভারের শীর্ষ ছুঁয়ে আছে তার চিবুক। শ্রাবণীকে সোজা করে বসিয়ে তার কোলে চট করে শুয়ে পড়ল শুভব্রত। এরকম তো রাতে মাঝেমধ্যেই করে, তার কোলে শুয়ে গল্প করে নানাবিধ, আজ কিন্তু তাকে ঝটকা মেরে তুলে দিল শ্রাবণী, বলল, কী চাও তুমি বলো তো?

শুভব্রত তার ঝটকা মারার ভঙ্গি দেখে চমকে উঠল, যে শ্রাবণীকে নিয়ে সে তিন বছর ঘর করছে তাকে যেন চিনতেই পারল না। শ্রাবণী মুডি ঠিকই, কলকাতায় কারণে-অকারণে তার মেজাজ হারানোর সঙ্গে শুভব্রত অতি অভ্যস্ত, কিন্তু বাংলোয় থাকতে এসে হঠাৎই তার এই ভয়ার্ত মুখভঙ্গি সম্পর্কে সে ঠিক অবহিত ছিল না।

বহুক্ষণ চোখে হাজার বিস্ময় জ্বেলে সে তাকিয়ে রইল শ্রাবণীর দিকে। শ্রাবণীও তার দিকে তাকিয়ে, তার দৃষ্টি স্থির, যেন শুভব্রতকে মাপছে নতুন করে। এরকম বহু বিস্মিত ও উৎকণ্ঠিত মুহূর্ত পার হয়ে যাওয়ার পর শুভব্রত খেয়াল করল চাঁদনিরাতের মায়াবী মুহূর্ত ক্রমশ বিলীয়মান। জ্যোৎস্নার রং দ্রুত শুষে নিয়ে কেউ উগরে দিতে চাইছে ভোরের আলো। এতক্ষণ যে-চাঁদ উপুড় করে দিচ্ছিল রুপোরঙের ঝাঁঝরি, সেই চাঁদও তার গরিমা হারিয়ে একটি বিবর্ণ কাঁসার থালা। এক সময় আবিষ্কার করল, ভোর আকাশে শুকতারাটির জ্বলজ্বল করে ওঠা। দু-জনে আবার ঘরে ফিরে আসে। কিন্তু ঘরে না-ঢুকে বসে পড়ল বারান্দার আরাম-চেয়ারটিতে।

— চৌকিদার বোধহয় ঘুমোচ্ছে। দু-কাপ চা পেলে বেশ হত, তাই না? এরকম ফাটাফাটি জ্যোৎস্নার পর চা না খেলে ঠিক মেজাজ পাওয়া যাচ্ছে না কী বলো?

শুভ তখনো চাইছে শ্রাবণীর শঙ্কা দূর করতে। জড়তা ভাঙার জন্য ইচ্ছে করে হাসল বারান্দা কাঁপিয়ে। চায়ের উপর শ্রাবণীর অতি দুর্বলতা জানার ফলেই চায়ের প্রসঙ্গ তুলল। কিন্তু তখনো শ্রাবণী কোনো উত্তর দেয় না। আঙুলে আঁচল জড়াতে জড়াতে ও আবার অন্যমনস্ক।

শুভ বুঝল এবার হয় এসপার না হয় ওসপার করতে হবে তাকে। বেশ রাগত কণ্ঠস্বরে বলল, তোমার কী হয়েছে বলো তো? কাল বিকেল থেকে অমন করছ কেন? ব্যাপারটা এবার বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। এত কষ্ট করে তা হলে এখানে আসার কী দরকার ছিল?

শুভর দিকে কেমন ভয়কাতর চোখে তাকাল শ্রাবণী। তারপর হঠাৎ বলল, তুমি আমাকে এই নির্জন ফরেস্ট বাংলোটায় নিয়ে এসেছ কেন, বলো তো?

শুভ হাঁ করে বহুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, এই কথাটা তুমি আরো একবার জিজ্ঞাসা করেছ। কেন তা তো ভালোই জানো তুমি। দু-জনে একটু হইচই করব বলে। দু-জনে কোথায় কোন নির্জনতায় হারিয়ে যাব বলাবলি করছিলাম, তুমিই তো বলেছিলে, জঙ্গল দারুণ।

শ্রাবণীর যেন মনেই পড়ল না তখনকার সংলাপগুলো। হঠাৎ অদ্ভুত চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, আচ্ছা একা পেয়ে তুমি আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলবে না তো?

স্তম্ভিত হয়ে গেল শুভ। বোধহয় শ্রাবণী সত্যিই পাগল হয়ে গেছে। ওর চোখ দুটোও কেমন অস্বাভাবিক আর ঘোলাটে। কিন্তু এই অল্প সময়ের ব্যবধানে কী এমন ঘটল যাতে শ্রাবণী এতটা অস্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে? ভিতরে ভিতরে কেমন অস্থির আর বিপন্ন বোধ করে শুভ। এমন একটি সমস্যার কীভাবে মোকাবিলা করবে সে? হঠাৎ শ্রাবণীকে প্রচণ্ড ধমক দিল, সত্যি করে বলো তো, কী হয়েছে তোমার?

ধমক খেয়ে শ্রাবণী হু-হু করে কেঁদে ফেলে। বেশ কিছুক্ষণ কেঁদে সে একটু হালকা হল। দুটো চোখ ফোলা আর ভেজা। মাথার চুল লেপটে রয়েছে কপালে আর চোখের কোণে। খানিকটা থেমে ভয়ে-ভয়ে যা জানায় তা এক রোমহর্ষক কাহিনী। এই বাংলোয় নাকি গত এক

বছর কেউ আসেনি। বছরখানেক আগে এক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে এসেছিলেন এখানে। রাতের বেলা স্ত্রীকে গলা টিপে মেরে ফেলে তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন ভোর হবার আগেই। আর সেই লোকটাকে দেখতে নাকি শুভব্রতর মতোই।

শুনে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল শুভ। এসব গল্প ওর মাথায় কে ঢুকিয়েছে? জিজ্ঞাসায় জানতে পারল, কাল শুভব্রত যখন মুরগি আনতে গিয়েছিল, তখন চৌকিদারের মেয়ে শোভনা তাকে শুনিয়েছে এই গল্পটা।

স্তম্ভিত শুভ জিজ্ঞাসা করল, আর তুমি নির্বিবাদে শোভনার কথা বিশ্বাস করলে? আমি গত তিন বছরে কলকাতা ছেড়ে কোথাও বেরিয়েছি? হতে পারে এমন একটা ঘটনা এই বাংলোয় ঘটেছিল, তাই বলে আমি? গত তিন বছরের প্রতিটি রাত আমি তোমার পাশে ঘুমিয়েছি এ-কথা কী তোমার মনে পড়ল না একবারও?

ম্লান হাসল শ্রাবণী, বোধহয় সে গত তিন বছরের আত্মজীবনী সিনেমার রিলের মতো রি-ওয়াইন্ড করে যাচাই করে নিল শুভব্রতর কথার সত্যতা। এতক্ষণে নিশ্চিন্ত দেখাল তাকে। বলল, আসলে আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। রোজ রাতের বেলা নাকি মেয়েটাকে বাংলোর ঘরে বারান্দায় ঘুরতে দেখা যায়, তার চিৎকার শোনা যায়। আমি কেমন চমকে উঠছিলাম সেই কারণেই।

শুভ ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলল, তা হলে চলো, আজই এখান থেকে কলকাতা ফিরে যাই আমরা।

তখন সকাল হয়ে এসেছে। ওরা আবার সুটকেস কিটব্যাগ গোছাতে বসল।

বর্ণনা

বাংলা বই
ভালো গল্প
দেখতে ভালো
খরচ অল্প,
বা কবিতা
ছবির সাথে
রেখায় লেখায়
মনটা মাতে —
এরম কিছু
বা অন্য,
'বর্ণনা' সবার জন্য।

ভালো কিছু — সুন্দর কিছু — ছাপার জন্য

বর্ণনা
৬/৭ বিজয়গড়, কলকাতা-৩২
দূরভাষ : ২৪১২ ১১৩৩/৩০৯৬ ৯৭২৫/২৪২৯ ৪০৯২
চলভাষ : ৯৪৩৩৪ ০৮২৬৫

স্থিরচিত্র

মানব চক্রবর্তী

ডান পায়ের হাঁটুটা নীলকান্তকে ভোগাচ্ছে অনেকদিন। প্রতি শীতেই তিনি হাঁটু নিয়ে কষ্ট পান। এ-বছর অবস্থা সত্যিই খারাপ। হাঁটুর যন্ত্রণায় কাতর নীলকান্ত সকালের হাঁটাহাটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছেন।

তবু কি ডাক্তার দেখাতে চান? ছেলে-মেয়ে-বউ সবার চাপাচাপিতে অবশেষে তিনি হাজির হাসপাতালে। বেসরকারি হাসপাতাল বলে কথা। নামডাক আছে। বিখ্যাত অস্থিবিশেষজ্ঞকে দেখাবেন। যা ভিড়! নাম লিখিয়ে বসে আছেন।

ভিড় হলেও হই-হল্লা নেই। প্রশস্ত ওয়েটিং রুমে সারি-সারি চেয়ার পাতা। টাইলস বসানো ঝকমকে মেঝে। বড়ো বড়ো জানলা। মাইক্রোফোনে একেকজনের নাম ডাকছে। তিনি উঠে যাচ্ছেন নির্দিষ্ট ডাক্তারবাবুর চেম্বারে। দেওয়ালের বড়ো বোর্ডে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুদের নাম। নামের পাশে লম্বা ডিগ্রি। নীলকান্ত বোর্ডটা আগাপাস্তলা পড়ে ফেলেছেন বারকয়েক।

চেয়ারে বসে বসে এখন তিনি মানুষ দেখছেন। এত রোগী? দেখে বোঝার উপায় নেই। ধোপদুরস্ত পোশাক। ফিটফাট। অসুস্থতা শব্দটাই যেন পরিপাটি পোশাকের আড়ালে চাপা পড়ে গেছে। অথচ প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু অসুখ আছে। নইলে এখানে আসবে কেন?

হঠাৎ নীলকান্তর দু-চোখের তারা স্থির হয়ে গেল।

বিপরীত দিকের একেবারে সামনের সারির ডানদিকে চতুর্থ চেয়ারে ও কে? মাধু না? আটান্ন বছরের নীলকান্তর রক্ত ছলকে উঠল। হ্যাঁ, মাধুই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু সত্যিই যদি মাধু হয় তবে সামনে বসা নীলকান্তকে সে চিনতে পারবে না তা হয়?

তবে কি নীলকান্ত খুব বুড়িয়ে গেছে? চেহারাটা খুব বিচ্ছিরি হয়ে গেছে?

নীলকান্ত অপলক দৃষ্টিতে দেখছেন মাধুকে। বয়েস বাড়লে চেহারার পরিবর্তন হয়, মুখের আদলও কিছুটা হয়তো বদলে যায়, কিন্তু তাই বলে চেনা মানুষ অচেনা হয়ে যায়? না, কখখনো নয়। তা ছাড়া মাধু কি আর যেমন তেমন চেনা?

নীলকান্ত বুকের মধ্যে একটা মৃদু ধড়ফড়ানি টের পেলেন! ওই তো, মাধুর চিবুকে ছোট্ট তিলটা। বয়সের ভারে গলার নীচে ক-টা ভাঁজ পড়েছে সত্যি, মুখের চামড়াও কিছু ঢিলে, কিন্তু তাই বলে চোখ দুটো তো আর বদলে যায়নি। সেই টানা টানা গভীর দুটো চোখ। এখনো তেমনি আছে। তবে হ্যাঁ, সে-চোখের উজ্জ্বলতা যেন কিছুটা কম। দৃষ্টিতে কি বিষণ্ণতা? তবে কি মাধু কষ্টে আছে? না, পোশাক দেখে তো তা মনে হয় না। শাড়িটা খুব দামি। বালুচরী হবে বোধহয়। কপালের শাদা-কালো চুলের মাঝে সিঁদুর। মুখ জুড়ে গাম্ভীর্য। সবার মধ্যে বসে থেকেও সে আলাদা। অনন্য। সোনার গয়না মাধু কোনোকালেই পছন্দ করত না। তার যা রূপ, সোনা তাকে আলাদা মাধুর্য দিতে পারে না।

বরং সোনাই যেন ওর অঙ্গে ধন্যি হয়ে যায়। মাধুর এক হাতে সোনারঙের ঘড়ি, অন্য হাতে পোড়ামাটি রঙের একটা বালা।

ফরসা হাতে কী সুন্দর দেখাচ্ছে দ্যাখো। সোনা নয় কিন্তু সোনার বাড়া।

নীলকান্তর মনে আর কোনো সন্দেহ নেই। ও মাধু। তার এককালের মাধবীলতা।

নামটা মনে মনে উচ্চারণ করতেই নীলকান্তর আটান্ন বছরের মরা সোঁতায় যেন বান ডেকে উঠল। যৌবনের দিনগুলোতে মাধবীলতা ছাড়া আর কি অন্য কিছু স্বপ্ন দেখতে পারতেন নীলকান্ত? স্বপ্নে এবং জাগরণে শুধু ওই এক নাম। তারপর, দুজনের কেউ কি ভেবেছিল তাঁদের দু-জনের জীবনের ধারা আচমকাই দিক বদল করে আলাদা বইবে?

বড়ো করে শ্বাস ফেললেন নীলকান্ত।

আচমকা দুর্ঘটনার মতোই মাধুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার ঘটনাটাকে সইয়ে নিতে চেষ্টা করলেন। ভাবাবেগ সামলে নিয়ে মনে মনে বললেন 'ভালোই হয়েছে, আমিও কিছু কম সুখে নেই। আমার অন্নপূর্ণা আমাকে কম সুখ দেয়নি —'

নীলকান্ত জোর করে মুখ ঘুরিয়ে রাখলেন অন্য দিকে। কিন্তু সেও বা কতক্ষণের জন্য?

একটু পরেই ফের চোখাচোখি মাধুর সঙ্গে। কিন্তু এবারেও তার মুখের গাম্ভীর্য খসল না। চিনতে পারেনি বোধহয়। চিনতে পারছে না, নাকি ইচ্ছে করেই চিনছে না?

হয়তো সে খুউব বড়োলোকের ঘরণী এখন। হয়তো ওর স্বামী খুব উঁচু পদে চাকরি করেন। সফল ব্যবসায়ীও হতে পারেন। বাড়ি, গাড়ি, পৃথিবীর সব সুখ ওদের করায়ত্ত। হয়তো মাধুর ছেলেরাও উঁচু পদে চাকরি করে। মেয়েদের বিয়ে হয়েছে প্রতিষ্ঠিত ঘরে।

নীলকান্তর এসব কোনোটাই ঘটেনি। একটা মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন কোনোমতে। তাতেই কবজা ঢিলে। এন্তার লোন নিতে হয়েছিল। অনেক কষ্টে সেই লোন শোধ করেছেন। বড়ো ছেলেটা বি.এস.সি. পাশ করে চাকরি পায়নি। ধার-দেনা করে তাকে একটা দোকান করে দিয়েছেন। মোটামুটি চলে আর কী! নেহাত সরকারি চাকরি, তাই বাসস্থানের ঝামেলা নেই নীলকান্তর। কোয়ার্টার্সে থাকেন। দুটো মাত্র শোবার ঘর। রান্নাঘর আর বাথরুম-টয়লেট। তার মধ্যেই গাদাগাদি করে থাকা। কিন্তু চাকরির আয়ুও তো প্রায় ফুরিয়ে এল। দু-বছর পরেই তো রিটায়ার করবেন। তারপর? যাবেন কোন চুলোয়?

নিজের বলতে একচিলতে জমি-জায়গা নেই। তার ওপর গোদের মধ্যে বিষফোঁড়া। ছোটো মেয়েটা এবারে বি.সি.এ. পাশ করে এম.সি.এ. পড়বে বলে জেদ ধরেছে। রাত্তিরে ঘুম হয় না টাকা পয়সার চিন্তায়। উচ্চশিক্ষার খরচ এখন অ-নে-ক। নীলকান্তর চিন্তার শেষ নেই।

আবার চোখাচোখি হল দুজনে।

এবারেও মাধু অচেনার মতো চোখ সরিয়ে নিল।

যদিও নীলকান্তর ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল, তবু তিনি কষ্ট করেই ভেবে নিলেন মাধু নিশ্চয়ই চিনতে পারছে না। তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের ব্যবধান কি কম? যৌবনের সেইসব তরতাজা দিনের উন্মাদনা কি পরবর্তী তিন দশকের ধূলিঝড়ে ঢাকা পড়ে গেল?

নীলকান্ত শেষটুকু দেখতে চান। দ্বিধা সংশয় ঝেড়ে খুঁড়িয়ে এক পা এক পা করে এগিয়ে এলেন। তারপর একেবারে সামনে এসে বললেন 'তুমি মাধু না!'

'কে আপনি?'

'তা হলে ঠিকই ধরেছি। তুমি আমায় চিনতে পারোনি। আমি নীল। নীলকান্ত। সেই যে তুমি আমায় নীলকান্তমণি বলে ডাকতে।'

ব্যস, যেই না বলা অমনি সব গাম্ভীর্য ভেঙে হাসির ঝরনাধারা গড়িয়ে নামল, বিস্ময়ে বড়ো বড়ো চোখে মাধবীলতা বলে উঠলেন, 'নীল! ইস, কত বদলে গেছ। বিশ্বাস করো তোমাকে চিনতেই পারিনি —'

নীলকান্ত নিজেকে ফিরে পাচ্ছেন। প্রাথমিক জড়তা কাটিয়ে প্রচ্ছন্ন গর্বে বললেন 'সে কী আর আমি জানি না? চিনতে পারলে তুমি স্বর্গে গিয়েও আমি ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে কথা কইবে না —'

মাধবীলতা লজ্জা পেলেন, আশেপাশের লোকেরা শুনছে। চাপা গলায় বললেন, 'আঃ আস্তে বলো'।

নীলকান্ত বুকের মধ্যে পাড়-উপচানো জলের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। মজা খালে বান এলে কী এমনই হয়? মাধবীলতার পাশে বসে উচ্ছ্বাস আর আবেগে টলোমলো নীলকান্ত প্রথমটা কী জবাব দেবেন ভেবেই পেলেন না, একটু আমতা আমতা করলেন, তারপর বললেন, 'বুঝলে মাধু, মনে হচ্ছে যেন এতগুলো বছর অন্ধকার টানেলের মধ্যে দিয়ে একটা গাড়ি চলছিল, সেই একঘেয়ে দীর্ঘ ক্লান্তির টানেল — আজ হঠাৎ আলো...'

মাধবীলতা চোখ কুঁচকে চাপা গলায় মৃদু আদুরে-ধমক যেমন হয় সেভাবে বললেন, 'ওহ্ তুমি এখনো সেই রকমই আছ... একটু আস্তে বলো, সবাই শুনছে —'

নীলকান্ত কি কারো পরোয়া করেন!

আটান্ন বছর বয়েস কি পরোয়া করার বয়স?

তিনি ফের বললেন, 'শুনেছিলাম তো শিলং-এ বিয়ে হয়েছিল তোমার, তারপর?'

'আর বোলো না। আমার ওনার তো ট্রান্সফারের চাকরি। শিলং-এ আট বছর, তারপর শিলচর, শিলিগুড়ি, হায়দ্রাবাদ হয়ে শেষের তিন বছর এই কলকাতা —'

'তিন বছর ধরে কলকাতায় আছ! অথচ এতদিন দেখাই হল না?'

'এরকমই হয়। দেখা হবার হলে প্রথম দিনেই হয় নইলে সারাজীবনেও নয়।'

কথাটার অন্য কোনো অর্থ আছে কি না ভেবে নিয়ে নীলকান্ত উদাস স্বরে বললেন 'তা বটে। তারপর? আছ কোথায়?'

'বাগুইহাটিতে ফ্ল্যাট কিনেছি। বড়ো রাস্তার ধারে। এসো না একদিন আমাদের ফ্ল্যাটে, খুব ভালো লাগবে। ষোলোশো স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাট, নীচে গ্যারেজ, অফুরন্ত আলো-হাওয়া। ব্যালকনিতে বসে বই পড়ি, লোকজন দেখি। এই যাঃ, শুধু নিজের কথাই গেয়ে যাচ্ছি, এবারে তোমার কথা বলো —' বলেই মাধবীলতা হাসলেন ঠিক যেমনভাবে কলেজ পালিয়ে পার্কের সবুজ ঘাসে নীলকান্তর কাঁধে মাথা হেলিয়ে হাসতেন।

নীলকান্তর উচ্ছ্বাস আবেগ উত্তেজনা একটু যেন থিতিয়ে এল। বোঝাই যাচ্ছে মাধু বড়োলোকের বউ। নইলে বাগুইহাটির মতো জায়গায় অত বড়ো ফ্ল্যাট কিনতে পারে?

বুকের কোনায় একটা যন্ত্রণা চিনচিন করে উঠল। নীলকান্তর জীবনটা তো বলতে গেলে কোম্পানির কোয়ার্টার্সেই কেটে গেল। সেই শ্যাওলাধরা বাইরের দেওয়াল। জায়গায়-জায়গায় পলেস্তারা খসে গেছে। ছাদের রড দাঁত বার করে আছে। মেরামতি নেই, চুনকাম নেই, তারই মধ্যে ঠাসাঠাসি গাদাগাদি খোঁয়াড়ের জীবন।

জীবনে যার নিজের বাড়িঘর বলতে কিছু হল না তার কি প্রকৃত ঠিকানা বলে কিছু থাকে? ছিঃ... সরকারি অফিসের কেরানি হয়ে পাহাড়-উঁচু ফাইলের আড়ালে মুখ গুঁজেই গোটা জীবনটা ফুরোতে চলল।

'কী হল, চুপ যে, তোমার কথা বলো, কতদিন পরে দেখা —'

অল্প ভেবে নীলকান্ত জোর করে হাসার চেষ্টা করলেন, বললেন, 'ফাইন... বেশ কেটে যাচ্ছে, এই তো রিটায়ার করব দু-বছর পর, তারপরই বাড়ি করব। তবে কিনা আমার আবার ফ্ল্যাট পছন্দ নয়। অন্নপূর্ণারও তাই। বাড়ির সামনে একটা ছোট্ট বাগান থাকবে... একটা জবা, একটা শিউলি গাছ, আর একটা দোলনা... হাঃ হাঃ, ওইটে আমার দীর্ঘদিনের সখ বুঝলে। শেষ জীবনটা বুড়োবুড়ি দু-জনে দিব্যি দুলে দুলে কাটাব —'

গুছিয়ে মিথ্যেটুকু বলতে পেরে মনে মনে প্রীত হলেন নীলকান্ত, ফের বললেন, 'বড়ো মেয়েটার বিয়ে দিয়েছি, ছেলেটা ব্যবসা করছে। তবে ব্যবসার ক্ষেত্রে তো পুঁজির বড়ো একটা ভূমিকা... তাই একটু লড়তে হচ্ছে, তবে ছেলে আমার দাঁড়িয়ে যাবে একদিন, খুব উদ্যমী। ছোটো মেয়েটা এবারে এম.সি.এ.-তে ভরতি হবে —'

মাধবীলতা মুগ্ধতার স্বরে বললেন, 'বাঃ চমৎকার, শুনেও আনন্দ। ক-জন এমন পারে শুনি? সত্যি বেশ আছ তা হলে। তা তোমার স্ত্রীর নাম বুঝি অন্নপূর্ণা? কী মিষ্টি নাম!'

মাধবীলতার কথা শেষ হতেই নীলকান্ত বললেন 'শুধু কী নামে? দেখতেও তেমনি। আর যা কাজের! সার্থক নাম, মানে কী বলি তোমায়', বলেই ফিসফিস করে ফের বললেন, 'এখনো কাছ-ছাড়া করতে চায় না।'

মাধবীলতা নিশ্চুপ। চোখ উদাস। মুখে যেন অবেলার মেঘ। তার স্বর ছেঁড়া-ফাটা শোনাল — 'আসলে কী জানো, জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে,বিধাতা তিন নিয়ে। ওখানে মানুষের ইচ্ছে-অনিচ্ছে ততটা মনে হয় খাটে না।'

নীলকান্ত তীক্ষ্ণ চোখে মাধবীলতার ভাবান্তর পরখ করলেন। তবে কী ওকে যতটা সুখী ভাবছেন ততটা সুখী নয়? নইলে কেন ওকথা বলবে? কেন ওর স্বর অতটা উদাস শোনাবে? মাধুরও তো খুব ভালো জায়গায় বিয়ে হয়েছে, কত ধনী পরিবারে। যাক, নীলকান্তর মনে একটু আগেও যে হীনমন্যতার ছায়া দেখা গিয়েছিল তা এখন কেটে গেছে।

'তা তোমার ছেলেমেয়েদের খবর বললে না!'

মাধবীলতা ছোটো করে হাসলেন — 'ছেলে তো আমেরিকায় চাকরি করে, এদেশে আসে কম। আর মেয়ের বিয়ে দিয়েছি আর্মি-অফিসারের সঙ্গে। জলন্ধরে থাকে।'

'আর তোমার স্বামী?'

'ওনার তো রিটায়ারের পর জমজমাট ব্যবসা। এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের। আজ দিল্লি কাল

বম্বে পরশু দুবাই।'

'তার মানে ঘরে তুমি একা?'

'ওই হল আর কী। একাও নই দোকাও নই।'

মাধবীলতার হাসিটা কষ্টার্জিত বুঝলেন নীলকান্ত।

এই জায়গাটায় তিনি অবশ্যই ওর চেয়ে এগিয়ে। না, নীলকান্তর কোনো নিঃসঙ্গতা নেই। একঘর লোক। সারাদিন কাইকিচির। নীলকান্ত যে এই একটা জায়গায় মাধবীলতার চেয়ে কতটা এগিয়ে এবং এই এগিয়ে থাকার কৃতিত্বটা যে তারই সেটা বোঝাতে গিয়ে বললেন, 'বুঝলে মাধু, সেইজন্যই আমি মেয়ের বিয়ে দিয়েছি ঘরের কাছে। যেদিন ইচ্ছে হয় সেদিনই গিয়ে মেয়েকে দেখে আসি। আর নাতিটাও হয়েছে তেমনি। এলেই আমার কাঁধে চাপবে হেঃ হেঃ, বড্ড ন্যাওটা —'

মাধবীলতার চোখ ছলছল করছে। সচকিত হয়ে উঠলেন নীলকান্ত। তবে কী নিজের সঙ্গময়তার বাখান দিতে গিয়ে মাধুর নিঃসঙ্গতাকে আঘাত করে ফেলেছেন? না... না... তিনি তা চান না। মাধু কষ্ট পেলে সেটা ঘুরে নীলকান্তর বুকেই বাজবে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গ বদলে নীলকান্ত জিজ্ঞাসা করলেন মশকরার ঢঙে — 'তা এখানে? শরীরের কোনো অঙ্গ বিকল হয়েছে?'

মাধবীলতা হেসে বললেন, 'আমি তো জীবনভর হৃদয়ঘটিত ব্যাপার নিয়েই জেরবার। শেষ অবধি দেড় বছর আগে হার্টে বাই-পাস সার্জারি হয়েছে। তারপর থেকেই ডক্টর সাক্সেনার কাছে প্রতি তিনমাস অন্তর এসে চেক-আপ করিয়ে যাই। তোমার কী হয়েছে?'

'আর বোলো না। খুচরো পাপ। হাঁটুটা বড্ড ভোগাচ্ছে। ডাক্তার সান্যালকে দেখাব। হাঁটতে-চলতে বড্ড কষ্ট —'

এমন সময় মাধবীলতা চ্যাটার্জীর নাম মাইক্রোফোনে ভেসে আসতেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন — 'আসি তবে, পরে কথা হবে —' বলেই হেঁটে গেলেন ডক্টর সাক্সেনার চেম্বারের দিকে।

নীলকান্ত দেখতে লাগলেন মাধুর হেঁটে যাওয়া। এই বয়সেও শরীরটা কী সুন্দর রেখেছে। লম্বা। ছিপছিপে। আর কী গায়ের রং। যেন দুধে আলতা। গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নীলকান্ত। পরক্ষণেই নিজের মনকে প্রবোধ দিলেন, হাঁপানির টানটা অন্নপূর্ণাকে শীতকালে ভোগায় বটে, হার্ট কিন্তু এখনো মজবুত। সারাদিন এখনো খাটতে পারে ক্লান্তিহীন। কতগুলো করে জামাকাপড় রোজ আছড়ে কাচে! হুঃ, পারবে মাধু?

একটু পরে নীলকান্তর নামও ডাকা হল। তিনি খোঁড়াতে খোঁড়াতে উঠে গেলেন ডাক্তারের চেম্বারের দিকে।

আশ্চর্য ব্যাপার। ডাক্তার দেখিয়ে দু-জনে বেরিয়ে এলেন প্রায় একই সঙ্গে। দু-তিন মিনিট ব্যবধানে।

এবারে মাধবীলতাই প্রায় এগিয়ে এসে কথা বললেন, 'তোমার দেখানো হয়ে গেল। কী বললেন ডাক্তার?'

ঝেঁঝে উঠলেন নীলকান্ত, 'হুঁঃ, এরা নাকি সব বিখ্যাত ডাক্তার। কচু... কচু... কিছু হলেই শুধু

অপারেশন। বলে কিনা মালাইচাকি বদলাতে হবে। দেড় লাখের অপারেশন, বোঝো কাণ্ড। আমি বাবা এই বয়সে ওসব কাটাছেঁড়ায় নেই। তার চেয়ে না হয় খুঁড়িয়েই হাঁটব বাকি জীবনটা।'

'তাতে যে কষ্ট ভোগ করতে হবে শেষ দিন অবধি।'

'হোক কষ্ট। এই পৃথিবীতে কার কষ্ট নেই বলতে পারো? কারোটা বোঝা যায়, কারোটা যায় না।'

মাধবীলতা চুপ। দু-জনেই হেঁটে যাচ্ছেন করিডোর দিয়ে। গেটের কাছে এসে দু-জনেই থামলেন।

দীর্ঘ তিন দশক পরে দেখা হওয়া এক অসফল প্রেমিকযুগল। এখনই ওরা আবার বিচ্ছিন্ন হবে। এবং তারপর তাদের জীবদ্দশায় আমার দেখা হবে কি না কেউ জানে না।

মাধবীলতা অস্ফুটে ডাকলেন 'নীল'।

'বলো মাধু।'

'জীবনে ভালোলাগার মুহূর্তগুলো বড়ো কম তাই নয়?'

'হ্যাঁ কম বলেই তা বুকে দেগে বসে যায়, ভোলা যায় না।'

গেটের বাইরে তখনই একটা চকচকে কোয়ালিস গাড়ি এসে দাঁড়াল। কালো কাচ নামিয়ে ড্রাইভার ডেকে উঠল 'মেমসাহেব'।

নীলকান্ত অবাক দৃষ্টিতে একবার ওই বিশাল দামি গাড়ি একবার মাধবীলতার মুখের দিকে তাকিয়ে বোকার মতো শুধোলেন —

'তোমার গাড়ি?'

'হ্যাঁ, এটা ছাড়াও আমার একটা জেন আছে, ওটা আমিই চালাই। তা ছাড়া ওনার একটা স্যান্ট্রো-ও আছে।'

মুহূর্তে নীলকান্তর মুখ বিস্বাদ হয়ে উঠল। হাঁটুর ব্যথাটা যেন বাড়ছে। তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন 'দু-জনের জন্য তিনটে গাড়ি?'

'হ্যাঁ, কিন্তু গতি নেই। মাঝে মাঝে মনে হয় একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, অন্ধকার।'

ততক্ষণে নীলকান্ত এগিয়ে গেছেন ক-পা। সঙ্গে সঙ্গে মাধবীলতা এসে একটা হাত ধরে বললেন 'হাঁটুতে অমন ব্যথা নিয়ে হেঁটে যাবে নাকি!'

' না, বাসে যাব।'

'কেন, আমি পৌঁছে দিলে ক্ষতি কী?'

নীলকান্ত চমকে উঠলেন। না, তিনি চান না তাঁর থোড়-বড়ি-খাড়া জীবনের দৈন্যরূপ মাধবীলতা স্বচক্ষে দেখুক। পলেস্তারা-খসা সরকারি আবাসনের দাঁত বার করা ইটের জোড়ায়-জোড়ায় নীলকান্তর জীবনের রোজনামচা অপ্রকাশ্যই থাক।

মাধু যদি পৌঁছে দিয়ে অন্নপূর্ণার সঙ্গে আলাপ করতে চায়? ওকে বসাবে কোথায়? তোশক গুটিয়ে পায়াভাঙা তক্তপোশে? ছারপোকা টিপে মারার দাগের মধ্যে নাতির লাল-রঙে এবিসিডি মকশো-করা শাদা দেয়ালের সামনে বসিয়ে কেন নীলকান্ত তার বিপর্যয়ের ছবি তুলে দেবে মাধুর হাতে?

না... না... মাধুকে ওখানে বসানো যায় না।

একটু ভেবে নীলকান্ত বললেন 'আসলে আমি এক বন্ধুর বাড়ি হয়ে ফিরব —'

'তা হলে সেখানেই পৌঁছে দি।'

'না... না... ওদের গলিতে তোমার এই ঢাউস গাড়ি ঢুকবে না।'

মাধবীলতা হেসে বললেন 'আসলে তোমাকে আজ ছাড়তেই ইচ্ছে করছে না। কত বছর পরে দেখা।'

নীলকান্ত হাঁটুর যন্ত্রণা ভুলে সোজা হয়ে দাঁড়াল — 'সত্যি বলছ মাধু?'

নির্বাক মাধবীলতা ধীরে ঘাড় নাড়লেন। তারপর ফিসফিস করে বললেন, 'পুরোনো দিনের সেসব কথা কি ভোলা যায়? কে জানে হয়তো তোমরা ছেলেরা তা পারো, মেয়েরা পারে না।'

নীলকান্তর আটান্ন বছরের দেহে বিদ্যুতের শিহরন। তবে কী মাধু তাকে এখনো ভালোবাসে? নইলে ওভাবে চেয়ে আছে কেন? কেন মাধুর চোখের তারায় অচেনা আলোর ঝিলিক?

নীলকান্তকে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকতে দেখে মাধবীলতা বললেন, 'তা হলে এক কাজ করা যাক, একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসি, একটু চা কফি বা যা হোক কিছু খাই তারপর ওঠা যাবে। জানো নীল, কত কথা জমে আছে বুকে। না, আজ তোমাকে ছাড়তেই ইচ্ছে করছে না। চলে এস —'

এরপরও কি না করা যায়?

নীলকান্ত পিছনের দরজা দিয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন, মাধবীলতা ঘাড় নেড়ে বললেন, 'সামনে এসো, আমার পাশে।'

উঠতে গিয়ে নীলকান্তর হাঁটু যন্ত্রণায় চিড়িক মেরে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মাধবীলতা হাত বাড়িয়ে বললেন 'ধরে ওঠো... ধীরে...।'

রেস্তোরাঁয় কফির অর্ডার দিয়ে দু-জনে মুখোমুখি। পরদা ঘেরা কেবিন। মাধবীলতার পোশাক থেকে দামি পারফিউমের গন্ধ। সেই গন্ধের দোলনায় চেপে নীলকান্ত ক্রমশ পেছিয়ে চলেছেন। পিছিয়ে কী মাধুও যাচ্ছে না? যাচ্ছে।

নীলকান্ত দেখতে পাচ্ছেন মাধুর মুখের রং-বদল ঘটছে। দুই নির্বাক প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ার মধ্যে ঢেউ খেলছে তিন দশকের পুরোনো দিনগুলি-রাতগুলি।

একসময় মাধবীলতা বলে উঠলেন, 'মনে আছে নীল সেই যেবার আমার টাইফয়েড হয়েছিল, পনেরো দিন বিছানায়, তুমি আমাদের বাড়ির দারোয়ানের চোখ এড়িয়ে পাঁচিল টপকে আমার জানলা দিয়ে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা পাঠিয়েছিলে; তার মধ্যে নীল কাগজের চিঠি, মনে আছে? ওঃ, সে-সব দিনের কথা মনে পড়লে এখনো বুকের মধ্যে কী যেন হয়।'

নীলকান্ত ঘাড় নেড়ে বললেন, 'মনে নেই আবার! সব মনে আছে। কেন, তোমাদের পাড়ার হিমাংশু বলে ছেলেটা, রাস্তাঘাটে তোমার পেছনে লাগত বলে একদিন হকি স্টিক দিয়ে কেমন পিটিয়েছিলাম?'

'সত্যি, কী ডানপিটে ছিলে তুমি। সেই মানুষটাই আজ কেমন যেন হয়ে গেছ, চেনাই যায় না।'

নীলকান্ত জবাব দিলেন না। মাধু মিথ্যে বলেনি। কলেজে হানড্রেড, টু-হানড্রেড মিটার স্প্রিন্টে নীলকান্ত বরাবর ফার্স্ট। ইন্টারকলেজ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান। নীলকান্তর তখন নামই হয়ে গিয়েছিল স্পিড-কিং। পড়াশোনাতেও কি যেমন-তেমন! প্রথম সারির স্টুডেন্টদের মধ্যেই নাম থাকত। ডিবেট বা তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় ধারে কাছে ঘেঁষতে পারত কেউ? কলেজের বাৎসরিক ম্যাগাজিন হোক বা যে কোনো অনুষ্ঠান, ছাত্রছাত্রীদের প্রতিনিধি বলতে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন নীলকান্ত।

ছিল, কত প্রতিভা ছিল। এমনি এমনিই কী আর মাধবীলতার মতো মেয়ে তার প্রেমে পড়েছিল! দীর্ঘ সাত বছরের প্রেম, ভালোবাসা। কিন্তু ওই যে মানুষ ভাবে এক আর ঈশ্বর ভাবেন অন্য। আচমকা বাবা মারা যাওয়ার পর সেই যে সংসারের জোয়াল ঘাড়ে চেপে বসল, সেই ঘাড় আর সিধে করা গেল না। মাধুর ঘরেও তখন বিয়ের জন্য প্রচণ্ড চাপ। কত অশান্তি। এদিকে বিধবা মা আর ভাইবোন নিয়ে অকূল পাথারে নীলকান্ত।

শেষে বাধ্য হয়েই মাধু বাবা মায়ের পছন্দসই পাত্রের সঙ্গে বিয়েতে রাজি হয়েছিল।

তার আগে অবশ্য নীলকান্ত নিজেই মাধুকে অনেকবার অনুরোধ করেছিল যেন সে মায়ের পছন্দ করা পাত্রের সঙ্গে বিয়েতে মত দেয়।

কফি এল। চুমুক দিয়ে মাধবীলতা বললেন, 'কাল এসো একবার আমাদের ফ্ল্যাটে। খুব ভালো লাগবে আমার। আসবে?'

'কিন্তু কাল যে আমায় অফিস যেতেই হবে।'

'ঠিক আছে, সন্ধের পর এসো। গল্পগুজব করে রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে ফিরবে। প্লিজ নীল —'

নীলকান্ত চমকে উঠলেন। ঠিক এই স্বরেই কলেজের মাধু আবদার করত — কী আন্তরিক, কী আবেগ। এখনো ঠিক তেমনি।

'আচ্ছা, যাব তা হলে —'

'এই নাও, আমার ফ্ল্যাটের ঠিকানা' — মাধবীলতা একটা সুদৃশ্য কার্ড হাতে তুলে দিলেন। এবার বিদায়ের পালা।

'সময়টা বড়ো ভালো কাটল মাধু।'

'আমারও।'

'সব পুরোনো, পুরোনো হয় না।'

'ঠিক বলেছ। কাল এসো কিন্তু, অপেক্ষায় থাকব। আর একটা জিনিস দেখাব।'

'কী জিনিস?'

'এখন বলব না।'

'না, এখনই শুনব' — যৌবনের জেদই যেন অবিকৃত বেরিয়ে এল নীলকান্তর গলা থেকে।

মিষ্টি হেসে মাধবীলতা বললেন, 'জেদটা দেখছি এখনো সেইরকমই আছে —'

'কী দেখাবে বললে না।'

'বলছি বাবা বলছি। তোমার লেখা প্রেমপত্রগুলো। যত্ন করে সব রেখে দিয়েছি। ইস, কী সুন্দর সুন্দর চিঠি। জানো নীল, আজও যখন মন খারাপ লাগে ওগুলো পড়ি। কী ভালো যে লাগে। মানুষ বুড়িয়ে যায় কিন্তু প্রেম বুড়োয় না —'

মাধবীলতা চলে গেলেন। নীলকান্ত জনারণ্যে। ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, 'ইস, বেলা হয়ে গেল।'

ঘরে ফিরতেই অন্নপূর্ণা উদ্বিগ্ন মুখে এগিয়ে এলেন। আপাদমস্তক নীলকান্তকে দেখে বললেন, 'এত দেরি! আমি ভাবলাম বুঝি রাস্তায় কিছু একটা ঘটল।'

'কিছু একটা মানে?'

'খোঁড়া পা... বলা তো যায় না, হয়তো বাসে উঠতে গিয়ে —'

মাধবীলতার সঙ্গসুধা লাভের পর ঘরে এসে বউয়ের মুখে 'খোঁড়া পা' শব্দটা শুনেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন নীলকান্ত, খিঁচিয়ে উঠলেন, 'খোঁড়া পা? এই খোঁড়া পা নিয়েই তো অফিস করছি বাজার করছি এই সংসারের ঝাঁকা বইছি। বলি তোমার বাপের বাড়ির লোক এসে কী আমার কাজগুলো করে দিয়ে যায়?'

নীলকান্তর রাগের কারণ বুঝতে পারলেন না অন্নপূর্ণা। তবে খোঁড়া শব্দটার প্রতি স্বামীর তীব্র অনীহা বুঝতে পেরে সেটা পালটাতে ব্যগ্র হয়ে ফের নরম স্বরে বললেন 'আহা... খোঁড়া বলতে কি আমি সেই খোঁড়া বলতে চেয়েছি। তোমার হাঁটুতে ব্যথা, চলতে-ফিরতে কষ্ট, সেজন্যই তো অষ্টপ্রহর চিন্তায় থাকি; দেরি হলে মনে কত দুশ্চিন্তা হয় তা জানো! সেই সাড়ে আটটায় ঘর থেকে বেরিয়েছ এখন হল গে একটা —'

নীলকান্তর রাগ তখনো মরেনি — 'আমার চেয়ে কমবয়েসি কত লোকের যে হাঁটুতে মাজায় ঘাড়ে বুকে কত রকমের ব্যথা তা জানো! হাসপাতালে থিকথিক করছে শুধু ব্যথার মানুষ।'

'সে তো সত্যি। তবে ডাক্তারবাবু কী বললেন?'

অপারেশনের কথাটা চেপে গিয়ে নীলকান্ত বললেন, 'কী আর বলবেন, ওই গত-বাঁধা বুলি। ওষুধ আর ব্যায়াম — দাও গামছা লুঙ্গি দাও —'

পোশাক ছেড়ে নীলকান্ত লুঙ্গি পরলেন। গামছা আর তেলের বাটি নিয়ে রোদে বসে হাত-পা-বুকে তেল মাখতে মাখতে ভাবতে লাগলেন মাধবীলতার কথা। কাল রাতে ওদের বাড়িতে আমন্ত্রণ করেছে মাধু। খাওয়া-দাওয়া সেরে ফেরার কথা।

অন্নপূর্ণা মাধুর বিষয়ে তিলমাত্র জানে না। যৌবন বয়সের প্রেমপর্ব আজ এই প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে বউকে বললে হিতে বিপরীত হতে পারে। তা ছাড়া অন্নপূর্ণার মধ্যে এখনো সেকেলে মানসিকতা রয়ে গেছে, শুনলে হয়তো কেঁদেকেটে একসা হবে।

মুখে অল্প তেল ঘষতেই নীলকান্ত টের পেলেন গত দু-দিন দাড়িকাটা হয়নি। ছিঃ ছিঃ, তা হলে নিশ্চয়ই তার এই না-কাটা পাকা দাড়ি দেখে মাধু তাকে চিনতে বারবার ভুল করছিল।

লজ্জায় গুটিয়ে গেলেন নীলকান্ত। চান করার আগে দাড়ি কাটতে বসলেন। দাড়ি কাটা শেষ হতে নিজের মুখটা ছোটো আয়নায় খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখলেন। গাল ভেঙে গেছে. চোখের তলায় কালচে ছোপ। সদ্য দাড়িকাটা গালেও কোনো জৌলুস নেই।

নীলকান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেললেন — 'ঠিক বলেছ মাধু, বড্ড খারাপ হয়ে গেছে চেহারাটা—'

বাথরুম থেকে একগাদা কাচা কাপড় নিয়ে বেরুচ্ছিলেন অন্নপূর্ণা, থমকে দাঁড়ালেন — 'একা একা কী বকবক করছ! মাধু আবার কে?'

নীলকান্ত সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিলেন — 'কী বললে? মাধু? কী যে শোনো তুমি! কানটা এবার ডাক্তারকে দেখাও। হাসপাতালে রাধু দত্তর সঙ্গে দেখা। তা ওর যা স্বভাব। দেখা হতেই বলল বড্ড খারাপ হয়ে গেছে চেহারাটা। ওর কথাটাই মনে মনে ভাবছিলাম, তুমি কিনা শুনলে মাধু —'

'ওই একই হল। তবে শরীরটা যে ভেঙেছে তা তো মিথ্যে নয় —'

রাত্তিরে নীলকান্তর ছেলে নবকান্ত যখন দোকান বন্ধ করে ঘরে ফিরল, নীলকান্ত তখন আলমারি খুলে তার ইস্তিরি করা জামাকাপড় একবার বার করছেন একবার ঢোকাচ্ছেন।

অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করলেন 'কী খুঁজছ?'

'একটা ভালো জামা প্যান্ট, যেটা পরে ভদ্র জায়গায় যাওয়া যায় —'

'তা হলে গেল পুজোর জামা প্যান্টটাই বার করো যেটা মামণি দিয়েছিল —'

বড়ো মেয়ে মামণি এখনো প্রতি বছর পুজোয় বাবা-মাকে জামাকাপড় দেয়। অন্নপূর্ণা উদ্যোগী হয়ে বার করে দিলেন গেল পুজোরটা।

মুখ কুঁচকে নীলকান্ত বললেন 'ধুত এই বয়সে চেক শার্ট মানায়? তা ছাড়া প্যান্টটার কোমরও ঢিলে হয়ে গেছে।'

নবকান্তর বউ বুলা বলল, 'তা হলে আপনার ছেলের বেল্টটা লাগান। জামা গুঁজে পরবেন, দারুণ স্মার্ট লাগবে —'

অন্নপূর্ণা হি হি হেসে উঠতেই নীলকান্ত ধমকে উঠলেন, 'কচু লাগবে। তোমরা আমাকে জোকার সাজাতে চাও? বরং ভালো একটা পাঞ্জাবি হলে বেশ হত। প্রতি বছরই ভাবি একটা ঘিয়ে রঙের দামি কাপড়ের পাঞ্জাবি বানাব কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে না —'

সঙ্গে সঙ্গে বুলা বলল, 'তা হলে বাবা আপনি বরং আপনার ছেলের নতুন বানানো পাঞ্জাবিটা পরে যান। কী সুন্দর কাজ করা গলায়। ওটাও তো ঘি রঙের। দু-জনের তো একই মাপ। খুব সুন্দর লাগবে।'

বুলার কথাটা মনে ধরল। মাধবীলতার সব সময়ই প্যান্টশার্টের চেয়ে পাঞ্জাবি-পাজামা পছন্দ। মাধু বলত, 'প্রেম, পদ্য আর পাঞ্জাবি-ধুতি — এ নাকি বাঙালি ছাড়া আর কাউকে মানায় না।' কত বছর আগের হলেও মাধুর পছন্দ-অপছন্দ আজও মনে আছে নীলকান্তর।

নীলকান্ত ঈষৎ আগ্রহ দেখিয়ে শুধোলেন, 'তা ছেলেরটা আমাকে মানাবে বউমা?'

'মানাবে মানে, দারুণ দেখাবে।'

'তবে বার করো দেখি —'

বুলা আলমারি খুলে ইস্তিরি করা পাঞ্জাবিটা বার করে দিতেই অন্নপূর্ণা চোখ কুঁচকে বলল, 'বাব্বা... সাজের কী ঘটা! কোথায় যাবে?'

'তুমি চিনবে না, আমার অফিসের কলিগ। দু-দিন আগে রিটায়ার করেছে। কাল বাড়িতে নেমন্তন্ন করে অফিস-স্টাফদের খাওয়াবে। ডিপার্টমেন্টের অফিসাররাও আসবেন।'

নবকান্তর পাঞ্জাবিটা হাতে নিয়ে নীলকান্ত অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তারপর বুলাকে বললেন, 'এখন রেখে দাও, কাল সন্ধ্যায় দিও —'

পরদিন অফিস থেকে ফিরে হাতমুখ ধুয়ে এক কাপ চা খেলেন নীলকান্ত। তারপর সন্ধ্যা একটু ঘন হতেই ছেলের পাঞ্জাবি পরলেন। সঙ্গে পাজামা। অনেকবার চুলে চিরুনি চালালেন। গলায় পাউডার। বউকে বললেন 'দুটো লবঙ্গ দাও তো —'

অন্নপূর্ণা লবঙ্গ হাতে দিয়ে বললেন, 'আহা সাজের কী বাহার!' বুলা হাসিতে যোগ দিয়ে একটা কাপড়ের সাইড ব্যাগ নীলকান্তর কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে বলল, 'বাবাকে এখন কবি কবি দেখাচ্ছে —'

নীলকান্ত আয়নায় নিজেকে বারবার দেখলেন। তারপর বললেন, 'একটা রুমাল দাও তো বউমা —'

বুলা একটা রুমালে অল্প সেন্ট ঢেলে বলল, 'নিন... খুব সুন্দর গন্ধ —'

চৌকাঠের ওপারে চটি। চকচক করছে। বুলা বলল, 'সকালে মুচি ডেকে পালিশ করিয়ে রেখেছি।'

নীলকান্ত বেরিয়ে পড়লেন। অন্ধকার রাস্তায় কিছুটা হেঁটে মোড় অবধি গিয়েও আবার ফিরে এলেন ঘরে।

'কিছু নিতে ভুলে গেছ নাকি?' অন্নপূর্ণা শুধোলেন।

নীলকান্ত জবাব দিলেন না। চুপচাপ বসে পড়লেন বারান্দার চেয়ারে। সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। হুঁশ নেই।

'কী হল বাবা, যাবেন না?' বুলা প্রশ্ন করল।

নীলকান্ত ছেঁড়াফাটা স্বরে বললেন, 'ভেবেছিলাম তো যাব, কিন্তু পথে বেরিয়ে কে যেন ভেতর থেকে টেনে ধরছে —'

বুলা শাশুড়ির কানে কানে বলল, 'আসলে বাবারও তো রিটায়ার করতে দু-বছর বাকি, তাই কলিগের রিটায়ারের নেমন্তন্ন খেতে মন কেমন করছে —'

অন্ধকারে বসে নীলকান্ত দেখতে পাচ্ছেন একটার পর একটা ঢেউ... তিরিশ বছরের ঢেউগুলো সব আছড়ে পড়ছে স্মৃতির বেলাভূমিতে। তিনি বসে আছেন স্থিরচিত্রের মতো। তিন দশকের পুরোনো একটা ছবিকে নতুন একটা ফ্রেমে আটকানোর ব্যর্থ প্রয়াস করে চলেছেন।

সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। এই-ই ভালো। মুখোমুখির চেয়ে অন্তর্মুখী।

এমন সময় নীলকান্তর নাতি ঘুম ভেঙে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল।

বিভাব

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

১৪১১

কমলকুমার মজুমদার সংখ্যা

হার্ডব্যাক - ২৫০ টাকা

আঁকা ছবি

৬০টি অপ্রকাশিত বহুবর্ণ ছবি

বইয়ের রঙিন প্রচ্ছদ

প্রচ্ছদের খসড়া

কয়েকটি শাদা কালো ছবি

আলোকচিত্র

পারিবারিক অ্যালবাম (৪ বছর বয়স থেকে)

যৌবনে কমলকুমার

বন্ধু এবং ভাইবোনেদের সঙ্গে কমলকুমার

হরবোলা পর্বের ছবি

দরিদ্র শিশুদের শিক্ষাদানরত কমলকুমার

দুর্লভ 'উষ্ণীষ' এবং 'তদন্ত' পত্রিকার প্রচ্ছদ

প্রবন্ধ ও গল্প

১৪টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ (ইতিপূর্বে গ্রন্থে অসংকলিত) ও একটি গল্প

তথ্যচিত্র

লিখিত ৩টি তথ্যচিত্রের ভাষ্যের সম্পূর্ণ পাঠ

এ-ছাড়াও কমলকুমার নির্দেশিত নাটকের প্রচারপত্র, প্রবেশপত্র, শিশুপাঠ্য ইংরেজি গ্রন্থের অলংকরণ সহ আরো বহু কিছু।

অঙ্কভাবনা

দুর্লভ অঙ্কবিষয়ক পত্রিকার দুটি সংখ্যার সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রণ।

এখনো পাওয়া যাচ্ছে

সহমরণ

কামাল হোসেন

প্রথম সন্তানটির মতো দ্বিতীয় সন্তানটিকেও অন্তিম শয্যায় শুইয়ে বাড়ি ফিরে এল আবুল। পাড়াপড়শি বয়স্ক সমবয়স্ক সকলে বাড়িতে পৌঁছে দিল তাকে। ভেতর ঘর থেকে তার বউ নার্গিসের কান্না ভেসে আসছিল। বাইরের ঘরের চৌকিটায় সে পর্যুদস্ত মানুষের মতো পাছা থেবড়ে বসল।

মুসাচাচা বললেন, 'কী করবে বাবা, হায়াত মওত আল্লার হাতে।'

আমিরচাচা বললেন, 'তোমার পরিবারের উপর জ্বেনের দৃষ্টি পড়েছে কি না সেটাও দেখতে হবে। একদিন সময় করে মেজলা হুজুরের কাছে চলো। উনি আমল করে ঠিক একটা দিশা বাতলে দেবেন।'

তার বাল্যবন্ধু খালেক কিছু না বলে পিঠে একটু চাপ দেয়।

আবুল অনুভব করে বাইরের ঘরের এই বিছানাতেও তার প্রথম পুত্রসন্তান আফজল আড়াই বছর বয়স পর্যন্ত খেলা করেছে। পরের কন্যাসন্তান নাজমা দেড় বছরেই চলে গেল।

খালেক সকলকে ডেকে নিয়ে বলল, 'এখন আমাদের চলে যাওয়া উচিত। ওরা একটু একলা থাকুক। কাছাকাছি আত্মীয়স্বজন নেই, তবে আমরা আছি। আমার বউ শাকিলা ভিতরে আছে। ও থাকছে। মুখে হাতে পানি দে আবুল। শাকিলা খাবার এনেছে। মুখে কিছু দিতে হবে। রাতের দিকে আমি আসব।'

মুসাচাচা জড়িয়ে ধরলেন আবুলকে। ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন, 'আমরা বুড়ো মানুষ জমি আঁকড়িয়ে পড়ে আছি। যাদের বাঁচার কথা, তারা এভাবে অকালে চলে যাচ্ছে।'

'সন্তানের মৃত্যুর মতো বড়ো শোক মানুষের জীবনে আর হয় না।' মৃদু কণ্ঠে আমিরচাচা বললেন ।

সকলে উঠে দাঁড়ালেন। মুসাচাচা পাড়ায় সব থেকে বয়স্ক লোক। সকলেই মান্য করে। গম্ভীর গলায় তিনি বললেন, 'খালেক থাকুক। আমরা এখন আসি।'

কাজের মেয়েটি ট্রেতে কয়েক গ্লাস সরবত নিয়ে এল। বোঝা গেল খালেকের স্ত্রী শাকিলার সামাজিকতা রক্ষার ইচ্ছে।

নীরবে সরবত পান করে সকলে চলে গেলেন। খালেক চুপচাপ একপাশে বসে থাকে। অন্যমনস্ক গলায় আবুল শুধায়, 'আমি কী কখনো পাপ করেছি খালেক? আমার কপালে বার বার দু-বার এই ঘটনা ঘটল কেন?'

'কী সব পাগলের মতো কথা বলছিস? কোথাও একটা অসুবিধা হচ্ছে। কলকাতার ভালো ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। চিকিৎসাবিজ্ঞান এত এগিয়ে গেছে এই সমস্যারও সমাধান নিশ্চয়ই আছে।' খালেক বলল।

বসিরহাটের ভ্যাবলা হল্টের কাছে তাদের বাড়ি। সাধারণ গ্র্যাজুয়েশন করে দুই বন্ধু

প্রাইমারি স্কুলের টিচার। সামান্য খেত জমি পুকুর বসতবাড়ি এই নিয়ে তাদের সামান্য জীবন। খুব বড়ো কিছু অ্যামবিশন নেই, একেবারেই সাদামাটা গার্হস্থ্য জীবন, সামান্য ভালোবাসা, এটুকুই তাদের জীবনের চাওয়া-পাওয়ার ইতিবৃত্ত। তবু তার জীবনে এমন অঘটন পর পর দু-বার ঘটল, তার কোনো ব্যাখ্যা নেই।

প্রথমবার জন্মের সময় বেবির ওজন ছিল চার কেজি। স্বাভাবিকভাবেই ওভার ওয়েট বেবি। তারপর কিছুদিন পরেই দেখা গেল বাচ্চা কিছু খেতে চাইছে না। বসিরহাটের চাইল্ড স্পেশালিস্টদের কাছে বারবার দেখিয়ে কোনো লাভ হল না। ওই বিপুল দেহ শুকিয়ে কাঠি হয়ে গেল। নার্গিস ধৈর্য হারিয়ে মারধোর করে এক আধ গ্রাস খাওয়ানোর চেষ্টা করত। কিন্তু বাচ্চার কী অদ্ভুত জেদ। স্রেফ না খেয়ে শিশু দুটি একইভাবে মৃত্যুবরণ করল।

'তুই কি মনে করিস উপরির দোষ কিছু আছে?' আবুল জিজ্ঞেস করে।

'ফের উলটো পালটা কথা? এটা একটা অন্য ধরনের অসুখ, সাধারণ জ্বর-পায়খানা-কাশির ট্রিটমেন্ট করা ডাক্তার কিছু বুঝবে না। আমি অনেকদিন ভেবেছি কলকাতার কোনো বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখাতে হবে। এবার আর ব্যাপারটা ভাগ্যের উপর ফেলে রাখলে হবে না। দাঁড়া, আমাদের বন্ধু রথীনের ভাই দেবেশ আর জি করে পড়ে। এ-ব্যাপারে ও সঠিক ইনফরমেশন দিতে পারবে মনে হচ্ছে।'

'দ্যাখ্, যা ভালো মনে করিস।' আবুল বলে।

খালেক বলে, 'তা হ্যাঁ রে, ভাবীর বাপের বাড়িতে খবর পাঠিয়েছিস?'

'কাল একটা পোস্টকার্ড লিখে দেবো। বাপ-মার বয়স হয়েছে। দুটো ভাই জমিজমা নিয়ে ব্যস্ত। আসবার সময় পাবে না। আর এলেই বা কী লাভ? এমনিতে সারা বছর বোনের খবর রাখে না।'

'তবু শোকের সময় বাপের বাড়ির লোকজন কাছে থাকলে মেয়েদের মনে শান্তি হয়।'

'আমার নিজের তো বাপ-মা নেই। নিকট-আত্মীয় বলতে তোদেরকেই জানি। বিপদ আপদে তোরা দু-জনে ছুটে আসিস।'

'সে তো আসতেই হবে।'

চুপচাপ চৌকির উপর শুয়ে পড়ে আবুল। খালেক তার বউকে উঁচু গলায় ডাকে। শাকিলা বেরিয়ে এসে বলল, 'আমরা চারজনেই একটু কিছু খাবো। আমি খাবার এনেছি।'

আবুল ম্লান মুখে বলল, 'কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।'

শাকিলা সবার উপরেই স্নেহ এবং খবরদারি চালায়। আর আবুল তার স্বামীর বাল্যবন্ধু। নার্গিস তার প্রাণের সখী বললে কম বলা হয়।

খালেক আবুলের মাথার চুলে হাত বুলায়। অশ্রুভরা চোখে আবুল ওদের দু-জনের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায়।

খালেক নরম গলায় বলে, 'আমাদের স্কুলের বিনয় স্যার শ্মশান-বৈরাগ্য সম্পর্কে মুসোলিনির একটা কথা খুব বলতেন, তোর মনে আছে নিশ্চয়ই, মানুষ যখন কবরখানায় কাউকে সমাধি দিতে যায়, তখন মনে হয়, জীবনের এটাই শেষ, এটাই আসল গন্তব্য, তখন

বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাই চলে যায়। আবার সেই মানুষ যখন সংসারে ফিরে আসে, নতুন উৎসাহে বেঁচে থাকার জন্য যুদ্ধ চলতে থাকে।'

শাকিলা বলে, 'এটাই যে জীবনের নিজস্ব নিয়ম।'

২

পার্ক স্ট্রিটের এই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আবুলদের বন্ধু রথীনের ভাই ডাক্তারি-ছাত্র দেবেশ যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিল। ওদের কলেজের প্রফেসর। এই দম্পতির দুটি সন্তানের এই রকম একইভাবে বিচিত্র মৃত্যুবরণের ঘটনা শুনে উনি নিজেও উৎসাহ বোধ করেছেন।

বেশ কয়েকবার যাওয়া হল, হাজার রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা হল, ওরা দু-জনে বুঝতে পারছিল ডাক্তারবাবুও খুব বিচলিত ওদের সমস্যা নিয়ে।

শেষ পর্যন্ত একদিন ওদেরকে নিয়ে বসলেন তিনি। দেবেশও ছিল।

'এটা একটা রেয়ার কেস দেবেশ। নেট সার্ফ করে দেখলাম, কখনো কখনো এমনটা ঘটে থাকে।'

'আমাদের অসুখটা কী ডাক্তারবাবু?' আবুল শুধায়।

'যেটা বাস্তব, আপনাদের কোনো অসুখ নেই।'

'অসুখ নেই?' নার্গিস শুধাল।

'তা হলে বাচ্চাগুলো এভাবে মারা যাচ্ছে কেন?' দেবেশ শুধাল।

'স্বামী স্ত্রী দু-জনের সবরকম পরীক্ষা কলকাতায় বসে লেটেস্ট যতটা সম্ভব, সব করিয়েছি। দু-জনেই হান্ড্রেড পারসেন্ট সুস্থ। আর পাঁচটা পুরুষ ও নারীর মতো বাবা-মা হতে কোনো অসুবিধা নেই। মায়ের বয়স এখন ছাব্বিশ, বাবার বত্রিশ। বয়সের দিক থেকেও প্রজননের জন্য আদর্শ।'

ওরা বোকার মতো ডাক্তারবাবুর দিকে তাকিয়ে থাকে।

দেবেশ জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে বলে, 'স্যার!'

'সমস্যাটা ধরা পড়ল দু-জনের ক্রোমোজোমের বিন্যাস ম্যাচিং করতে গিয়ে। বলছিলাম, এটা একটা রেয়ার কেস। দু-জনের ক্রোমোজোমের সজ্জায় কোনো সমস্যা নেই, দু-জনেই সুস্থ, কিন্তু দু-জনের ক্রোমোজোম পরস্পরের ইনকমপ্যাটিবল।'

'মানে?' দু-জনেই একসঙ্গে আর্তনাদ করে ওঠে।

'এখানেই আপনারা ফেঁসে গেছেন। আপনারা আলাদা কাউকে বিয়ে করলে সুস্থ সন্তানের বাবা মা হতে পারবেন, কিন্তু আপনাদের দু-জনের মিলনে যে-সন্তান জন্মাবে, তার এরকম ক্রোমোজোমাল অ্যানোমালি থাকবে, ওভারওয়েট নিয়ে জন্মাবে, অথচ বেবির কোনো খাওয়ার স্পৃহা থাকবে না, ন্যাচারেলি আর্লি ডেথ হবে।'

ডুকরে কেঁদে ওঠে নার্গিস। তার হাতদুটো চেপে ধরে আবুল।

খানিকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলতে পারেন না। আবুল ভাঙা গলায় শুধায়, 'তা হলে আমরা কোনোদিন বাবা মা হতে পারব না?'

'কে বললে পারবেন না? আপনাদের রিপ্রোডাকটিভ এজকে নষ্ট করবেন কেন? দু-জনে ডিভোর্স করে ফেলুন। তারপর অন্য পুরুষ ও নারীকে আপনারা বিয়ে করুন।'

'মানে?' এবার গ্রাম্য মেয়ের মতো কাঁদতে থাকে নার্গিস।

'দেখুন, বিয়ে হচ্ছে দু-জন মানব-মানবীর একটা সোশাল কনট্রাক্ট। আপনাদের দু-জনেরই সুস্থ সবল শিশুর বাবা মা হবার অধিকার আছে। ডিভোর্স তো এমনিতেই সমাজ-স্বীকৃত বিচ্ছেদের পথ। আপনাদের শাস্ত্রেও তালাক দেওয়ার প্রথা আছে। সুতরাং আপনারা সেই সুযোগ নেবেন না কেন?' ডাক্তারবাবু বললেন।

আবুল বোকার মতো তাকিয়ে বলল, 'জীবন বড়ো বিচিত্র জায়গা ডাক্তারবাবু।'

ডাক্তারবাবু সহৃদয় গলায় বললেন, 'আপনাদের ইমোশনাল ফিলিং-এর কথা বুঝতে পারছি। যেখানে দু-জনের মধ্যে কোনো মনোমালিন্য নেই, আশা করা যায় ভালো সম্পর্কই আছে, যদিও আপনাদের অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ। আমি যেটা সাজেস্ট করব, আমার চেনা এক সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে চলে যান। উনি আপনাদের কিছু ওষুধ দেবেন, কাউনসেলিং করবেন, দু-জনে যাতে মিউচ্যুয়াল ডিভোর্স নিতে পারেন, তার জন্যে মনে জোর এনে দেবেন।'

নার্গিস তার অমার্জিত কণ্ঠস্বরে বলল, 'ডাক্তাররা মানুষের মন পালটে দিতে পারে ডাক্তারবাবু?'

একটু সান্ত্বনার ভঙ্গিতে ডাক্তারবাবু বললেন, 'তা পারে বইকি মা।'

আবুল হতভম্বের মতো বলল, 'এ বড়ো অদ্ভুত সংকট ডাক্তারবাবু। যতো দুর্ঘটনা আমাদের কপালেই ঘটল।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'আরে, আমরাই কী আগে সব কিছু জানতাম? ইনভেস্টিগেশন যত সূক্ষ্ম হচ্ছে, নতুন নতুন পদ্ধতি আসছে, আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রের নানা রকম ব্যাধির ডায়াগনোসিস করা সহজ হচ্ছে। আসলে আপনাদের যে সমস্যা, সাধারণ পরীক্ষা পদ্ধতিতে কিছুই ধরা পড়ত না। ফলে আমাদের দেশের যা কালচার, এসব ক্ষেত্রে দৈব, ওঝা, গুণিন, মাদুলি তাবিজ জলপড়া এ-বাবা ও-বাবার কাছে ছোটাছুটি শুরু করে দেওয়াটাই স্বাভাবিক হত।'

আবুল বলল, 'সেসব উপদেশ অনেকেই দিচ্ছে। আসলে আমরা মফস্বলের মানুষ ঠিকই, কিন্তু আমাদের শিক্ষিত বন্ধুবান্ধবদের একটা ভালো গ্রুপ আছে। এই দেবেশের দাদা রথীনও আমাদের ছেলেবেলার বন্ধু, আমরা এক সঙ্গে নিয়মিত বসি। সাহিত্য বিজ্ঞান নাটক এসব নিয়ে চর্চা করি, যুক্তিবাদী মানবতাবাদী চিন্তাভাবনা করি।'

'গুড। তা হলে আপনি পুরো সিচুয়েশনটা ভালো বুঝতে পারছেন। একটা মাত্র জীবন। শুধু শুধু কেন নষ্ট করবেন নিজেদের জীবন? বাৎসল্য স্নেহ থেকে নিজেদের কেন বঞ্চিত করবেন?' ডাক্তারবাবু বললেন।

'আপনার কাছে এসে — এত সব পরীক্ষা করে আমাদের সন্তানদের মৃত্যুর প্রকৃত কারণটা জানতে পারলাম। আপনার কাছে এজন্য আমরা সত্যি কৃতজ্ঞ ডাক্তারবাবু।' আবুল বলল।

'জীবনকে নতুনভাবে সাজান দু-জনে। দু-জনেই নিজের নিজের জীবনে সুখী হন এই

আশীর্বাদ আমি সব সময় করি।' ডাক্তারবাবু বললেন।

পরীক্ষাপর্বের ফাইল সমেত দেবেশ আর নার্গিসকে নিয়ে আবুল কুইন্স ম্যানসনের বিশাল বাড়ি থেকে বেড়িয়ে আসে।

সন্ধের পর পার্ক স্ট্রিটে আলো আর গাড়ির সংখ্যা আরো বেড়ে গেছে। ঝলমল করছে চারদিক।

'হ্যাঁ রে দেবেশ, তুই তো এখন হস্টেলে ফিরবি?'

'হ্যাঁ, আমি মেট্রো ধরে বেলগাছিয়া চলে যাব। তোমরা ধর্মতলায় এক্সপ্রেস ধরবে?' দেবেশ বলে।

নার্গিস বলল, 'আগে কোথাও একটু কিছু খেলে হয় না? ছেলেটা সারাদিন কলেজ করেছে, তারপর আমাদের নিয়ে এতদূর এসেছে।'

'যাক, তোমাকে আর বেশি চিন্তা করতে হবে না বউদি। চলো, সামনে একটা ভালো রোলের দোকান আছে. দারুণ বানায়'। দেবেশ হাসতে হাসতে বলে।

খাওয়া দাওয়ার পর দেবেশ বলে, 'তোমরাও আমার সঙ্গে মেট্রোতে চাপতে পারো। একটা স্টপ, পরেরটাই এসপ্ল্যানেড।'

'নারে, এটুকু হাঁটি। ছেলেবেলা থেকে যখন কলকাতা এসেছি, সন্ধের পর এই এলাকাটায় পথ হাঁটতে একটা অন্য রকম অনুভূতি হয়। চারিদিকে এত বড়ো বড়ো দোকান, এত প্রাচুর্য, এত ভোগ্যপণ্য থরে থরে সাজানো আছে, মনে হয় দেশে কোনো দরিদ্র নেই, সমস্যা নেই, সত্যিই যেন একটা সব পেয়েছির দেশে আমরা পৌঁছে গেছি।'

'তা হলে, হাঁটো তোমরা। আমি যাই।'

'সাবধানে যাস ভাই। সামনের মাসে বাড়ি আসলে দেখা করিস।'

৩

রাতে শোওয়ার ঘরে ঢুকে বিছানার উপর দু-জনে চুপচাপ বসে থাকে।

বসিরহাট এক্সপ্রেসের বাসটা আজ খুব খারাপ চালিয়েছে। অযথা দেরি করল। রাস্তার অবস্থাও ভালো না।

'বাপ রে, গোটা গা হাত পা মনে হচ্ছে, যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে।' বিছানায় শুয়ে পড়ে আবুল।

নার্গিস কিছু বলে না।

'কী গো, শোবে না?' আবুল শুধায়।

নার্গিস গোঁজ মুখে বসে থাকে।

'আমি বাপু আজ মশারি টাঙাতে পারব না। হেভি টায়ার্ড।' লঘু গলায় আবুল বলে।

হঠাৎ ক্ষিপ্ত বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল নার্গিস। আবুলের চুল ধরে টানতে লাগল। কিল চড় ঘুষি যেমন ইচ্ছে মেরে যেতে থাকল।

আবুল কোনো বাধা দিল না। দ্বিতীয় সন্তানটি মারা যাওয়ার পর থেকে নার্গিস এভাবে

যখন ইচ্ছে তাকে মারধোর করে। খুবই কষ্টদায়ক, অনেক সময় সহ্য করা যায় না, তবু কোন অসহায়তা থেকে নার্গিস এরকম অস্বাভাবিক আচরণ করে, সেটা বোধহয় অনুভব করে আবুল।

খানিকক্ষণ মারধোর করে ক্লান্ত হয়ে রেহাই দেয় নার্গিস। তারপর হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে। তার মাথায় হাত বুলাতে থাকে আবুল।

অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা খুঁজে পায় না। যেন ঘুম থেকে জেগে নার্গিস শুধায়, 'হ্যাঁগো, আমরা এখন কী করব?'

'তোমার তো মা হতে ইচ্ছে করে।' আবুল বলে।

'বাপ হতে কি তোমারও ইচ্ছে করে না? ওই দুটোকে নিয়ে তুমিও বাপু কম আদিখ্যেতা করতে না।'

'এটাই তো সংসারের নিয়ম। অপত্য স্নেহ। এভাবেই সৃষ্টি বেঁচে থাকে।'

'তোমার একটা বংশধর দরকার।'

হাসতে হাসতে আবুল বলে, 'এটা একটা দারুণ কথা বলেছ বেগম সাহেবা। আমি তো শালা শেষ মুঘল সম্রাট — আমার বংশধর না জন্মালে গোটা ভূ-ভারত অন্ধকার হয়ে যাবে।'

'না — ঠাট্টা না — আমি বলি, তুমি আর একটা বিয়ে করো।'

'ওঃ — কী উদারতা। সিনেমায় ঐশ্বর্য রাইয়ের প্রশংসা করলে হিংসায় জ্বলে যাও, আর আমি অন্য মেয়েমানুষের সঙ্গে ঘরে ঢুকে দরজায় ছিটকিনি আটকাব — সহ্য করতে পারবে? অবশ্য দু-জনে দু-পাশে একসঙ্গে শুলে সেটা অবিশ্যি ফাস্টক্লাস হবে।'

'কিন্তু এভাবে তোমার জীবনটা নষ্ট করবে কেন? তার থেকে ভালো, তুমি আমাকে তালাক দিয়ে আবার বিয়ে করো। আমি তোমার চোখের সামনে থাকব না।'

'সেটা তখনই সম্ভব, তুমি যদি আর একটা বিয়ের ব্যাপারে মনস্থির করো। তা হলে একসঙ্গে দু-জনের দু-জায়গায় বিয়ের ব্যবস্থা করব। বলো, কাল থেকে তোমার ছেলে দেখতে শুরু করি।'

আবার তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নার্গিস। অনেকক্ষণ কিল ঘুষি মারে।

কী আর করবে আবুল, মানুষ প্রকৃতির কাছে কতটা অসহায়, সেরকম কিছুই বোধহয় ভাবতে থাকে।

ঘুম আসে না চোখে। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে পড়ে থাকে দু-জনে। হঠাৎ বউকে খুব আদর করে প্রথম দিনের মতো চুমু খায় আবুল।

'হ্যাঁগো, তুমি বলে দিলে না, আমরা এখন কী করব?' নার্গিস শুধায়।

'আসলে খুব নিরাসক্তভাবে সমস্যাটা ভাবতে হবে। আমরা প্রত্যেকটা মানুষ আলাদা আলাদা সত্তা। আলাদা পরিবার, আলাদা কালচারে মানুষ। তুমি কোথায় হুগলির আরামবাগের কাছে একটা অজ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, আমি বসিরহাটের এই ভ্যাবলার সাধারণ ঘরের ছেলে। আগে আমরা পরস্পরকে চিনতাম না, কোনোদিন দেখা হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল না। তোমাদের

গ্রামে আমাদের কোনো দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজনও ছিল না, যে যোগাযোগ হবে। অথচ বিয়েটা হল। আমার বিধবা মা ছেলের বউ আনার জন্য পাগলামি করছিলেন। চেনাজানা সকলকে বলছিলেন। হঠাৎ তাঁর কোন বান্ধবীর পরিচিত এক ঘটক তোমার সন্ধান আনলেন। মায়ের পছন্দ হল তোমাকে। আমি দেখলাম, ঝামেলা করে লাভ নেই, বিয়ে একটা করা দরকার, করেই ফেলি। সে সময় অবশ্য মায়ের সঙ্গে খালেক আর শাকিলাও খুব ষড়যন্ত্র করেছিল।'

'ওরা আমাদের ভালো বন্ধু।' নার্গিস বলে।

'একটা জীবনে আর বেশি কী চাওয়া থাকতে পারে নার্গিস? খুব প্রিয় এক নারী, কিছু ভালো বন্ধু, কিছু ভালো বই, রবীন্দ্রনাথের কিছু গান, অনেক বেশি আমি পেয়ে গেছি।'

'মা আজ বেঁচে থাকলে খুব দুঃখ পেতেন।' নার্গিস বলে।

'সেটা ঠিকই। বড়ো নাতির মুখ দেখে হঠাৎ স্ট্রোকে চলে গেলেন। এখানকার হাসপাতালে ভালো চিকিৎসারও ব্যবস্থা নেই। অবশ্য কলকাতার বড়ো বড়ো হাসপাতালের অবস্থাও যা কাগজে পড়ি, সেখানে নিয়ে যেতে পারলেও কী হত, কে জানে!' আবুল বলে।

'আমরা নিজেরাও জানি না, আমাদের জীবনটা কখন কোন খাতে বইবে।' নার্গিস বলে।

'সেজন্যই বলছিলাম, ঘটনাচক্রে আমরা দু-জন অপরিচিত মানব মানবী এক ঘরে আইনসম্মতভাবে আশ্রয় নিয়েছি। আজ যখন দেখা যাচ্ছে, এমনিতে দু-জনের মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই, অথচ সন্তানধারণে এক বিচিত্র সমস্যা, তখন যুক্তি দিয়ে ব্যাপারটা ভাবতে হবে বইকি। দেবেশের প্রফেসর ডাক্তারবাবু এই কথাটাই আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন।'

'তা হলে আমার এই সংসার, এই পছন্দ করে সাজানো জানলার পরদা, বিছানার চাদর, জ্যোৎস্নারাতে ছাদে উঠে তোমার সঙ্গে বসে থাকা — সব মিথ্যে হয়ে যাবে?'

'সবটাই নির্ভর করছে আমাদের নিজেদের সিদ্ধান্তের উপর। আমি তোমাকে কতটা ভালোবাসি, তুমি নিশ্চয়ই বোঝো। এই সংসারটাকে তুমি কীভাবে তিল তিল করে সাজিয়েছ, সে তো আমি রোজ উপভোগ করি, আমার বন্ধুরাও তোমার রুচির পছন্দ করে। অন্তর থেকে আমি তোমাকে ছাড়তে পারব না, কিন্তু নিজের আত্মস্বার্থর জন্য তোমাকে মাতৃত্ব থেকেও বঞ্চিত করতে পারি না। আমার বিবেকের কাছে আমি কী জবাবদিহি করব?'

'কিছু জবাবদিহি করতে হবে না। আর এসব সমস্যা নিয়ে আমরা কিছু ভাবব না। এখন থেকে দু-জনকে আরো বেশি করে ভালোবাসব।' আবুলের বুকে মুখ গুঁজে নার্গিস বলে।

নার্গিসকে তীব্র আলিঙ্গনে কাছে টেনে নেয় আবুল। দু-জনের চারপাশে ভূগোলের আলো-আঁধার ঘুমন্ত সমুদ্রের মতো আছড়িয়ে পড়ে।

দিগন্ত আলোয় কোথাও যৌথ কণ্ঠে ভেসে আসে ভালোবাসার গান। বিষণ্ণ পাতাগুলি উড়ে যায় উতল হাওয়ায়।

'এবার থেকে গরমের ছুটিতে আমরা কোথাও বেড়াতে যাব।' আবুল বলে।

'আমি মাসে মাসে তার জন্য আলাদা কিছু টাকা জমাব। খুব বেশি দূর নাই বা গেলাম।' নার্গিস বলে।

'এবার ছুটিতে কোথায় যাওয়া যায় বলো তো? পাহাড়ে না সমুদ্দুরে না অরণ্যে?' আবুল শুধায়।

'কোথাও একটা যাব নিশ্চয়ই।' নার্গিস বলে।

বিছানা ছেড়ে দু-জনে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে। সামনে গাছপালা, পুকুর, শুক্লপক্ষের আলোয় আশ্চর্য মায়াবী পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। পুকুরপাড়ের ঘাটে দু-জনে চুপচাপ বসে থাকে হাত ধরাধরি করে। কখন যেন অসহায়ভাবে তারা কাঁদতে থাকে, পরস্পরকে স্পর্শ করে না-বলা ভাষায় হয়তো তারা বলার চেষ্টা করে, 'তুমি আছো, আমি আছি।'

জেলখানার জানলা

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে তাদের সমর্থনে প্রকাশ্যে বক্তব্য রাখা এবং প্রবন্ধ রচনার অপরাধে এক শিল্পীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

শিল্পী গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সম্পূর্ণ অনাড়ম্বরভাবে। যখন তিনি শহর থেকে বহুদূরে সমুদ্রের কাছে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তিনি একা ছিলেন না অবশ্য। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর বান্ধবী; যার অপরূপ বিষণ্ণ মুখ শিল্পীর আঁকা অনেক ছবিতে এবং ভাস্কর্যে বারবার দেখা যায়।

সমুদ্রসৈকতে একটা নির্জন বাড়ি। যেন একটা অতিকায় পাখি ডানা মুড়ে, উড়বে কী উড়বে না, বসে বসে ভাবছে। সেই বাড়ির দোতলার ঘরে বান্ধবীকে নিয়ে শিল্পী বসেছিলেন। ঘরে একটা রোগা মোমবাতি জ্বলছিল শুধু। তার মানে এই নয় যে সেই রাতে সমুদ্রাঞ্চল হঠাৎ নিষ্প্রদীপ হয়ে পড়েছিল। বৈদ্যুতিক আলো যেরকম থাকার ঠিকই ছিল। সমুদ্রের ধারে ধারে, পরিকল্পিত তফাতে ছিল ভেপার-আলো যার বর্ণালী যে কোনো সমুদ্রসৈকতের পরিবেশকে রহস্যময় করে তোলে। বালিয়াড়ি থেকে একটু দূরে দূরে পরপর হোটেলগুলোও সেজেছিল পর্যাপ্ত আলোয়। সেদিন রাতে আকাশ ছিল আশ্চর্য নিশ্চুপ। ছিল না চাঁদ কিংবা নক্ষত্রদের একচ্ছত্র আধিপত্য। মেঘময় ছিল আকাশ। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলক ছিল। কিন্তু মেঘের ডাক অথবা বিদ্যুতের গর্জন কিছুই ছিল না।

শিল্পী বৃষ্টির প্রতীক্ষায় ছিলেন। তিনি নিবিয়ে দিয়েছিলেন ঘরে এবং সারা বাড়িতেই বৈদ্যুতিক আলো। পরিবর্তে জ্বেলেছিলেন সরু ও অপুষ্ট মোমবাতি। ঘরের খাটে শুয়েছিল সেই রূপসী; — শিল্পীর অদ্বিতীয় বান্ধবী। তার পরনে একচুল সুতোও ছিল না। দুটো বালিশ উঁচু করে, নিজের দুধ-সাদা ঘাড় সেখানে স্থাপন করে অবিকল ক্লিওপেট্রার ভঙ্গিমায় আধ-শয়ান অবস্থাতে ছিল সেই নারী। তার স্তনবৃন্তে বসে ছিল দুটো আশ্চর্য প্রজাপতি। একটা হাত নামিয়ে রেখেছিল সে। আর একটা হাত তুলে, মাথার পেছনে রেখেছিল। ফলে কাঁধের কাছে বাহুসন্ধিতে ধূসর রোমরাজি দৃশ্যমান ছিল। যে রোমরাজি স্বভাবত গোপন রাখে নারীরা। আর গোপন রাখে বলেই তা দেখে পুরুষেরা রোমাঞ্চিত হয়। এরকম নয় যে শিল্পী বিছানায় অর্ধশয়ান ওই নারীর কোনো স্কেচ করতে ব্যস্ত ছিলেন। শিল্পী শুধুই দেখছিলেন মোমবাতির আলোয় ওই নগ্ন নারীকে। বিশেষত তার ছড়িয়ে রাখা শাদা পা দুটিকে, যেখানে ছায়া ফেলেছিল অপরূপ খিলান ও গম্বুজের রেখা। একটা শাদা-কালো বেড়াল ঘরের এককোণে চুপ করে বসেছিল। মোমবাতির অস্পষ্ট আলোয় তাকে মনে হচ্ছিল বেড়ালের মমি। শিল্পীর ডানপাশে দেয়াল ঘেঁষে একটা ছোটো টেবিল। সেই টেবিলের ওপর পেটমোটা ভদকার বোতল, আপেলের ভগ্নাংশ এবং রক্তিম গেলাসে পাকা চুলের মতন শাদা মদ।

নগ্ন এবং নির্জন নারীটির দিকে তাকিয়ে
বেড়ালের মমির দিকে তাকিয়ে
টেবিলের ওপর পেটমোটা ভদকার বোতল ও
আপেলের ভগ্নাংশের দিকে তাকিয়ে
মোমবাতির রহস্যময় আলোয় নিজের হৃদয়ের
খনি-গুহায় প্রবেশ করবার প্রস্তুতি
নিচ্ছেন শিল্পী ...

ঠিক সেই সময় সিঁড়িতে শোনা গেল জুতোর মস মস শব্দ। এক জোড়া নয়। অনেক জোড়া জুতোর মসমস শব্দ। যেন কুচকাওয়াজের ধ্বনি। একসঙ্গে অনেকজন উঠে আসছে। কারা উঠে আসছে?

ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। দু-বার নক। ঠক ঠক। শিল্পী, 'ভেতরে আসুন' বলার আগেই খুলে গিয়েছিল দরজা। সামরিক পোশাকে দু-জন দীর্ঘদেহী ঢুকেছিল ঘরে। বিছানায় অর্ধ-শায়িত নারী চকিতে ঢেকে দিয়েছিল একটা চাদরে নিজের নগ্নতাকে। শিল্পী কিছু বলার আগেই অফিসার বলেছিল — আপনাকে যেতে হবে আমাদের সঙ্গে...।

— অ্যারেস্ট-ওয়ারেন্ট আছে? — শিল্পীর প্রশ্ন ছিল।

— অফ কোর্স! ...চলুন...হারি আপ প্লিজ।

শিল্পী বান্ধবীর দিকে একবার তাকিয়ে হেসেছিলেন। তারপর অফিসার এবং অন্যান্য সেপাইদের সঙ্গে চলে গিয়েছিলেন। কালো ভ্যান তাঁকে পেটের মধ্যে নিয়ে চলতে শুরু করেছিল। বেড়ালটা কেঁদে উঠেছিল হঠাৎ ...।

২

রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অপরাধ গুরুতর। তাই আদালতে সেই অপরাধীর বিচারও চলে বহুদিন ধরে। একটা নির্জন এবং প্রায়ান্ধকার কুঠরিতে শিল্পীকে বন্দী রাখা হয়েছিল অনেকদিন। কতদিন তা শিল্পীর নিজেরও ঠিক খেয়াল ছিল না। তবে তাঁর মাথার চুলগুলো নির্ভেজাল কালো ছিল। সেগুলো ক্রমশ হয়ে গেল শাদা। তাঁর মুখে কোনোদিনই দাড়ি ছিল না । এখন দাড়ি-গোঁফে তাঁকে দেখতে লাগে ক্ষ্যাপা সাধকের মতো। আদালতে শিল্পীকে যেতে হয়। আবার ফিরে আসতে হয় কুঠরিতে। শুনানি চলে এক একদিন বহুক্ষণ। কত সাক্ষী যে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে শিল্পীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দ্যায়। তাদের অধিকাংশকেই শিল্পী চেনেন না। বিচারক অনেক উঁচু একটা চেয়ারে বসে থাকেন। তাঁকে দেখে শিল্পীর মনে হয় একটা নির্জন লাইটহাউস। শিল্পীর ধারণা আদালতে সাক্ষীরা যখন সাক্ষ্য দেয় একের পর এক, সরকার পক্ষের উকিল এবং শিল্পীর পক্ষের উকিল যখন নাটকীয়ভাবে কোন্দল করে যায় তখন বিচারক শীর্ষ-চেয়ারে বসে খুবই অসহায় বোধ করেন। ক্লান্তি বোধ করেন মূলত। মরা মাছের চোখে বিচারক তাকিয়ে থাকেন। কোনদিকে শিল্পী ঠিক বুঝতে পারেন না। একদিন যখন আদালত চলছে তখন শিল্পী

বিচারককে সকলের অলক্ষ্যে ঢুলতে দেখেছিলেন। তাঁর খুব মায়া হয়েছিল বিচারকের জন্যে। আহা রে! লোকটা কতদিন শান্তিতে ঘুমোয়নি! সবসময় চিন্তা। কতরকম মামলার চিন্তা। এক একটা মামলা যা জটিল। কত পরস্পরবিরোধী বক্তব্য। কী জাজমেন্ট দেওয়া যায়। আসামীকে ফাঁসি দেবেন না তার যাবজ্জীবন হবে; নাকি সে বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে এসব নিশ্চয়ই ভাবতে হয় বিচারককে অনেক রাত পর্যন্ত। ফলে তাঁর নিদ্রায় ব্যাঘাত হয়।

এই মামলাতে অবশ্য বিচারকের রায় খুব স্পষ্ট ছিল। তিনশো এগারো জন সাক্ষীর সাক্ষ্য নেবার পর বিচারক শিল্পীকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একজন প্রধান ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে চিহ্নিত করলেন। ষড়যন্ত্রকারীদের যে মদত দিয়ে থাকে সেও একজন ষড়যন্ত্রকারী। আর তার শাস্তি হল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

শিল্পী ভাবলেশহীন মুখে বিচারকের রায় শুনলেন। সাধারণত রায় দেবার আগে বিচারক আসামীকে জিজ্ঞেস করে থাকেন — আপনার কিছু বলার আছে? আবহমানকাল ধরে আসামীরা এই প্রশ্নের কী উত্তর দিয়ে থাকেন আমরা জানি।

কিন্তু এই বিচারক কিঞ্চিৎ অন্যরকম। তিনি রায় ঘোষণা করার পর শিল্পীকে জিজ্ঞেস করলেন — আমার কাছে আপনার কিছু চাওয়ার আছে?...

শিল্পী হেসে বললেন — আপনি তো সাজা ঘোষণা করেই দিয়েছেন। এখন এই প্রশ্নের কী মানে হয়?

— তবুও...। আপনাকে তো এখনো অনেকদিন বেঁচে থাকতে হবে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মানে অবশ্য বোঝায় আমৃত্যু কারাদণ্ড। কিন্তু আসলে তো ব্যাপারটা সেরকম নয়। আপনাকে আসলে চোদ্দো বছর জেল খাটতে হবে। এটাই আমাদের দেশের আইন।

— চোদ্দো বছরের আগে মৃত্যু হলে অবশ্য...

— হ্যাঁ। সেটা হলে আলাদা কথা। ...তাই বলছিলাম চোদ্দো বছর একজন মানুষের জীবনে অনেকটা সময়। এত বছর জেলে বেঁচে থাকাও খুব কষ্টকর। বিশেষত আমি আপনাকে চিনি। আপনি যে কত বড় শিল্পী সেটা আমার কিছুটা জানা আছে। ইন ফ্যাক্ট আমার বাড়িতে আপনার কয়েকটা ওয়াটার কালার আছে। আমার স্ত্রী আপনার শিল্পের খুব ভক্ত।

— এরকমই হয়। — শিল্পী আবার হাসলেন। হাসিটা বেশ বাঁকা।

— এরকমই হয় মানে? বুঝলাম না? — বিচারক জিজ্ঞেস করলেন।

শিল্পী হেসে বললেন — অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি বড়ো বড়ো রাজকর্মচারী, মন্ত্রী, বিচারক, এরকম সব কৃতি ব্যক্তিদের স্ত্রীরাই শিল্পের অনুরাগী হন, সাহিত্যের পাঠক হন। আপনার ক্ষেত্রেও সেটা বেশ মিলে গেল। শিল্পীর কথার খোঁচাটা বোধহয় বিচারকের একটু লাগল। তবে যে লোকটাকে এইমাত্র যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন, সে তো খাদের ধারেই দাঁড়িয়ে আছে। তাকে আর নতুন করে কী আঘাত দেবেন? তাই বিচারক খোঁচাটা হজম করে প্রসঙ্গ পালটাতে চাইলেন।

বললেন — আবার আপনাকে জিজ্ঞেস করছি আপনার যদি আমার কাছে কিছু চাওয়ার থাকে তো বলুন?

— একটা কিছু চাইতে হবে আমাকে। জেলখানায় বেঁচে থাকার স্বার্থে।

— বলে ফেলুন — হারি আপ!

— দেখুন আমি একজন শিল্পী। প্রতিদিন ছবি না আঁকলে আমার শান্তি নেই। আমার ঘুমই হবে না যদি আমি ছবি আঁকতে না পারি। তাই —

— বলে ফেলুন?

— আমাকে যদি আপনি অনুমতি দ্যান...

— কী অনুমতি?

— রং, তুলি, ইজেল, পেইন্টিং-পেপার এসব যাতে আমি রেগুলার জেলখানায় সাপ্লাই পাই। তা হলে আমি ছবিটা আঁকতে পারব। আর ছবি যদি আঁকতে পারি তা হলে আমার অবস্থান কোথায় সেটা আমার খেয়ালই থাকবে না। দেখতে দেখতে চোদ্দো বছর কোথা দিয়ে কেটে যাবে...।

— আপনার এই অনুরোধ মঞ্জুর হল। যে জেলখানায় আপনি থাকবেন সেখানকার জেলারের কাছে আমার নির্দেশ চলে যাবে। জেলখানাতে আপনার ছবি আঁকার সব সরঞ্জাম থাকবে। আপনি নিয়মিত ছবি আঁকতে পারবেন।

আদালত থেকে বেরিয়ে শিল্পী দেখলেন প্রচুর জনতার ভিড়। বিশেষ করে সংবাদ-মাধ্যম আর বৈদ্যুতিন মাধ্যমের লোকজনেরা খুব চেষ্টা করছে তাঁর কাছে পৌঁছতে। পুলিশের সঙ্গে তাদের বচসা চলছে। একটা মাইক্রোফোন এগিয়ে এল শিল্পীর মুখের সামনে। প্রশ্ন ভেসে এল — আপনার মতো একজন বড়ো শিল্পী যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত। তাতে আপনার প্রতিক্রিয়া কী? শিল্পী উত্তর দিলেন — আমি নতুন আঙ্গিকে কিছু ছবি আঁকার কথা ভাবছি।...

৩

জেলখানায় সাধারণত কয়েদিদের একসঙ্গেই রাখা হয়। কিন্তু এই নিয়ম হল সেইসব কয়েদির ক্ষেত্রে যাদের বিচার এখনো শেষ হয়নি। যেসব বন্দীর বিচার হয়ে গেছে; শাস্তি ঘোষণা হয়ে গেছে; তাদের সব ক্ষেত্রে হয়তো নয়, কিন্তু কিছু কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক 'সেল' বা কুঠুরিতে রাখা হয়। যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত শিল্পীকে এরকম এক কুঠুরিতে এনে হাজির করা হল। সেটি নির্জন এবং নিঃসীম অন্ধকারে পরিপূর্ণ। কুঠুরিতে শিল্পীকে ঢুকিয়ে দিয়েই প্রহরী চলে গেল। লোহার দরজা চকিতে বন্ধ হয়ে গেল। শব্দ হল বিকট। শিল্পীর মনে হল, তিনি হঠাৎ অন্ধ হয়ে গেছেন। তাঁর দু-চোখের সামনে সব অন্ধকার। তিনি কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। তিনি বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন চুপচাপ। অনেক ওপরে কুঠুরির সিলিং-এর দু-পাশে দুটো ছোটো ঘুলঘুলি। সময়টা বিকেল। ঠিক বিকেলও নয়। সূর্যাস্ত আসন্ন। ধূসর এবং বিষণ্ণ

কিছু আলোর রেখা সেই ছোটো ঘুলঘুলি চুঁইয়ে ঘরের মধ্যে আসছিল। শিল্পীর চোখে ক্রমশ অন্ধকার সয়ে আসছিল। এমনকী অস্পষ্ট আলোর ক্ষীণ রেখার সাহায্যে তিনি বুঝতে পারছিলেন যে, নির্জন এই কুঠুরি এমন কিছু বড়ো নয়। লম্বাতেও বড়ো নয়। চওড়াতেও বড়ো নয়। ঠিকমতো বলতে গেলে দু-জন মানুষ এই ঘরে পাশাপাশি শুতে পারবে না। চলতে ফিরতে গেলে একে অপরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে বিরক্ত হবে। এরকম একটা ঘরে তাঁকে বারো বছর কাটাতে হবে? এর থেকে বোধহয় মৃত্যুও ভালো ছিল। তিনি ইচ্ছেমতো আকাশ দেখতে পারবেন না। প্রকৃতির অপরূপ শোভা, যা তাঁকে ছবি আঁকতে কতবার অনুপ্রাণিত করেছে, তিনি আর চোখ মেলে দেখতে পারবেন না। তাঁর চোখের সামনে শুধু হাজির থাকবে জ্যামিতিক আকারের চারটি দেওয়াল। আজ প্রথমদিন। তাতেই মনে হচ্ছে, দেয়ালগুলো হঠাৎ এগিয়ে এসে তাঁকে পিষে মেরে ফেলবে। তিনি আচমকা ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন। নির্জন কুঠুরিতে শিল্পীর আর্তধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে তাঁর নিজেরই কানে তীব্রভাবে ফিরে এল। শিল্পী যন্ত্রণায় তাঁর মাথার চুল ধরে টান দিলেন। নিজের দাড়ি ধরে টান দিলেন। ভয়ে, যন্ত্রণায় নিজের সঙ্গে পাগলের মতো আচরণ করছিলেন তিনি। তারপর সব কিছু নিষ্ফল ভেবে তিনি দুই হাতের চেটোয় মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলেন। তাঁর মনে পড়ল সেইসব গেরিলা যোদ্ধাদের কথা। যারা নিজেদের পরিবার-পরিজন ছেড়ে পাহাড়ে, জঙ্গলে, দিনের পর দিন লুকিয়ে আছে। তাদের চোখে স্বপ্ন। অজস্র স্বপ্ন। এক স্বৈরাচারী শাসকের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার স্বপ্ন। দেশের প্রতিটি মানুষ যাতে খেয়ে-পরে, আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকে তা সুনিশ্চিত করার স্বপ্ন। তাদের স্বপ্নগুলোর সঙ্গে নিজের স্বপ্নগুলোরও মিল খুঁজে পেয়েছিলেন শিল্পী। সে-কারণেই তিনি ওই গেরিলাদের সমর্থনে নানা অনুষ্ঠানে প্রকাশ্যে বক্তব্য রেখেছিলেন। নানা পত্রিকায় তাদের সমর্থনে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তার ফলেই শাসকশ্রেণীর রোষ পড়ল তাঁর ওপর। আজ তিনি তাঁদের হাতে বন্দী। তাঁকে নিরুপায়ভাবে চোদ্দো বছর কাটাতে হবে জেলখানায়। সমাজ, সংসার, নিজের বন্ধুবান্ধব, প্রেমিকা, বইপত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এভাবে বাঁচা যায়? চোদ্দো বছর শেষ হবার অনেক আগেই হয়তো তাঁর, শিল্পীর মৃত্যু হবে।

পাথরের মেঝেতে ছেঁড়া মাদুরের ওপর শুয়ে শিল্পীর সারা রাত ঘুম এল না। তাঁর বারবার মনে হচ্ছিল, এই কুঠুরিতে বাইরের আলো, হাওয়া, জীবনের কলরোল আসবার জন্যে অন্তত একটা জানলা থাকা দরকার। কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষ কী তাঁর কথা শুনবেন? কুঠুরির দেয়াল ফুঁড়ে তারা কী একটা জানলা বানাবেন সেখানে? অসম্ভব। জেল কর্তৃপক্ষ যদি এত সদয় হতে শুরু করে বন্দীদের প্রতি, তা হলে তো জেলের ভেতরে নৈরাজ্য শুরু হবে; বন্দীদের একের পর এক চাহিদার শেষ থাকবে না।

তা হলে কী করা যায়?

এই কুঠুরিতে একটা জানলা চাই। একটা জানলা না হলে শিল্পী এখানে বন্দী থাকতে পারবেন না। তাঁকে হয়তো আত্মহননের রাস্তা বেছে নিতে হবে। সুতরাং...

সুতরাং সারা রাত নিদ্রাহীন থেকে, ভাবতে ভাবতে শিল্পী নিজেই ঠিক করলেন যে,

তিনি
এই কুঠুরির দেয়ালে
একটা জানলা এঁকে নেবেন...

৪

যেমন ভাবা তেমন কাজ। রং, তুলি, অন্যান্য সরঞ্জাম সব তো শিল্পীর কাছেই আছে। বিচারকের কাছ থেকে অনুমতি পেয়েছেন, ছবি আঁকার যাবতীয় সরঞ্জাম বন্দী অবস্থায় শিল্পী নিজের কাছে রাখতে পারবেন। সুতরাং সেই কাকভোরে, যখন ভোরের আলো বাস্তবিক তেমন ফুটে ওঠেনি, অন্ধকার যাই যাই করেও যেতে চাইছে না, শিল্পী লেগে গেলেন নিজের নির্জন কুঠুরির পাথরের দেয়ালে একটা বড়োসড়ো জানলা আঁকতে। তেমন আলো পাচ্ছিলেন না। কোনো বাতিও নেই নিজের কাছে যে, একটু নিজের প্রয়োজনমতো আলো জ্বেলে নেবেন। এরকম কোনো সুযোগও ছিল না। কিন্তু তাতেও শিল্পী পেছপা হলেন না। আলো তাঁর নিজের ভেতরেই আছে। অনিঃশেষ কল্পনার আলো। সেই আলোতে তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন সব কিছু। পাথরের দেয়ালে একটা জানলা এঁকে ফেলতে কোনো অসুবিধেই হল না শিল্পীর।

একটা জানলা একটা জানলা
নিরেট পাথরের দেয়ালে
কল্পনার অনিঃশেষ আলোয়
একটা জানলা আঁকলেন শিল্পী...

ভোর পুরোপুরি নিজেকে মেলে ধরেছে অনেকক্ষণ। নিজের আঁকা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাইরেটা দেখলেন শিল্পী। অনেক উঁচু থেকে বাইরেটা দেখতে বেশ ভালোই লাগছিল। হ্যাঁ, অনেক উঁচু তো বটেই। শিল্পীকে যে কুঠুরিতে বন্দী করে রাখা হয়েছিল সেটা জেলখানার ওপর তলায়। কত ওপরে তা শিল্পী ঠিক আন্দাজ করতে পারেননি। তবে চারতলা তো বটেই। তার বেশি উঁচুও হতে পারে। পাঁচতলা বা ছ-তলা। কারণ নীচের রাস্তা, মানুষের বাড়িঘর, এমনকী মানুষগুলোকে পর্যন্ত বেশ ছোটো ছোটোই তো লাগছিল। শিল্পীর ভালো লাগছিল এটা ভেবে যে, এই জানলাটা তাঁকে তাঁর জেল-জীবনে বাঁচিয়ে রাখবে। এই জানলাটা দিয়ে তিনি —

আকাশ দেখবেন
মেঘ দেখবেন
পাখি দেখবেন
সূর্যের পৌরুষ দেখবেন
মেঘের অভিমান দেখবেন

রাস্তার সপ্রতিভতা দেখবেন
গাড়ির পারঙ্গমতা দেখবেন
খরগোশ দেখবেন শিশু দেখবেন
আর মেয়েদের দেখবেন যাদের
চোখে ভালোবাসার আলো...

৫

প্রতিদিন সকালে জেলখানার বন্দীরা এক ভাঁড় চা এবং একটি ন্যাতানো বিস্কুট পাবার অধিকারী। শিল্পীর কুঠুরিতে গরাদের তালা খোলার শব্দ হল। জেলের কর্মচারীটি ঢুকল চা আর বিস্কুট নিয়ে। কুঠুরির মধ্যে ঢুকে তার চোখ আলোর ধাঁধায় ধাক্কা খেল। সে প্রথমে চোখ বুজে ফেলল। তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে অবাক হয়ে দেখল, জানলা দিয়ে আলো আসছে বাইরের। কী আশ্চর্য! জানলা কোথা থেকে এল? সে ভুল দেখছে না তো? নাহ্, ভুল দেখবে কেন? পরিষ্কার একটা জানলা। আর সেই জানলা দিয়েই তো এত আলো আসছে!

— জানলা কোথা থেকে এল? — কর্মচাবীটি প্রশ্ন করল।

— আমি এঁকেছি ওই জানলা। — হেসে জানালেন শিল্পী।

— আপনি এঁকেছেন? ... আপনি কত বড়ো অপরাধ করেছেন জানেন? লাইফ প্রিজনারদের সেলে তো জানলা থাকার কথা নয়?

— আমি এঁকেছি। — শিল্পী আবার জানালেন।

— এত বছর ... কত বছর জানেন? ২৮ বছর এই জেলে কাজ করছি। এরকম আজব কাণ্ড দেখিনি। আমি এখনই জেলারকে রিপোর্ট করছি।

চা-এর ভাঁড় আর বিস্কুট, কর্মচারী শিল্পীকে দিতে ভুলে গেল। হাতেই রয়ে গেল জিনিসগুলো। সে ছুটল জেলারকে খবর দিতে। এরকম একটা বিচিত্র খবর পেয়ে, সাতসকালে, ধরাচুড়ো পরে জেলার এসে হাজির শিল্পীর কুঠুরিতে। সেখানে ঢুকতেই জেলারের চোখও ধাঁধিয়ে গেল বাইরে থেকে আসা অপ্রত্যাশিত আলোয়। প্রথমে বিশ্বাসই হচ্ছিল না ব্যাপারটা। তারপর যখন দেখলেন সত্যিই সশরীরে অবস্থান করছে দেয়ালে একটি জানলা, তখন রাগের ঢেউ আছড়ে পড়ল যেন শিল্পীর ওপর।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে জেলারের প্রশ্ন — এটা কী কাণ্ড করেছেন?

— একটা জানলা এঁকেছি। — শিল্পীর শান্ত উত্তর।

— সে তো দেখতেই পাচ্ছি। — মুখ ভেংচে জেলার বললেন। — কিন্তু ওই জানলাটা তো দেয়ালে আঁকা। তা হলে ঘরে এত আলো আসছে কোথা থেকে?

— জানলাটা এঁকেছি আমি ঠিকই। তবে এটা সত্যিকারের জানলা। ওটা খোলা জানলা বলেই বাইরে থেকে ঘরে এত আলো আসছে। শিল্পী উত্তর দিলেন। তারপর জেলারের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন — আপনার কাছে সিগারেট হবে? গত রাত থেকে একবারও স্মোক

করতে পারিনি। একটা সিগারেট হলে খুব ভালো হয়। শিল্পীর মুখের দিকে তাকিয়ে জেলারের বোধহয় কীরকম মায়া হল। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে তিনি একটা সিগারেট দিলেন শিল্পীকে। নিজেও একটা ধরালেন। লাইটারে সুন্দর বাজনা। উভয়ে একই আগুনে সিগারেট ধরালেন।

ধোঁয়া ছেড়ে জেলার বললেন — এসব কী ভোজবাজি শুরু করেছেন বলুন তো? এটা তো সলিটারি সেল। এখানে এত আলো বাইরে থেকে কীভাবে আসতে পারে?

শিল্পী আবার বললেন — আমি যে জানলাটা এঁকেছি সেটা প্রকৃতই একটা জানলা। জানলার দুটো পাট খোলা। তাই ঘরে এত আলো।

— আবার বাজে বকছেন? ওটা তো দেয়ালে একটা জানলা এঁকেছেন। এ সিম্পল ড্রয়িং। আঁকা জানলা আবার সত্যি হয় নাকি? এই তো আমি হাত দিচ্ছি দেয়ালে। এটা তো আঁকা জানলা। তবে একেবারে সত্যিকারের বলে মনে হচ্ছে। আপনার আঁকার হাতটা রিয়েলি ভালো, আই মাস্ট অ্যাডমিট...।

— ওই আঁকা জানলাটাই আপনি সত্যি বলে ভাবতে পারবেন যদি আপনার কল্পনাশক্তি থাকে।

— কল্পনাশক্তি? ... ইউ মীন ইমাজিনেশন?

— ইয়েস ইমাজিনেশন। ... শিল্প সৃষ্টি করতে যেমন কল্পনাশক্তির প্রয়োজন, তেমনই শিল্প বুঝতেও। — ঘন ঘন টান দেবার ফলে সিগারেটটা শেষ হয়ে এসেছিল। শিল্পী সেটা ঘরের এক কোণে ছুঁড়ে দিলেন। নিভে গেছে সিগারেটটা।

— ওসব তত্ত্বকথা রাখুন মশাই। — জেলার আবার ভেংচে বললেন। — অর্ডিনারি কয়েদিদের নিয়ে কোনো ঝামেলা নেই। কিন্তু আপনাদের মতো এইসব ইনটেলেকচুয়াল, শিল্পী, সাহিত্যিক এদের নিয়েই হয়েছে যত জ্বালা। কখন কী যে আপনারা করে বসেন?

— গর্হিত কিছু করেছি কী?

— ওই যে একটা জানলা এঁকে বসলেন? আর বিচারককেও বলিহারি? এসব বললে তো আবার আমাকেই আদালত অবমাননার দায়ে পড়তে হবে।... কীভাবে উনি এরকম একটা জাজমেন্ট দিতে পারেন? যে আপনি নিজের পেইন্টিং-এর সব ইকুইপমেন্টস নিয়ে জেলে থাকতে পারবেন। সেই সুবিধে পেয়েই তো আপনি এখানে পা দিয়েই নুইসেন্স ক্রিয়েট করতে লেগেছেন...।

— যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত আমি। ... মানে বারো বছর আমাকে এই ছোট্ট কুঠুরিতে কাটাতে হবে। একটা জানলা না হলে; বাইরের দৃশ্য ওই জানলা দিয়ে দেখতে না পেলে আমার সময় কাটবে কী করে? আমি বাঁচব কীভাবে?

— কীভাবে বাঁচবেন সেটা আপনি বুঝবেন। ... বাঁচছে না কী? সব কয়েদি, আই মীন যারা লাইফার তারা তো এভাবেই কাটিয়ে দেয় বছরগুলো। মানুষ অভ্যাসের দাস জানেন তো? এরকমও আমি দেখেছি যে, কোনো কয়েদি দীর্ঘদিন জেলে কাটাবার পর আর বাড়ি

ফিরতে চায় না, নিজের সমাজে ফিরতে চায় না। বলে কিনা জেলখানার ভেতরে এক ধরনের নির্জন আর অন্ধকার জীবনের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। মানুষের সমাজে এতদিন বাদে ফিরে গিয়ে কী করব? আর অ্যাডজাস্ট করতে পারব না। ... এরকম কয়েদি আমার নিজের চোখে দ্যাখা।

— হ্যাঁ এরকম হতে পারে। — শিল্পী বেশ চিন্তিতভাবে বললেন। — এরকম হতে পারে ভেবেই তো আমি নিজের জন্যে একটা জানলা বানিয়ে নিলাম...।

— বেশ করেছেন। ... এবার তাড়াতাড়ি জানলাটাকে মুছে ফেলুন তো দেখি! ... সিম্পলি ওয়াশ ইট অফ...।

— কী করে মুছব? ওটা তো একটা সত্যি জানলা?

— আবার পাগলামি শুরু করলেন? ... প্লিজ স্টপ দিস বুলশীট! আপনি যা ইচ্ছে আঁকুন, আম আঁকুন, জাম আঁকুন, খরগোশ আঁকুন, মানুষ আঁকুন, ন্যাংটো মেয়েছেলেকে আঁকুন, রম্বস আঁকুন, ত্রিভুজ আঁকুন, পিরামিড আঁকুন, সব, সব কিছু আঁকতে পারেন আপনি। শুধু জানলার ছবি আঁকা যাবে না।

— কেন জানলার ছবি আঁকা যাবে না?

— কারণ জানলার ছবি আঁকলেই সেই জানলা দিয়ে বাইরের আলো আসবে। জেলখানায় বাইরের আলো নিষিদ্ধ...।

— সে আপনি যাই বলুন জেলার সাহেব। ওই জানলা আর মুছে ফেলা সম্ভব নয়। কারণ ওটা একটা সত্যি জানলা।

— সত্যি জানলা যে তার প্রমাণ দিতে পারবেন?

— কী প্রমাণ চান?

— জানলা যেটা এঁকেছেন তাতে তো কোনো শিক নেই। আপনি ওই জানলা দিয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়তে পারবেন?

— দেখবেন পারি কি না?

— দেখান।

শিল্পী তড়াক করে জানলার ওপর উঠে বসলেন। মুণ্ডুটা বাড়িয়ে একবার দেখে নিলেন বাইরেটা। তারপর ঝাঁপ দিলেন। জেলার ছুটে গেলেন জানলার কাছে। মুখ বাড়িয়ে দেখলেন শিল্পী বায়ুমণ্ডলে ভাসছেন। ঠিক একটা পাখির মতো। কিংবা একটা উড়োজাহাজের মতো। অথবা সার্কাসের ট্রাপিজ-খেলোয়াড়ের মতো।

ভাসছেন। ভাসছেন। আমাদের শিল্পী ভাসছেন।
নির্ভার সেই ভেসে যাওয়া। নির্বাক সেই ভেসে যাওয়া।
অসীম আনন্দে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের দিকে সেই ভেসে যাওয়া।
শিল্পী হাসছেন। তাঁর হাসি থেকে মুক্তো ঝরে পড়ছে শূন্যে।
যেন তারাফুল। উদাত্ত স্বরে শিল্পী গান ধরেছেন।

মুক্তির গান। বৈরাগ্যের গান। স্বাধীনতার গান। শিল্পী দূর থেকে হাত নাড়লেন জেলারের দিকে। অর্থাৎ — আপনিও আসুন। আপনিও উড়ুন আমার সঙ্গে ...।

কিন্তু জেলার তো শিল্পীর মতো স্বাধীন আকাশে উড়তে পারবেন না। তাঁর অত কল্পনাশক্তি কোথায়? উড়তে উড়তে শিল্পী চলে যাচ্ছেন দূরে অনেক দূরে। এখন একটা বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে তাঁকে। জেলারের চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। অনেক, — অনেকদিন বাদে নিজের পরাধীন জীবনের কথা ভেবে জেলার কাঁদছিলেন...।

সিজ ফায়ার

সেলিনা হোসেন

তাহেরুণ মাঝে মাঝে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করে, কী কচ্ছেন বীরপত্তিক নুরুদ্দিন? ভাত খাবেন এলা?

— কী রান্ধিছো?

— লাফা শাক রান্ধিনু আর শীদলের ভত্তা বানানু।

— মুই এলা ভাত খাম। ভাত দে।

ভাত খাওয়ার চিন্তায় নুরুদ্দিনের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, শিশুর মতো সরল হাসিতে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয় — এই মুহূর্তে যারা ওকে দেখে তারা হিসাব মেলাতে পারে না যে এই লোকটি মুক্তিযুদ্ধের সময় একজন দুঃসাহসী যোদ্ধা ছিল। জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করে মানুষের চোখের সামনে বিস্ময়ের মানুষ হয়ে গিয়েছিল। স্বাধীনতার পরে ও বীরপ্রতীক খেতাব পেয়েছিল। তখন গাঁয়ের লোকে ওকে ডাকত বীরপত্তিক নুরুদ্দিন, এখন আর কেউ সেই গৌরব নিয়ে ডাকে না, শুধু তাহেরুণ ভোলে না, মাঝে মাঝে এই নামে ডেকে ওকে সেই সময়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। গভীর সুখের অনুভবে ওর বুক ভরে যায়। মনে করে ওটাই ওর সঞ্চয়, গরিব মানুষের টাকা-পয়সার সঞ্চয় থাকে না, তাতে কী, এই স্মৃতিই ওর টাকা-পয়সার সঞ্চয়। অনেক মূল্যবান, কোনো চোরই চুরি করতে পারবে না।

তাহেরুণ সানকি বোঝাই ভাত নিয়ে আসে। ভাতের ওপরে লাফা শাকের ঝোল আর শীদলের ভর্তা। গরম ভাত দেখে জিভে পানি আসে নুরুদ্দিনের। এত যে খিদে লেগেছে ভাত দেখার আগে তা বোঝেনি, মাঝে মাঝে তো পেটের খিদেকে নুড়ি পাথরের নীচে চাপা দেয়, অভিমান-ভরা কণ্ঠে নিজেকে বলে, মুই তো দুই টাকার মজুর, মোর ভোখ লাগবে ক্যান? এখন তাহেরুণের হাত থেকে সানকিটা নিজের কোলের ওপর টেনে নিতে নিতে বলে, তোর সানকি লিয়ায়, মোর সাতে ভাত খা।

তাহেরুণ নিজের সানকিতেও ভাত বেড়েছিল, সেটা চুলোর পাড় থেকে নিয়ে আসে। পাতিল খানিক, দু-জনের পেট ভরবে এমন অনুমান করেই রান্না করে ও। ওর হিসেবের মাপ একদম ঠিক, একটুও এদিক-ওদিক হয় না। নুরুদ্দিন বউয়ের এই দক্ষতায় মুগ্ধ। বলে, তুই ক্যাংকু করলু এডা? তাহেরুণ নুরুদ্দিনের এসব প্রশ্নের উত্তর দেয় না। ও জানে পুরুষ মানুষের এসব বোঝার সাধ্য নেই, কোথাও কোথাও ওদের বোঝার ঘাটতি আছে, যেটা ওরা স্বীকার করতে চায় না। তাই ও প্রসঙ্গ এড়িয়ে চুপ করে থাকে। তবে ও নুরুদ্দিনের সঙ্গে বসে ভাত খেতে ভালোবাসে। ওর মা-খালারা স্বামীর খাওয়া শেষ হলে ভাত খেতো। এমন ব্যবস্থা ও ভাবতেই পারে না। খেতে খেতে দু-জনের যে কত কথা হয়, হাসাহাসি হয়, এটা আর ও কখন পেত? সময় কোথায়? সারাদিন চলে যায় পথের ধারে বসে কাজ করে, ঘরে ফিরে থাকে রান্নাবাড়া, লেপাপোঁছা, ধোয়ামোছা সহ কত কাজ! তাই ভাত খাওয়ার সময়টি ওদের দু-জনের বিনোদনের সময়। খানিকটুকু আনন্দ।

সানকি নিয়ে বসতে বসতে তাহেরুণ দেখতে পায় বীরপ্রতীক নুরুদ্দিনের ঘাড়টা নুয়ে পড়েছে, হাত ডুবে গেছে ভাতে, কারণ নুরুদ্দিন গরম ভাতে পানি ঢেলে দিয়েছে। লোকটি এমন করে খেতে মাঝে মাঝে ভালোবাসে, যখন মেজাজ ভালো থাকে ঠিক তখন। কারণ তখনই ও বুঝতে পারে যে ও দু-টাকার মজুর এবং মজুরের কপালে পান্তাভাত ছাড়া অতিরিক্ত আর কী জুটবে? স্বামীর এমন ধারণার কথা জানে তাহেরুণ এবং মনে করে নুরুদ্দিনের এই ধারণাটি ঠিক। যে-মানুষ সাহস নিয়ে যুদ্ধ করে, যাঁর সাহসের জন্য বীরপ্রতীক খেতাব জোটে সে তো সঠিক সিদ্ধান্তই নেবে। তাঁর ভুল হবে কেন? সে ভুল করতেই পারে না। এই মুহূর্তে তাহেরুণ নুরুদ্দিনের সানকির দিকে তাকিয়ে বলে, মুইও পান্তাভাত খাম।

— খা। নুরুদ্দিন মাথা না তুলেই বলে। ও বেশি কথা বলতে পারে না। মুখ-ভরতি ভাতের দলা ও দাঁতের নীচে ফেলে চাবায়।

তাহেরুণ নিজের সানকিতে পানি ঢেলে দিলে গরম ভাত গবগব শব্দ করে এবং ধোঁয়া ওঠে। বেশ লাগে দেখতে, দু-জনে সেদিকে তাকায়। তাহেরুণ খিলখিল হাসিতে ভেঙে পরে বলে, মোর সানকিডা নদী হইচে। ডাহুক নদী।

নুরুদ্দিন সঙ্গে সঙ্গে সায় দেয়, ও নিজেও হাসতে থাকে, এখন ওর মুখগহ্বর শূন্য, ভাতের দলা পেটে চলে গেছে। তাহেরুণের সঙ্গে নিজেও গলা ছেড়ে হাসে, হাসির তরঙ্গ বাড়ির আঙিনায় ছড়ালে নুরুদ্দিন বলে, তোর ভাত গুটিক য্যান নুড়িপাথর।

— নুড়িপাথর! মোরা পাথরের মানুষ।

স্তব্ধ হয়ে যায় দু-জনের দৃষ্টির ভাষা। সত্যি কী ওরা পাথরের মানুষ? দু-জনের মাথা নেমে আসে ভাতের সানকির ওপর — ওরা গপগপিয়ে ভাত খায়, শীদলের ভর্তা খুঁটে খায় আর লাফা শাক দিয়ে ভাত মাখে, সানকির পানিতে ভেসে থাকে শাকের কুচি, যেন বিলের শাপলার মতো লাফা শাকের কুচি ওদের চোখে একটি সুন্দর দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছে — বলছে, তোমরা পাথর হওয়ার দুঃখ ভুলে যাও। তোমাদের কোনো বেদনা নেই।

নুরুদ্দিন বাম হাত দিয়ে চোখের পানি মোছে। তাহেরুণও। দু-জনের কেউই আজ মজুরি পায়নি। ভাটিয়া বলেছে, এ-সপ্তাহের মজুরি দিতে পারবে না।

কীভাবে বীরপ্রতীকের সামনে ভরা সানকি এগিয়ে দেবে তাহেরুণ? তাই ওকে চোখের পানি মুছতে হয়। আর একটু একটু করে অনেকটা সময় নিয়ে ভাত খায়। নুরুদ্দিনও ভাবে দু-কেজি চাল হাতে ধরিয়ে না দিয়ে কেমন করে বউকে বলবে, মোকে ভাত দে মনার মা। মোর ভোক লাগিছে।

ভাত দেওয়া কী সহজ কথা? ভাতের কথা ভাবলে তো দু-জনের পিলে চমকে ওঠে। কী সাংঘাতিক কথা, কী কঠিন কাজ, দু-মুঠো ভাতের হিসাব মেলাতে মেলাতে বেলা শেষ হয়ে যায়। আর দু-মুঠো ভাতের জন্য ওরা তেঁতুলিয়া-বাংলাবন্দ সড়কের ধারে বসে নুড়ি পাথরের গা থেকে বালুকণা পরিষ্কার করে পাথরের স্তূপ বানায় — ডাহুক নদী থেকে পাথর সংগ্রহ করে অন্যরা, জোয়ান ছেলেরা কিংবা তার চেয়েও ছোটোরা — মহানন্দা নদী বয়ে আনে হাজার হাজার নুড়ি পাথর, ঢেলে দেয় ডাহুকে, দুই নদীতে জমে আছে কতদিনের ভালোবাসা

— যে-ভালোবাসা দিয়ে মানুষের এক-জীবনের ক্ষতিপূরণ হয় না, আরো লাগে, আরো। উদাস হয়ে যায় নুরুদ্দিন। একটি মাত্র মেয়ে ওদের, শ্বশুরবাড়িতে আছে, বছরখানেক দেখা হয়নি মেয়েটিকে। মেয়েটি আসতে পারেনি, ওরাও যেতে পারেনি। কী আর হবে এইসব আসা-যাওয়ায়, গরিব মানুষের জীবনে এত কিছু কী মানায়? ভাবতেই তাহেরুণ উদাস হয়ে যায়। তারপর ভাতের শেষ লোকমাটা মুখে পুরে বলে, ভেলে দিন থাকে বেটিটারে দেখিনি —

— চল দেখবার যাম।

নুরুদ্দিনের চোখে ঝিলিক উঠে সেটা মুহূর্তে দপ করে নিভে যায়। বিলাসিতা, মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে যাওয়া এই মুহূর্তে বিলাসিতা, ভেবে লাভ নেই, মেয়েকে দেখার ইচ্ছা এই মুহূর্তে শিকায় উঠিয়ে রাখাই ভালো। ভালোবাসার মাটির হাঁড়িটা যাক না শিকায় ভরা, নামানোর দরকার কী? দু-জনে খাওয়া শেষ করে।

আসলে দু-জনে গতকালের ঘটনাটা ভুলতে চেষ্টা করছে। দু-জনের বুকের ভেতরে আগুন — দুঃখের এবং ক্রোধের। কিন্তু কেউই কাউকে কোনো কিছু বুঝতে দেয় না, কেবলই অন্য প্রসঙ্গ খোঁজে। বিয়ের পরে তাহেরুণ ভীষণ গৌরবে নুরুদ্দিনের বীরপ্রতীক শব্দটি ধরে রেখেছে নিজের ভেতর, এ-গাঁয়ে আর কারো নামের সঙ্গে এ-শব্দটি নেই। ও ভাবে স্বামী এবং সংসার পাওয়ার মতো এই শব্দটি ওর বাড়তি পাওয়া, গরিব মানুষের ধন। নিজের ভিটেয় ঘুমোনোর যে-আনন্দ, এটাও তেমনি। জমিজিরাত সব গিয়ে দু-টাকার মজুর হয়েছে তো কী হয়েছে, এই শব্দটা তো আছে। এ-নিয়ে ওদের দুঃখ নেই।

বরং দু-জনে কাজের অবসরে হাঁ করে কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ার দিকে তাকিয়ে থাকে, অনেক দূরের পাহাড়, কিন্তু দৃশ্যটি চমৎকার, রোদ ঝলমলে দিনে পাহাড়ের চূড়াটি ঝকমক করে, অস্পষ্ট কুয়াশার পাতলা আবরণের ফাঁকে জমাট বরফ যেন অদৃশ্য দৃশ্যকে ঘনীভূত করার চেষ্টায় ওদের সামনে হাজির হয়। ওরা দু-জনে এমন সুন্দর দৃশ্যের দূরের হাতছানি দারুণ উপভোগ করে। ভাবে, ওদের জীবনে নদী আছে, পাহাড় আছে, নুড়ি পাথরের স্তূপ আছে — জমিজিরাত ভাটিয়ার কাছে বেচতে হয়েছে তো কী হয়েছে, বেঁচে থাকার জন্য যুদ্ধ করার স্মৃতি আছে। এখনো বুক ভরা সাহস আছে। দরকার হলে আবারও লড়তে পারবে। দু-টাকার মজুর হয়েছে তো কী হয়েছে, লড়ার সাহস তো ফুরিয়ে যায়নি।

আসলে দু-জনে গতকালের ঘটনাটা ভুলতে চাইছে।

তাহেরুণ সানকি নিয়ে উঠতে উঠতে বলে, পানি খাবা?

খাম, এক খুরি দে।

তাহেরুণ নিজের সানকি ধুয়ে কলসি থেকে পানি ঢেলে আনে। নুরুদ্দিন সানকি থেকে পানি অর্ধেক খেয়ে বাকিটার ভেতরে হাত ধুয়ে নেয়। লুঙিতে মুছে ফেলে ভেজা হাত এবং মুখও। এখন কী করবে নুরুদ্দিন? সামনে কোনো কাজ নেই। ঘুম ছাড়া কিছু করার নেই, কিছু করার না থাকলে ভীষণ অসহায় মনে হয় নিজেকে। ও একটা বিড়ি ধরায়। তাহেরুণ চুলোর ধারে গেছে, কাজ সারতে সারতে ও গুনগুনিয়ে গান গায়, ওর প্রিয় অভ্যেস। নুরুদ্দিন বিড়িতে টান দিয়ে কান খাড়া করে, বেশ মজা, ও একটা কাজ পেয়েছে, মনোযোগ দিয়ে গান

শোনা এখনকার কাজ। কে বলেছে কাজ নেই, কত কাজ যে চারপাশে থাকে, শুধু খুঁজে নেওয়া মাত্র। নুরুদ্দিন উঠোনে নেমে দাঁড়ায়।

কাজ তো ওকে খুঁজতে হয়েছে, জীবন বাঁচানোর কাজ। যুদ্ধ করে ফিরে এসে হাজার রকম কাজ করেই তো বেঁচে থাকল এতটা জীবন। শুনতে পায় তাহেরুণের গলা চড়ছে, বেশ লাগছে গলার টানের সঙ্গে সুরের আবহ, মনে হয় বাড়িটায় যেন সেই পাহাড়ের চূড়ায় দেখা ঝলমলে দৃশ্যটি ভর করেছে। পরক্ষণে মনে হয় ডাহুক নদীটা বোধহয় এই বাড়িতে ভর করেছে, একসময় বুক সমান পানিতে দাঁড়িয়ে যে-নদীর তল থেকে ও নুড়িপাথর তোলার কাজ শুরু করেছিল, ততদিনে বাঁচার তাড়নায় জমিটুকু বিক্রি করে দিতে হয়েছিল, এখন পাথর-তোলা মানুষের দল নিয়ে পুরো নদীটা ওর বাড়িতে ভর করে।

নুরুদ্দিনের মনে হয় ওর মাথায় আকাশ নেমে এসেছে, এই পৃথিবীতে এই মুহূর্তে তাহেরুণ ছাড়া আর কেউ নেই। চারদিকে তারার আলো, সেই আলোতে তাহেরুণের সুরেলা কণ্ঠ আরো মায়াবী হয়ে ওঠে। ও তখন বুঝতে পারে একজন মুক্তিযোদ্ধার জন্য ওর এত গর্ব কেন, কেন অন্যরা ভুলে গেলেও ও ভুলতে পারে না নুরুদ্দিনের বীর প্রতীক হওয়ার অহংকার। এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে নুরুদ্দিন বিড়িতে জোর টান দেয়, ওর ভেতরটা উথলে ওঠে মহানন্দার মতো, ও আকাশ ছুঁতে পারে এবং তারা কুড়িয়ে নিয়ে তাহেরুণের জন্য মালা গাঁথতে থাকে।

কাজ শেষ করে তাহেরুণ ওর পাশে এসে দাঁড়ায়। বলে, এলা কী তুম নিন্দাবে?

— না। নুরুদ্দিন সজোরে মাথা নাড়ে। ওর ঘুম পায়নি। আজ রাতে ওর ঘুমোনো হবে না।

তাহেরুণও বলে, মুইও এলা নিন্দামনি।

— চল, হামরা আঙ্গিনাত বসি।

তাহেরুণ ঘর থেকে তিন-চারটা চটের বস্তা এনে উঠোনে বিছিয়ে দেয়। নুরুদ্দিন লুঙি গুটিয়ে পা ছড়িয়ে বসে। তাহেরুণ ওর পিঠের ঘামাচি খুঁটে দিতে দিতে বুক ভরে বিড়ির গন্ধ টানে। এক কালে ও নিজেও প্রচুর বিড়ি খেতো। মনার বিয়ের সময় হঠাৎ করে ছেড়ে দিয়েছে। বিড়ি টানাটা খুব কাজের কাজ মনে হয় না এখন। নুরুদ্দিনকেও নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। লোকটা বিড়ির নেশায় পাগল। একটা শেষ হলে সেই আগুনেই আর একটা ধরায়। তাহেরুণ বোঝে যে লোকটা এক প্যাকেট বিড়ি আজ রাতেই শেষ করবে।

আসলে দু-জনে গতকালের ঘটনাটা ভুলতে চাইছে।

একসময় তাহেরুণ ওর পিঠের ওপর নিজের মাথাটা ফেলে দিয়ে ডাকে, বীরপত্তিক।

নুরুদ্দিন বিড়ির ধোঁয়া উড়িয়ে দিয়ে বলে, কদ্দিন আগত যুদ্ধ হয়ছিল তোর মনে আছে?

তাহেরুণ হিসেব না করে তুখোড় স্মৃতির ক্ষিপ্রতায় বলে, সাতাইশ বছর।

নুরুদ্দিন হা-হা করে হাসে। হাসতে হাসতে কাশি ওঠে। কাশতে কাশতে বলে, ভাটিয়া মোক যুদ্ধের কথা ভুলে যাবার কয়।

তাহেরুণ নুরুদ্দিনের শোকে মুখ থুবড়ে পড়ে না। ভুলে যেতে বললে তো ভুলে যাওয়া যাবে না। যুদ্ধ অত ছোটো জিনিস নয়। তাহেরুণ নুরুদ্দিনের বলাটা গায়ে মাখে না। নুরুদ্দিন

আকস্মিকভাবে উঠে দাঁড়িয়ে ওর হাত ধরে বলে, চল নদীর ডাঙ্গাত যাই।

তাহেরুণ সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়। সন্ধ্যারাতে নদীর ধারে গেলে শরীর জুড়োবে। বিয়ের পরে ওরা এমন করে অনেক রাতে বাড়ির বাইরে চলে যেত। তখন নুরুদ্দিনের বয়স ছিল ছাব্বিশ, ওর আঠারো।

তারপরের দিনগুলো খুব দ্রুত পাল্টেছে।

যুদ্ধ করে ফিরে এসে পেয়েছিল ধূ-ধূ ভিটে। কাউকে কিছু না বলে যুদ্ধে চলে গেলেও রাজাকাররা ঠিকই বুঝেছিল এবং পাক-আর্মির কানে উঠিয়েছিল ওর যোদ্ধা হওয়ার খবর। আর্মি পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে ভিটে, বাবা-মা ও ছোটো চার ভাইবোনকে ডাহুক নদীর ধারে নিয়ে গুলি করে নদীতে ফেলে দিয়েছিল।

যুদ্ধ শেষে ফিরে এসে প্রথমে শূন্য ভিটেয় দাঁড়িয়ে কাঁদেনি নুরুদ্দিন। দেখেছিল চারদিক খোলা, আশেপাশের ঘরগুলো নেই, যারা পালিয়ে যেতে পেরেছিল তারা ফিরে আসতে শুরু করেছে। সেদিন মানুষ চোখে পড়েনি নুরুদ্দিনের, চোখে পড়েছিল দূর পাহাড়ের ঝলমলে চূড়া। দেখে থ হয়ে গিয়েছিল ও, আশ্চর্য এমন করে কোনোদিন ওই পাহাড়ের চূড়া দেখা হয়নি। সেদিন ও বুঝতে পেরেছিল স্বাধীনতার সত্য এমন, অনেককে হারাতে হয়।

এদিকে মানুষের ভিড় জমে ওর শূন্য ভিটায়। তেঁতুলিয়ার ধামনগর তিরনইহাটের মুক্তিযোদ্ধা নুরুদ্দিনকে আশেপাশের গাঁ থেকে দেখতে আসে মানুষ। ওদের অন্তহীন কৌতূহল, প্রশ্ন। প্রশ্নের শেষ নেই। নারী-পুরুষ ওর গায়ে মাথায় হাত বুলায়, ছোটোরা বিপুল বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে, কিন্তু নুরুদ্দিনের মাথায় ঘূর্ণি, নদীটা বুঝি ওর মাথায় ঢুকেছে, নাকি পাথুরে জমি, যে-জমি চাষ করতে করতে ওর বাবা জীবনীশক্তি ক্ষয় করেছিল। ওর মনে হল পরিবারের সবার মুখ মনে করতে ওর পাথুরে জমির কথাই মনে হয়েছিল। জমি তো কথা বলে না, কিন্তু জমি ধারণ করে, মানুষের দুঃখ-বেদনা-কষ্ট এবং আনন্দকেও। নুরুদ্দিন মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে। একজন এসে ওর মাথা থেকে হাতটা সরিয়ে দেয়।

একজন প্রশ্ন করে, ক্যাংকু করা যুদ্ধ করলু?

ও ছোটোদের দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসে, মৃদু হাসি। কেমন করে যুদ্ধ করল সে কথা কী বলা যায়। বলা যায় না। বলতে গেলে ভুল হতে থাকবে। নুরুদ্দিন মাথা নিচু করে চুপ করে থাকে। খোলা মাঠের ওপর দিয়ে দূরের দিকে তাকায়। কেমন করে জীবনের চারদিক ঘিরে থাকা বেড়াটা উড়ে গেল।

আবার প্রশ্ন। এবার পরপর প্রশ্ন চলতেই থাকে।

— তুই কয়জন পাক-সেনা খুন করলু?

— তোর ভয় করেনি?

— হামারা মাঝে মাঝে তোর কথা ভাবিছি।

— ওহ্ রে তোর বাপ একডা সোনার মানুষ ছিল।

— তোর মাও ভালো মানষে ছিল।

— এলা হামরা তোর তানে তামাম করিমু।

— কাল তোক হামরা একডা ঘর ওঠায়ে দিম।

— আইজ রাইতত তুই হামার এইঠে ভাত খাবু। ভাত খায়ে এইঠে নিন্দাবি, বিহানে উইঠে যাস।

— তুই কাইল নতুন ঘরত নিন্দাবি।

— মোর ঘরত চল ভাত খাবু।

নুরুদ্দিন কারো প্রশ্নের জবাব দেয় না। শুধু বলে, মোর বাপের একটা শ্যালো মেশিনের শখ ছিল। বাপ চাইছিল মেশিন দিয়া খ্যাতে পানি দিব। ধান ফলাইব। ও বাবাগো —

এতক্ষণে চিৎকার করে কাঁদে নুরুদ্দিন। ওর কান্নায় মানুষজন আরো ঘন হয়ে আসে ওর চারপাশে। ওর দম আটকে আসে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। ও নিজের মাথা হাঁটুর মধ্যে গুঁজে রেখে শরীরে নুড়ি পাথরের অস্তিত্ব অনুভব করে, ওকে এমন পাথুরে হতে হবে — শক্ত, কঠিন এবং নিরেট।

তারপরের দিনগুলো দ্রুত পালটাতে থাকে নুরুদ্দিনের।

গ্রামের সবাই মিলে ঘর তুলে দেয় ওকে। তাহেরুণের সঙ্গে বিয়ের আয়োজন করে। ওর মনে হয় দ্রুত অনেক কিছু ঘটে যাচ্ছে। উপার্জনের কী ব্যবস্থা হবে ভাবতেই তাহেরুণ চোখ বড়ো করে মাথা নাড়িয়ে বলে, ক্যান হে, জমি চাষ করো।

নুরুদ্দিন চুপ করে থাকে। ও জানে এখানকার পাথুরে জমি এক-ফসলি। শুধু আমন ধানের আবাদ হয়, বোরো হয় না। বোরো চাষের জন্য সেচের ব্যবস্থা করা লাগে, কিন্তু শ্যালো মেশিন ছাড়া সেচের ব্যবস্থা হবে না। এক ফসল দিয়ে কী সংসার চলবে? সামনে তো ঘরে নতুন মানুষ আসবে। তখন কী হবে? সন্তানের কথা ভাবতেই ওর মুখে মৃদু হাসি খেলে যায়।

তাহেরুণ কৌতূহলী হয়ে বলে, হাসেন ক্যানে?

— এমনি।

— কীসের তনে হাসেছেন কহেন?

তাহেরুণের জোর দাবি শুনে নুরুদ্দিন হো-হো করে হাসে। হাসতে হাসতে বলে, তোর কোলে ছোয়া হবে। এতানে মোর খুশি লাগেছে।

তাহেরুণ গভীর আনন্দে ওকে জড়িয়ে ধরে। নুরুদ্দিনের মনে হয় যুদ্ধ করা মানুষের এমন আনন্দ প্রাপ্য হয় যার কথা ভাবলে জমি অল্প খুঁড়লে যে পাথরের স্তর পাওয়া যায় সেটা আর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজ করতে ইচ্ছে হয়। তাহেরুণ বুকের ভেতর থেকে বুক তুলে বলে, মুই ছোয়া পিঠত লয়ে ধানের বিচন ওকড়াব। ওয়া গাড়িব। মোর খুশি লাগতাছে। মোর ছোয়া নয়া চালের ভাত খাবে।

এইসব কথা শেষে প্রবল জড়াজড়িতে দু-জনের ঘরে আলো ঢোকে। নুরুদ্দিনের জীবনের হিসেবে ভুল হবে না বলে ধারণা হয়।

কিন্তু ইচ্ছেমাফিক জীবন চালানো আর হয়ে ওঠে না নুরুদ্দিনের। তাহেরুণের কোল জুড়ে সন্তান আসে ঠিকই কিন্তু এক-ফসলি আবাদে জীবন চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। জমি চাষের

স্বপ্ন ভুলে ও ডাহুক নদীতে একবুক সমান পানির নীচ থেকে পাথর ওঠানোর কাজ শুরু করে। লোহার শিক দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নদীর নীচে কোথায় পাথর আছে তা খুঁজে বের করে বেলচা দিয়ে পাথর ছেঁচে তুলে টুকরি ভরে মাথায় করে ডাঙায় ফেলে।

নুড়ি পাথরের স্তূপ জমে ওঠে ডাঙায় — বিভিন্ন ছোটোবড়ো আকারের স্তূপ নদীর পাড়ে পাহাড়ের দৃশ্য তৈরি করে। নুরুদ্দিন এভাবে পাহাড় চিনতে শুরু করে, নিজেদের তৈরি করা পাহাড়, কিন্তু মালিক ওরা নয়। ভাটিয়া মহাজনেরা সে-পাহাড় কেনে। আর একদল লোক চালুনি দিয়ে সে-পাথরের গা থেকে বালি পরিষ্কার করে। আকার অনুযায়ী ভাগ করা হয় পাথর — বড়ো, মাঝারি, ছোটো — কী সুন্দর দেখতে। কখনো আকার দৃষ্টি কাড়ে, কখনো রঙ, কখনো বা সবটা মিলিয়ে। পিঠে বাচ্চা বেঁধে রেখে পাথর ভাঙার কাজ করে তাহেরুণ।

ফসলের স্বপ্ন ও আর দেখে না। জমিজিরাত যেটুকু ছিল সংসারে মুখ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটুকু বেচে খেতে হয়েছে, এখন বাকি ভিটেটুকু। ক্লান্ত তাহেরুণ কাজের ফাঁকে গাছতলায় গিয়ে বসে। নুরুদ্দিনও পাশে এসে বসলে ও বিষণ্ণ হাসি হেসে বলে, বীরপত্তিক, মুই পানি খাম।

নুরুদ্দিন ওকে নদী থেকে পানি এনে দেয়। ঢকঢক করে পানি খায় তাহেরুণ। ওর বুকটা তৃষ্ণায় বুঝি পাথুরে জমি হয়ে গেছে, পাথুরে জমি তো এক মুহূর্তে সব পানি শুষে ফেলে। জীবনটা কেমন যেন হয়ে গেল, তবু বিভ্রান্ত হয় না নুরুদ্দিন, ভাবে জমির নীচের পাথরের চেয়ে নদীর পাথর অনেক সুন্দর, তবু তো পাথর তোলার কাজ পেয়ে ও নিজে গ্রামে থেকে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে। নইলে দিনমজুর হয়ে শ্রম-বিক্রির জন্য যেতে হত অন্য কোথাও। নিজ গ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চায় না নুরুদ্দিন। মনে হয় তা হলে স্বাধীনতার স্বপ্ন অস্পষ্ট হতে থাকবে, যে-যুদ্ধটা করেছে তার অনুভব এই পাথুরে জমিতে দাঁড়িয়েই ও বুকের ভেতরে রাখতে চায় — এই নদী, মাঠ-প্রান্তর, পথঘাট এবং মানুষের দল ওর সামনে দৃশ্যমান থাকে আপনজনের মতো, যা ও জন্মের পর থেকে দেখেছে, যার মাঝে ওর বাবা-মায়ের ঘরগেরস্তি ছিল, যেটা স্বাধীনতার জন্য দান করতে হয়েছে। এই মূল্যের বাইরে গিয়ে ও উদ্বাস্তু হতে চায় না। উদ্বাস্তু হওয়া মানুষকে ও ঘৃণা করে।

ভাটিয়া মহাজন যারা অন্য জেলা থেকে এসে এখানে পানির দরে জমি কিনেছে তারা ওর দু-চোখের বিষ। ওরাও উদ্বাস্তু। নিজের ঠাঁই খেয়ে ফেলে অন্য জেলায় এসেছে মান কিনতে। এদের একজন আবার ওকে সহ্য করতে পারে না। যখন জেনেছে নুরুদ্দিন মুক্তিযোদ্ধা বীরপ্রতীক, সেদিনই বলেছিল, বীরপত্তিক না ছাই, যত্তসব চালাকি, মোরা এগ্‌লা বুজি।

একদিন নদীর ডাঙায় দাঁড়িয়ে হাসমতের গলা দু-হাতে চেপে ধরে বলেছিল, আর এইরকম কথা কইলে মাথাটা ফাটায়ে দিম। শালা, কুত্তার বাচ্চা। মোর জমিনত আসে ভাটিয়া হইছিত। নিজের জমিন নাই তোর, পরের জমিত আসে ঘর উডাইছিস। ভাটিয়া শালার পুত তোর কন্না চাবায়ে খাম।

নুরুদ্দিন গলার রগ ফুলিয়ে দাঁত কিড়মিড় করে বলে, তুই যুদ্ধ করিসনি, স্বাদীন দ্যাশ পাইছিস, এলা হামরা পথের কাঁটা হইছিত, না? আরো যুদ্ধ করিম, হয় তুই থাকিব, না হয়

হামরা থাকিম।

হাসমত সেদিন কথা বাড়ায়নি। ও যুদ্ধের সময় ময়মনসিংহে রাজাকার ছিল, টাকা-পয়সা লুটপাট করে ভয়ে পালিয়ে এসেছে এখানে। ওকে পথ দেখিয়েছে হসরত রাজাকার, ওর আত্মীয়। এখন ওরা দলে ভারী হতে যাচ্ছে।

এভাবেই তো দিন পার হয়। কখনো মুখোমুখি রুখে দাঁড়িয়ে, কখনো আর একটি যুদ্ধের কথা ভেবে। এর মাঝে জীবিকার জন্য পাথরের পাহাড় বানিয়ে অন্যদের ডেকে বলেছে, দ্যাখ মুই হিমালয় পব্বত বানাইছু।

ইদানীং হাসমতের বাড় বেড়েছে। ওর দলের মানুষ মন্ত্রী হয়েছে। নুরুদ্দিনের সামনে বুক টান করে বলে, ওইসব যুদ্ধফুদ্ধ ভুলে যাও। বীরপ্রতীক লেবাস পরে কাজ হবে না।

এখনকার বয়সী নুরুদ্দিন হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। ভাবে, যারা ওকে সেই সময়ের কথা ভুলতে বলে তারা কী এই দেশের মানুষ? নতুন করে বিষয়টি ওকে ভাবাচ্ছে। ওর বাড়ি ফিরতে দেরি হয়। ও ডাহুক নদীর ধারে বসে থাকে। আর তাহেরুণ প্রতিবেশি গেদুর মাকে বলে, বেলা গেল মুই ভাত চড়াম, মোর ভাতার এলা বাড়ি আসিবে।

— তোমরা য্যান লোকটারে কী করে ডাকো?

— বীরপত্তিক। তাহেরুণের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে যায়। এই তো দুপুরবেলা পর্যন্ত দু-জনে পাথর ভেঙেছে। ট্রাক বোঝাই পাথর চলে গেছে শহরে। তা হলে লোকটা আসছে না কেন? তা হলে কী হাসমত ওকে আবার বলেছে, এলা হামরা ক্ষমতা পাইছি। তুই বেশি বাড়াবাড়ি করলে তোর ঘাড় মটকায়ে দিম, হালার পুত।

ভাত রান্না শেষ হলেও, নুরুদ্দিন ঘরে ফেরে না দেখে তাহেরুণ ওকে খুঁজতে বের হয়। ডাহুক নদীর ধারে এসে দেখতে পায় নুরুদ্দিন একা একা বসে আছে। ও কাছে গিয়ে বসে। মৃদু স্বরে বলে, বীরপত্তিক!

ও তাহেরুণের দিকে ফিরে না তাকিয়ে বলে, আর একটা যুদ্ধ করিম।

— কী কহিলেন?

— ঠিকই কহিলাম।

— তো বাড়িত চলেন ভাত খাবেন।

— হ ভাত খাম, ভোক লাগছে। মোক বেশি করে ভাত দেব। য্যান শরীরের শক্তি শ্যাষ না হয়।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারার এক অদৃশ্য আনন্দে সে-রাতে নুরুদ্দিন গভীর ঘুমে রাত পার করে দেয়।

কয়েকদিন পরে পাথর ভাঙার সময় কয়েকজন যুবক ছেলে নুরুদ্দিনের কাছে এসে দাঁড়ায়। ও পাথর ভাঙা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করে না। কারণ মজুরির হিসাব হবে ফুট হিসাবে মেপে। কাজ বন্ধ রাখা লস। তাহেরুণ ওর পাশে বসে কাজ করছে। ওর হাতের হাতুড়ি থেমে গেছে। একজন ছেলে পিঠের ব্যাগটা নামিয়ে বলে, আপনি এই গাঁয়ের মুক্তিযোদ্ধা, বীর প্রতীক নুরুদ্দিন?

তাহেরুণ তড়িৎ উত্তর দেয়, ঠিক কহাছেন।

নুরুদ্দিনও চোখ তুলে তাকায়। ছেলেটি বলে, আমি বিবিসিতে কাজ করি। আপনার একটা সাক্ষাৎকার নেব।

— ক্যানে?

— আপনি যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছেন। এখন আপনি কেমন আছেন?

— যুদ্ধ তো শ্যাস হয়নি। নুরুদ্দিনের নির্বিকার কণ্ঠ।

— হয়নি?

— না। ও দৃঢ় কণ্ঠে বলে। কারো দিকে তাকায় না।

— তা হলে...

আমতা আমতা করে সাংবাদিক। ওর বিস্ময় ফুরোয় না। কী বলছে মুক্তিযোদ্ধা নুরুদ্দিন তা বুঝতেও ওর সময় লাগছে। এলাকার নানাজনের সাক্ষাৎকার নিয়ে ও একটি রিপোর্ট করবে বলে এসেছে। গাঁয়ের লোকজন দূর থেকে নুরুদ্দিনকে দেখিয়ে দিয়েছে। নুরুদ্দিনের মুখের সামনে ছোটো ক্যাসেটটা ধরে রাখা যুবক বলে, আপনি যেন কী বলছিলেন?

— কী কইছিলাম? কইছিলাম যে হামরা এলা সিজ ফায়ারে আছু।

— সিজ ফায়ার? তরুণ সাংবাদিক চিৎকার করে ওঠে।

নুরুদ্দিন মৃদু হেসে আবার পাথর ভাঙায় মনোযোগী হয়। সাংবাদিকের বিস্ময়কে ভ্রূক্ষেপ করে না। পাথর ভাঙার ধুকধুক ধ্বনি চারদিকে বাজতে থাকে।

সাংবাদিক আবার বলে, আপনি বললেন? আমরা এখন সিজ ফায়ারে।

— যুদ্ধের ট্রেনিংয়ের সময় এই কথাটা লিখেছু। এলা এইটার মানে বুঝেছু। আর একটা যুদ্ধ লাগিবে।

বিমূঢ় সাংবাদিক অপার বিস্ময়ে নুরুদ্দিনকে দেখে — সব চুল পেকে গেছে, হাতের মোটা রগ দৃশ্যমান, বুকের হাড় গোনা যায়। ছেঁড়া গেঞ্জি সব হাড় ঢাকতে পারেনি। একটু পরে ঘাড় ঘুরিয়ে তাহেরুণকে কি যেন বলে ওরা তা বুঝতে পারে না।

কয়েকটি শব্দের অর্থ :

লোকমা — এক গ্রাস / এলা — এখন / মোকে — আমাকে / নিন্দাবে — ঘুমোবে / ডাঙ্গাত — পার / তানে — জন্য / তামাম — সমস্ত / এতানে — তাই / বিচন — বীজ / ছোয়া — ছেলে / খাম—খাবো / কল্লা — ঘাড় / হইছিত — হওয়া / দিম — দেবো / লেবাস — পোশাক / ভাতার — স্বামী।

বিভাব

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বিশেষ চিত্রনাট্য সংখ্যা

১৪১১

সীমিত সংখ্যায় এখনো পাওয়া যাচ্ছে

দাম : ৬০ টাকা

লিটল ম্যাগাজিন মেলায় আমাদের স্টলে পাওয়া যাবে

১৪১২ বইমেলায় আমাদের টেবিলে পাওয়া যাবে

তিনটি চিত্রনাট্য

দেখা

শুভ মহরৎ

লালসালু

আলাদা করেও পাওয়া যাচ্ছে

দেখা : ৩৫ টাকা

শুভ মহরৎ : ৩৫ টাকা

লালসালু : ৩০ টাকা

উত্তরা : ৩০ টাকা

পাওয়া যাচ্ছে বিভাবের অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য পুরোনো সংখ্যা

জীবনচক্র

কল্যাণ মজুমদার

জীবনের গতিপথ বৃত্তাকার। নইলে যে-শহর ছেড়ে গিয়েছিল, সঠিক বলতে গেলে পালিয়ে গিয়ে বেঁচেছিল, সেই শহরেই কেন ফিরে আসবে উনিশ বছর পর। প্রাক তারুণ্যের দুর্বিষহ তিনটি বছরের সামান্য পলিও স্মৃতির দূরতম কোণে ছিল না। চেষ্টা করে বা কষ্ট করে ভুলতে হয়নি। জীবনের প্রবহমানতার গতি-মহিমায় স্বাভাবিক নিয়মেই মুছে গিয়েছে। এখনকার সম্পন্ন ও সমাজমান্য ভূমিকায় প্রাচীন অন্ধকারের নিশিডাক কেন? যে-ডাকের নাম ডাব্বুভাই, ভেকু, পেগড়ু। ওরা এতদিন পরও মনে রাখবে, খুঁজে নিয়ে পুরোনো দিনের অধিকারে স্যাঙাতগিরির আবদার করবে, ভাবনায় আসেনি কখনো। সামান্যতম সম্ভাবনাও মাথায় উঁকি দিলে অবশ্যই এই পোস্টিং এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করত। ওদের ডাককে সরাসরি উপেক্ষাও করতে পারছে না অন্তর্গত কৃতজ্ঞতাবোধের জন্য। সেই অন্ধকার দিনে, রাত বলাই সঙ্গত, ডাব্বুভাইয়ের স্নেহাশ্রয়ের ঋণ ভোলা অসম্ভব। পিচ্ছিল অন্ধকারের সোপান পেরিয়েই আজ এই আলোকোজ্জ্বল শিখরে পৌঁছেছে। তখন ডাব্বুভাই ভরসা না দিলে কী হতে পারত, আজ কোথায় থাকত আঁচ করাও কঠিন। খুনি হতে পারত, দাগি আসামি হয়ে জেল-শালিখ হতে পারত। সিফিলিস বা এইডসের রোগী হওয়াও অসম্ভব ছিল না। পুলিশের গুলিতে ঝাঁঝরাও হতে পারত। তার বদলে লোহিত পাইন এক নামী প্রতিষ্ঠানের দামি অধিকর্তা। সরকারি আমলা, পুলিশের বড়ো সাহেব, এমনকী বিচারক, ব্যারিস্টারদের সঙ্গেও তার দহরম। ভাগ্যিস চিত্রিতা এখানে নেই এখন। থাকলে নিশ্চয় নাক কুঁচকে বলত, এইসব রাফিয়ানরা তোমার বন্ধু ছিল! মেয়ে টুসকি হয়তো বলত, পাপা, হোয়াই দে লুক লাইক হুলিগানস অফ হিন্দি মুভিজ?

অথচ এখনো ওদের সঙ্গে দেখা হয়নি। শুধু ফোনে কথা হয়েছে। তাতেই কত কী ভেবে চলেছে। অজস্র স্মৃতি মনে পড়ছে একের পর এক। স্থিরচিত্রের মিছিল যেন। এতগুলো বছরে ওরাও নির্ঘাৎ অনেক বদলেছে। কিন্তু স্মৃতিতে ধরা আছে সেই পুরোনো মূর্তিমায়া। আসলে ফোনটাই আমূল নাড়িয়ে দিয়েছে। পি.এ. কৌশল্যা বলেছিল, কে একজন ডাব্বুভাই আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে।

— কে বললে?

— ডাব্বুভাই। বলছে ডাব্বুভাই, পাণ্ডু স্টেশন — বললেই আপনি চিনবেন।

ডাব্বুভাই! পাণ্ডু স্টেশন! ভুলবে কীভাবে? ফোনটা ধরতেই হল।

— হ্যাঁ, ডাব্বুভাই, কেমন আছ? এই নম্বর পেলে কোথায়?

— আরে রাজা, তু কিতনা বড়া হো গিয়া। বড়ো খুশি লেগেছে যেদিন ভেকু আর পেগড়ু টিভিতে দেখে তোকে পহচান লিয়া। আখবারেও নাকি ছেপেছিল।

— তোমরা কেমন আছ? ভেকু, পেগড়ু, গজা এখনো আছে তোমার সঙ্গে?

— গজাটা নেই, পাঁচ সাল হল সাবাড় হয়ে গেছ। ভেকু কয়েক মাস হল জেল থেকে বেরিয়েছে। পেগড়ুর একটা পা গেছে। আছে আমার সঙ্গে, যাবে আর কোথায়! যেমন ছিলাম তেমনি চলছে। রোজগার কম, হয়রানি বেশি। উমর ভি হল।

মনে মনে ছোটো একটা হিসেব কষে লোহিত। নিজের ছত্রিশ চলছে। ডাব্বুভাইয়ের নিশ্চয় পঞ্চাশ হবে। ভেকু, পেগড়ুও বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশের কম নয়।

— লাইনটা আর ছাড়তে পারলে না, ডাব্বুভাই!

— পড়ালিখা শিখিনি, অন্য কোনো কাজও করিনি। যা পারি, তা-ই চালিয়ে যাচ্ছি। তু বড়া আদমি বনা, হম বহুত খুশ। লেকিন হমসে মিলেগা তো? রাজা, তোমাকে দেখতে দিল চাইছে খুব।

— আমারও তোমাদের দেখতে ইচ্ছে করছে। আজ তো বুধবার, শনিবার একটা নাগাদ আমার অফিসে চলে এসো সবাইকে নিয়ে। একসঙ্গে লাঞ্চ খাব, আড্ডা দেবো। আমার অফিস চেন তো? পল্টনবাজারে।

— তোমাদের বিশাল অফিস, চিনব না! কিন্তু আমরা গেলে তোমার কোনো অসুবিধে হবে না তো?

— না, না। কীসের অসুবিধে! চলে এসো, আমি গেটে বলে রাখব। ডাব্বুভাই, ইয়ে মানে ভেকু কী এখনো জংলি চেহারায়, নোংরা শার্ট-প্যান্টে —

— সমঝ গিয়া, রাজা। বেফিকির থাকো। আমরা ঠিক পোশাকে যাব।

এইটুকু ভদ্রতা করতেই হত। কিন্তু টেলিফোন রাখার পর থেকেই বুকের মধ্যে শঙ্কার শীতল প্রবাহ। ওদের মতলব কী? শুধু পুরোনো রাজার সাচ্ছল্য দেখার জন্য ডাব্বুভাই এত খোঁজখবর নিয়ে ফোন করে দেখা করতে চাইবে, এটা বিশ্বাস্য নয়। যদি তা হয়ও, বারবার আসতে চাইবে না তো! বাড়িতে আসতে চাইলে আরো সমস্যা। চিত্রিতা মুখের ওপর যা খুশি বলে দিতে পারে, ঢুকতেও না দিতে পারে। ওদের চটানোও বিপদের। ডাব্বুভাইয়ের স্নেহশীলতা এখনো উদারভাবে বর্ষিত হবে, ভাবা উচিত হবে না। ঝোঁকের মাথায় নিমন্ত্রণ করাটা বোধহয় হঠকারিতা হয়ে গেল। এত বছর পর ডাব্বুভাইয়ের গলা শুনে মনটা উচ্ছল হয়েছিল। শনিবারের জন্য না বললেও অন্য কোনো একদিন করতেই হত। আশা করা যাক একদিন খাইয়ে দাইয়ে দিলে আর হয়তো ডাকাডাকি করবে না। ডাব্বুভাই বুদ্ধিমান ও বিবেচক। নিশ্চয় বুঝবে পাণ্ডু স্টেশনের রেল বগির বাসিন্দা সেই রাজা এখন এক সম্পূর্ণ অন্য ভুবনের অধিবাসী, যেখানে ওদের প্রবেশ নিষেধ।

ডাব্বুভাইয়ের টেলিফোনটা ডিনামাইটের গোপন তারে আগুন লাগার মতো কাজ করেছে। অসংখ্য স্মৃতির স্লাইড বারবার পরদায় ভেসে ওঠে। অনেক কথা, ঘটনা। ভাবত সব ভুলে গেছে। গত পনেরো বছরে একবারও ওদের কারো কথা মনে পড়েনি। এখন মাথায় হঠাৎ বিস্ফোরণ। বন্যার মতো ভেসে আসছে স্মৃতির ঢেউ। মাঝে মাঝে ফাঁক থেকে যাচ্ছে। সব কিছু ঠিকঠাক মনে পড়ছে না। কিছুতেই মনে পড়ছে না কীভাবে পরিচয় হয়েছিল ডাব্বুর সঙ্গে। প্রথমে বোধহয় ভেকুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। নাকি রামশরনের ঘরে এসেছিল ডাব্বু? ঘর

মানে মাল গাড়ির বাতিল বগি। ছ-টা কী সাতটা বগি ছিল। সেগুলোতে রামশরনের মতো কুলিরা থাকত। ওরা বলত ডাব্বাঘর। একটা ছিল ডাব্বুদের দখলে। পাণ্ডু স্টেশনের কোনো গুরুত্ব ছিল না। দিনে গোটা কয়েক লোকাল ট্রেন চলত শুধু। কুলিরা সব কাজে যেত গুয়াহাটি, ঝালুকবাড়ি, মালিগাঁওতে। ডাব্বুরা কী করত প্রথমে বুঝতেই পারেনি লোহিত। হঠাৎ হঠাৎ অনেক রাতে হাজির হত। রামশরন ওদের সম্পর্কে বারবার সাবধান করে বলত — ইয়ে সব বুরা লড়কা, এক নম্বর কা বদমাস। ওদের মতো চলার চেষ্টা করবে না। রামশরনের কথা মনে পড়তে বুকের মধ্যে ঝাঁকুনি লাগে। এমন একটা খাঁটি মানুষ জীবনে আর দেখল না। সেদিন কৌতূহলী রামশরন স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে আশ্রয় না দিলে কোথায় যেত লোহিত? ডাব্বুদের দেখাও পেত না। তাহলে এই সম্ভ্রান্ত সিংহাসনে আসীন হতে পারত কি?

দুঃস্বপ্নের রাতটার কথা মনে করলে এখনো নিজের ভেতরটা কেঁপে কেঁপে ওঠে। সদ্য হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করেছে। দু-চোখ ভরা স্বপ্ন। শুধু নিজের নয়। মা বাবা দিদি — সবার। বাবার ইচ্ছে লোহিত ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুক। দিদি বলত ডাক্তারি। ওর নিজের ইচ্ছে ছিল অধ্যাপক হবার। মা বলত, মানুষের চাওয়ায় কিছু হয় না; ভাগ্যে যা আছে তা-ই হবে। শেষ বিচারে হয়ত মা-র কথাই ঠিক। এখানে পৌঁছাতে পারবে কোনোদিন — রেল প্ল্যাটফর্ম বা বগিতে শুয়ে স্বপ্নে দেখাও সম্ভব ছিল না। বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা দেখে ফুরফুরে মনে বাড়ি ফিরে জামা ছাড়ছিল লোহিত। অকস্মাৎ কারা যেন বাবার নাম ধরে ডাকল। রাজনীতি ও ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত থাকায় সময়ে অসময়ে বাবার কাছে লোকজনের আসা যাওয়া ছিলই। বাবা বেরিয়ে কী বলেছিলেন, আদৌ কিছু বলেছিলেন কি না জানা নেই লোহিতের। হঠাৎ অনেক মানুষের চিৎকার, অশ্রাব্য গালাগালি। তারপরই গুলির শব্দ। মা-ও 'কী করছেন', বলে এগিয়ে যেতে গুলি লাগে মা-র বুকেও। আরো চিৎকার —

— শালাদের আজ নির্বংশ করে ছাড়ব। হারামির ছেলেমেয়েরা কোথায় আছে দ্যাখ্।

— মেয়েটা জবর জিনিস, ওটাকে আমি নেবই। কোনো কথা শুনব না বলে দিলাম।

হতভম্ব লোহিত বুঝতেই পারছিল না কী ঘটছে। সবাই বাবাদের একই লাল পার্টির লোক। কী এমন ঘটেছে যে এমন অতর্কিত আক্রমণ করল দল বেঁধে!

ছুটে এসে বলল, তুই পালা। এক মুহূর্তও দেরি করিস না। পিছনের দরজা খুলে এসেছি। যা। যা —

লোহিত বলল, তুই? তুই যাবি না?

দিদি বলল, কথা না বাড়িয়ে তুই যা। মা একলা আছে, আমি মা-র কাছে যাচ্ছি।

একরকম ঠেলেই দিদি ওকে বের করে দিয়েছিল। ও দিগ্‌বিদিকশূন্য হয়ে দৌড়াতে থাকে। দু-তিনজন টের পেয়ে ওকে তাড়া করে। লোহিত আক্ষরিক অর্থেই প্রাণ মুঠোয় নিয়ে ছোটে। বাঁক নেবার মুখে দ্যাখে দাউদাউ অগ্নিশিখা। অনেক বছর পরে জেনেছিল, দিদি সেই আগুনেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। যেমন জেনেছিল পার্টির দুর্নীতি নিয়ে সরব হবার জন্যই বাবার ওপর ওই সংগঠিত আক্রমণ। স্থানীয় প্রধান নেতার বহু কুকীর্তির তথ্য-প্রমাণ ছিল বাবার কাছে।

সুতরাং অপারেশন — স্বদেশ পাইন! লোক দেখানো তদন্ত হলেও কারো শাস্তি হয়নি। লোহিত আর ফিরে যায়নি পৈতৃক ঠিকানায়।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটতে ছুটতে কীভাবে শিয়ালদহ স্টেশনে হাজির হয়েছিল জানা নেই। ও আজও মনে করতে পারে না কীভাবে, কেন গুয়াহাটি স্টেশনে পৌঁছেছিল।

দু-দিন ধরে প্ল্যাটফর্মে শুয়ে থাকা কিশোর লোহিতকে লক্ষ করে রামশরন। ভদ্র চেহারার ছেলেটি চুপচাপ শুয়ে বা বসে থাকে। মাঝে মাঝে আঁজলা করে জল খেয়ে আসে। স্টেশনের ভিড়, কোলাহল, ট্রেনের আসা যাওয়া — সব কিছুর প্রতি উদাসীন। কৌতূহলী রামশরন ওর পাশে বসে স্নেহের স্বরে জানতে চায়, দু-দিন ধরে তোমাকে দেখছি। কাঁহা যাওগে?

লোহিত নিরুত্তরে মাথা নাড়ে।

রামশরন আবার বলে, জরুর ভুখ লাগা হোগা। কুছ খাওগে, বেটা?

লোহিত ওর মুখের দিকে চেয়ে আবার মাথা নাড়ে।

নাছোড় রামশরন জানতে চায়, তোমার বাড়ি কোথায়?

এবার লোহিত কথা বলে, নেই।

— পিতামাতা?

— নেই।

— কী করতে তুমি?

— হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করেছি। কলেজে ভরতি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু —

লোহিতের মুখে আর কথা জোগায় না। কণ্ঠার কাছে বাষ্প জমে। চোখ জ্বালা করে, জল আসে না। অশ্রুগ্রন্থি শুকিয়ে গেছে বুঝি।

রামশরন বলল, সমঝ গিয়া। চল বেটা মেরে সাথ।

— কোথায়?

— মেরা ঘর। আজ রাতে থাক, ঘুমাও। কাল থেকে ধান্ধা শুরু।

একরকম জোর করেই রামশরন লোহিতকে নিয়ে তার মাল, গাড়ির বাতিল বগির ঘরে নিয়ে এল। নিজের হাতে রুটি সবজি বানিয়ে খাওয়াল। লোহিত অবাক হয়ে দেখল রামশরনের ওই ডাব্বাঘরও কী পরিচ্ছন্ন। সামান্য বাসনপত্র, সতরঞ্চি, বিছানার চাদর, বালিশ সব পরিপাটি করে রাখা। সতরঞ্চি পেতে দিয়ে বলল, আভি লেট যাও। ডরো মত। আপনা ঘর সমঝ কর রহো।

লোহিত বলল, আপনার পরিবার নেই?

— আছে। বালিয়াতে। বিবি, দো লড়কা। আউর দো পোতা হ্যায় তুমহারা মাফিক।

নিজের অসহায়তা বুঝে রামশরনের সঙ্গে এলেও মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের অহমিকা লোহিতের মস্তিষ্কে অজস্র কাঁটা ফোটাচ্ছিল। অস্বস্তির ভার বুকে নিয়ে সতরঞ্চির ওপর শুয়ে পড়ল। রামশরন বলল, তোমার কষ্ট হবে, কিন্তু আমার কাছে আর কিছু নেই।

প্রতিবাদ করে লোহিত, কী বলছেন আপনি! আপনি আমার জন্য কত করছেন, আপনার কর্জ কী করে শোধ করব জানি না।

রামশরন বলে, ইনসান ইনসানের জন্য না করলে, সে কীসের ইনসান! বাবুবেটা, আরো বয়স হলে বুঝবে জীবনের সব কর্জ শোধ করা যায় না, করতে হয়ও না। বরং মনে করো, আমিই আমার কোনো পুরোনো কর্জ চুকাচ্ছি।

বাবুবেটা শব্দটা লোহিতের প্রাণে গভীর স্নেহের ছাপ এঁকে দেয়। তখন অবশ্য জানত না রামশরন ওকে এই সম্বোধনেই ডেকে যাবে।

সে-রাতেই রামশরনের জানা হয়ে যায় লোহিতের পরিবারের ইতিবৃত্ত। লোহিতের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের কথা। জীবনধারণের জন্য ওকে এখন সব ভুলে রোজগারের কথা ভাবতে হবে। কী কাজ করবে, কে ওকে কাজ দেবে? রামশরন ওকে আশ্বস্ত করে, অত ভেব না, কিছু একটা ব্যবস্থা হবেই। তুমি আমার এখানে থাকবে যতদিন খুশি। লেকিন কুছ কামাই করনা জরুরি, নেহি তো আপনা পাস গির যাওগে। ঔর এক বাত, বাবুবেটা, আপনা মকসদ নহি তোড়না। আপনা পরিবারকা পরম্পরা নহি ভুল না।

সকালে রামশরনের করা চা খেতে খেতে রোজগারের পন্থা ভাবছিল লোহিত। খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন বিক্রি করা যেতে পারে। অথবা লজেন্স বা চানাচুর। যাই করুক কিছু টাকা তো লাগবেই। ওর কাছে কিছুই নেই।

— আরে চাচা, ইয়ে নয়া চিড়িয়া কঁহাসে লায়া?

বক্তার দিকে চেয়ে লোহিতের হাতের কাপ কেঁপে ওঠে। বলিষ্ঠ চেহারার মানুষটা ওর চেয়ে আট-দশ বছরের বড়ো হবেই। গায়ে বাঘের মুখ আঁকা কালো গেঞ্জি, পরনে রং-চটা জিনস। কবজিতে স্টিলের কড়া। চঞ্চল চোখের দৃষ্টিতে হিংস্রতা।

রামশরন মুখ না তুলেই বলল, ভেকু, তু ফির আ গিয়া।

খিকখিক হেসে ভেকু বলল, কী করব বলো, সরকার রাখতে চাইল না। ওস্তাদ ভি এসে গেছে।

রামশরন এবার মুখ তোলে, ডাব্বু এসেছে! কখন এল?

ভেকু বলল, কাল রাত কো। বহুত আচ্ছা দাঁও মারা। প্রচুর ফুর্তি হয়েছে। এখন ঘুমোচ্ছে।

— ডাব্বু উঠলে একবার আসতে বলিস।

— তা তো বলব। তুমি এই নতুন চিড়িয়ার কথা বলছ না কেন?

ধমকে ওঠে রামশরন, ইজ্জত সে বাত কর্। এ আমার বাবুবেটা। পড়ালিখা জানা ভদ্রলোক। তোর মতো চোর লাফাঙ্গা নয়। যা, ভাগ এখন।

রামশরন দ্রুত হাতে ঘরের কাজ সেরে সবজি কাটে, আটা মাখে। লোহিতের আপশোস হয়, ইস, এই কাজগুলো জানলে এই বৃদ্ধকে কিছু সাহায্য করতে পারত। রান্না জানলে হয়তো একটা কাজও পাওয়া সম্ভব হত। ড্রাইভিং শেখেনি। এখন শিখতে গেলে অনেক টাকা দরকার হবে। লোহিত মন দিয়ে আটা মাখা, রুটি বেলা দেখে। বাড়িতে কোনোদিন লক্ষ তো করেইনি, চিন্তাও করেনি এসব কীভাবে হয়। অথচ নিয়মিত খাওয়ার টেবিলে সব পেয়ে গেছে। রুটিন অভ্যস্ততা কোনো আগ্রহ জাগতে দেয়নি।

কিছুক্ষণ পর বগির বাইরে থেকে ডাক এল, চাচা —

রামশরন মুখ তুলে ওকে দেখে বলল, ডাব্বু! দাঁড়া আমি আসছি।

রুটি বেলা থামিয়ে গামছায় হাত মুছে রামশরন নেমে গেল বগিঘর থেকে। লোহিত দেখল একটু দূরে গিয়ে রামশরন ডাব্বুকে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছে। ওকে নিয়েই যে বলছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিব্রত বোধ করলেও পরিস্থিতি বাধ্য করে নিশ্চুপ থাকতে। লোহিত আড়াল থেকে ডাব্বুকে লক্ষ করে। ছ-ফুটি চেহারা। ভেকুর মতোই শক্তপোক্ত। বয়স অবশ্য ভেকুর চেয়ে অনেক বেশি। মুখ ভরতি দাড়িগোঁফ। ডোরাকাটা লুঙ্গির ওপর সবুজ কুর্তা। মাথায় কোঁকড়া চুলে বহুদিন কাঁচি চলেনি।

কথা বলতে বলতে দু-জনে বগির কাছে এলে রামশরন ডাকে, বাবুবেটা ইধর আও।

লোহিত লাফিয়ে নেমে ডাব্বুর মুখোমুখি দাঁড়ায়। ডান দিকে রামশরন।

ডাব্বু বলে, চাচার কাছে সব শুনলাম। রহনেকা কোই প্রবলেম নহি। মানলো মেরা ঘর তুমহারা হো গয়া।

রামশরন বলল, আমার পরের তিন নম্বর বগিটা ওদের। কখনো কখনো আসে, থাকে।

ডাব্বু আবার বলে, আভি বাত হ্যায় কাম-কাজ কা, রোজি কা। আমার সঙ্গে লেগে যাও।

রামশরন প্রতিবাদ করে, নহি ডাব্বু। আমি বললাম না ওকে তোমাদের লাইনে লাগাবে না। আচ্ছা ঘরকা লড়কা কো উসব গান্ধা কাম নহি করনা চাহিয়ে।

— আরে চাচা, ভুখ আচ্ছা বুরা কুছ নহি। ভুখ ভুখই হোতা হ্যায়। রন্ডি কা রুপায়া ঔর পণ্ডিতকা রুপায়া মে কোই ফারাক নহি। ফির ভি, চাচা, তুমহরা বাত হম ধ্যান মে রাখেঙ্গে। ক্যায়া নাম বোলা?

— লোহিত। লোহিত পাইন। — লোহিত নিজেই বলল।

— হ্যাঁ, লোহিত, চাচা তুমকো বেটা বানায়া, তো তুম হামারা ভাই হো। আংরেজি আতা হ্যায়? সাহাব লোকোসে বাত করনে সকতা?

— ইংরেজি জানি। বলতেও পারি।

— ব্যস, কাম বন গয়া। লেকিন ইয়ে কাপড়া নহি চলেগা। আচ্ছা ড্রেস চাহিয়ে।

— আমার আর কোনো পোশাক নেই। একটা টাকাও নেই। — ব্যাকুল গলায় বলে লোহিত।

— ঘাবড়াও মত। আমি আছি তো। এখন থেকে যা যা দরকার আমাকে বলবে। আর আমি তোমাকে বলে দেবো কোথায় কখন কার কাছে যেতে হবে, কী করতে হবে। ঠিক আছে?

সম্মতিতে মাথা নাড়ে লোহিত।

সেদিনই ডাব্বু ওকে দু-সেট ভালো শার্ট প্যান্ট আর একজোড়া জুতো কিনে দিয়ে বলল, এসব টাকা পরে তোমার রোজগার থেকে কেটে নেব। আমরা দান-খয়রাতে বিশ্বাস করি না।

কয়েকদিনের মধ্যেই লোহিত বুঝে যায় এরা আসলে ওয়াগনব্রেকার। ডাব্বুই দলনেতা। ওর সঙ্গে আছে ভেকু, পেগড়ু, গজা, মুন্না, আলতাফ, ফকরু। গজা আর ফকরু সুযোগ বুঝে যাত্রীদের মালপত্রও হাপিশ করে। পালা করে জেলে যায়, আবার ফিরেও আসে। ডাব্বুর বগিঘরেও পালা করে আসে, থাকে। ওদের প্রত্যেকের আলাদা ঘরবাড়ি আছে ঝালুকবাড়ি,

কাঁইকুচি, পলাশবাড়ির মতো জায়গায়। বগিঘর ওদের শেলটার। মাল রাখা ও পাচারের গুদামঘরও। ভালো দাঁও মারতে পারলে নেশার ফুর্তিতে এখানেই শুয়ে থাকে দল বেঁধে। ডাব্বুর বগিঘরই এখন লোহিতের ঠিকানা। রামশরন সকালে রুটি-সবজি খেয়ে বেরিয়ে যায়। ফেরে শেষ লোকালে। ডাব্বুদের আনা মালপত্র ঠিক হিসাব করে রাখা, আবার যথাসময়ে সেসব যথাস্থানে পৌঁছে দেবার কাজ এখন লোহিতের। তাকেও বেরুতে হয় ডাব্বুর নির্দেশমতো। প্রথমদিন ওকে যেতে হয়েছিল ফ্যান্সি বাজারে এক মাড়োয়ারি ব্যবসাদারের গদিতে। ধোপদুরস্ত শার্ট প্যান্ট, চকচকে জুতো, হাতে ব্রিফকেস, চোখে রোদ-চশমা। ওকে ফিল্মস্টার না হলেও স্মার্ট একজিকিউটিভের মতো নিশ্চয় দেখাচ্ছিল। বুক অবশ্য দুরুদুরু করছিল ভয়ে। যদি কেউ সন্দেহ করে, পুলিশ যদি জিজ্ঞাসাবাদ করে! কিছুই ঘটেনি। কেউ ওর দিকে আগ্রহী চোখে তাকিয়েছিল বলেও মনে হয়নি। ব্রিফকেস চেক করে রামেশ্বর আগরওয়াল বলে, নয়া ভরতি হুয়া কেয়া?

— হাঁ। ইটস এ নিউ জব।

— ঠিক হ্যায়। ফির ভি আনা।

— দরকার হলেই আসা যাবে। এখন টাকাটা দিন।

— রুপিয়া! ও হম ডাব্বুভাইসে বাত কর লেঙ্গে।

— নো, লোহিত ইংরেজিতে বলে, ডাব্বুভাই টাকা নিয়ে যেতে বলেছে। এখনই দিতে হবে। নইলে অন্য কোথায় যেতে হবে আমি জানি। বাট ইউ উইল বি ফিক্সড।

ডাব্বু বলে দিয়েছিল, রামেশ্বর টাকা দেবার সময় বহুত নখরা করে। চেম্বার (পিস্তল) দেখলে আর ইংরেজি শুনলেই ঘাবড়ে যায়। হলও তাই। রামেশ্বর তড়বড়িয়ে বলে, খামোখা রাগ করছেন কেন! একলা অতগুলো টাকা নিয়ে যাবেন, তাই আপনার সিকিউরিটির জন্যই বলছিলাম।

অতগুলো টাকা পকেটে নিয়েও অস্বস্তি হয়। একসঙ্গে এত টাকা ও কখনো হাতে নেবার সুযোগ পায়নি। যদি পকেটমার হয়, যদি কেউ কেড়ে নেয়, বা কেউ চ্যালেঞ্জ করে কোথায় পেয়েছে এত টাকা! এইসব ভাবনা বুকে পুষে লোহিত বাসস্টপে দাঁড়ায়।

— কাম হো গ্যয়া?

গলা শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে, আলতাফ। বিস্মিত লোহিত বলল, তুমি এখানে কী করছ? আলতাফ বলল, বস কা হুকুম। তোমার যদি কোনো বিপদ হয়! সব টাকা পেয়েছ?

— পেয়েছি।

— আব হম সাথ চলেঙ্গে।

পরে বুঝেছিল লোহিত, আলতাফ শুরু থেকেই ওকে চোখে চোখে রেখেছে যাতে ও মাল বা টাকা নিয়ে ভেগে না যায়। এই ধান্ধায় এটাই দস্তুর। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না।

সেদিন রাতে ওদের মদ খেতে দেখে লোহিতের বিভ্রান্তি উঠেছিল চরমে। ভেকুকে বলেছিল, তোমরা মদ খাও!

ভেকু বলেছিল, খাই না, পান করি। ইয়ে পিনে কা চিজ হ্যায়, ইয়ার। তুমিও একটু নাও।

— এসব আমি খাই না। বিচ্ছিরি গন্ধ।

— সয়ে যাবে। ধীরে ধীরে সব সয়ে যাবে।

গজা, ফকরুও খুব জোরাজুরি করতে থাকে। লোহিত তার সিদ্ধান্তে অনড়। শেষে ধৈর্য রাখতে না-পেরে বলল, আমি তা হলে চলে যাব। থাকব না তোমাদের সঙ্গে।

ডাব্বু শুনতে পেয়ে বলল, এই কেউ ওকে জোর করবে না। ও হামারা রাজা। সমঝা? কোই গড়বড়ি করে গা তো লাথ মারকে ভাগা দুঙ্গা। আও রাজা, বিরিয়ানি, কাবাব লায়া, খা লো।

ধীরে ধীরে লোহিত ওদের কাজের ধারা বুঝে যায়। মাঝে মাঝে ওদের সঙ্গে বেরুতেও হয়। তবে ওকে ডাব্বু অ্যাকশনে ডাকে না। ও দূর থেকে জি আর পি-র ওপর নজর রাখে। কখনো আলাপ জমাবার চেষ্টা করে। কখনো যাত্রী সেজে খালি ব্যাগ নিয়ে প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করে। মাল হাতিয়ে ওর কাছে ফেলে দিয়ে গজা ফকরু পালিয়ে গেলে ও নিরীহ মানুষের মতো স্টেশন ছেড়ে রিকশা ধরে। পার্টিদের কাছে মাল দিয়ে টাকা আনার কাজ এখন ওরই। থানা পুলিশ হলে উকিলের কাছে ও-ই যায়। লেখাপড়া জানা ভদ্র ছেলে পেয়ে ডাব্বু খুব খুশি। নিয়মিত ওর প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়ে বলে, তু হামারা আসলি রাজা। আমার কথামতো চললে বহুত টাকা হবে।

একটু মদ খাওয়াও শিখেছে। খিস্তিও শিখেছে প্রচুর। তবে নিজে উচ্চারণ করতে পারে না। অন্যের মুখে শুনতে মজাই লাগে। হঠাৎ হঠাৎ ওকে অন্য সমস্যায়ও পড়তে হয়। পেগড়ু আর ফকরু রাতে বগিঘরে থাকলে ওর ওপর হামলা করার চেষ্টা করে। প্রথমবার ঠিক বুঝে উঠতে পারার আগেই লোহিতের পাজামা খুলে পেগড়ু নিজের পুরুষাঙ্গ ওর পায়ুতে চেপে ধরেছিল। শরীরে অজানা অনুভবের সঙ্গে তীব্র আশঙ্কা ওকে অস্থির করে তোলে। তৎসহ যন্ত্রণা। ও প্রাণপণ শক্তিতে কনুইয়ের ধাক্কায় পেগড়ুকে সরিয়ে উঠে পড়ে। কনুইয়ের গুঁতোয় পেগড়ু আর্তনাদ করে ওঠে। সেদিন ডাব্বু ছিল না। আলতাফ আর গজা ধড়মড়িয়ে উঠে বলে, কী হয়েছে?

পেগড়ু বলে, গাণ্ডু রাজা আমার বুকের পিঁজরা ভেঙে দিল মাইরি! — তারপর নিজের কীর্তি স্বীকার করে বলে, আরে ইয়ার দোস্ত মে ইয়ে তো চলতাই হ্যায়। হামে আভি রেন্ডিকাঁহা মিলেগি!

লোহিতকে বোঝাবার চেষ্টা করে ফকরু, গজা, আলতাফ। বগিঘরে মেয়েমানুষ আনা খুব মুশকিল। নিজেরা নিজেদের না দেখলে কে দেখবে! আর এ তো সবাই করে। পেগড়ুর অবশ্য ওকে আগে কিছু না বলে আচমকা আক্রমণ করাটা ঠিক হয়নি। ও মাফিও মেঙেছে। লোহিত বলল, আমার এসব ভালো লাগে না। তোমরা আমার গায়ে হাত দেবে না। দিলে আমি ওস্তাদকে বলে দেবো।

আলতাফ বলল, আর ওস্তাদ করতে চাইলে?

— ওস্তাদ করবে না।

— করবে না কী রে! ভেকুকে তো ওস্তাদ খাল বানিয়ে দিয়েছে।

— কে কাকে কী করেছে আমার জানার দরকার নেই। ওস্তাদ আমাকে কিছু করবে না।

রাতে রামশরনের সঙ্গে নিয়মিত দেখা হয় না। তবে সকালে লোহিত, চাচার সঙ্গে একবার দেখা করার চেষ্টা করে। রামশরন, কাজ কেমন হচ্ছে, কোনো তকলিফ হচ্ছে কি না জানতে চায়। একদিন রামশরন বলল, বাবুবেটা আমি তোমাকে বলেছিলাম, আপনা মকসদ নেহি ছোড়না। এও বলেছিলাম, ওদের সঙ্গে থাকো, কিন্তু ওদের পথে চোলো না। লেকিন তুম তো, মুঝে মালুম হোতা হ্যায়, চক্রব্যূহমে ফাঁস গয়া। পয়সাকড়ি যা পাচ্ছ, কিছু রেখেছ, নাকি ওদের মতো সব উড়িয়ে দিয়েছ?

কী ছিল রামশরনের গলায়? ওর কথাগুলো শুধু শব্দ নয়, যেন গুরুবাণী। লোহিতের মনের গভীরে তোলপাড় শুরু হয়। জানতে চায়, আপনি এমন বলছেন কেন?

রামশরন বলল, বাবুবেটা, পহেলা রোজ তুমি আমাকে বলেছিলে কলেজে ভরতি হবার কথা থাকলেও অবস্থার কারণে পারোনি। এখন সেসব একেবারে ভুলে গেছ? তুমি কী সারা জীবন ডাব্বুর সাগরেদি করেই কাটাবে? তোমার মা-বাবার কথা ভাববে না? পরিবারের কথা? সব স্মৃতি ধুয়ে ফেলেছ? টাকাগুলো কী করেছ?

— আছে। লুকিয়ে রেখেছি।

— যা আছে তা দিয়ে পড়া শুরু করা যায় না? আমি আনপড় আদমি, কিছু বুঝব না। তুমি তো খোঁজ করে জানতে পারো। এখানে থেকেই পড়তে পারো। পারো না? কোশিশ তো করো। দিনে না হোক রাত কা কলেজমে ভরতি হতে পারো। আর যদি মনে করো এইসব লাফাঙ্গাদের লেজুড় হয়ে জেল বা পুলিশের গুলির অপেক্ষায় থাকবে, তবে আমি আর কিছু বলব না।

একজন সাধারণ কুলির গলায় এমন দরদভরা আন্তরিক উচ্চারণ, ওর মতো ঘর-হারা একক তরুণের ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা ও অভিমান ধ্বনিত হবে, নিজের কানে না-শুনলে বিশ্বাসই করতে পারত না লোহিত। তখন বুঝতেও পারেনি রামশরনের সঙ্গে কাটানো ওই সকালের কিছুটা সময় কীভাবে ওর জীবনের ছকটাই বদলে দেবে। পড়াশোনার জগৎ থেকে গত কয়েক মাসে এতদূর সরে গিয়েছিল যে আবার তার হাল হকিকত জানতেই কয়েকদিন লেগে গেল। কলেজে ভরতি হবার জন্য প্রয়োজনীয় কোনো কাগজপত্রই সঙ্গে নেই। মার্কশিট, শংসাপত্র, মাইগ্রেশন ইত্যাকার বিবিধ প্রয়োজনের একদা-পরিচিত শব্দাবলী ওর চেতনার বন্ধ জানালা খুলে দেয় একে একে। সমস্যার সমাধানও হাতড়ায়। স্কুলের বন্ধু অপ্রমেয়কে চিঠি লিখতে বসে মনে পড়ে জীবনের স্বপ্নময় দিনের কথা। কী করে ভুলে ছিল সে-সব! গড্ডলিকা প্রবাহের নিহিত দ্যোতনার পরিচয় কী এ-ভাবেই পেতে হয়!

অপ্রমেয় প্রকৃত বন্ধুর মতো প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাঠিয়ে দেয়। নতুন সেশন শুরু হবার সময় প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর কলেজে ভরতি হল লোহিত। ডাব্বুকে বলল, কলেজের সময়ে ওকে যেন কাজ দেওয়া না হয়। জরুরি কিছু থাকলে ক্লাসের ফাঁকে করে দেবে। ডাব্বুর কাজ নিয়ে দরকার, কখন কীভাবে করছে তার জন্য মাথাব্যথা করবে কেন! সমস্যা হল সন্ধ্যার পর ডাব্বাঘরে পড়া নিয়ে। ভেকু পেগড়ুরা হয় মাল টানতে বসে, নয় তিন পাত্তি খেলে। তার সঙ্গে হেঁড়ে গলায় খুশির গান। লোহিতকেও ডাকে। মাঝেমধ্যে ওদের খুশি রাখার জন্য বই-খাতা

তুলে রাখলেও পরীক্ষার সময় তা সম্ভব হয় না। ভরতি যখন হয়েছে ভালো ফল করারই চেষ্টা করবে। ডাব্বু যথাসাধ্য সহযোগ দিলেও, যখন সে থাকে না, গঞ্জা আলতাফরা আরো বেশি করে ওকে বিরক্ত করে। এক একদিন লোহিত পাণ্ডু স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে গিয়ে বইপত্র খোলে।

ওর সেকেন্ড ইয়ারে পড়ার সময় পেগড়ু ধরা পড়ে জেলে গেল অনেক দিনের জন্য। তার কিছুদিন পর আলতাফ গুলি খেয়ে প্রথমে হাসপাতালে, পরে জেলে যেতে বাধ্য হল। ডাব্বু সদলে গা-ঢাকা দিতে কোথায় যে গেল জানতেই পারল না লোহিত। গুজব ছিল ওরা নাকি আলফার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। সেই কঠিন দিনে ওর অনুভূতি ছিল বহুধাবিভক্ত। নিরুপদ্রবে ক্লাস করা ও পড়তে পারার জন্য প্রফুল্লচিত্ত; আবার রোজগার বন্ধ হবার জন্য দুশ্চিন্তা। ডাব্বুর যে-সব চেলাদের পুলিশের খাতায় নাম ওঠেনি, যেমন সোনা, শঙ্কু, টিপরা, এরা এসে পেগড়ু আর আলতাফকে ছাড়িয়ে আনতে উকিলের কাছে গিয়ে ধরাধরি করার জন্য চাপ দিত। উকিলের টাকা জোগাড় করা নিয়েও চলত টালবাহানা। পার্ট ওয়ানের রেজাল্ট বেরুবার ঠিক আগে ফিরে এল ডাব্বু, ফেকু। এতদিন কোথায় ছিল বলল না কিছুতেই। ক্রমে লোহিত বুঝতে পারে ওদের মনোজগতে বদল ঘটেছে। আগের মতো ওয়াগনের খোঁজে বেরুচ্ছে না। মেলামেশা করছে ভিন্ন ধরনের লোকজনের সঙ্গে। হাতে টাকারও প্রাচুর্য। কিন্তু আগের মতো তার বণ্টন হচ্ছে না।

সোনা, শঙ্কু একদিন বলল, ওস্তাদ, অ্যাকশনও হচ্ছে না, মালকড়িও পাচ্ছি না। এদ্দিন শুখা গেল। আমাদের চলবে কী করে?

সাগরেদদের ক্ষোভ ও দুঃখের কথা মন দিয়ে শুনল ডাব্বু। লোহিতকে বলল, তুমি চুপ কেন?

লোহিত বলল, আমি তো অ্যাকশন জানি না। তবে এতদিন ব্যবসার বাইরে থাকায় কনট্যাক্ট সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অন্যরা জায়গা দখল করে নিচ্ছে। এতে দলের খুবই মুশকিল হবে। লাইন ছেড়ে দিলে অবশ্য অন্য কথা।

ওর পিঠে চাপড় মেরে ডাব্বু বলল, এই জন্য তোকে রাজা বলি। গান্ডু মুখ্যুগুলো খালি নেকু কান্না শিখেছে। এই টিপরা, খবর আছে কিছু?

টিপরা, সোনা একসঙ্গে বলে ওঠে, হাঁ ওস্তাদ। ইয়ার্ডে কাল থেকে নতুন আটটা ওয়াগন পড়ে আছে।

— পেগড়ু কবে বেরুবে রে? আলতাফ? ওরা থাকলে সুবিধা হত।

লোহিত বলল, পেগড়ুর এখনো দেরি আছে। আলতাফ শিগগিরই এসে যাবে মনে হয়।

ডাব্বু চেলাদের বলল, আজ রাতে ঠিক জায়গায় রেডি হয়ে চলে আসিস। এখন যা।

ওরা চলে গেলে ডাব্বু বলল, রাজা, তোমার টাকা পয়সা আছে? পড়া কেমন চলছে?

— কোনোরকমে চালিয়ে যাচ্ছি। কয়েকদিনের মধ্যে পার্ট ওয়ানের রেজাল্ট বেরুবে। দেখা যাক কী হয়!

— ভেবেছিলাম লাইন ছেড়ে দেবো। সোনাদের জন্য হবে না। আমি ছেড়ে দিলে ওরা না খেয়ে মারা যাবে। কিংবা পুলিশের গুলিতে সাবাড় হবে।

লোহিত জানে এসব নিছক মুখের কথা। আগেও অনেকবার শুনেছে। সম্ভবত নিজের বিবেকের কাছে ব্যাখ্যা দেবার প্রয়াস। অথবা দলের ছেলেদের জন্য ও যে কত চিন্তা করে তার নম্র ঘোষণা। কলেজের পড়ুয়া হিসাবে দলের ছেলেদের কাছে সে আলাদা খাতির পায়। তার কথাও সবাই সমীহ করে শোনে। পেগড়ু আর ফকরু অবশ্য রাগ পুষে রেখেছে ওদের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায়। ওরা জানে না যে ভেকু ও আলতাফ তাদের অভীষ্ট পূরণ করে নিয়েছে। এমন মাদকতাময় মুহূর্ত তৈরি করেছিল ওরা লোহিত নিজের আগ্রহী উচ্ছলতা শাসন করতে পারেনি। তার জন্য ওর কোনো মনোবেদনা নেই। বরং সেই অভিজ্ঞতার আকর্ষণ মাঝে মাঝেই লোভনীয় মনে হয়।

আলতাফ ফিরে আসার পর কাজকর্ম আবার আগের মতো। লোহিত মাল পৌঁছায়, টাকা আনে। একদিন ডাব্বাঘরে মাল নিতে গিয়ে ওর চোখ পড়ে চালের বস্তার নীচে চাপা-দেওয়া একটা বড়ো সাইজের কিটব্যাগ। বেশ ভারী। অতি কষ্টে ব্যাগটা সরিয়ে ভিতরের জিনিস দেখে চমকে ওঠে। অনুমান করে এইজন্যই ডাব্বুর মধ্যে এত বদল, হাতে টাকার ঢল এবং ওর হঠাৎ হঠাৎ দিন কয়েকের জন্য উধাও হয়ে যাওয়া। অধুনা ডাব্বুর আসা যাওয়া গভীর রাতে। অনেক সময় লোহিতের সঙ্গে দেখাও হয় না। মনে হয় ভেকু ছাড়া ব্যাপারটা আর কেউ জানে না। কিন্তু এত রকমের অস্ত্র আসে কোত্থেকে, চালানইবা করে কোথায়! শঙ্কায় ওর বুক হিম হয়ে আসে। পুলিশ খোঁজ পেলে কারো রেহাই নেই। ও কাউকে বলতেও পারবে না। নিমকহারাম হবার জিন ওর মধ্যে নিশ্চিতভাবে নেই। স্থির করল সচেতনভাবে এইসবের চলাচল লক্ষ করলেও নিজে থেকে কাউকে কিছু বলবে না।

পার্ট ওয়ানে প্রথম বিভাগের নম্বর পাওয়ায় দলের সবাই দারুণ খুশি। অনেকেই প্রথম বিভাগ কী জানে না। খুব জবরদস্ত ফল করেছে ওদেরই সাগরেদ তাতেই অনাস্বাদিত আনন্দ। ডাব্বু ওকে প্রায় কোলে তুলে দু-গালে সশব্দ চুমু খেয়ে বলে, তু সচমুচ রাজা আছিস।

রামশরন্ ওকে বুকে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, বাবুবেটা, আমি আনপড় কুলি। কখন কী বলেছি, তার জন্য রাগ কোরো না। এত খুশি মেরা পহেলা লড়কা হোনেসে ভি নহি মিলা। লেকিন বেটা, অস্ত দেখনা, নহি ছোড়না।

ভেকু বলল, কিসকা অস্ত, ক্যায়া অস্ত?

রামশরন বলে, আরে বুদ্ধু, পড়ালিখাকা কোই অস্ত নহি হোতা। বাবুবেটা যবতক তুম লিখাপড়াই মে সব সে উঁচাই তক নহি যাতা, তো রুখনা নহি। তুমহারা পিতামাতা আজ জরুর তুমে আশীর্বাদ দে রহে। হো সকতা রো ভি রহে।

উচ্চগ্রামের উল্লাসের মধ্যে যখন ভেকু, আলতাফ, সোনারা গ্লাসে মদ ঢালছে, মুরগির ঠ্যাং চিবানোর শব্দে উঠছে বিহু গানের মূর্ছনা, ঠিক সেই সময়ে রামশরনের কথায় লোহিতের দু-চোখ জলভারে ভেসে যায়। ও নিজেকে আড়াল করার জন্য ডাব্বাঘর ছেড়ে তারাখচিত আকাশের নীচে গিয়ে দাঁড়ায়। এতদিন পর ওর দিদির কথা মনে পড়ে। দিদি, তুই কোথায় আছিস রে? তারা হয়ে আমাকে দেখতে পাচ্ছিস? সেদিন নিজেকে না বাঁচিয়ে আমাকে বাঁচিয়েছিলি কী এজন্যই?

ফিরে গিয়ে রামশরনকে বলল, চাচাজি, আপনি ঠিক বলেছেন। শেষ না দেখে থামব না।

কিন্তু থামার মতোই পরিস্থিতি হল পার্ট-টুর দুটি পেপার বাকি থাকতে।

বেলা তখন তিনটে পেরিয়েছে। পড়ন্ত সূর্যের রশ্মি এক ঝাঁক বর্শার মতো ডাব্বাঘরে আছড়ে পড়েছে। লোহিত পরের দিনের পরীক্ষার জন্য পড়া বিষয়গুলো বারবার করে দেখে নিচ্ছিল। হঠাৎই অসময়ে রামশরন হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল, বাবুবেটো, তোমার যা কিছু আছে এক্ষুনি গুটিয়ে নিয়ে পালাও। সব নেবে। যাতে এখানে তোমার কোনো চিহ্ন না থাকে।

বিস্মিত লোহিত জানতে চায়, বাত ক্যায়া, চাচা?

রামশরন বলল, এখন কথা বলার সময় নেই। জামাকাপড় বইপত্র সব গুছিয়ে নাও। জলদি করো।

বইপত্র একটা ব্যাগে ধরে গেল। জামাকাপড়ের জন্য একটা সুটকেস কিনেছিল। গুছিয়ে নিতে সময় লাগল না। কিন্তু যাবে কোথায়? রামশরন শুধু বলল, ভেকু আচানক ছুটে এসে ওকে বলেছে আজ এখানে পুলিশের রেইড হবে। পাক্কা খবর। ভেকু বলেছে, রাজা কো তুরন্ত ভাগনে বোলো। সম্ভব হলে গুয়াহাটি থেকেই। ধরা পড়লে ওর জিন্দেগি বরবাদ হয়ে যাবে।

গন্তব্য স্থির না করেই লোহিত ব্যাগ আর সুটকেস নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। রামশরন চোখ মুছে বলল, বাবুবেটো, জরুরত হো তো চাচাকো ইয়াদ করনা। আপনা মকসদ পুরা করনে কা ওয়াদা নহি ভুলনা।

পাণ্ডু স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে লোহিত রিকশা নিল। দু-দিনের জন্য একটা আস্তানা জোগাড় করা কঠিন হল না। সন্ত্রস্ত উদ্বেগ নিয়ে কোনোমতে পরীক্ষা শেষ করেই উঠে পড়ে কলকাতার ট্রেনে। যখন এসেছিল জানত না কেন এসেছে এখানে, ছেড়ে যাওয়ার সময় জানে কেন পালাচ্ছে। খবরের কাগজে বে-আইনি অস্ত্রের সন্ধানে তোলপাড় তল্লাশির পরও কোথাও ওর উল্লেখ না থাকা ছিল এক প্রবল স্বস্তির। কয়েকজন নিরীহ মানুষের গ্রেপ্তার হওয়া ছিল খুবই দুর্ভাগ্যজনক। ওরা কিছুই জানত না। ডাব্বু দলবল-সহ ফেরার। ব্রহ্মপুত্র না পেরুনো পর্যন্ত বুকের মধ্যে বাজতে থাকা দামামার শব্দ থামছিল না। ঝালুকবাড়ি ব্রিজ পার হওয়ার পর ছিলাটান স্নায়ু ক্রমে শান্ত হয়ে আসে। একবারও মনে হল না এই স্মৃতির শ্মশানে আবার কখনো ফিরবে। প্যান্টের গোপন পকেটে রাখা টাকাগুলো এখন লোহিতের পাথেয় নয়, আত্মশক্তির উৎস।

দুই

শনিবার সকালে ডাব্বু ফোন করে বলল, রাজা, তুমি এখন মানী লোক, তোমার অফিসে যাওয়াটা আমাদের বোধহয় ঠিক হবে না। তুমি বরং একটা নাগাদ কুবের হোটেলে চলে এসো। আমরা সেখানেই থাকব।

মনে মনে কৃতজ্ঞ বোধ করে লোহিত। ঝোঁকের মাথায় অফিসে আসতে বলার পর থেকেই মনে খুঁতখুঁতি ছিল। তীর ছোঁড়া হয়ে গেছে, তাই সুরাহার পথ পাচ্ছিল না। ডাব্বুর কথায় সোল্লাসে রাজি। এই হোটেলে কয়েকবারই গেছে। খাবার বেশ ভালো। ঘিঞ্জি এলাকা বলে

গাড়ি রাখার খুব অসুবিধে। ওর লালবাতিওয়ালা গাড়ি অবশ্য অতিরিক্ত সুবিধা ও সমীহ পেতেই অভ্যস্ত।

ওরা ক-জন আসতে পারে তা নিয়ে মনে কিঞ্চিৎ সংশয় ছিল। মাত্র তিনজন এসেছে দেখে স্বস্তি বোধ করে লোহিত। ডাব্বু আর ভেকুকে চিনতে লহমাও লাগল না। দু-জনেরই অবয়বে বয়সের আঁচড়ের সামান্য আভাস থাকলেও স্বাস্থ্য আগের মতোই সুঠাম। পোশাক পরিচ্ছদ পরিপাটি। দু-জনেরই পরনে দামি ব্র্যান্ডের জিনস ও টি-শার্ট। ডাব্বুর দাড়িগোঁফ অবিচল থাকলেও ভেকুর সব নিখুঁত কামানো। ওর প্রজাপতি গোঁফ কোথায় উড়ে গেছে! তৃতীয় ব্যক্তি অপরিচিত। গাঢ় আলিঙ্গন ও প্রাথমিক উচ্ছ্বাসের পর ডাব্বু বলল, রাজা, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, ইনি সুকেশ ফুকন, শিলংয়ে থাকেন, ওখানে আমাদের ডিস্ট্রিবিউটর। আর রাজার কথা তো আপনি জানেনই সুকেশভাই।

সুকেশ পরে আছে ক্রিম রঙের সাফারি। চোখে পুরু লেন্সের সুদৃশ্য চশমা। মুখে প্রসন্ন হাসি, রাজনীতিবিদদের যেমন থাকে। ঠিক ডিস্ট্রিবিউটরের মতো নয়। ডিস্ট্রিবিউটর আসলে চোরাই মাল পাচার করে টাকা আনে। এর পরিশীলিত কণ্ঠস্বর ঋষভ-গান্ধারে ওঠানামা করে। প্রথমেই জানতে চাইল, অহমিয়া কব পারে নিকি?

লোহিত অসমিয়াতেই জবাব দেবার চেষ্টা করে, মোটামুটি। আগে অবশ্য আরো ভালো পারতাম। এখন বিনা চর্চায় একটু অসুবিধা হয়।

সুকেশ বলে, আপনাদের বন্ধুদের পুনর্মিলনের মধ্যে আমার আসা উচিত হয়নি। কিন্তু এরা আপনার কথা এত বলেছে যে আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার লোভ সামলাতে পারলাম না।

— আয়াম অনার্ড! — লোহিত বলল। পরমুহূর্তেই বলল, ডাব্বুভাই, চাচার কোনো খবর জানো?

— না, রাজা। তুমি চলে যাওয়ার পরও বছর দু-এক ছিল বোধহয়, তারপর নিজের গাঁয়ে ফিরে গেছে। আর কোনো খবর পাইনি।

ভেকু বলল, এতদিনে হয়তো উপরে চলে গেছে।

মুহূর্তের জন্য বিষণ্ণতা ছায়া ফেলে লোহিতের স্বরে — ওই অসাধারণ মানুষটার কাছে আমি সারাজীবন ঋণী থেকে গেলাম। এখনো মনে হয়, সেদিন উনি যদি নিজে এগিয়ে এসে আমাকে আশ্রয় না দিতেন, আমি তা হলে কী করতাম! আজ এভাবে তোমাদের সঙ্গে বসতেই পারতাম না।

সুকেশ বলল, আপনি সেসব মনে রেখেছেন দেখে খুব ভালো লাগছে। আজকাল মানুষ নিজেকে স্বয়ম্ভু ভাবে। মা-বাবার অবদানও স্বীকার করতে চায় না।

— বলুন, কে কী খাবেন। খেতে খেতে কথা বলা যাবে। — লোহিত স্টুয়ার্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

খাবারের অর্ডার দিয়ে লোহিত বলল, মি. ফুকন, আমি মনে করি কৃতজ্ঞতাবোধটা মানুষের অতি নিজস্ব, এই চেতনাই মানুষকে পশু থেকে আলাদা করে। এখান থেকেই মানুষের

র‍্যাশানালিটির সূত্রপাত।

আলোচনায় অব্যর্থভাবে পুরোনো টুকরো টুকরো স্মৃতিচিত্র উঠে আসে। কৌতুকের কথা, বেদনার কথা। দলের লোকেদের কথা। ফকরু লাইন ছেড়ে কোথায় গেছে কারো জানা নেই। সোনা ট্রেনে চাপা পড়ে মারা গেছে। আলতাফ জেলে। শঙ্কু এখন ট্যাক্সি চালায়।

লোহিতের অনন্ত কৌতূহল। মাঝের বছরগুলোর সংক্ষিপ্তসার জুড়ে দিতে পারলেই যেন ফিরে যাবে নীলাভ্র তারুণ্যের কালে। সাগ্রহে জানতে চায়, আর ওই ডাব্বাঘর — ওগুলো আছে এখনো?

ডাব্বু বলে, না না। সেসব কবেই রেল তুলে নিয়েছে। অবশ্য আমরাও আর থাকতাম না।

— তোমরা তবে কোথায় থাকো?

— বয়স হলে যা হয় আর কী! ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কাজের সময় দেখা হয়। তারপর যে যার ডেরায়।

খাওয়া শেষ হলে লোহিত বিল মিটিয়ে দেয়। সুকেশ বলেছিল, প্রথমবার, ওটা আমাকেই দিতে দিন।

লোহিত বলল, আপনি জানেন না এই ডাব্বুভাই আমাকে কত খাইয়েছে। আমার প্রথম নিজে কেনা জামাকাপড়ের টাকাও দিয়েছিল ও। আমি কিছুই ভুলিনি ডাব্বুভাই।

ডাব্বু সুকেশকে বলল, দেখছেন তো, কী বলেছিলাম, রাজা আমাদের আসলি রাজা!

সুকেশ বলল, মানিব লাগে, বহুত ভালো মানু (মানুষ) আছে। এতিয়া কিবা কাম আছে নিকি? (এখন কী কোনো কাজ আছে?)

লোহিত উদার উচ্ছ্বাসে বলল, এতদিন পর পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা, সুতরাং আজ আর কোনো কাজ নয়।

ডাব্বু বলল, বাঃ! তা হলে চলো আমাদের সঙ্গে। একটা ছোট্ট কাজও হয়ে যাবে, আমাদের আড্ডাও চলবে।

ভেকু বলল, রাজা, এখন মাল-টাল চলে তো? যা শালা সতীগিরি দেখিয়েছিলে!

লাজুক হাসে লোহিত, তখন সবে স্কুল ছেড়েছি, পকেটে পয়সাও নেই, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। তখন তোমাদের মতো মাল টানা শুরু করলে অনেক আগেই ফুটে যেতাম। শুধু কী মাল, আরো যা সব করতে, উঃ, ভাবলে এখনো আতঙ্ক হয়।

ডাব্বু আর ভেকু শব্দ করে হেসে ওঠে। সুকেশ নিঃশব্দে মিটিমিটি হাসে। লোহিতের মুখেও স্মৃতিমেদুরতার বর্ণাভা।

ভেকু বলল, তা হলে আমাদের সঙ্গে আসছ!

— কোথায়?

ডাব্বু বলল, আমাদের আড্ডায়।

সুকেশ বলল, ডাব্বু, আমি তবে এগিয়ে যাই। খানাপাড়ায় স্পটে দেখা হবে।

লোহিতকে বলল, চলে আসুন, বেশিক্ষণ লাগবে না। উই শ্যাল হ্যাভ আ গ্রেট টাইম। করমর্দন করে সুকেশ চলে গেল। লোহিতের আবেগমুগ্ধ চোখে ডাব্বু ভেকুর নয়নের ভাষা-

সংকেত ধরা পড়ল না।

হোটেল থেকে বেরিয়ে ডাব্বু বলল, তোমার গাড়ি কোথায়?

লোহিতকে নামতে দেখেই ড্রাইভার রাভা গাড়ি নিয়ে এগিয়ে এসেছে। লোহিত বলল, উঠে পড়ো।

ডাব্বু লোহিতের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় বলে, আজ একটু ফুর্তি-টুর্তি হবে, ড্রাইভারের থাকাটা কী ঠিক হবে, রাজা? ভেকু ভালো চালায়, কোনো অসুবিধা হবে না।

এক মিনিট ভাবল লোহিত। ফুর্তির ফোয়ারা কতক্ষণ চলবে কে জানে! বেশি দেরি হলে রাভার ওভারটাইম ছাড়াও বাড়ি ফিরতে সমস্যা হবে। নিজে চালাতে পারলেও মদ্যপান করে স্টিয়ারিংয়ে হাত না দেবার সংকল্প নিয়েছে। ফুর্তির আসরে কী থাকবে, কী ঘটবে তাও অনুমেয়। ডাব্বুর প্রস্তাব সেই বিচারে সুবিবেচনাপ্রসূত। রাভাকে ডেকে ছুটি দিয়ে বলল, চাবিটা?

— গাড়িতেই আছে, স্যার।

— ঠিক আছে। কাল তো রবিবার, তুমি এগারোটা নাগাদ এসো।

ভেকু ড্রাইভারের আসনে, ডাব্বু বসল তার পাশে। পিছনে লোহিত একা। গাড়ি চলতে শুরু করে। লোহিত জানতে চায়, কোনদিকে যাবে এখন?

— প্রথমে ভারালিমুখ, সেখান থেকে উজানবাজার হয়ে সোজা খানাপাড়া। তুমি তো খানাপাড়া গেছ?

অসম আর মেঘালয়ের সীমান্তে খানাপাড়া। মেঘালয়ে ট্যাক্স কম বলে ওখানে মদের দাম অসমের তুলনায় অনেক কম। সীমান্তে চেকপোস্ট থাকলেও লোহিতের গাড়ি সবসময় অবাধে যাতায়াত করেছে। হয়তো গাড়ির লালবাতি অলংকারের জন্যই।

ভারালিমুখের আগে বাঁদিকে একটা সরু রাস্তা দিয়ে অনেকখানি ভিতরে চলে এল। ঘিঞ্জি এলাকা ছেড়ে ফাঁকা এলাকায়। আরো কয়েকটা বাঁক নিয়ে একটা ঘন বস্তির সামনে গাড়ি দাঁড় করায় ভেকু। বস্তির পিছনে খাড়া পাহাড়। পাহাড়ের গা বেয়ে সরু রেখায় জল ঝরছে। দৃশ্যটা মনোরম লাগে লোহিতের। এমন উদোম প্রকৃতির কাছে বহুকাল আসা হয়নি।

ডাব্বু বলল, রাজা, তুমি বোসো। আমি একটু আসছি। বেশি দেরি হবে না।

ভেকু গাড়ি থেকে নেমে সিগারেট ধরায়। লোহিত পায়ে পায়ে এগোয় পাহাড়ের দিকে। বেশি দূর যাওয়া হয় না। সামনে হঠাৎ উজিয়ে ওঠে নালা। তার স্রোতে চঞ্চল গতি।

পাশে এসে ভেকু জিজ্ঞাসা করে, তোমার ছেলেমেয়ে কী?

লোহিতের মুখে মৃদু হাসি ছলকায়। — একটা মেয়ে।

— এখানে আছে?

— না। কলকাতায় পড়ছে।

— তোমার বউ?

— মেয়ের কাছে। মেয়েকে তো একা রাখা যায় না।

— ওরা আসবে না এখানে?

— আসবে মেয়ের ছুটি পড়লে। কিছুদিন থেকে চলে যাবে আবার।

এই সময়ের মধ্যে ডাব্বু যে তার দুই সঙ্গীকে নিয়ে গাড়ির ডিকিতে কয়েকটা ব্যাগ তুলেছে লোহিত জানতেও পারল না। নিখুঁত কাজ সেরে ডাব্বু হাঁক দেয়, এই ভেকুয়া, রাজা কো কঁহা লে গিয়া, শালে! জলদি আ যা।

গাড়ির কাছে এসে নতুন দুই মূর্তি দেখে থমকে দাঁড়ায় লোহিত। ডাব্বু এগিয়ে এসে বলল, সিনারি বহুত আচ্ছা হ্যায় না! রাজা, ইনসে মিলো, অশ্বিনী ঔর মাসুদ। এরাও আমাদের সঙ্গে যাবে। নাও, উঠে পড়ো। ভেকু, সিধা উজানবাজার।

লোহিতের পাশে এবার ডাব্বু বসল। সামনে ভেকুর পাশে অন্য দু-জন। যেতে যেতে ডাব্বু স্মৃতিচারণা করে। ভুলে যাওয়া অনেক কথা লোহিতের স্মৃতিতে ফিরে আসে। তবু ও অস্বস্তি বোধ করে। অশ্বিনী আর মাসুদকে কেন জোটাল ডাব্বু? সামনে ওরা একবারে চুপচাপ। ভেকু যথাসম্ভব দ্রুত গাড়ি চালায়। পশ্চিম দিগন্তে আগুনের শিখা ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে।

উজানবাজারে যে-বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করালো ভেকু, এমন বাড়ি এখানে আছে জানত না লোহিত। অসমিয়া বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। বিশাল লনে নানা রঙের ফুলের সমাহার। গেটের দু-পাশে দুটি ঝাঁকড়া দেবদারু গাছ। চারদিক এত নিস্তব্ধ ও শান্ত, মনে হয় না কোনো মানুষ আছে। ডাব্বু গেট খুলে ভিতরে ঢোকে। মিনিট দশেক বাদে তিনজনেই বেরিয়ে আসে। অশ্বিনী ও মাসুদের হাতে একটা করে ব্যাগ। কাছে আসতে বোঝা গেল পাইলটদের ফ্লাইট ব্যাগের মতো। রং বাদামি।

ডাব্বু হুকুম দেয়, সামনে পায়ের কাছে রাখো। ডিকিতে জায়গা হবে না।

বিস্মিত লোহিত জিজ্ঞাসু চোখে তাকালে ডাব্বু বলে, কিছু মাল নিয়েছি। ডেলিভারি দিতে হবে।

লোহিত প্রশ্ন করে, এই ব্যাগে কী আছে?

ডাব্বু হাসে, যা থাকার। নতুন দেখছ নাকি!

মাসুদ বলে ওঠে, ওস্তাদ, আমার কথা শুনলে না। চেক না করেই মালটা নিয়ে নিলে, যদি দু-নম্বরি হয়!

— অত সাহস হবে?

— গড়বড় হলে ফুকন ছাড়বে না কিন্তু। পাঁচ কোটি বলে কথা।

— সে দেখা যাবে। এখন উঠে পড়ো। অন্ধকার হবার আগেই খানাপাড়ার চেকপোস্ট পেরুতে হবে।

ডাব্বু নিজের জায়গায় বসে। মাসুদরাও ব্যাগ নিয়ে সামনে বসল। ডাব্বু বলল, ভেকু টেনে চলিস। কোথাও থামবি না। অশ্বিনী, তোদের দিকের জানালার কাচ তুলে দে।

লোহিতের অস্বস্তি বাড়ে। মাথার মধ্যে অজস্র প্রশ্ন চিড়বিড় করে। ভেকু গাড়ি ঘুরিয়ে অ্যাকসিলেটরে চাপ বাড়ায়। — ডাব্বুভাই, লোহিত বলে, তুমি তো বললে না ব্যাগে কী আছে।

ডাব্বু বলল, বলব, আগে খানাপাড়ার চেকপোস্ট নিকাল নে দে।

লোহিত জেদ করে, তা হলে আমাকে নামিয়ে দিয়ে তোমরা চলে যাও।

— ধ্যাৎ, তা কী হয় নাকি! সুকেশভাই তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে।

— না, ডাব্বুভাই, আমার ভালো লাগছে না। আমি যাব না। আমাকে নামিয়ে দাও।

— কী রে, ডর লাগছে তোর? তুই ডরালে আমাদের কী হবে! চুপ করে বোস। খানাপাড়া গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

একটু পরে লোহিত আবার বলল, ডিকিতে মাল তোলার সময় আমাকে একবার বললে না! কী মাল তুলেছ?

বিরক্তির সঙ্গে ডাব্বু বলে, তোর কী হল রে রাজা! আগে তো এরকম ছিলি না। বড়াসাব হয়ে আমাদের কাজ-কাম ভুলে গেছিস নাকি?

— কিছুই ভুলিনি। ভুলিনি বলেই বলছি আমাকে নামিয়ে দাও।

— নামতে চাস, নেবে যা। গাড়ি থামবে না।

মাসুদ সামনে থেকে ধমকে ওঠে, এই বাবু, ওস্তাদ কো তং মত করো।

অশ্বিনী মন্তব্য করে, ওস্তাদ থোড়া সা মেডিসিন লাগা দো। নিকালু এক পাউচ?

ডাব্বু ওদের চুপ করিয়ে বলে, দ্যাখো রাজা, খানাপাড়া মে কুছ নহি কহনা। চুপচাপ নিকল যানা চাহিয়ে। জরুরত হোনে সে আপনা পরিচয় দেকে বোলনা, হম সব তুমহরা দপ্তর কা আদমি। ক্রোড়ো কা সামান হ্যায় গাড়ি মে। সমঝা?

লোহিতের মনে পড়ে ডিব্বাঘরে অস্ত্র আবিষ্কারের কথা। এবারও তেমনই কিছু করেছে ডাব্বু। কোটি টাকা আর কীসে হতে পারে! নাকি ড্রাগ? ব্রাউন সুগার বা কোকেন? লোহিতের বুকের মধ্যে হিম জমে। চেকপোস্টে আটকালে বাঁচার কোনো আশা থাকবে না। জেল হবে, চাকরি যাবে। চিত্রিতা, টুসকির কী হবে? ওঃ, কী চক্করে যে পড়ল! ডাব্বুভাই এমন বিপদে ফেলবে ভাবতেও পারেনি। ওরই ভুল। বিনা দরকারে ওরা খুঁজে বের করেনি, এটা বোঝা উচিত ছিল। ওর বুকে দপদপ হর্নের শব্দ বাজে। গলা শুকিয়ে ওঠে। দু-চোখে কালো পতাকার মিছিল।

খানাপাড়া আর সামান্য দূরে। চেকপোস্ট, পুলিশের গাড়ি দেখা যাচ্ছে। ডাব্বু লোহিতের গা ঘেঁষে বসে। ডাব্বুর হাত ওর কোমরের খাঁজে যা চেপে ধরে না-দেখেও লোহিত তা বুঝতে পারে। মনে পড়ে পেগড়ুর প্রথম পায়ু আক্রমণের কথা। সারা সত্তা কাঁপে লোহিতের। গাড়ি এগিয়ে যায়। মনে হয় যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

ডাব্বু ফিসফিস করে বলে, যা বলেছি মনে রেখো। নো গড়বড়।

গলা উঁচিয়ে বলল, এই অশ্বিনী, মাসুদ আপস মে বাতচিত কর। লেকিন রেডি রহনা। ইয়াদ হ্যায় না সব?

— হাঁ, ওস্তাদ।

ভেকু হিন্দি গানের কলি ধরে, কহো না পেয়ার হ্যায় —

গাড়ি চেকপোস্টের গেটে। পুলিশ জানলার কাছে এগিয়ে আসে। লোহিত হাসি হাসি মুখে পুলিশের দিকে তাকিয়ে বুক পকেটে হাত দেয়। যেন আইডেনটিটি কার্ড বের করবে। নিঃশ্বাস বন্ধ। কোমরে আরো চাপ। ওর দৃষ্টি মুছে যায়। দেখতেও পায় না, পুলিশ যাওয়ার অনুমতি

দিয়ে সরে গেছে। ভেকু জোরে হাম্প পেরুতে গেলে গাড়ি ঝাঁকিয়ে ওঠে। লোহিতের অবশ অনুভবে সাড় ফেরে।

আরো কিছুটা এগুলে সবারই মুখ দিয়ে স্বস্তির শব্দ বেরোয়। ডাব্বু বলল, রাজা, দেখলি তো বেকার ডরাচ্ছিলি। তু আমাদের আসলি রাজা।

জোড়াবাটের কাছে এসে ভেকু মেন রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। শিলং যাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে লোহিতের। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে তো যেতে হয়নি। বলল, কোথায় যাচ্ছ?

ডাব্বু বলল, স্পটে। মাল বের করে নিয়ে এলে, ডেলিভারি দিতে হবে না?

ঠিক কতটা পথ এসেছে জানে না লোহিত। অন্ধকার নামায় দিকচিহ্ন বোঝার উপায় নেই। কিন্তু যেখানে এসে থামল সেখানে যে গাড়ি আসতে পারে, না-এলে বিশ্বাস হত না। এক থোকায় কতগুলো কাঁচা ঘর। ট্রাইবালদের যেমন হয়। একটা কেবল অসম টাইপের ঘর, টালির ছাউনি। গাড়ির শব্দ পেয়ে সে-ঘর থেকে বেরিয়ে এল সুকেশ। লোহিতের হাত ধরে বলল, আহক, আহক, ডাঙ্গরিয়া। এহি মোর রাজপ্রাসাদ।

বারান্দায় টেনে নিয়ে একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল, ইয়াত বহক।

ততক্ষণে অশ্বিনী ও মাসুদ সব মাল, গাড়ি থেকে নামিয়ে বারান্দায় জমা করেছে। ভেকু বলল, সুকেশভাই, ইতনা আরামসে আগর হর রোজ কাম হো তো মজা আ যায়েগা।

সুকেশ বলল, কী রে ডাব্বু, তোদের রাজাকে না দেখেই প্ল্যানটা কেমন দিয়েছিলাম!

ডাব্বু বলল, বস্, ও বহুত নরাজ হ্যায় হমসে।

— কিঁউ?

— সামানের কথা কিছু বলিনি বলে।

— এখন দেখিয়ে দে।

— দেখাব?

— আচ্ছা আমি বলছি, রাজা সাব, এখানে বারোটা এ.কে.৪৭, পাঁচশো ম্যাগাজিন, তিনশো গ্রেনেড আর পাঁচ কিলো ব্রাউন সুগার আছে। এ সাকসেসফুল বিগ ডিল। মেনি মেনি থ্যাঙ্কস ফর ইওর কো-অপারেশন।

এমনই কিছু হবে অনুমান করেছিল লোহিত। মাথার মধ্যে এখনো উথাল-পাথাল। তবু কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য বলল, কী করবেন এগুলো?

সুকেশ জবাব দেয়, এ.কে.৪৭ আর গুলিগোলা যাবে আলফা গেরিলাদের কাছে। আর ব্রাউন সুগার যাবে মায়ানমার হয়ে থাইল্যান্ড। ওই টাকা দিয়ে আবার কিছু আর্মস আসবে। আবার আমাদের ভাবতে হবে কীভাবে সেসব খানাপাড়া পার করাব। আপনি যদি এবারের মতো হেল্প করেন তবে অবশ্য কোনো সমস্যা থাকে না।

— আপনি কী করে ভাবলেন যে আমি রাজি হব!

সুকেশ হাসে। বলে, হুইস্কি চলবে তো? মাসুদ মাল দাও সবাইকে। যা ধকল গেছে। খেয়েদেয়ে লম্বা ঘুম দাও।

লোহিত বলল, আমাকে ফিরতে হবে।

— অবশ্যই। আপনাকে ভেকু পৌঁছে দেবে।

হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে সুকেশ বলল, ডাব্বুর কাছে আপনার কথা শুনে যখন প্ল্যানটা করি ডাব্বু বলেছিল, আপনি ওদের সঙ্গে দেখাই করবেন না। আমি বলেছিলাম আপনার মতো কৃতজ্ঞ মানুষ তা পারবে না। কৃতজ্ঞতা, পুরোনো স্মৃতির মতো বিষয়গুলো খুব খারাপ। আগের দিনে রাজাদের এসব থাকত না। কিন্তু আপনি ডাব্বুদের প্রাণের রাজা। কাজেই নিরুপায়। আপনাকে এখানে আসতেই হল। এবার বলুন, আবার এরকম একটা এক্সাইটিং এক্সকারশনে আসবেন কি না।

বলতে যাচ্ছিল, কক্ষনো না। সমীচীন হবে না ভেবে বলল, এখন তো ফিরে যাই।

— সে তো যাবেনই। কিন্তু গিয়েই পুলিশের কাছে সব বলে দেবেন না তার গ্যারান্টি কী?

লোহিত চিৎকার করে, হাউ ডেয়ার ইউ! ডাব্বুভাই, ইনি বলছেন আমি তোমাদের সঙ্গে গদ্দারি করতে পারি! তার তো কত সুযোগ ছিল আমার কাছে, কখনো করেছি?

ডাব্বু বলল, রাজা ওদিন অলগ থা। এখন আমরা কোনো চান্স নিতে পারি না। সেবার এজন্যই ভেকু, চাচাকে দিয়ে তোমায় পালাতে বলেছিল। আমার ডাব্বাঘরে মাল ছিল, সরাতে পারিনি।

লোহিত বলল, আমি জানতাম। দেখেওছিলাম। তবু কাউকে কিছু বলিনি। কোনোদিনই বলিনি। বলবও না। এবারও বলব না, এখন আমাকে যেতে দাও।

সুকেশ বলল, বললাম তো ভেকু দিয়ে আসবে। এখন নিশ্চিন্ত মনে মাল খান। খেতে খেতে আমার প্রস্তাবটা নিয়ে ভাবুন।

নেশার ঘোরে লোহিত টের পেল না কখন মাসুদ আর অশ্বিনী ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

তিন

রবিবার রাভা, সাহেবকে না পেয়ে লোহিতের ডেপুটি রাজেশ গোয়েলের বাড়িতে গিয়ে খবর দেয়। রাজেশ থানায় রিপোর্ট করে। দিল্লিতে ফোনে জানায় সব। পুলিশ জোর খোঁজখবর শুরু করে। সোমবার বিকেলে পুলিশ রাজেশকে জানায়, লোহিতের গাড়ি, যা বস্তুত অফিসের, নংপু-র কাছে খালি অবস্থায় পাওয়া গেছে। গাড়িতে দুর্ঘটনার বা অস্বাভাবিক কোনো কিছুর কোনো চিহ্ন নেই। যেন রাস্তার ধারে পার্ক করে গেছে।

খবরের কাগজে তিন দিন বড়ো বড়ো হরফে লোহিতের নিরুদ্দেশ হওয়ার খবর ছাপা হয়। প্রথম পাতা থেকে খবরটা ক্রমশ সরে যায় সপ্তম পাতায়। তারপর আর উল্লেখ থাকে না।

পুলিশ জানায়, লোহিতের খোঁজ চলছে।

চিত্রিতা টুসকিও শুধু জানে লোহিতের খোঁজ জারি আছে।

চলছে এখনো। আরো অনেকের জন্যও যেমন চলছে কাগজে কলমে।

প্রভাব

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

১৪১১

শরৎকালীন সংখ্যার সূচি

বিশেষ আকর্ষণ

বৃটিশ আমলে রামকৃষ্ণ মিশন ও বাংলার বিপ্লববাদ
সম্পর্কে দীর্ঘ, অতি চাঞ্চল্যকর মূল গোয়েন্দা রিপোর্ট
যা প্রকাশমাত্র আলোড়ন তুলবে। এ-বিষয়ে
গবেষণামূলক বিস্তৃত নিবন্ধ লিখেছেন
ল্যাডলীমোহন মুখোপাধ্যায়।

উপন্যাসিকা : তপন বন্দ্যোপাধ্যায়।
গল্প : প্রফুল্ল রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়,
সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত মুখোপাধ্যায়,
সুব্রত সেনগুপ্ত, রবিশঙ্কর বল, নবকুমার বসু,
বিজনকুমার ঘোষ, সুনীল দাশ, অলোককুমার বসু
ও আরো অনেকে

এখনো পাওয়া যাচ্ছে

বৃক্ষ

অলোককুমার বসু

পুজোর ফুল তুলতে এসে বাগানের কোণে ছোট্ট টিনের চালাটায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন নিভাননী। আটকে পড়েছেন, তবুও ভালোই লাগছে তাঁর। ভোর থেকে শুরু হয়েছে বৃষ্টি। সঙ্গে এনেছে কত রকমের শব্দ — গাছের পাতায় বৃষ্টির শব্দ — শব্দ মাটিতে ঘাসের বুকে। টিনের চালের ওপর — সেখান থেকে মাটিতে — চারিদিকে শব্দের জলতরঙ্গ যেন।

বাগানের বৃষ্টিভেজা গাছে গাছে সবুজের কত রূপ — আমগাছের পাতায়, নারকেল গাছের পাতায়, এককোণে ভয়ে ভয়ে লুকিয়ে থাকা এক কচুগাছের নরম অস্তিত্বে, মাটিতে ছড়ানো মায়ের স্নেহের স্পর্শের মতো কোমল ঘাসের বনে — সবুজ কী আর এক রকম! এত সবুজের মাঝখানে অশোকের গাছটা লাল হয়ে আছে ফুলে ফুলে। এই বাগানে সে আর সবার থেকে আলাদা।

একটু পুব ঘেঁষে বসতবাড়ির কাছে জুঁই আর টগরের ডালগুলো তাদের নিষ্পাপ শুভ্রতার শোভা নিয়ে দুলছে বাতাসে। আর এরই মাঝে একটা নাম-না-জানা শাদা কালোয় মেশানো ছোট্ট পাখি চারিদিকের এই ঝরনাধারায় ভারি ব্যস্ত হয়ে এ-ডাল থেকে ও-ডাল করতে থাকে। কত সুন্দর পৃথিবীর বুকে এ জীবনের মেলা। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন তিনি।

তাকিয়ে দেখেন পাঁচিলের ধারে বাগানের এক কোণের কৃষ্ণচূড়া গাছটার দিকে। বর্ষা এখন প্রায় শেষ। শীত আসবে, তারপরে বসন্ত। এপ্রিলে হোলির রং লাগবে কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে।

ওই গাছটা ওঁরা দু-জনে লাগিয়েছিলেন। বিয়ের যেদিন পনেরো বছর পূর্ণ হয় সেদিন।

তখন তো এমন ঘটা করে বিবাহবার্ষিকীর রেওয়াজ ছিল না। চারাটা এনে নিভাননীকে বলেছিলেন মানিকবাবু। — 'আজকের দিনে চলো আমরা দু-জনে মিলে এই গাছটা লাগাই। আমরা যখন বুড়ো হয়ে যাব, তখনো এই কৃষ্ণচূড়াতে ফুল ফুটবে, আর মনে করিয়ে দেবে আমাদের বিয়ের দিনটার কথা।'

প্রতি বছর কৃষ্ণচূড়ার রঙের উৎসবের প্রতীক্ষা করেন নিভাননী। তাঁর হারিয়ে যাওয়া সোহাগের রঙে রাঙানো ওর রং।

একা থাকলে পুরোনো কত কথা মনে পড়ে নিভাননীর।

শহর কলকাতার দক্ষিণে টালিগঞ্জের স্টুডিয়ো পাড়া যেখানে শেষ — তাও পেছনে ফেলে টালির নালা পার হয়ে আরো দশ মিনিট হাঁটলে পূর্ব পুঁটিয়ারি — এখন আবার তার নাম হয়েছে নিউ টালিগঞ্জ। এইখানেই অনেকখানি জায়গা নিয়ে এ-বাড়িটা করেছিলেন মানিকবাবু। আত্মীয়স্বজনেরা সবাই বলেছিল:

'কোথায় গোবিন্দপুরে বাড়ি করছিস মানিক, ওইখানে কী মানুষ থাকে?' মানিকবাবু অবশ্য সে-কথায় কান দেননি, বলেছিলেন:

'মানুষ থাকে। হয়তো সংখ্যায় তোমাদের শ্যামবাজার, বালিগঞ্জ, আলিপুরের থেকে কিছু কম। তবে অনেক গাছগাছালি আছে, পুকুর আছে, ভারি সুন্দর জায়গা। সকালবেলা অনেক রকম পাখির ডাক শোনা যায়।

'বাড়ি করব, অথচ দু-একটা গাছপালা থাকবে না, নাতি-নাতনিরা একটু বাড়ির মধ্যে খেলতে বেড়াতে পারবে না, ওইরকম ইটের খুপরি একের পর এক — তা হলে এত কষ্ট করার দরকার কী, সে তো বাসাবাড়ির মতোই হল' — নিভাননীকে বলেছিলেন মানিকবাবু।

দেশে কিছু জমিজায়গা ছিল মানিকবাবুর — তিন শরিকের ভাগ। সে-সব দেখাশোনা করা আর সম্ভব হচ্ছিল না তাঁর পক্ষে। আর সেখানে যাওয়াও তো আর যে সে কম্ম ছিল না। প্রায় একটা অভিযান বলা যায়।

হাওড়া থেকে ট্রেনে যেতে হত কোলাঘাটে। তারপরে সেখানে নেমে নৌকা ধরে রূপনারায়ণের উজান বেয়ে গিয়ে কোথায় যেন নামতে হত আবার। সেখান থেকে ভাড়ায় যেত কয়েকটা মান্ধাতা আমলের ভাঙা মোটরগাড়ি — কোনোদিন নাকি তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় খুঁজে পাওয়া যেত না — তাদের একটাকে ধরে করে পৌঁছতে হত নিভাননীর শ্বশুরবাড়ির আদি ভিটেয়। হুগলি জেলার চক্রধরপুর গ্রামে।

সেখানে নিভাননী স্বামীর হাত ধরে দু-বার মাত্র গিয়েছিলেন — একবার নতুন বিয়ের পর আর একবার সতীশ যখন সাত কি আট আর সন্তোষ সবে চার বছরের তখন। সে আজ অনেক যুগ আগের কথা। প্রতি বছর অবশ্য কিছু ধান বেচা টাকা, আর চাষের আলু, চাল — কোনো বছর কিছু পেঁয়াজ নিয়ে আসতেন মানিকবাবু। তার মাধ্যমেই যা দেশের সঙ্গে পরিচয়।

সন্তোষের বোধহয় তখন বছর সাতেক বয়স, একদিন মানিকবাবু এসে বললেন:

'দ্যাখো, আমাদের আত্মীয়কুটুম ওঠাবসা সবাই তো এখন কলকাতায়, ছেলেরাও এখানেই বড়ো হচ্ছে। পড়াশুনা সব কলকাতার স্কুল কলেজে। দেশের জমি-জায়গা আছে বটে কিন্তু সে তো নাম-কা-ওয়াস্তে। এখনই আমার পক্ষে দেখাশোনা করা সম্ভব হচ্ছে না। বয়স বাড়লে আরোই পারব না। বরং সেটাকে শরিকদের বিক্রি করে কলকাতাতে একটা নিজস্ব কিছু করি।'

নিভাননী বলেছিলেন — 'পূর্বপুরুষের ভিটে, অমন পুকুর, বাগান, খেত — সব বিক্রি করে দেবে?'

'ওহো! সে তো বংশের মধ্যেই থাকবে! আর পুরোনো দিনকে ধরে বসে থাকলে চলবে? ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে হবে না? ছেলেরা বড়ো হবে। ঘর সংসার করবে। নাতি-নাতনি হবে। তারা থাকবে কোথায়? এই তিনখানা ভাড়া করা ঘরে তো আর কুলোবে না। তখন এক-একজন এক-এক জায়গায় যাবে। বড়ো করে একটা কিছু করতে পারলে সংসারটা অন্তত আমাদের জীবদ্দশায় এক জায়গায় থাকবে।'

নিভাননী বলেছিলেন — 'আচ্ছা, তুমি যা ভালো বোঝো, তাই করো।' তো শেষমেষ জমির অংশ শরিকদের বিক্রিই করে দিলেন মানিকবাবু।

কলকাতায় জমিটা যখন কেনা হয় তখন নিভাননীকে একবার দেখিয়েও নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তখনকার দিনে বাড়ির মহিলাদের আগে থেকে সব ব্যাপারে এত কিছু জানবার শোনবার

রেওয়াজ ছিল না। তাও মানিকবাবু স্ত্রীকে সঙ্গে করে এনেছিলেন।

বলেছিলেন — 'আমি আর কতক্ষণ বাড়িতে থাকব, এক রিটায়ার করার পরে ছাড়া? জায়গাটা একবার দেখে আসবে না? চলো চলো, ঘুরে আসবে।' — তাই সতীশ আর সন্তোষের হাত ধরে স্বামীর সঙ্গে জমি দেখতে এসেছিলেন নিভাননী।

ওই যে রাস্তার ধারে পাঁচিলের কোণে শিউলি গাছটা, যেটা শরৎকালে ফুলে ফুলে শাদা আর হলুদে খুব সাজগোজ করে থাকে, তখন ওখানে ওটা ছিল না। ওইখানে দাঁড়িয়ে নিভাননীকে বুঝিয়েছিলেন মানিকবাবু — 'পশ্চিমের ওই আম গাছটা থেকে এই পাঁচিল পর্যন্ত আর পেছনে নারকেল গাছের লাইন থেকে এই রাস্তা পর্যন্ত পুরো আট কাঠা, বুঝলে না। প্রায় জলের দরেই পেলাম বলতে পারো। দেশের জমি-জায়গা বিক্রি করে যা পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে প্রভিডেন্ড ফান্ডের কিছু লোন নিলেই জমি, বাড়ি সবই করা যাবে।'

চল্লিশ বছর আগে সাধারণ মানুষের সাধ আর সাধ্যের মধ্যে এত ফারাক ছিল না। মানিকবাবু তাই এমন কথা বলতে পেরেছিলেন নিভাননীকে।

বাড়ির প্ল্যান যখন হল, ভবানীপুরের গৌর ঘোষ রোডের ভাড়াটে বাড়ির তক্তপোশে নীল রঙের নকশাখানা পেতে বুঝিয়েছিলেন তিনি।

'আমাদের দেশে বাড়ি তৈরির নিয়ম জানো তো? দক্ষিণ ছেড়ে, উত্তর চেপে, পুবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ। এই হল গিয়ে বাড়ি তৈরির খনার বচন। অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে খালি জায়গা রাখতে হবে, তাতে গরমকালে দক্ষিণের হাওয়া পাবে। তোমারও রাস্তার দিকে ত্রিশ ফুট ছাড়া আছে। উত্তরটা হল পেছন দিকে। সেইদিকে চেপে রাখবে, কেন? না, তা হলে উত্তরের কনকনে বাতাস শীতকালে বেশি কষ্ট দিতে পারবে না।

'পুবে হাঁস মানে হল পুবদিকে একটা পুকুর রাখতে হবে। তো এসব তো দেশে ঘরের নিয়ম। এখানে তো পুকুর কাটা যাবে না। লাইন দিয়ে নারকেল গাছ আর সুপুরি গাছ লাগিয়ে দেবো। তবে ছাতে উঠলে এখানে দু-চারটে পুকুর তুমি দেখতে পাবে। আর পশ্চিমে বাঁশ মানে হলো বাগান। গাছ-গাছালি বাগান সব করবে পশ্চিমদিকে। পড়ন্ত রোদ্দুরে বড়ো গরম হয়। পশ্চিমের বাগান ঠাণ্ডা রাখবে বাড়িটাকে। ফল আর ফুল দুটোই পাবে। দু-চারটে পাখির ডাক শুনতে পাবে। গাছপালার যত্ন করে সময়ও কাটাতে পারবে আর মনটাও ভালো থাকবে। পশ্চিমদিকের জমির অর্ধেকটাই খালি থাকবে বাগানের জন্য, বুঝলে? পুরো চার কাঠা। আমরা ছোটোবেলায় দেশে ঘরে গিয়ে যখন থেকেছি, মাটিতে ঘাসের ওপর পা ছোঁয়াতে কীরকম যেন একটা মজা ছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছ।' — শ্রীরামপুরে তাঁর ছোটোবেলায় বাড়ির পেছনের বাগানে আম কুড়োতে যাওয়া মনে পড়ে নিভাননীর। মনে পড়ে ভোরবেলায় ফুল তোলার কথা। শিশির ভেজা সবুজ ঘাসের নরম স্পর্শ, বাগানে লেবুপাতার গন্ধ, টগর গাছের ডালে ডালে হাজার তারার রূপ, — এসব কলকাতায় ভবানীপুরের বাসা বাড়িতে সংসার করতে করতে কবেই ভুলে গিয়েছিলেন নিভাননী।

'তা হলে এবার বলো তো এই নকশার মধ্যে বাগানটা কোথায়?' — মজা করে জিজ্ঞাসা

করেছিলেন মানিকবাবু।

'এত কী করে জানব, এই দিকে বোধ হয়!'

নীল কাগজে অসংখ্য দাগের মধ্যে যে-কোনো একটা দিক দেখিয়ে দিয়েছিলেন নিভাননী।

'আরে দূর! কী তোমার বুদ্ধি! কার কাছে যে তোমায় রেখে যাব আমি, ও তো অন্য লোকের জমি। আমাদের বাড়ি হল এইটা, আর বাগান হবে এইখানে।' আঙুল দিয়ে নকশার ওপর দেখিয়েছিলেন মানিকবাবু।

বুদ্ধি কম বলাতে অবশ্য নিভাননীর কোনোই দুঃখ হয়নি। ওই যে নাটক সিনেমায় সব বলে না, 'আমি তোমায় ভালোবাসি।' ওনার এই কথাটা আসলে ছিল তাই।

'কী তোমার বুদ্ধি — মানে হচ্ছে গিয়ে — নিভাননী, তুমি খুব সরল, সোজা, অনেক কিছুই জানো না — কিন্তু আমি তোমায় খুউব ভালোবাসি।'

এ-কথা জানতেন নিভাননী।

মানিকবাবু অবশ্য না বুঝিয়ে ছাড়েননি।

'এই হল একতলার তিনটে ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম, সিঁড়ি — আর এই হচ্ছে দোতলার প্ল্যান। ঘরের উপর ঘর। রান্না ঘরের ছাতটা খালি।'

'আর আমার পুজোর ঘর?' সব আশ্রয়ের দরজা বন্ধ হলে শেষ আশ্রয় নেবার যে আলাদা একটা স্থান সব হিন্দু গৃহস্থ বাড়িতে থাকত এককালে, তার জন্য একটা দাবি পেশ করেছিলেন নিভাননী।

'তিনতলার ছাদে ঠাকুরঘর? বুড়ো বয়সে তোমার তো নির্ঘাত হাঁটুতে বাত হবে আমার শ্বশুরমশাইয়ের মতো। তিনতলায় উঠে পুজোআচ্চা করতে পারবে তুমি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব পারব। বাত হলে হাঁটু ধরে ধরে উঠব আমি। তুমি ওই ঘরটা করে দাও গো।' — বলেছিলেন নিভাননী।

তাই তিনতলার ঘরখানাও শেষপর্যন্ত যোগ হয়েছিল প্ল্যানের মধ্যে। বছর ঘুরতে একদিন ঘটা করে গৃহপ্রবেশ করে এই বাড়িতে এলেন তাঁরা। তখন অশোক এসেছে কোলে। তারপরে কতদিন কেটে গেল, সতীশের চাকরি হল রেলে। সন্তোষ দমদমের জেশপ কোম্পানিতে কাজ পেল। সন্তোষ আর সতীশের দেখে-শুনে বিয়ে দিয়ে গেছেন মানিকবাবু। বউমারা বড়ো ঘরের মেয়ে। খুবই লক্ষ্মী তাঁরা।

যতদিন তিনি বেঁচেছিলেন, সংসারের হাল নিভাননীই ধরে থাকতেন। বউমারা সাহায্য করত। তবে সামান্য মনোমালিন্যও কখনো হয়নি কী আর। সে তো সব সংসারেই হয়। তবে তাই নিয়ে সাংঘাতিক কোনো পরিণতি হয়নি কোনোদিন।

'এক সঙ্গে দুটো ঘটিবাটি থাকলে তাদেরও ঠোকাঠুকি লাগে বউমা। আর আমরা তো সব সাধারণ মানুষ। দোষে গুণে তৈরি।' তাদের বোঝাতেন নিভাননী।

'তোমরা লেখাপড়া জানা বড়ো ঘরের মেয়ে। তোমাদের আর কী বলব। তোমাদেরই তো সংসার। তোমাদের বাদ দিয়ে আর থাকে কী। সবাই একটু সহ্য করে নিয়ো মা।'

তা সংসারটা এক করেই রেখেছিল তাঁর ছেলের বউয়েরা।

তারপর উনি চলে যেতে আর এ-সবের মধ্যে যান না নিভাননী। এখন বড়ো আর মেজ বউ ওপরে নীচে আলাদা রান্না করে। কোনো ঝগড়াঝাটি ছাড়াই এ-ব্যবস্থা করে নিয়েছে ওরা। দুই ভাইয়ের আয় ব্যয় তো সমান নয়। এখন আর একান্নবর্তী পরিবার কোনো সংসারেই নেই। কী হবে ভবিষ্যতের একটা মনোমালিন্যের বীজ পুঁতে। একতলার রান্নাঘরের উপর দোতলায় একটা রান্নাঘর করে নিয়েছে সতীশ। নিভাননীর বেশিরভাগ ওঠাবসা অবশ্য ওপরেই। তবে নীচে থেকে মেজ বউমা নিরামিষ তরকারি যেটা ভালোমন্দ হয় একবাটি করে রেখে যায় মায়ের জন্য। হাঁড়ি আলাদা হলেও ওরা সবাই মিলে বেশ আছে।

না, কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই নিভাননীর। তাঁকে ভালোই রেখে গেছেন কর্তামশাই।

তিনতলার ছাতের ঠাকুরঘর আর গৃহদেবতা, আচারের বয়াম, বাগানের ফুলগাছ আর নাতি-নাতনিদের নিয়ে দিন কেটে যায় তার। তিন ছেলের মধ্যে ছোটো ছেলে অশোকই এখন তাঁর কাছে নেই। পড়াশুনোয় খুব মাথা ছিল ওর। নৃপেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশনে বরাবর ফার্স্ট হত ক্লাসে। তারপর শিবপুর থেকে পাশ করার পর সন্তোষের মাধ্যমেই বলে কয়ে সহজেই একটা চাকরি হলো জেসপে। তাও বছর দু-এক পর ছেড়ে দিয়ে চলে গেল সেই দিল্লি।

ইঞ্জিনিয়ারদের নাকি এরকমই করতে হয়। প্রথম প্রথম দু-চারটে কোম্পানিতে ঘুরলে নানা ধরনের অভিজ্ঞতা হয়। তাইতে সুযোগ আসে বেশি। মাইনেও বাড়ে। এখন দিল্লিতে চিত্তরঞ্জন পার্কে থাকে ওরা। বউমা দিল্লিরই মেয়ে। ওখানেই জানাশুনা হয়েছিল ওদের। যুগের হাওয়া।

সতীশ একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিল। ভাইয়ের বউ দেখেশুনে ঘরে আনতে পারল না বলে। তারপর মেনেই নিয়েছিলেন ওরা। সেও তো বছর দশেক আগের ব্যাপার।

এই বাগান কাগজে কলমে এখন ছোটো ছেলে অশোকেরই।

বছর চারেক আগে যখন নিভাননীর খুব অসুখ গেল, তখন ভালো হতে ছেলেরা মিলে বললে — 'মা, তুমি থাকতে থাকতে বাড়ির কাগজপত্র সব করে দাও। যে যার অংশ সব বুঝে নিক। যাতে ভাইয়ে ভাইয়ে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা থাকবে না, মিল থাকবে বরং।' তারপর ওরা সব নিজেরাই বোঝাপড়া করে ঠিকঠাক করে দিলে। উইল-টুইল নয় একেবারে দানপত্রই করে দিলেন নিভাননী।

একতলা হল সন্তোষের আর দোতলা সতীশের। ছাদে তিনতলার ঠাকুরঘরের ভাগাভাগি নেই, ওটা সবারই। বউমা দিল্লির মেয়ে, অশোকও দিল্লির কোম্পানিতে ভালোই আছে বলছে। এখন ওদের দিল্লি থেকে কলকাতায় আসার সম্ভাবনা কম। পরে যদি আসতে চায় তো একটা নিজের মতো ঘরদোর বানিয়ে নেবে সে। অশোক তাই ওই চারকাঠার বাগানটাই নিয়েছে।

সে তো এখন আসেই খুব কম। কাজের খুব চাপ। এই বয়সেই অনেক দায়িত্ব তার। আর মেয়ের ইংরেজি স্কুলের ছুটির সঙ্গে দিনক্ষণ মিলিয়ে নাকি ছুটি নিতে হয় তাদের। গত বছর পুজোতে আসতে পারেনি, মেয়েকে নিয়ে গরমের সময় এসেছিল ক-দিনের জন্য। আর একবার অফিসের কাজে এসেছিল এই শীতকালে। এইবার পুজোয় আসবে বলেছে আবার। তাঁর

নাতনি তিতলি ভারি মিষ্টি হয়েছে। তাকে একবার দেখতে ইচ্ছে হয় নিভাননীর।

নিভাননীকে অনেকবার বলেছে অশোক:

'মা, একবার দিল্লি বেড়িয়ে আসবে চলো।' তা একবার যাবেন তিনি। যাবেন যাবেন করে যাওয়া হয়ে ওঠে না। স্বামীর এই ভিটে ছেড়ে আসলে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না তাঁর। শ্রীরামপুরে দাদা বেঁচে আছেন এখনো। ওই একটিই ভাই নিভাননীর। ভাইপোরা দু-জনেই বিদেশে থাকে। একলা, কাজের লোকেদের হেফাজতেই থাকেন তিনি। তাই প্রায়ই চিঠি লেখেন বোনকে —

'কিছুদিন থেকে যা, ভাইবোনে ক-দিন সুখদুঃখের গল্প করা যাবে। বাইরের লোকের রান্না আর ভালো লাগে না। কতদিন তোর হাতে ডুমুরের ডালনা, মোচার ঘণ্ট খাইনি। তোর রান্না অবিকল মায়ের মতো, এরা সেসব কিছু জানে না।' — সেখানেও যাওয়া হয় না নিভাননীর। বৃষ্টি থেমে গেলে ফুলের সাজিটা নিয়ে বাড়ির দিকে ফেরেন তিনি।

বর্ষা পেরিয়ে শরৎ এল। বোনাসের টাকা থেকে বাঁচিয়ে দুই ভাই এ-বাড়িটা রং করেছে এবার। আবার যেন নতুন হয়ে গেছে বাড়িটা।

আজকের দিনটা বেশ লাগছে নিভাননীর।

ক-দিন বৃষ্টির পর আজকে আবার সূর্যের মুখ দেখা গেল। ছাতের ওপর নরম রোদ্দুর এসে পড়েছে পুবের নারকেল গাছ আর সুপুরি গাছের সারির ফাঁক দিয়ে। একপাল চড়ুই আর গুটিকয়েক শালিক যারা রোজ সকালে এসে বসে ছাতের পাঁচিলে — নিভাননীর ছড়ানো খই মুড়ির লোভে, তারাও এসেছে। এরপরে নাতি-নাতনি আসবে, তাদেরও কিচিরমিচির যোগ হবে ওদের সঙ্গে। মাদুরে বসে বসে দেখবেন আর শুনবেন নিভাননী। কাল গেছে সপ্তমী। আজ অষ্টমী। গত পরশু ছোটো ছেলে অশোকও দিল্লি থেকে এসেছে নাতনি আর বউমাকে নিয়ে।

তাঁর নাতনি তিতলি একেবারে চলন্ত অভিধান হয়েছে। পদিপিসি টুনটুনিমাসি একটি। এক বছর পর দেখলে কী হবে, দু-দিনেই একেবারে ভারি ভাব ঠামার সঙ্গে। ঠামার সব ব্যাপারেই তার ভারি চিন্তা। ছোটো নাতি পাড়ার পুজোমণ্ডপে গেছে। তিতলি ঠামার সঙ্গে ঘুরতে থাকে। তার জিজ্ঞাসারও শেষ নেই।

'আচ্ছা ঠামা, তুমি যে ঠাকুরকে রোজ এই একই ব্রেকফাস্ট, বাতাসা মুড়কি আর জল, বাতাসা মুড়কি আর জল দাও, ঠাকুর রাগ করে না? রোজ ঠিক খায় তুমি জানো?'

এমন কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি কোনোদিন হননি নিভাননী।

নাতনিকে বোঝান — 'ঠাকুর তো আর সত্যি সত্যি খায় না। একবার চোখ দিয়ে দেন শুধু। তাইতেই ওগুলো প্রসাদ হয়ে যায়।'

'ও, আচ্ছা।'

তাঁর মুখে নরম নরম হাত বুলিয়ে দেখে তিতলি।

'আচ্ছা ঠামা, তোমার বয়স কত?'

নাতনির সঙ্গে মজা করেন নিভাননী।

'আমার বয়স? এই তিন কুড়ির বেশি তো বটেই।'

আবার বলেন — 'বোধহয় চার কুড়ি।'

'চার কুড়ি মানে কত?'

'চার কুড়ি মানে? চারবার কুড়ি।'

'তার মানে এইট্টি?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ তাই হবে। আমি কী অত অঙ্ক ইংরেজি জানি?'

ঠামা যে ঠিক করে নিজের বয়সটাও বলতে পারে না এতে ভারি মজা পায় তিতলি।

'ঠামা, তোমার বার্থ ডে গোনো না কেন? এই যেমন আমার দ্যাখো গতবার হয়েছে সেভেন্থ বার্থ ডে, এবার হবে এইটথ বার্থ ডে। এ তো খুবই সহজ মনে রাখা। তুমি মনে রাখতে পারো না?'

'না মা, বুড়ো মানুষের কী অত মনে থাকে?'

'তুমি মোটেই লেখাপড়া করো না আর কিছু মনে থাকে না তোমার। এইটা আমি বুঝতে পেরেছি।' নিভাননীর মূল্যায়ন সম্পন্ন করে তিতলি।

'পরশুদিন তুমি আমাদের সঙ্গে দিল্লি যাবে। ওখানে আমি তোমায় পড়াব। তোমার জিনিসপত্র কই, আমি গুছিয়ে দি। সুটকেশ আছে তোমার?'

'না মা, সুটকেশ কোথা পাব, নেই তো।'

'আচ্ছা আমি গিয়ে বাপিকে বলছি, তোমার জন্য একটা সুটকেশ কিনে আনতে।' লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল তিতলি।

একটু পরে অশোক এসে বসল মায়ের কাছে।

'মা একটা কথা তোমাকে তো আর না বললে চলছে না।'

শরতের সোনালি রোদে উজ্জ্বল সকালবেলাতেই ঈশান কোণে কালবৈশাখীর মেঘ দেখতে পান নিভাননী।

'কী হয়েছে বাবা, নীচের বাড়িতে কিছু হয়েছে?'

'না না বাড়িতে কিছু হয়নি, আসলে কী, দিল্লিতে তো আমাদের থাকতেই হচ্ছে, ভয়ানক বাড়ি ভাড়া ওখানে, তিন তলার ছাতে মাত্র দুটি ঘরের ফ্ল্যাট চিত্তরঞ্জন পার্কে। তারই যা ভাড়া তাতে মাস মাইনের অর্ধেক চলে যায়। তার ওপরে ইলেকট্রিক বিল। দিল্লিতে জিনিসপত্রের খুব দাম মা। আমাদের খুবই অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে, জানো।'

'ওঃ! এই কথা' — হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন নিভাননী। —'তুই কলকাতায় একটা ট্রান্সফার নিয়ে চলে আয় না বাবা। এ-বাড়িতে তোর দুই দাদার সঙ্গে তোরও জায়গা হয়ে যাবে। ওপরে নীচে ছ-খানা ঘর আমাদের। দিল্লিতে তোর তো দু-খানা ঘরের ফ্ল্যাট। তা সতীশ আর সন্তোষ তোকে এখানেই ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। ইচ্ছে হলে ছাতেও দুটো ঘর তুলে নিতে পারিস। তা ছাড়া বাগানের জমিটা তো তোর নামে রয়েছে, সেখানেই কিছু একটা করে নে না বাবা।' অশোকের সমস্যার সহজ সমাধান করে দিতে চান নিভাননী।

'না মা', ম্লান হাসে অশোক, — 'তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না। তোমাদের জন্য এখনো আমার মন কেমন করে। অনেক সমস্যা থাকলেও এই আধমরা শহর কলকাতারও একটা আলাদা আকর্ষণ আছে — একথাও সত্যি। কিন্তু সংসার তো আমি আর একা করব না। দিল্লির জীবনযাত্রা ঠিক আমাদের এখানকার মতো না। আমরা সবাই এখন তাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। তোমার নাতনি সেখানে ভালো স্কুলে ভরতি হয়েছে। সেখান থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ওকেও একটা ভালো জায়গায় মাঝখান থেকে ভরতি করা কঠিন হবে। এখানে এসে আমরা ঠিক মানিয়ে নিতে পারব না মা।'

'তবে তুই কী করতে চাইছিস অশোক?' ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন নিভাননী।

'দিল্লির নয়ডাতে আমরা একটা ফ্ল্যাট বুক করেছি। অফিসে সবাই বলল। আমার বন্ধুবান্ধব সহকর্মীদের অনেকেই করেছে। এখনো পাওয়া যাচ্ছে। এরপরে অফিসের কাছাকাছি কিছুই পাওয়া যাবে না। আমি কিছু টাকা জোগাড় করেছি। হাউসিং লোনও নিয়েছি। কিন্তু আরো পাঁচ-ছ-লাখ টাকা লাগবে।'

'এত টাকা তোর জোগাড় হবে বাবা?' — আশঙ্কা ফুটে ওঠে নিভাননীর কণ্ঠে।

'দাদারা যদি আমার ভাগের জমিটা নিয়ে টাকাটা দেয় তা হলে হয়।'

'পাঁচ-ছ-লাখ টাকা?' অবাক হয়ে সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন নিভাননী। 'তুই তো তোর দাদাদের কথা জানিস অশোক। এত টাকা ওরা কোথা থেকে পাবে বল্? সতীশের তো রেলের চাকরি, কোনো গতিকে সংসারটা চালায় এই যথেষ্ট। সন্তোষ তাও একটু রোজগারপাতি করে যা হোক। তাই বলে এত টাকা একসঙ্গে ওরা জোগাড় করতে পারবে বলে তো মনে হয় না বাবা।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে অশোক, তারপর বলে :

'তা হলে তুমি অনুমতি দাও, আমি অন্য কাউকে নিতে বলি মা। বাগানটা আর কী কাজে লাগবে বলো? তা ছাড়া কলকাতা শহরে আজকের দিনে বাড়িতে এত বড়ো বাগান রাখবার কথা কেউ চিন্তাও করে না। আমি দাদাদের বলছি। তুমি একটু শান্ত মনে ভেবে দেখো মা। আমাকেও তো আমার ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে।' দাদাদের অবশ্য বলে অশোক। অষ্টমীর দুপুরেই বিসর্জনের বাজনা শুনতে পান নিভাননী।

সতীশ আর সন্তোষ দোতলার দালানে তাঁর তক্তপোশে এসে বসে। তাদের মুখ গম্ভীর। মুখ নীচু করে থাকে তারা।

'শুনছ মা, অশোক কী বলছে?' — সতীশই কথাটা বলে।

'শুনেছি বাবা, তোরা যা দিতে পারিস, তাই দিলে যদি ওর চলে, তা হলে একবার বুঝিয়ে বল্ না সতীশ।' সতীশ মুখ নিচু করেই থাকে, সন্তোষই জবাব দেয় —

'পাঁচ লাখ টাকার কমে অশোকের পোষাবে না মা। আমি সাকুল্যে এক লাখ টাকা জোগাড় করতে পারি। দাদার প্রভিডেন্ট ফান্ডে দাদা বলেছিল পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা পড়ে আছে। বাগানটা বোধহয় রাখা যাবে না। তার হিসেব অনুযায়ী সে ঠিকই বলেছে। এখানে জমির কাঠা এখন দেড় লাখ টাকার ওপর। চার কাঠা জমির দাম পাঁচ লাখ টাকার বেশি হয়। আমরা তো

যাই হোক একটা নিজস্ব বাসস্থানে আছি। ঘটনাচক্রে অশোক পৈতৃক বাড়ির কোনো ভোগ তো করতে পারছে না। ওকে আমরা আটকাতে পারি না মা।'

'আমার চোখের সামনেই বাগানটা অন্য লোকের কাছে বিক্রি করে দেবে অশোক। আমার বড়ো কষ্ট লাগছে রে সতীশ। তোরা ওকে আর বউমাকে একবার পাঠিয়ে দিস।'

'ওরা একটু বেরিয়েছে মা। এলে তোমার কাছে আসতে বলব।'

অবশ্য বউমাকে বলেও কোনো ফল হয় না। বউমা বলে —

'আমি শুনেছি মা, বাবা এই বাড়িটাও দেশের জমি বিক্রি করেই করেছিলেন। তখনো তো পিছুটান ছিল। সেও ভদ্রাসন ছিল। আমাদের ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে মা। অতীত খুব মায়ার বস্তু হলেও তাকে আঁকড়ে থাকলে যে ভবিষ্যতের প্রতি অন্যায় করা হবে। আপনার ছেলের আশা আকাঙ্ক্ষার কথাটাও একটু ভাবুন মা। মাসে মাসে এতগুলো টাকা বাড়ি ভাড়া দিয়েও একটু ভালো থাকতে পারি না আমরা। নিজের বাড়ি হলে আপনি আমাদের সঙ্গে গিয়ে থাকবেন। আপনার আলাদা ঘর থাকবে সেখানে।'

নম্রভাবে কথাগুলো বলল অশোকের বউ তাপসী, তাঁর ছোটো বউমা। অনেক বছরের ওপার থেকে অতীতের প্রতিধ্বনি যেন শুনতে পেলেন নিভাননী। বউমার মুখের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকেন তিনি। আর কিছুই বলা হল না তাঁর।

পরের দিনই তিতলি আর তাপসীকে নিয়ে দিল্লি চলে গেল অশোক। প্রতিবারের মতো এবারও সন্তোষ গিয়েছিল তাদের ট্রেনে তুলে দিতে, সঙ্গে গিয়েছিল সতীশের ছেলে, নিভাননীর বড়ো নাতি কুন্তল।

একমাস পরে কথামতো আবার ফিরে এল অশোক। রাজমিস্ত্রীরা এল। যে-পথ দিয়ে নিভাননী বাগানে যেতেন সেই পথের ওপর পাঁচিল উঠল। দালালরা এল। প্রমোটাররা এল। নিভাননী দোতলার জানলা থেকে, ছাতের প্রিয় কোণটা থেকে, পাথরের মূর্তির মতো বসে বসে দেখলেন। শুধু একটা কথা না বলে পারলেন না ছেলেকে —

'অশোক, ওরা সব গাছ কেটে ফেলবে?'

'না মা, সব গাছ নাও কাটতে পারে। এখানে একটা তিনতলা ফ্ল্যাটবাড়ি হবে। পেছনের দিকের নারকেল গাছগুলো তো ব্যাক স্পেসে যে দশফুট জায়গা ছাড়তে হয় তার মধ্যে পড়ে, ওগুলো হয়তো কাটবে না।'

'আর সামনে ওই কৃষ্ণচূড়াটা? ওটা তোর বাবা নিজের হাতে লাগিয়েছিলেন। তুই ওদের বলে দিস বাবা, ওই গাছটা যেন তারা না কাটে।' — ব্যাকুল কণ্ঠে বলেন নিভাননী।

'নতুন বাড়ির সামনে গাছটা তো ভালোই লাগবে, তাই না অশোক। তুই ওদের বুঝিয়ে বলিস বাবা।'

কৃষ্ণচূড়ার আসল ইতিহাসটা পেটের সন্তানকে সঙ্কোচে বলতে পারেন না নিভাননী। বলতে পারেন না, প্রতি বছর শেষ বসন্তে তার ডালে ডালে লাল ফুলের মেলা, আসলে নিভাননীর মুছে যাওয়া সিঁদুরের রঙে লাল।

'আচ্ছা মা, আমি বলব ওদের।' — এই বলে নিষ্কৃতি পায় অশোক।

কাগজপত্র হয়ে গেলে পাঁচ লাখ টাকার চেক নিয়ে দিল্লি চলে যায় সে।

তারপরে এক শীতের সকালে তারা এল, — কুয়াশার মাঝে নজর চলে না নিভাননীর। কানে কীসের একটা শব্দ আসে মাঝে মাঝে। নিশ্চিত নিয়তির মতো। একের পর এক। ছাতের পাঁচিল থেকে ঠাহর করে দেখেন নিভাননী — রাস্তার দিকের পাঁচিলের খানিকটা ভেঙে ফেলেছে ওরা। ওখান দিয়ে বাড়ি তৈরির মালমশলা সহ ট্রাকের যাতায়াতের রাস্তা হবে বোধহয়। আর ওকি করছে জল্লাদের দল! কৃষ্ণচূড়ার চারিদিকে দড়িবাঁধা। তার গোড়ায় কুড়ুল মারছে ওরা। গাছের গোড়ায় নয়, তার বুকেই আঘাত পড়তে থাকে যেন।

সিঁড়ি দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে নেমে আসেন তিনি।

'বউমা, সতীশ, বাবা ওরা কী করছে দ্যাখ্!'

'কী হয়েছে মা?' — দৌড়ে আসে সতীশ।

'বাগানের কৃষ্ণচূড়া গাছটা ওরা কেটে ফেলছে। অশোক যে আমায় বলল ওদের বুঝিয়ে বলব। সে বলেনি ওদের?' আর্তনাদ করে ওঠেন নিভাননী।

'শান্ত হও মা, এখন তো ওটা ওদের জায়গা। সে বললেই বা ওরা শুনবে কেন। আচ্ছা দাঁড়াও গিয়ে দেখছি।' কিছুই শোনেন না নিভাননী। বুকের মধ্যে আর বা-কাঁধের কাছে অসম্ভব যন্ত্রণা হয় তাঁর। আস্তে আস্তে সিঁড়িতে বসে পড়েন তিনি।

যোধপুর পার্কের এক নার্সিং হোমের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে যমে মানুষে টানাটানি চলে তিনদিন।

দিল্লি থেকে ট্রাঙ্ককল পেয়ে অশোকরা আসে। নিভাননীর আর জ্ঞান ফেরেনি। ফুলে ঢাকা তাঁর শরীরটাই একবার বাড়িতে ফিরিয়ে এনেছিল তাঁর ছেলেরা।

কৃষ্ণচূড়া কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি। তার কাটা ডালপালাগুলো পড়েছিল পাঁচিলের ধারে। এত ডাক্তার বদ্যি দৌড়াদৌড়ির মাঝেও তারই একটা শক্তসমর্থ ডাল এনে সতীশের বড়ো ছেলে পুঁতে দিয়েছিল পুবের গেটের ধারে। সবাই বলল, 'পাগল ছেলে, এত বড়ো ডাল কখনো বাঁচে?' কুন্তল শোনেনি। যত্ন করেছে খুব। তার এক বন্ধুর নার্সারি আছে। সে কলমের গাছ বানাতে ওস্তাদ। তাকে দিয়ে নানা ডাক্তারি করেছে ভাঙা ডালটার ওপর। সার দিয়েছে, জল দিয়েছে, আর দিব্যি তরতাজা হয়ে উঠেছে সেই ছিন্নমূল শাখা। দেখতে দেখতে ছোট্ট নতুন পাতা গজিয়েছে তাতে। ভোরের হাওয়ায় থিরথির করে কাঁপে তার শরীর। দু-একটা অচেনা পাখি মাঝে মাঝে এসে দোল খায় আর কত কথা বলে যায় তার ডালে বসে বসে, চেনা চেহারাটা অচেনা জায়গায় কেমন করে এল তাই বলে কী? সবাইকে অবাক করে দিয়ে সেবারই শেষ বসন্তে একঝাঁক ফুল ফুটল ছোট্ট গাছটাতে — অনেক বছর আগে পশ্চিমের বাগানে প্রথম যেমন ফুটেছিল সেই রকমই লাল।

ট্যাবলয়েড সংবাদপত্র ও আজকের সাংবাদিকতা

স্বাতী ভট্টাচার্য

যাঃ, গার্ডিয়ানও ট্যাবলয়েড হয়ে গেল।

বিলেতে ওজনদার দৈনিক বলতে চারটে, দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট, দ্য টাইম, দ্য গার্ডিয়ান আর দ্য ডেলি টেলিগ্রাফ। বিক্রির সংখ্যায় 'সান' বা 'ডেলি মিরর'-এর মতো ট্যাবলয়েডগুলো দীর্ঘদিন ধরেই টেক্কা দিয়ে আসছে এই চার 'ব্রডশিট' কাগজকে। তার উপর ২৪ ঘণ্টা ইন্টারনেটে হরবখত ফ্রি নিউজ, যে-কোনো কাগজের ইন্টারনেট সংস্করণ কেবল ক্লিক-এর অপেক্ষায়। ফলে নব্বইয়ের দশকে বড়ো কাগজগুলোর পাঠকসংখ্যা ক্রমশ চড়চড় করে কমে আসছিল। সেই পড়ন্ত বিক্রিকে চাগিয়ে তুলতে আয়তনে পরিবর্তন আনার ঝুঁকি প্রথম নিয়েছিল ইন্ডিপেন্ডেন্ট। ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর থেকে টেবিল-ঢাকা সাইজের কাগজ হয়ে গেল টেবিল ম্যাট সাইজের ট্যাবলয়েড। তার ছয় সপ্তাহ পরেই টাইম কাগজ তার দীর্ঘ ট্র্যাডিশন ভেঙে ছোটো আকারে এল বাজারে। ফলও পেল দুটো কাগজই — ছয় মাসের মধ্যে ইন্ডিপেন্ডেন্টের প্রচারসংখ্যা বাড়ল ২০ শতাংশ, টাইম-এর পাঠকসংখ্যা বেড়েছে এক বছরে ৪.৫ শতাংশ। অন্যদিকে, গার্ডিয়ান খুইয়েছে প্রায় ২৫ হাজার পাঠক। অতএব এই ১২ সেপ্টেম্বর থেকে, ১৮৪ বছরের ট্র্যাডিশনের মায়া ভুলে, দ্য গার্ডিয়ানও হ্রস্বাকার। একেবারে ট্যাবলয়েড নয় অবশ্য, স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে তার চেয়ে একটু বড়ো — ১২.৫ ইঞ্চি বাই ১৮.৫ ইঞ্চি। কাগজের দুনিয়ায় এই সাইজকে বলে 'বার্লিনার', যদিও জার্মানির রাজধানী থেকে আজ আর এই সাইজের একটাও খবরের কাগজ বেরোয় না, বরং ফ্রান্সের ল্য মোন্দ্, ইতালির লা রেপুবলিকা আর বার্সিলোনার লা ভ্যানগুয়ার্দিয়া হল এই 'বার্লিনার' সাইজের দৈনিক। ট্যাবলয়েডের মাপ সেখানে ১১.৫ ইঞ্চি বাই ১৪.৭ ইঞ্চি।

প্রতিযোগিতায় গার্ডিয়ান দু-বছরে পিছিয়ে পড়েছে, বিক্রি নেমে এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র সাড়ে তিন লক্ষে, তার ওপর নতুন কলেবরের কাগজ বার করতে ৮০ মিলিয়ান পাউন্ড খরচ করে যন্ত্রপাতি বসিয়েছে। সুতরাং সাইজ খাটো করে বিক্রি বাড়ানোর চেষ্টা কতটা ফলপ্রসূ হয়, তা নিয়ে নিশ্চিত বেজায় টেনশনে আছেন গার্ডিয়ানের সম্পাদক, অ্যালান রাসব্রিজার। তবে যা এখনি জলের মতো পরিষ্কার তা হল, ব্রিটেনের জাতীয় দৈনিকের বাজারে আর মাত্র একটা কাগজ রয়েছে, যা আমাদের চেনা মাপের খবরের কাগজ, বা ব্রডশিট। তা হল ডেলি টেলিগ্রাফ। ব্রিটেনের জাতীয় কাগজগুলোই শুধু নয়, দ্য স্কটসম্যান বা দ্য বেলফাস্ট টেলিগ্রাফের মতো আঞ্চলিক দৈনিকও ট্যাবলয়েড হয়ে গিয়েছে।

ব্যবসায়িক কাগজগুলোও থেমে নেই। এই তো অক্টোবর থেকে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এশিয়া এবং ইউরোপ সংস্করণ হয়ে যাচ্ছে ট্যাবলয়েড। এ-ঢেউ লেগেছে খোদ এশিয়ার মিডিয়া জগতেও। এ-বছরই এপ্রিলে মালয়েশিয়ার প্রাচীনতম ইংরেজি দৈনিক, নিউ স্ট্রেটস টাইমস, ১৬০ বছরের ব্রডশিটের ঐতিহ্য স্মৃতির সিন্দুকে তুলে রেখে ট্যাবলয়েড হয়ে এল বাজারে।

এক সাক্ষাৎকারে এডিটর ইন চিফ কালিমুল্লা হাসান বলেছেন, 'ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই সিদ্ধান্ত নিতে হল আমাদের। এ আমাদের দুঃখের দিন, কিন্তু ব্যবসার ক্ষেত্রে যা রূঢ় সত্য তা আমাদের মেনে নিতেই হবে।' সেই সত্য হল এই যে, 'দ্য স্টার' নামে ট্যাবলয়েড আকারের একটি ইংরেজি দৈনিক প্রচার সংখ্যায় অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছে নিউ স্ট্রেট টাইমসকে। নিউ স্ট্রেট টাইমস যেখানে ১ লক্ষ ২৯ হাজার, স্টার সেখানে প্রায় ৩ লক্ষ। এরপর কাগজ ছোটো না করে উপায় কী?

কাগজের পাঠকেরা যে ট্যাবলয়েড সাইজের কাগজ পছন্দ করে, সে নিয়ে তেমন সন্দেহ নেই। ছোটো সাইজের কাগজ সহজে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া চলে ট্রেনে-বাসে, ভাঁজ করতে গেলে দুমড়ে-মুচড়ে একাকার হয় না। মস্ত কাগজের পাতার নানা কোণে খবরের সন্ধান করে বেড়াতে হয় না, ছোটো পাতার মাত্র দুটো কি তিনটে খবর সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। বিশেষত মহিলা এবং অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের কাছে ট্যাবলয়েড যে বড়ো কাগজের চেয়ে বেশি পছন্দসই, তা ইউরোপ আর আমেরিকায় নানা সমীক্ষায় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। মুশকিল হল, পাঠক হারানোই খবরের কাগজের কাছে একমাত্র ঝুঁকি নয়। বোধহয় সব চেয়ে বড়ো ঝুঁকিও নয়। পাঠকের কাছ থেকে কাগজের জন্য যে দাম পাওয়া যায়, তা থেকে কাগজগুলোর বড়ো জোর ২০-৩০ শতাংশ খরচ ওঠে। বাকিটা ওঠে বিজ্ঞাপন থেকে, আর বিজ্ঞাপনদাতারা ছোটো সাইজের কাগজ তেমন পছন্দ করেন না। বড়ো কাগজের পাতা-জোড়া বিজ্ঞাপনে যে-কোনো পণ্য অনেক তরিবত করে 'ডিসপ্লে' করা যায়। প্রায় টিভি স্ক্রিনের সাইজের কাগজের চেয়ে ট্যাবলয়েডের খুদে পাতার বিজ্ঞাপনের সাইজ ঠিক অর্ধেক, তা হলে বিজ্ঞাপনদাতা একই রেটে পয়সা দিতে যাবে কেন? এই কারণে, ইউরোপের যতগুলো কাগজ ট্যাবলয়েড হয়েছে, তাদের প্রায় প্রতিটিরই পাঠক বাড়লেও, বিজ্ঞাপন থেকে আয়ের পরিমাণ গোড়ায় অনেকটাই কমছে। বছর দুয়েক পরে আবার আস্তে আস্তে তা বেড়ে ক্ষতির পরিমাণ পুষিয়ে নিয়েছে, বলছেন মিডিয়া বিশেষজ্ঞরা। এই কারণেই আমেরিকার জাতীয় দৈনিকগুলোয় এখনো ট্যাবলয়েডের হুজুগ তেমন ভাবে ওঠেনি। ইউরোপে কাগজ-পিছু ক্রেতার থেকে যত আয় হয়, আমেরিকায় হয় তার চেয়েও কম। অর্থাৎ কাগজ ছাপার দামের বেশির ভাগটাই তুলে দিচ্ছেন বিজ্ঞাপনদাতারা, তাঁদের দাপটও সেই কারণে বেশি। তাই সান ফ্রান্সিসকোর 'দ্য একজামিনার' কাগজের মতো দু-একটা দৈনিক ছাড়া এখনো কোনো বড়ো দৈনিক ট্যাবলয়েড হয়ে ওঠেনি। কিন্তু সে আর কতদিন? পাঠকের সংখ্যা যদি কমে, তা হলে শেষ অবধি বিজ্ঞাপনদাতাদেরও নড়েচড়ে বসতেই হবে। গত বছরে আমেরিকায় সংবাদপত্রের পাঠকের সংখ্যা ৮ শতাংশ কমেছে। সেখানকার ডিজাইনার, প্রকাশকরাও স্বীকার করছেন যে, ২০২০ সালের মধ্যে ব্রডশিট ব্যাপারটাই ইতিহাস হয়ে যাবে। তবু অস্ট্রেলিয়া থেকে আর্জেন্টিনা অবধি ট্যাবলয়েড-করণ শুরু হলেও, আমেরিকায় এখনো বিজ্ঞাপনদাতাদের চটিয়ে তেমন ঝুঁকি নিতে কেউ রাজি নয়।

আর ভারতে? ভারতের কাগজের অত সিঁটিয়ে থাকার কিছু নেই, কারণ ইউরোপ বা আমেরিকার মতো, আমাদের কাগজের মালিকদের, পাঠকসংখ্যা নিয়ে 'গেল গেল' রব তোলার

দশা এখনো হয়নি। সেখানে পাঠক কমছে, এখানে সাক্ষরতার হাত ধরে পাঠকসংখ্যা বাড়ছে। একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, গত তিন বছরে ভারতে পাঠকের সংখ্যা ১৪ শতাংশ বেড়েছে, যার বেশির ভাগটাই আঞ্চলিক ভাষার কাগজের। বিজ্ঞাপনের দিক থেকেও ভারতের সংবাদপত্র যথেষ্ট সবল — গোটা মিডিয়ায় যত বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তার ৪৬ শতাংশ পায় খবরের কাগজ। প্রতিষ্ঠিত কাগজগুলো ট্যাবলয়েড হয়ে যাওয়ার কোনো ইঙ্গিত তো পাওয়া যাচ্ছেই না, নতুন যে খবরের কাগজগুলো প্রকাশ করা হচ্ছে, সেগুলোও ব্রডশিট আকারেই বেরোচ্ছে। মুম্বইয়ে ডি এন এ (ডেলি নিউজ অ্যান্ড অ্যানালিসিস) কাগজ শুরু করল দৈনিক ভাস্কর এবং জি নেটওয়ার্ক, যা সম্পূর্ণ নতুন, প্রায় ১০০ পাতার ব্রডশিট। বাংলায় নবতম দৈনিক দ্য স্টেটসম্যান, সেও ব্রডশিট। একটা নতুন ট্যাবলয়েডও অবশ্য শুরু করেছে টাইমস অফ ইন্ডিয়ার প্রকাশকরা, তার নাম মুম্বই মিরর। তবে তা প্রধানত অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের আকর্ষণের জন্য, আর সে-শহরের (মুম্বই) প্রতিষ্ঠিত ট্যাবলয়েড কাগজ 'মিড ডে'-র সঙ্গে লড়াইয়ে মুম্বই মিরর তেমন দাঁড়াতেও পারছে না। ট্যাবলয়েড আকার আমরা এখন প্রধানত দেখি অপরাহ্ন বা সান্ধ্য দৈনিকে, যা মেজাজে, মর্যাদায় প্রভাতী কাগজের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ-ছাড়া দ্য হিন্দু বা দ্য টেলিগ্রাফের মতো কিছু ইংরেজি কাগজ তাদের ফিচার বিভাগগুলো নিয়মিত ট্যাবলয়েড আকারে প্রকাশ করছে। তবে হ্রস্বকরণের প্রয়োজন যে আমাদের দৈনিকগুলির হয়নি, তাও নয়। নিউজপ্রিন্টের চড়া দামের কারণে গত বছর খানেকের মধ্যে প্রায় সব ক-টি জাতীয় দৈনিক চওড়ায় ৩৬ সেন্টিমিটার থেকে কমে ৩৩ সেন্টিমিটারে এসে দাঁড়িয়েছে। যদিও বেশিরভাগ কাগজই একে 'স্মার্ট লুক' বা 'ইন্টারন্যাশনাল লুক' বলে চালাতে চাইছে, আসল কারণ ট্যাকের টান।

কিন্তু সংবাদপত্রের ট্যাবলয়েড হয়ে ওঠা মানে তো কেবল আকারে ছোটো হওয়া নয়, তা যে সংবাদের চরিত্র নিয়েই টানাটানি। ট্যাবলয়েড দৈনিক বলতে সাংবাদিকতার একটা ধারাই চিহ্নিত হয়ে গিয়েছে, যেখানে ক্লিন্টনের বিদেশনীতির চাইতে মনিকা লিউনস্কির সঙ্গে তার কেচ্ছা অনেক, অনেক বেশি জায়গা জুড়ে বসে, যেখানে রাষ্ট্রনীতি এঁটে উঠতে পারে না ফ্যাশান, সিনেমার সঙ্গে। সেই অর্থে পাক্কা ৩৬ ইঞ্চি বহর নিয়েও বহু কাগজ ট্যাবলয়েড হয়ে উঠেছে। বছর তিনেক আগে বিলেতের কাগজগুলো নিয়ে পড়াশোনার সুযোগ হয়েছিল। সেই সময় পপ গানের এক অনুষ্ঠানে এক পুরুষ পপস্টার স্টেজে গাইতে গাইতে তার সঙ্গী মহিলা স্টারের পশ্চাদ্দেশে হাত দেন, ইংরিজিতে যাকে বলে 'গ্রোপ' করা। অবাক হয়ে দেখেছিলাম, সেখানকার ট্যাবলয়েডগুলো কেবল নয়, টাইম বা গার্ডিয়ানের মতো দিমাগ-দেমাকী কাগজগুলোও প্রথম পাতায় ফলাও করে সে-ছবি ছাপল, রিপোর্টও লিখল। ভদ্র ভাষায় একে বলে ট্যাবলয়েডাইজেশন, সোজা সাপটা বললে, 'ডামবিং ডাউন।' ফলে কোনো ঘটনার 'খবর' হয়ে ওঠার শর্তগুলোই পালটে যায়। জ্যানেট জ্যাকসনের 'ওয়ার্ডরোব ডিসফাংশানের' মতো খবরকে কাগজের প্রথম পাতায় ফলাও করে ছাপার প্রস্তাব দিলে গৌরকিশোর ঘোষ হয়তো মূর্ছা যেতেন, অন্তত বেজায় রাগ করতেন তা নিশ্চিত, কিন্তু আজকের সম্পাদকের কাছে তা নেহাত জলভাত। সংবাদের এই 'অবমূল্যায়ন' নিয়ে বহু কথা হয়েছে, হচ্ছে, তবে সেই কথা

বেশিরভাগ সময়েই একটা হতাশা-মিশ্রিত নিন্দা। তার মধ্যে 'ছ্যা ছ্যা' করার ইচ্ছেটা যত প্রখর, বিশ্লেষণের ঝোঁকটা তত প্রবল নয়। সংবাদমাত্রই ভুয়ো, সাংবাদিক মাত্রই দালাল, এমন আলোচনায় মনের ঝাল অনেকটা ঝাড়া যায় ঠিকই, কিন্তু 'কেন,' 'কতখানি', 'কী উদ্দেশ্যে'— এই প্রশ্নগুলোর উত্তর তেমন মেলে না।

প্রথমত, যেগুলো প্রতিষ্ঠিত দৈনিক, তাদের সংবাদ পরিবেশনের নকশায় খুব পরিবর্তন যে হয়েছে, সেই কথাটাই অনেকে স্বীকার করতে চান না। টাইম বা গার্ডিয়ান, যে-কোনো কাগজের কর্তৃপক্ষই বলবেন, খবরে তাঁরা সিরিয়াস বিষয়কে যথেষ্ট গুরুত্ব দেন। অন্য বিষয়গুলো এখন অর্ন্তভুক্ত করেছেন বটে, তবে তার জন্য পাতাও বাড়িয়েছেন। অতএব রাজনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের বরাদ্দ কমেনি, অন্য খবরের বরাদ্দ বেড়েছে। এমন কথা ভুল প্রমাণ করতে কেবল ধারণায় কাজ চলে না, চাই সমীক্ষা এবং গবেষণা। এমন একটি সমীক্ষা ১৯৭৭ থেকে ১৯৯৭, এই ২০ বছরের সংবাদ খতিয়ে দেখেছে। গবেষকরা বলছেন, ১৯৭৭ সালে স্ক্যান্ডাল নিয়ে লেখা খবর ছিল এক শতাংশেরও কম, ১৯৯৭ সালে তা দাঁড়িয়েছে ১৭ শতাংশ। এই একই সময়কালে টাইম ম্যাগাজিনের সরকার-সম্পর্কিত খবর ১৫ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়ায় চার শতাংশে, যেখানে বিনোদন ৮ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ১৫ শতাংশে। সুতরাং খবরের নকশায় মৌলিক পরিবর্তন যে সত্যিই এসেছে, তা মানতে হবে।

আমাদের দেশে এমন সমীক্ষা হয়েছে বলে জানা নেই। যদি তেমন সমীক্ষা হয়, তা হলেও ইংরেজির সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষার কাগজ, শহরের কাগজের সঙ্গে জেলার কাগজ, বড়ো কাগজের সঙ্গে মাঝারি কাগজের খবরের বন্টনের নকশায় পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। তবু তর্কের খাতিরে মোটের ওপর এটা ধরে নেওয়া চলে যে, বড়ো মাপের সংবাদপত্র, অর্থাৎ যেগুলির প্রচারসংখ্যা ১০ লক্ষের উপরে, সেগুলিতে গত এক-দেড় দশকে রাজনীতি, রাষ্ট্র এবং প্রশাসন, যাকে সাংবাদিক পরিভাষায় 'হার্ড নিউজ' বলা হয়, তার প্রাধান্য কমেছে, বেড়েছে 'সফট নিউজের' প্রাধান্য, যার মধ্যে প্রধানত পড়ে স্ক্যান্ডাল, সেলিব্রিটি আর স্পোর্টস।

কিন্তু কেন এই পরিবর্তন? অনেকেই বলতে পারেন, কেন নয়? কেবল ভারিক্কি নীতির তাত্ত্বিক আলোচনা করে সংবাদপত্রকে সমাজের গোটাকয়েক মানুষের কুক্ষিগত করে রাখাই বা হবে কেন? পাঠক যা চায়, সংবাদপত্রকে তাই দিতে হবে। আর পাঠক যদি সিনেস্টারের প্রেমলীলা পড়তে পয়সা খরচ করতে চায়, তা হলে তাকে জোর করে ইরাক-নীতি গিলিয়ে লাভটা কী? সংবাদপত্র না হয় পাত পেড়ে খাওয়ায়, কিন্তু ইন্টারনেটের খবর তো বুফে ডিনার। সেখানে মাপাও যায়, কে কোন খবর বেশি পড়ছে। লাইকোস সার্চ ইঞ্জিনে দেখা যাচ্ছে, জ্যানেট জ্যাকসনের বক্ষবন্ধনী ছিঁড়ে যাওয়ার খবর মার্স রোভারের চেয়ে ২৫ গুণ বেশি 'হিট' হয়েছে। আর লোকে কী খবর পড়তে চায়, তা কেবল খবরের কাগজের উপরেও নির্ভর করে না। করে তার সামগ্রিক চিন্তার উপর। একটা সময় ছিল যখন লোকে বাস্তবিক বিশ্বাস করত, রাজনীতি মানুষের ভাগ্য বদলাতে পারে। রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্যের কারণে মানুষের জীবনধারা, সমাজের উন্নয়নের পথ আলাদা হয়ে যেতে পারে। আজ সে-বিশ্বাস আর নেই। এখন আমরা জানি, ম্যানিফেস্টো কেবল কথার কথা, আদর্শ ও বাণীসর্বস্ব। রাজনৈতিক

দ্বন্দ্ব মানে নেতাদের ক্ষমতা কাড়ার লড়াই, যেখানে জনগণ সতত উলুখাগড়া। তা হলে সেই কুৎসিত নেতাদের মিথ্যে কথা পড়ে সকালটা নষ্ট করে লাভ কী?

এ-কেবল রাজনীতির নয়, একে গণতন্ত্রের সংকটই বলতে হবে। কিন্তু তা হলে সংবাদপত্রের দায়িত্ব কি আরো বেড়ে যায় না? ভোট পাঁচ বছরে একবার হয়, কিন্তু প্রশাসন নিত্যদিনের, সেখানে প্রতিনিয়ত অনুসন্ধিৎসু চোখ মেলে রাখাই তো সাংবাদিকের কাজ। নেতা যেমনই হোক, তার নীতি তো চাপছে মানুষের উপর। সেই নীতি নিয়ে সমালোচনার, আপত্তির, প্রতিবাদের, অন্য কোনো মঞ্চ যদি নাও থাকে, মিডিয়ায় তার জায়গা তো বুজিয়ে ফেলা যায় না। গণতন্ত্র বড়ো দুর্লভ ধন, তাকে অমন আনমনে হারিয়ে ফেলা চলে না।

বড়ো ঠিক কথা, কেবল প্রশ্ন একটাই — সংবাদপত্রে নীতি নিয়ে, রাজনীতি নিয়ে আলোচনার জায়গা যে অপসৃত হচ্ছে, সে কী পাঠকের অমনোযোগের জন্য? নাকি অনাস্থার জন্য? বছর দু-এক আগে নিউ ইয়র্ক টাইমসের জেসন ব্লেয়ার নামে এক সাংবাদিককে বেশ ঘটা করে বরখাস্ত করা হয়েছিল, কারণ জানা গিয়েছিল যে, সে স্রেফ বাড়িতে বসে বানিয়ে রিপোর্ট লিখছে। তাই নিয়ে দিন কতক বেশ হইচই চলেছিল। সেই সময় একটি 'গলাপ পোল' করা হয়েছিল জানতে যে, মিডিয়ার খবরের উপর কত মানুষ ভরসা করে। মাত্র ৩৬ শতাংশ মানুষ বলেছিলেন, তাঁরা মনে করেন যে, মিডিয়া সাধারণত ঠিক তথ্য পরিবেশন করে। ভারতে এমন সমীক্ষার কথা জানা নেই, তবে ফলাফলটা খুব ভিন্ন হবে কী? মনে আছে, কিছুদিন আগে একটি মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'আগে ভাবতাম, খবরের কাগজে দিয়েছে, তা হলে ঠিক খবরই হবে। এখন ভাবতে হয়, কোন কাগজ লিখছে, কে লিখছে, কোন পাতায় লিখছে।'

তবু তথ্যের সত্যতা নিয়ে এই সংশয়ের চেয়েও গভীর সংকটময় এক প্রশ্নের সামনে দাঁড়াতে হবে আজকের সাংবাদিককে। তা হল, সে কী আদৌ তার নিজের পরিবেশিত তথ্য বা তত্ত্বে বিশ্বাস করে? সে কী কেয়ার করে? তার পাঠকের যা দুশ্চিন্তা, তাতে কি সাংবাদিক আদৌ বিচলিত? যে সংবাদ লিখছে, যে সংবাদ পড়ছে, সে কি বিষয়টা সম্পর্কে লেখার মতো, বলার মতো, কিছু জানে? নাকি বাইলাইন আর সাউন্ডবাইটের দায় সেরেই সে দিনের কাজ শেষ করার তৃপ্তি নিয়ে বাড়ি ফেরে? সংবাদপত্রের খবর পড়ে বহুদিনই এ-চিন্তা কুরে কুরে খেতো। সম্প্রতি টি.ভি.-র খবর দেখলে এই অস্বস্তি আরো ঘুলিয়ে ওঠে। গুরগাঁওয়ে যে ছাঁটাই-হওয়া শ্রমিকরা মার খেলেন, তাঁদের খবর বলছিলেন যে কোট-টাই পরা তরুণী, যিনি বারবার 'ড্রামাটিক' শব্দটি ব্যবহার করছিলেন; ওই শ্রমিককুল, তাঁদের জীবনযাত্রা, তাঁদের জীবনমরণ সমস্যা সম্পর্কে তিনি সত্যিই কি কিছু জানেন? না কেবল আজকের ডিউটি করছেন? যে-কোনো পরিস্থিতিতে, যে-কোনো ঘটনার সামনে দাঁড়িয়ে, তাঁরা গুটিকতক গতে-বাঁধা প্রশ্ন করেন — কেন এমন হল? অমুক কী বলছে? এরপর কী হবে? কিছুদিন আগে রাজদীপ সরদেশাই বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, সলমন-ঐশ্বর্যের টেপ নিয়ে এত জলঘোলা হল, কেউ জিজ্ঞেস করল না, মুম্বই পুলিশ চার বছর টেপ পেয়েও চেপে বসে রইল কেন? এ তো কেবল একটা প্রশ্ন, এমন কত প্রশ্ন রোজ বন্ধ ঘরে চড়াইয়ের মতো ঘুরপাক খায়। এন ডি

টি.ভি.-র বরখা দত্তকে যে এক সময়ে মানুষ এমন আপন করে নিয়েছিল, তার কারণ কেবল তাঁর সাহস, তাঁর সাংবাদিকতার উৎকর্ষ নয়, তিনি দর্শকের কাছে নিজের প্যাশনের, নিজের বোধের সততার পরিচয় রাখতে পেরেছিলেন।

বিশ্বাসযোগ্যতা, বোধশক্তি, এই দুয়ের সংকটে পড়েছে সাংবাদিক, সংবাদমাধ্যম। কেন? একটা কারণ অবশ্যই সংবাদমাধ্যমে কর্পোরেটের আধিপত্য, যা ক্রমশ মনোপলিতে পর্যবসিত হচ্ছে। মাত্র কয়েকটি সংস্থা বা পরিবারের দ্বারা পৃথিবীর সংবাদপত্র-শিল্প নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। ভারতেও এই পরিবারতন্ত্রের ছবি ভিন্ন নয়। সংবাদপত্র নিরপেক্ষ থাকবে, তা বস্তুত কেউ কোনোদিন আশা করেনি। কিন্তু ভরসা রেখেছে ভারসাম্যের ধারণায় — ভিন্ন স্বার্থের সংঘাতের ফলে এক এমন জমি তৈরি হবে, যেখানে নানা মতের জায়গা থাকবে। কিন্তু অল্প কয়েকজনের হাতে সংবাদশিল্প চলে আসছে ক্রমশ, ফলে সেই প্রত্যয় আর থাকছে না। এও বহুবিদিত যে বেশিরভাগ স্বত্বধারী পরিবারেরই অন্যান্য ব্যবসা রয়েছে, এবং সংবাদপত্র বা টি.ভি. চ্যানেল তাদের মূল ব্যবসার একটি সংঘটক মাত্র। তাই সংবাদপত্রের আর সাংবাদিকের বিশ্বাসযোগ্যতায় এমন চিড় ধরেছে। হয়তো সেইজন্যই বিনোদনটুকু ছাড়া পাঠক বিশেষ কিছু আশা করে না। আবার মালিকও 'লাইফস্টাইল' দিয়ে ভরিয়ে দিতে চায় পাতা, কিংবা করিনা কপুরের চুম্বন-সংক্রান্ত কোনো অর্থহীন বিতর্ক দিয়ে। ফলে সাংবাদিকও এখন ক্লীব, কলমকে ভাড়া খাটায়। দুঃখের কথা, অনুসন্ধানী সাংবিদকতার কাজে, পেশাদার সাংবাদিকের চেয়ে অনেক সময়ে বেশি অগ্রণী হন অন্য পেশার মানুষ। ২০০১ সালের তীব্র খরায় রাজস্থানের মানুষের দুর্বিষহ অবস্থার কথা সিরিজের আকারে লিখেছিলেন সমাজবিজ্ঞানী জাঁ দ্রেজ। সরকারের খরাত্রাণের দাবির মুখ ঘষে দিয়েছিলেন মাটিতে। কোনো সাংবাদিক এই উদ্যোগ নেননি কেন?

সাংবাদিকতা নিয়ে মানুষের সংশয়, অবিশ্বাসকে পূর্ণ মর্যাদা দিতে হবে সাংবাদিককে। তবু নৈরাশ্যের দেওয়াল সত্যের সম্পূর্ণতাকে যেন ঢেকে দিতে না পারে, তা দেখতে হবে। একটি বিদেশি কাগজ লিখছে, ভারতে আজকের সংবাদপত্রকে দেখলে বিংশ শতকের গোড়ার আমেরিকার কথা মনে পড়ে, যখন মানুষ বাস্তবিক বিশ্বাস করত যে সংবাদমাধ্যম রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করতে পারে। কিছুটা হলেও এ-চিন্তা ঠিক। নইলে নবসাক্ষর মানুষও ট্যাকের পয়সা খরচ করে কেন কিনবে খবরের কাগজ? রাষ্ট্রযন্ত্রের, বাণিজ্যজগতের বৃহৎ জটিলতার কথা তাঁরা হয়তো কিছুটা বোঝেন, কিছুটা বোঝেন না। কিন্তু কারণেই হোক বা অকারণে, তাঁদের এখনো এই আশা রয়েছে যে, যে-কথা তাঁরা বলতে পারছেন না, যে-প্রশ্ন তাঁরা করতে পারছেন না, তা সংবাদমাধ্যম প্রকাশ করবে। কেবল নতুন পাঠকই নন, পুরোনো পাঠকের সন্দেহের, নিরাশার কৃষ্ণতম মেঘের চারপাশেও এমন একটি আলো জেগে থাকে, তাই সকালে কাগজ পড়া এখনো স্রেফ 'সময় নষ্ট' হয়ে ওঠেনি।

যে-জমিতে প্রোথিত আশার এই শিকড়, সেখান থেকেই যদি রসগ্রহণ করে আজকের সাংবাদিক, তা হলে হয়তো বীজতলা নিঃশেষ হয়ে যাবে না। আজ আমরা এমন যুগে বাস করছি, যখন সর্বাধিক প্রচারিত ইংরেজি কাগজে সম্পাদকীর পাতা উঠে যাচ্ছে, সম্পাদকীয় কলাম নিলাম হচ্ছে, টাকার বিনিময়ে কর্পোরেট কর্তার ছবি ছাপা হচ্ছে, খবরের সঙ্গে বিজ্ঞাপনের

তফাত বুঝতে হিমসিম — হয়তো সাংবাদিক নিজেও সব সময়ে সেই সূক্ষ্ম সীমারেখা চিনতে পারে না। চিন্তা করার যন্ত্রণা অনেক, চিন্তা না-করার প্রলোভন অপরিসীম। কিন্তু মালিকের কাছে সে-ব্যক্তি কর্মচারী, পাঠকই তাকে 'সাংবাদিক' করে তোলে। তখন নয়, যখন সাংবাদিক তাকে উদ্ধৃত করে, তার মুখের সামনে মাইক্রোফোন ধরে। সংবাদ-কর্মচারী থেকে মানুষ একজনকে সাংবাদিক করে তোলে তখন, যখন সে নিজের প্রশ্নের উত্তর পায় সাংবাদিকের কলমে।

কী সেই প্রশ্ন? মানুষের জীবনের তিন মৌলিকতম বিষয় যদি হয় আহার-নিদ্রা-মৈথুন, তা হলে প্রথম তিনটি প্রশ্ন, কী খাব, কোথায় শোব, আর কার সঙ্গে শোব। চতুর্থ কোন প্রশ্ন উসকোয় মানুষকে? মনে হয় সে-প্রশ্ন এই — কী ভাবব? কেমন করে চিন্তা করব আমার চারপাশ নিয়ে, আমাকে নিয়ে, আমার জীবনকে নিয়ে? কীভাবে বুঝে নেব আমার অবস্থান, আমার চাওয়া-পাওয়ার সম্ভাবনা? এখানেই রাষ্ট্রের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে, পরিবারের সঙ্গে ব্যক্তির যোগ, আর সেই সীমারেখায় দাঁড়িয়ে থাকে সাংবাদিক। সতত সীমান্তবাসী সে, নিয়ত সীমান্তযুদ্ধের সাক্ষী। যে-সীমান্ত রোজ রচিত হয়, আবার ভাঙে, আবার আঁকা হয় রক্ত-অশ্রুতে। সে যদি থাকে অবচেতনে, এক মুহূর্তে বস্তুত বহু অগণিত লোক উদ্বাস্তু হয়ে যায়। তাই রোজ সমাজ-জমিনের জরিপ করতে হয় সাংবাদিককে, জোগাতে হয় চিন্তাসূত্র। এই তার সাধনা, তার ধর্ম, এ-ধর্মাচরণ ফুরোবার নয়। সাংবাদিক নিজে যদি রণে ভঙ্গ না দেয়, তবে সাংবাদিকের পায়ের তলার এই জমিটুকু কেড়ে নেওয়া কঠিন। কারণ এখানে মানুষের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে তার যোগ। ব্রডশিটের বিস্তার যদি বা হয় ট্যাবলয়েডের আঁটসাঁট স্বল্পতা, সংবাদ সংগ্রহের নামে হাজার আদেখলেপনা ঘটতে থাকে চারপাশে, সাংবাদিক চাইলে তার কলম এক গণ্ডুষ জলকে অকূল সমুদ্র করতে পারে। আজো পারে। এই সম্ভাবনাই এখন সম্বল সাংবাদিকের। আর এই সমাজের, এই সময়ের।

বর্ণনা

বাংলা বই
ভালো গল্প
দেখতে ভালো
খরচ অল্প,
বা কবিতা
ছবির সাথে
রেখায় লেখায়
মনটা মাতে —
এরম কিছু
বা অন্য,
'বর্ণনা' সবার জন্য।

ভালো কিছু — সুন্দর কিছু — ছাপার জন্য

বর্ণনা
৬/৭ বিজয়গড়, কলকাতা-৩২
দূরভাষ : ২৪১২ ১১৩৩/৩০৯৬ ৯৭২৫/২৪২৯ ৪০৯২
চলভাষ : ৯৪৩৩৪ ০৮২৬৫

শূন্য থেকে শূন্যে

অলোক গোস্বামী

সত্যি সত্যিই কি কোথাও কিছু পুড়ছে? কাগজ, চট, কাপড়, চামড়া, মাংস! কিংবা আরো উৎকট ধরনের কোনো সামগ্রী, যা সহজদাহ্য নয়! কিংবা যা সচরাচর পুড়তে দেখা যায় না তেমন কিছু? তাই শুধু দম আটকানো গন্ধটা পাওয়া গেলেও শনাক্ত করা যাচ্ছে না, কী পুড়ছে।

অবশ্য এইরকম থমকে যাওয়া মধ্যরাতে, আদিগন্ত যখন মায়াবী চাঁদের আলোয় ভিজে একেবারে সপসপে তখন অনায়াসে পুড়ছে উতথ্য নন্দীর অস্তিত্ব, এরকম কিছু একটা ভেবে নিয়ে ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে রেহাই দেওয়া যেতে পারত। কিন্তু সেটা ভীষণ বস্তাপচা, নাটুকে ভাবনা হয়ে যায়। ওরকম কোনো ভাবনাকে প্রশ্রয় দিতে পারবে না উতথ্য।

তা হলে কী পুড়ছে? বন্‌ধের বর্ষপূর্তির পর এমন কী অবশিষ্ট থাকতে পারে যা পোড়ানোর জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে এই মধ্যরাতটাকে! পুলিশ লাগিয়ে লেবার বস্তি খালি করে দেওয়া হয়েছে সেই কবে। যে দু-একটি পরিবার, তেমন আশ্রয় না-থাকায় হাতে পায়ে ধরে রয়ে গেছে, হয়তো তাদের উনুন আছে, খিদে আছে, কিন্তু আগুন জ্বালানোর মতো সাহস নেই। তা ছাড়া তেল, নুন ছাড়া কোনো কিছু পুড়িয়ে খাওয়ার যে ঐতিহ্য একদা ছিল এখন তা নিছকই গবেষকদের মাথা ঘামানোর মতো ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট। এখন, এই রাতে যদি এই ভূখণ্ড তলিয়ে যায় মাটির নীচে, তবে বহু শতাব্দী পর প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে নাকাড়া, ধামসা, তীর, ধনুক কিংবা হাঁড়িয়া বানানোর জালা নয়। দিল মাঙ্গে মোর-এর বোতল আর দো মিনিটের র‍্যাপার। এবং এই ভাবনা যে বাড়াবাড়ি রকমের নঞর্থক নয়, কেউ তার প্রমাণ চাইলে উতথ্য এই মধ্যরাতে সেই সন্দেহবাতিকগ্রস্তকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাবে বাগানের গেটে, যেখানে রংচটা, অজস্র ছিদ্রময় সাইনবোর্ডে লেখা আছে গুলমোহর, অস্পষ্ট চা বাগানের নাম। আর ঠিক তার পাশে অদ্যাবধি টকটকে কালি আর ঝকঝকে যৌবনের ছবি মারফত বুঝিতে দেওয়া আছে — ঠাণ্ডার আসল মতলব কী।

যদিও আপাতত ওসব ঠাণ্ডা গরম ইস্যু, প্রমাণ-অপ্রমাণের ঝুটঝামেলায় যাবে না উতথ্য। কারণ ঘর থেকে বেরোনোর সময়ই পুলিশ ছোকরা সতর্ক করে দিয়েছে, ওপর থেকেই ছাড়বেন। বারান্দা থেকে নামবার দরকার নেই।

রাত দশটায় শেষবারের মতো টহল দিয়ে যাওয়া সেক্টর অফিসার শুনিয়ে গেছে, দো এভরিথিং ইজ ইন আওয়ার কন্ট্রোল, স্টিল কোনো রিস্ক নেবার প্রয়োজন নেই। ডোন্ট ফরগেট, সব কিছু ঠিকঠাক চালাতেই হবে। ইটস আওয়ার চ্যালেঞ্জ।

কাল রাতে ঘুমন্ত মেয়ের মাথায় হাত ছুঁইয়ে গোপা শপথ করিয়ে নিয়েছিল, কোনো গোয়ার্তুমি করবে না। অ্যাম্পদম মাথা গরম করা চলবে না। ওষুধটা রাতে মনে করে খাবে।

অবশ্য এমনটা ভেবে নেবার মতো কোনো কারণ নেই যে উপরিউক্ত তিন ধরনের সতর্কীকরণ না থাকলে উতথ্য এই মধ্যরাতে পোড়া গন্ধের উৎস সন্ধানে বেরিয়ে পড়ত।

কারণ সে উতথ্য নন্দী, সরকারি ব্যাঙ্কের নিম্নপদস্থ কর্মচারী, দমকলের কর্মকর্তা কিংবা ফরেনসিক এক্সপার্ট নয়। এই বাগানে তাকে গত বিকেল, এই রাত এবং কালকের দিনটাও কাটিয়ে যেতে হচ্ছে স্বেচ্ছায় নয়। নিতান্তই বাধ্যতামূলকভাবে। গণতন্ত্রের মস্ত রথটাকে মসৃণভাবে চালাতে শুধু তো সারথি কিংবা বিশেষজ্ঞ নয়, প্রয়োজন অসংখ্য নাটবোল্ট, স্ক্রু, লোহালক্করেরও। সেরকমই এক স্ক্রুর নাম উতথ্য নন্দী। যতক্ষণ না তাকে উলটো প্যাঁচে খুলে নেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ সে রথের গায়ে সেঁটে থাকতে বাধ্য। না হলে রেহাই নেই। আর পান থেকে চুন খসানোর সাহস কবেই বা কোন স্ক্রু দেখাতে পেরেছে! সুতরাং জল খরচের বাহানায় ঘর থেকে বেরোনো উতথ্য তেমন অস্বস্তি বোধ করলে অনায়াসে দু-তিনটে সিগারেট ধরিয়ে বাতাসের শরীর থেকে দম আটকানো গন্ধটাকে তামাকের আমেজি গন্ধে বদলে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। এ ছাড়া অন্য কোনো হঠকারিতা তাকে মানায় না।

তার মানে কী ভয় পাচ্ছে উতথ্য? হঠকারিতার বিপরীতেই তো ভয়ের বসবাস! না হলে বারান্দা থেকে নেমে সামনের খোলা চত্বরে খানিক হেঁটে আসাও তো যেত। গন্ধের উৎস সন্ধানে নয়, নিছকই হাওয়া খেতে। এভাবে স্থির দাঁড়িয়ে মশার শিকার হওয়ার থেকে সেটা মন্দ কী ছিল! মধ্যরাতের এরকম মায়াবী পরিবেশে একা একা খানিক দূর হেঁটে আসার রোমাঞ্চ শেষ কবে উপভোগ করা গেছে মনেও তো পড়ে না।

না, যাবে না উতথ্য। তা হলে প্রমাণ হয়ে যাবে এখনো নিজেকে পুরোপুরি পালটে ফেলতে পারেনি। চাঁদ, নিস্তব্ধতা, রাতের সৌন্দর্য, ঘাসে ঘাসে পা ফেলার মেকি রোমান্টিকতা এখনো রয়ে গেছে।

কার কাছে যেন দীনেশদা শুনেছিলেন উতথ্য কবিতা লেখে। সকলের সামনে ব্যঙ্গ করেছিলেন, কী নিয়ে কবিতা লেখো, চাঁদ, তারা, ফুল, পাখি নিয়ে?

লজ্জায় মাটিতে মিশে যাওয়া উতথ্য উত্তর দেয়নি। অগত্যা রেহাই দিতে চেয়ে দীনেশদা ফরমান দিয়েছিলেন, কবিতা-ফবিতা ছাড়ো। মনে রেখো, ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়।

মাথা নেড়েছিল উতথ্য। কিন্তু প্রতিবাদ করেছিল কমল, পদ্যময় নয় কেন? তা ছাড়া আপনি যেই উপমাটা দিলেন সেটাও তো কবিতা থেকে নেওয়া।

থতমত খেয়েছিলেন দীনেশদা। পরক্ষণেই সামলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হ্যাঁ, কিন্তু এটা কার কবিতার লাইন জানো? তোমার স্যাঙাত পারবে এমন কবিতা লিখতে!

উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, উতথ্য আমার স্যাঙাত নয়। চোরেরা পরস্পরের স্যাঙাত হয়, বিপ্লবীরা নয়। উতথ্য আমার কমরেড। আর একটা কথা, পৃথিবীতে কোনো কবি আরেকজন কবির মতো লেখে না। তা ছাড়া আপনি তো ওর লেখা পড়েননি, কীভাবে বুঝলেন সুকান্তের থেকে ভালো কবিতা লেখে না কমরেড উতথ্য!

সুকান্ত সম্পর্কে এমন মন্তব্যে সারা ঘর নিস্তব্ধ। জ্বলন্ত চোখে দীনেশদা জরিপ করেছিলেন কমলকে। অথচ কমল অকুতোভয়। পোড় খাওয়া নেতা দীনেশদা ঘটনাটাকে লঘু করতে চেয়ে বলেছিলেন, আমাদের পড়তে হয় না, বুঝলে? কোনটা হরিদ্বার আর কোনটা ইসে বোঝার ক্ষমতা আছে।

ঘরময় বয়েছিল হাসির ছটরা। উতথ্য ইশারায় চুপ করে যেতে বলেছিল কমলকে, কমল শোনেনি। পালটা ব্যঙ্গ করে বলেছিল, কতটা যে বোঝেন সেটা বেশ বুঝতে পারছি। না হলে মস্কোর বদলে হরিদ্বারের নাম উচ্চারণ করেন।

এরপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল কমল। যাবার সময় উতথ্যকে ডেকেছিল, উতথ্য যায়নি। অন্যমনস্ক দীনেশদা এরপর সিগারেটের ধোঁয়ার রিং শূন্যে ভাসাতে ভাসাতে বলেছিলেন, ভালো, ভালো। অথচ কথাগুলো শুনিয়েছিল অন্য রকম। 'খারাপ' শব্দটাকে দু-অক্ষরে উচ্চারণ করলে যেমন শোনাবে, তেমনটা।

কবিতা লেখা উনিশ-শো কতয় ছেড়েছে মনে পড়ে না যার, এই মধ্য পঞ্চাশে সেই উতথ্য কি ফের কাব্যরোগে আক্রান্ত হবে! যেখানে মিডিয়া মোতাবেক পাঁচজন — সত্যি সত্যি কতজন কেউ সঠিক জানে না — শ্রমিকের মৃত্যুগন্ধে বাতাস ভারী হয়ে আছে, সেখানে সিগারেট ফুঁকতে গিয়ে মিথ্যে প্রাকৃতিক দৃশ্যে বিমোহিত হয়ে পড়াটা কি বিকৃতির লক্ষণ নয়?

তা ছাড়া কোথায়, কোনদিকে যাবে? দেখার মতো কী এমন ছড়িয়ে আছে চারপাশে! যে ফ্যাক্টরির টারবাইন মাটি কাঁপিয়ে ঘোরে না, অব্যবহৃত থেকে থেকে যেখানে চিমনিতে জং পড়ে যায়, কাঁচামালের অভাবে কনভেয়ার বেল্ট বৃদ্ধার স্তনের মতো ঝুলে থাকে, সেখানে মধ্যরাতে কী দেখার থাকতে পারে? বিকৃত মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে থাকতে না পারাটা নিশ্চয়ই ভিতুর লক্ষণ নয়!

কুষ্ঠরোগীর মতো ছালবাকল, পাতা খসিয়ে একবগ্গা দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলো নিছক নামেই শেড-ট্রি। আর ওগুলোর প্রায় কোমর ছুঁয়ে ফেলা প্রায় জংলা ঝোপের চরিত্র নিয়ে-নেওয়া দুটি পাতা একটি কুঁড়িকে নিয়ে গান, কবিতাই শুধু লেখা যেতে পারে। এ ছাড়া ওগুলোর আজ আর অন্য কোনো উপযোগিতা নেই। বসন্তের বজ্র নির্ঘোষ শোনানোর মুরোদ তো সেই কবেই খুইয়েছে। যেহেতু উতথ্য ভাববাদী নয় তাই ওদিকে তার দ্রষ্টব্যও কিছু নেই।

তা হলে মধ্যরাতে যখন ঘরের ভেতর বাকি চারজনের গভীর নিঃশ্বাস ভিন্ন ভিন্ন তালে ওঠানামা করছে তখন উতথ্য এভাবে ভূতের মতো বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে আছে কেন? দিনের আলোয় যেখানে একটা কুকুর বেড়ালেরও দেখা পাওয়া যায়নি সেখানে এখন কাকে দেখতে এতটা উত্তেজিত হয়ে বেরিয়ে আসা!

দুই

দূর থেকে মনে হয়েছিল দাবানল বুঝি। কাছে গিয়ে উতথ্য দেখে, মস্ত জঙ্গল, যার প্রতিটি গাছ ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে। চেনা গেল না ফুলগুলো। প্রথমে মনে হয়েছিল কৃষ্ণচূড়া। কিন্তু কৃষ্ণচূড়া তো আরো লাল হয়, এই ফুলগুলো কালচে লাল, অনেকটা রক্তের রং।

ফুল থেকে চোখ সরিয়ে উতথ্য আরো অবাক হয়। প্রতিটা গাছের গোড়ায় একজন করে মানুষ বসে আছে। এত মানুষ কেন। এখানে কী কোনো জনসভা হওয়ার কথা? কোন দলের? কিন্তু এত মানুষকে যেহেতু খুঁটিয়ে দেখাটা অসম্ভব এবং কারো মুখই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না, সুতরাং জমায়েতের কাউকেই চিনতে পারে না উতথ্য। শুধু প্রত্যেকের সামনে ঝকঝকে থালা দেখে বুঝতে পারে এখানে কোনো পিকনিকের আয়োজন করা হয়েছে।

কী আশ্চর্য, এই কথাটা প্রথমেই কেন মনে পড়েনি! ফুলবাগানে কখনো জনসভা হয়? জনসভা মানেই তো ময়দানের মাইল মাইল শূন্যতা ভরানোর চ্যালেঞ্জ। সেখানে ফুলের ভূমিকা শুধু মাল্যদান আর কৃত্রিম পুষ্পবৃষ্টির জন্য। নন্দন কাননে মিটিং করার কথা ভাবাটা পাতি বুর্জোয়া বিলাস।

কথাগুলো মনে পড়ায় নিজের ওপর বিরক্তই হয় উতথ্য। হতে পারে কথাগুলো পুরোনো, তা বলে ভুলে যেতে হবে? কত দিন, রাত এই কথাগুলো শুনে রোমাঞ্চিত হয়েছে, সে-সব কী তবে মিথ্যে ছিল! দীনেশদা যদি শোনে তবে রেগে একেবারে ফায়ার হয়ে যাবে।

দীনেশদার কথা মনে হতেই দীনেশদা হাজির। উতথ্যকে দেখে একগাল হেসে বললেন, তুমি এসে গেছ! গুড। তোমার কথাই ভাবছিলাম। এমন একটা দিনে তোমরাই যদি না থাকো তবে তো ফিস্টের মজাটাই মাটি।

উতথ্য হাঁ করে তাকিয়ে থাকে দীনেশদার দিকে। ফটফটে পাজামা, পাঞ্জাবি, নিখুঁত দাড়ি গোঁফ কামানো, বেশ খানিকটা মুটিয়ে যাওয়া দীনেশদাকে একদম অন্যরকম দেখায়।

— যোগাযোগ রাখো না কেন? কী এমন তালেবর হয়েছ, অ্যাঁ! নাকি তোমার সেই বন্ধুর মতো নিজেকে সাচ্চা বিপ্লবী আর আমাদের প্রতিক্রিয়াশীল মনে করো।

যতই চেহারায় আভিজাত্য আসুক দীনেশদা এখনো একইরকম খিটখিটে আছেন দেখে খুশিই হয় উতথ্য, না, মানে আসলে সংসার...অফিস...অসুখ...এমন সব ফালতু ঝামেলা নিয়ে...

— ঠিক আছে, ঠিক আছে। ফিরিস্তির দরকার নেই। যোগাযোগ না রাখতেই পারো, তা বলে দায়িত্ব তো আর অস্বীকার করতে পারো না। যে যতই তোমার মাথাটি খাওয়ার চেষ্টা করুক, আমি জানি তুমি এখনো আমাদেরই ছেলে। তাই এভাবে সঙের মতো দাঁড়িয়ে না থেকে কিছু একটা ব্যবস্থা করো।

দীনেশদার আন্তরিকতায় প্রায় গলে যাবার উপক্রম হয় পঞ্চাশ বছরের ছেলে উতথ্য নন্দীর, বলে — সে কী আর আমি জানি না। আমি তো এখনো কিছু করার স্বপ্ন দেখি। কী করতে হবে বলুন।

— কী করবে সেটা বলে দিতে হবে! তোমরা কী এখনো সাবালক হবে না? দেখছ না এতগুলো মানুষ সেই কবে থেকে হাপিত্যেশ করে বসে আছে। কখন হবে খাওয়া-দাওয়া? এরপর বিরক্ত হয়ে যদি লোকগুলো সব উঠে যায় কে দায়িত্ব নেবে ওদের ফিরিয়ে আনার? এই বয়সে আমাদের আর সেই উৎসাহ আছে!

— ও, পরিবেশন করার লোক নেই বুঝি! ঠিক আছে করে দিচ্ছি।

এবার ভেংচি কেটে উঠলেন দীনেশদা, রান্না হল না আর ওদিকে উনি কোমরে গামছা বাঁধতে শুরু করেছেন! বলি, আগুন ছাড়া খিচুড়ি হবে কি করে শুনি, ম্যাজিকে? জ্বালানির ব্যবস্থা করতে হবে না?

দিশেহারা বোধ করে উতথ্য। কোথা থেকে জোগাড় হবে জ্বালানি! ফুলগাছের কাঠ দিয়ে কী খিচুড়ি রান্না করা যায়? বিপ্লবীরা খাবে সেই খিচুড়ি! তারপর সবাই যদি জনগণতান্ত্রিক

বিপ্লবের কথা ভুলে চাঁদ, তারা, ফুল, পাখি নিয়ে মাতামাতি শুরু করে দেয় তখন কী দীনেশদা ছেড়ে কথা কইবে? এখন আর ভালোর ঢঙে খারাপ বলার দিন নেই। লাশ পুরো হাপিশ করে দেবে।

পিঠে মৃদু চাপড় পড়ায় চমকে তাকায় উতথ্য। হাসি মুখে কমলকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে যত না খুশি হয় তার চেয়ে ভয় পায় বেশি। দীনেশদার চোখে পড়লে আর দেখতে হবে না। খানিক আগেই সার্টিফিকেট দিয়েছেন। এখনই যদি দুই স্যাঙাতকে একসঙ্গে দেখেন তা হলে শুধু সার্টিফিকেটটাই ছিঁড়ে ফেলবেন না, প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তের গন্ধ পেয়ে দু-জনকেই জীবন্ত জ্বালিয়ে দেবেন।

কমল কীভাবে যেন মনের কথাগুলো বুঝে যায়। আশ্বস্ত করে বলে, ভাবিস না। কিস্যু বলবে না দীনেশদা। রাজ্যে এখন ক্ষুধাই নেই, তাই পদ্য গদ্য সব সমান। তা ছাড়া আমি তো জ্বালানির ব্যবস্থা করতেই এসেছি।

তবু আশ্বস্ত হতে পারে না উতথ্য। বরং সন্দেহ হয়, সেদিন পাশে না দাঁড়ানোর বদলা নিতে আসেনি তো কমল!

— কী ব্যবস্থা করবি তুই জ্বালানির?

— তুই আমাকে অবিশ্বাস করছিস! জানিস না আমি প্রয়োজনে কী করতে পারি! রাতারাতি ভুলে গেলি সব? অভিমান মাখা গলায় বলে কমল।

অবিশ্বাসের কথা কেন উঠছে কিংবা কী ভুলে যাওয়ার কথা হচ্ছে, বুঝতে না পেরে কমলের দিকে তাকায় উতথ্য। দেখে, কপালে হাত চাপা দিয়ে রেখেছে কমল। আঙুল বেয়ে টপটপ রক্ত ঝরছে। উতথ্যর চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ দেখে উল্লাসে ফেটে পড়ে কমল। কপাল থেকে সরিয়ে নেয় হাত। উতথ্য দেখে কপালের মাঝখানে মস্ত একটা ক্ষত। আর ক্ষতটা এতই গভীর যে মাথার ভেতর থাকা অসংখ্য শিরা উপশিরা স্পষ্ট দেখতে পায় উতথ্য। দেখে শরীর এমন গুলিয়ে ওঠে যে চোখ না সরিয়ে পারে না।

কমল হিংস্র গলায় বলে — জ্বালানি নিয়ে না তোর এত মাথাব্যথা ছিল! এখন চোখ সরালে চলবে। তাকা আমার দিকে।

উপেক্ষা করতে না পেরে তাকাতে বাধ্য হয় উতথ্য। দেখে রক্ত নয়, কমলের কপালের ক্ষত থেকে ফিনকি দিয়ে বের হচ্ছে তরল আগুন। গাছের নীচে এতক্ষণ থালা নিয়ে অপেক্ষা করে থাকা মানুষগুলো কখন যেন উধাও হয়ে গেছে। সেই আগুনে শুধুই পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে নাম-না-জানা সেই সব ফুলগুলো। ফুল পুড়লে যে মাংস পোড়ার ঘ্রাণ বের হয় সেটা যেহেতু আগে জানা ছিল না উতথ্যর, তাই নাকে রুমাল চাপা দিতে ভুলে যায়। ধোঁয়া, গন্ধ আর পোড়া পাপড়ির টুকরো প্রবল হাওয়ায় উড়ে এসে এমন জাপটে ধরে যে এরপর ধড়মড়িয়ে উঠে না বসে উপায় থাকে না।

সারি সারি পাঁচটা মশারিতে ঘরটাকে দেখায় বারণাবতের মতো। তা হলে কী পুড়িয়ে মারার জন্যই এখানে আনা! আচমকাই খানিক মুক্ত বাতাসের জন্য বুকের ভেতরে হাঁসফাঁস বোধ করে উতথ্য। তাড়াতাড়ি মশারি ছেড়ে বেরিয়ে এগোয় দরজার দিকে।

তিন

— কী ব্যাপার, এত রাতে বাইরে! প্রকৃতির শোভা দেখছেন?

ঘাড়ের কাছে আচমকা কেউ কথা বলে ওঠায় চমকে তাকায় উতথ্য। নিরুপম রায়, থার্ড পোলিং অফিসার। সদ্য চাকরি পেয়ে দক্ষিণবঙ্গ থেকে এসেছে। কাল গাড়িতে সারাটা পথ পরিবেশে বুঁদ হয়েছিল। মাঝে মাঝেই ডুকরে উঠছিল, ওয়ান্ডারফুল, এক্সেলেন্ট ইত্যাদি ইত্যাদি। এ হেন আদেখলাপনায় বিরক্ত হওয়া সত্ত্বেও কিছু বলেনি উতথ্য। কিন্তু এখন মেজাজটা বেতরিবত থাকায় স্বরের রুক্ষতাটুকু গোপন করার চেষ্টা করে না।

— নাহ্। এই বয়সে পৌঁছে আর নতুন কী শোভা দেখব! দেখে দেখে চোখ পচে গেছে।

— তা হলে কী টেনশন হচ্ছে? আবার প্রশ্ন করে নিরুপম।

— কীসের টেনশন! কেন টেনশন হতে যাবে, অ্যাঁ?

স্বভাববিরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও রুখে ওঠে উতথ্য। কিন্তু এই রূঢ়তাকে বিন্দুমাত্র আমল না দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নিরুপম তবুও হেসে উত্তর দেয়, — কালকের ব্যাপারে। পোলিং কী কাল আদৌ হবে মনে করেন?

একটা ভোটও যদি কাল না পড়ে কী এসে যায় উতথ্যর! তবুও জিজ্ঞেস না করে পারে না— হবে না কেন!

— জানেন না, নকশালরা ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছে? তার ওপর এই বাগানটা নাকি পুরো নকশালদের কন্ট্রোলে।

আচমকাই কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে এমন নাটুকে পরিবেশ তৈরি করে ছোকরা যে উতথ্য মজা পায়। পালটা নাটুকে গলায় বলে — ভুল শুনেছেন, নকশালদের নয় বনশালদের কন্ট্রোলে।

বিভ্রান্ত স্বরে নিরুপম জানতে চায় — বনশাল আবার কোন পার্টি? লেফট না রাইট? আগে কখনো তো ওদের নাম শুনিনি!

হাসি চাপতে গিয়ে কেশে ফেলে উতথ্য। তারপর রহস্য ফাঁস করার ভঙ্গিতে জানায় — লেইট বা রেফট পার্টিও বলতে পারেন। বাংলায় বলে, মালিক পার্টি। শুধু এই বাগান নয়, ডুয়ার্স জুড়ে ওদের বেশ কয়েকটা বাগান আছে। চা শিল্পে ওরাই শেষ কথা। ছাঁটাই, লে-অফ, লক আউট, সব ওদের প্ল্যান মাফিক হয়। কারো সাধ্য নেই ওদের ঘাঁটানোর।

রসিকতাটা বুঝতে পারে না নিরুপম। কিংবা আমল দেয় না। জিজ্ঞাসু ছাত্রের ঢঙে জানতে চায়, — কিন্তু এখান থেকে নকশালবাড়ি তো খুব কাছে!

— তাতে কী? ওরা এখন কত খণ্ডে বিভক্ত সেটা ওরা নিজেরাও গুনে গেঁথে বলতে পারবে না। সবাই ব্যস্ত বিশ্ববিপ্লব নিয়ে। নকশালবাড়ি তো আর চিৎপুর নয় যে সব দলেরই ওখানে গদি খুলে বসে থাকতে হবে! বিশ্ববিপ্লবের দায়িত্ব বহন করা চাট্টিখানি কথা?

মিইয়ে আসা স্বরে নিরুপম জিজ্ঞেস করে — তা হলে এই যে চারদিকে বাগান বন্ধ করার কারসাজি, কয়েক পুরুষ ধরে চা বাগানে কাজ করে করে হাত সবুজ করে ফেলা মানুষগুলোকে না খাইয়ে মারার চক্রান্ত, তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ হবে না বলছেন!

ছোকরা মনে মনে অনেকদূর কল্পনা করে নিয়েছে বুঝে মজা পায় উতথ্য। ঠাট্টা মাখা গলায় বলে — আমাকে দেখে বাক্‌সিদ্ধ জ্যোতিষ মনে করেছিলেন নাকি! আমি বলার কে, যা বলার সময়ই বলবে।

— আমারও সেরকমই বিশ্বাস।

অবিশ্বাসীর স্বরে 'বিশ্বাস' শব্দটা উচ্চারণ করে নাকি নিরুপম! নাকি বাতিকগ্রস্ততার কারণে এমনটা মনে হচ্ছে, বুঝতে না পেরে ফের একটা সিগারেট ধরায় উতথ্য। খানিক ইতস্তত করে একটা সিগারেট চেয়ে বসে নিরুপম। তারপর জম্পেশ টান দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে — সত্যি বলতে কী, প্রথম প্রথম জায়গাটাকে ভালোই লেগেছিল। কিন্তু তারপর থেকে কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছে। দম আটকানো ভাব। অথচ প্রথম যখন ডিউটির চিঠিটা পেয়েছিলাম, নাম দেখে আমার সে কী আনন্দ। ভেবেছিলাম গুলমোহর গাছে ঘেরা কোনো নন্দনকানন বুঝি হবে। সত্যজিৎ রায়ের ছবির নায়কদের মতো গাছের নীচে বসে হাঁড়িয়া খেতে খেতে সাঁওতাল মেয়েদের নাচ দেখা যাবে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এটা কোনো চা-বাগান নয়, যেন মৃত্যু উপত্যকা। ভয়ঙ্কর অভিশাপে এখানকার বাতাস ভার হয়ে আছে সবসময়। এখানে যে আসবে সেও রেহাই পাবে না অভিশাপের হাত থেকে। যেন চক্রান্ত করে আমাদের এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। কথাগুলো শুনে হয়তো আপনি আমাকে ভিতু ভাববেন উতথ্যদা, তবু বলি, ঘুমোতে পারছিলাম না। শরীরটা এমন ছমছমিয়ে উঠল যে...

ছোকরা কী কবিতা লেখে, নাকি নাটক? নিরুপমের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করে উতথ্য। কিন্তু শাদা মরখুটে আলো-আঁধার, সিগারেটের ধোঁয়ার জাল এবং রহস্যময় কথাগুলো ওকে ঘিরে এমন পাক খেতে থাকে যে কিছুই বুঝতে পারে না। শুধু মাথার ভেতর দমকা বয়ে-যাওয়া বরফ ঠাণ্ডা বাতাসের আঘাত অনুভব করে।

সিগারেটটা দ্রুত টানে শেষ করে ঘরে ঢুকে যায় নিরুপম। মাথার ভেতর ঝড়ের অনুভূতি নিয়ে উতথ্য তারপরও দাঁড়িয়ে থাকে। তা ছাড়া উপায়ই বা কী! অন্যূন কুড়ি বছরের ছোটোকে তো পরবর্তী প্রজন্মই বলা হয়। এতক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে সাতপাঁচ উলটোপালটা ভাবনায় নাজেহাল থাকা সত্ত্বেও যখন সহজ সত্যটা চোখে পড়েনি, তখন ধরে নিতে হবে তার মগজ জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। আর পরবর্তী প্রজন্ম মানেই তো স্পষ্টতর চিন্তাভাবনা। সেই চিন্তা ভাবনার শরিক না হওয়াটা তো মৃত্যুরই নামান্তর।

অনিবার্য এবং হয়তো বা আসন্ন সেই মৃত্যুকে এড়াতে হলে ঘরে ঢুকে পড়া যায় না। যাচাই করে নিতেই হয় নিরুপমের বলে যাওয়া কথাগুলো। আর তাই বারান্দা থেকে নেমে পড়ে উতথ্য। অফিস কম্পাউন্ডের ভেতর বেহায়ার মতো ফুলের বোঝা সাজিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কৃষ্ণচূড়া গাছটায় হেলান দিতে যায়। পাথরের চাঁইয়ে মাথাটা বেমক্কা ঠুকে যাওয়া সত্ত্বেও ব্যথা পায় না উতথ্য। পলকা কাঠবোর্ডের গাছকে যে আসল ভেবে ভুল করে এই আঘাতটা তো তার ন্যায্য পাওনা।

এরপর উতথ্য এগোয় ফ্যাক্টরির দিকে, যথারীতি অদৃশ্য হয়ে যায় সেই চিত্রপট। সব থেকে মজার ঘটনাটা ঘটে চা বাগানের দিকটায় যাবার পর। পাতাগুলো ছুঁতে চাওয়া আঙুল

এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয় ক্যানভাসটাকে। চাঁদের আলোয় ক্যানভাসটাকে খুঁটিয়ে দেখেই উতথ্য বুঝতে পারে ওটা শুধু বহু ব্যবহারেই জীর্ণ নয়, চা গাছের ছবিগুলোও খুবই কাঁচা হাতের আঁকা।

কেন প্রকাশ্য আলোয় এই ফাঁকিবাজিটা ধরতে পারেনি? কেন নিরুপমের কথা শোনা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল? ধিক্কারে ব্যতিব্যস্ত উতথ্য এরপর ফিরতে গিয়ে যখন দেখে অফিস ঘরটাই নেই তখন আর অবাক হয় না। বুঝে ফেলে, যোগ্যতা খুইয়ে ফেলা এই বাগান বহুদিন আগেই নিজেকে মুছে নিয়েছে একভাগ স্থল থেকে। এখন এর অস্তিত্ব শুধুই সরকারি মানচিত্রে, খবরের কাগজের পাতায় আর অনন্ত ঈথারে। আর গণতন্ত্র যেহেতু কোনো অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে না, শূন্যের মোকাবিলা যেহেতু শূন্য দিয়েই করতে হয় তাই এখানে পোলিং বুথ খোলা হয়েছে। সাজিয়ে রাখা হয়েছে চা বাগানের ছবিওয়ালা কিছু পটচিত্র। যে-গন্ধে দমবন্ধ হয়ে আসছিল উতথ্যর তার উৎস ধুলোমলিন এইসব ক্যানভাস আর ওগুলোর গায়ে চাপানো সস্তা রং।

চার

প্রাণায়ামের উপকারিতা বোঝাচ্ছিলেন প্রিসাইডিং অফিসার বিমল বিশ্বাস। রোজ নিয়ম করে টিভিতে 'আস্থা' চ্যানেল দেখে শিখেছেন। এই যোগাভ্যাসে শুধু যে যাবতীয় ব্যাধি বিয়োগই হয় না, যৌবনশক্তিও অটুট থাকে, বোঝাচ্ছিলেন সে-কথা।

— বললে বিশ্বাস করবেন না মোশায়। আমিই কী ছাই প্রথমটায় বিশ্বাস করেছিলাম! ভেবেছিলাম হয়তো প্রস্টেটের অসুখটা ফের মাথা চাড়া দিয়েছে। আসলে এই বয়সে, ভোরবেলায় অহেতুক ওরকম ইরেকশন, ভাবা যায়!

নিরুপম শুধু নয়, ছোকরা পুলিশ দুটোকেও হাঁ করে বিমল বিশ্বাসের কথা গিলতে দেখে অস্বস্তি হয়েছিল উতথ্যর। চোখের ইশারায় সতর্ক করতে চেয়েছিল। লাভ হয়নি। সমবেত শ্রোতৃবর্গের আগ্রহী মুখের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে শুরু করেছিলেন — ওরকম অবস্থায় তো আর চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা যায় না। তাই আপনাদের বউদির দিকে পেছন ফিরে ভাবতে শুরু করলাম কেসটা কী! খানিক ভাবতেই মনে পড়লো স্বপ্নটার কথা। হায় হরি, ওরকম একটা ফাটাফাটি স্বপ্নের কথা বিলকুল ভুলে গেলাম কী করে!

এরপর কী স্বপ্নের বিশদ বর্ণনা শুরু করবেন বিমল বিশ্বাস? আর ইশারার ওপর ভরসা রাখতে পারেনি উতথ্য। ধমকে উঠেছিল — কী হচ্ছে বিশ্বাসবাবু! বাচ্চা বাচ্চা ছেলেপুলের সামনে এসব কী শুরু করলেন!

দমানো যায়নি বিমল বিশ্বাসকে। বিশল্যকরণীর সন্ধান দিতে উপড়ে দিয়েছেন মূল্যবোধের গন্ধমাদন, —কীসের বাচ্চা ছেলে মোশায়! বাচ্চা ছেলে কী চাকরি করতে আসে নাকি? শাস্ত্রেই তো আছে, প্রাপ্তে তু ষোড়শ বর্ষে পুত্র মিত্র বদাচরেৎ। এদের ষোলো বছর তো অন্তত হয়েছে, নাকি! আর আপনি যে কাল রাতে নেশা করে মাঠে পড়েছিলেন, ফোর্স পাঠিয়ে চ্যাংদোলা করে তুলে আনতে হল তখন লজ্জা ছিল কোথায়?

— আমি তো নেশা করিনি!

উতথ্যর প্রতিবাদকে বিন্দুমাত্র আমল না দিয়ে শেয়ালের মতো হেসে বিমল বিশ্বাস বলেছেন — নেশা করেননি তো ওরকম আলফাল বকছিলেন কেন, অ্যাঁ! আমাকেও কি ছেলেমানুষ ঠাউরে নিলেন নাকি?

এরপর আর বসে থাকার যেহেতু অর্থ হয় না তাই চেয়ারটা নিয়ে বারান্দায় এসে বসেছে উতথ্য। বিমল বিশ্বাস আবার পূর্ণ উদ্যমে শুরু করে দিয়েছে — তারপর বুঝলেন কী না কেমন যেন লোভ হল। মুখ ফেরালাম আপনাদের বউদির দিকে। ভাবলাম, হাতে কলমে পরীক্ষাটা সেরে নিলে কেমন হয়! ধারণা ভুল হলে হবে। এ তো ঘরেরই বউ। ফেলও যদি মারি তা হলেও তো আর নাক কাটা যাবে না। কী বলব...

বারান্দা থেকেই উতথ্য টের পায় বিমল বিশ্বাসের ঝোল টানা। এবার আর বিরক্তি জাগে না। বরং বিস্ময় লাগে। হঠাৎ হল কী লোকটার! ট্রেনিং-এর তিনটে দিন কিংবা এখানে আসার পরও তো এরকম গোলা কথাবার্তা বলেননি। বরং মার্জিত রুচির নিপাট ভদ্রলোকই মনে হয়েছিল। টেনশন ভুলতেই কী ফালতু গল্পের ঝাঁপি খুলে বসেছেন? এ ছাড়া দুশ্চিন্তা এড়ানোর অন্য কোনো উপায় খুঁজে পাননি, বেচারি। প্রিসাইডিং অফিসারের দায়দায়িত্ব তো কম নয়।

অথচ এই টেনশনের কোনো অর্থই হয় না। সেই সকালে বাসর সাজানো পর্বেই উতথ্য বলেছিল — কেউ আসবে না।

খানিক বেলা গড়ানোর পর হেলতে দুলতে এসেছিল মোটে একজন প্রার্থীর পোলিং এজেন্ট। সেই তিনিও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে উধাও হয়ে গিয়েছেন। কথা দিয়ে গেছেন সবাইকে নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন। সবাই মানে কারা, খুলে বলে যাননি। উতথ্য তখনো বলেছিল — জিনিসপত্র গুছিয়ে নিন বিমলবাবু, কেউ আসবে না।

রেগে উঠেছিলেন বিমল বিশ্বাস — কু-ডাক থামান মোশায়। জিনিসপত্র সাত তাড়াতাড়ি গুছিয়ে কী করবেন, নেশা করতে বেরোবেন? তা যান না। কে ঠেকাচ্ছে আপনাকে? এখানে আসার পর থেকে তো আমার ঘাড়ে দায় চাপিয়ে নেশা করে বেড়াচ্ছেন। যত্তসব নেশাখোর এসে জুটেছে আমারই কপালে! তবে এটাও জেনে রাখুন এমন তেমন হলে কিন্তু রেহাই পাবেন না। এমন রিপোর্ট করব যে চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে, বলে দিলাম।

এরপর আর কথা বাড়ায়নি উতথ্য। বাড়িয়ে লাভ হত না। বুঝতেন না বিমল বিশ্বাস। যে-বাগানের অস্তিত্ব নেই সেখানে পোলিং বুথ খোলা, কয়েকজনকে ডিউটি দিয়ে পাঠানো, সমস্ত ব্যাপারটাই যে প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়, ধারণাই করতে পারবেন না সেটা। ততদূর বোধবুদ্ধিই নেই। অহেতুক চটাচটি করতেন। না হলে অন্তত এটুকু ভাবতেন, গতকাল চ্যালেঞ্জ জানানো সেক্টর অফিসার আজ ভোট হচ্ছে না শুনেও এতক্ষণ ছুটে আসেনি কেন? কেন ক্ষমতাসীন দলের পোলিং এজেন্ট, লোক ডেকে আনার ছুতো দিয়ে উধাও হয়ে যায়?

এখন প্রায় বিকেল চারটে। খুব স্বাভাবিক কারণেই কেউ আসেনি। নিরুপম দু-একবার খুঁচিয়ে গেছে — কী দাদা, হারলেন তো বাজি! নিন এখন বের করুন পাঁচশো টাকা।

কখন ধরা হয়েছিল পাঁচশো টাকা বাজি, মনে পড়েনি উতথ্যর। এমনকী মনে পড়ার জন্য নিরুপমের কাছে কোনো সূত্রও ধার করেনি। লজ্জিত গলায় বলেছে, থ্যাঙ্কস। সত্যিই আমি

ব্যাপারটা ধরতে পারিনি। বুড়ো হয়ে গেছি তো।

নিরুপম তর্ক জুড়েছে — শুধু বুড়ো নয়, বুড়ো ভাম। মানুষকে আপনারা চিরকাল গোরু গাধা মনে করেছেন। আপনাদের রাজনীতি যে ওদের মৃত্যুমুখে এনে দাঁড় করিয়েছে, সেটা ওরা বোঝে না মনে করেন? ওরা না খেয়ে মরবে তবু আর মিথ্যে প্রতিশ্রুতিতে ভুলবে না। এবং শেষ কথা ওরাই বলবে, আমি, আপনি নয়।

'আপনাদের', এই সম্বোধন মারফত নিরুপম কাদের সঙ্গে যুক্ত করতে চাইছে? ত্রিশ বছর ধরে নিজেকে সাফসুতরো রেখে চলা উতথ্য নন্দীকে কাদের পাপের ভাগীদার বানানো হচ্ছে? খবরের কাগজে বেনামে চিঠি লিখে কিংবা ঘনিষ্ঠ মহলে গরম বুকনি ঝেড়ে যারা নিজেদের বিপ্লবী মনে করে, তাদের এক উত্তরসূরির কাছে আজ অপমানিত হতে হবে! কোনো প্রাণায়াম ছাড়াই এসব মেকিদের শায়েস্তা করার বিদ্যেটা এখনো যে ভোলেনি উতথ্য, দেবে নাকি তার প্রমাণ!

অথচ, কী আশ্চর্য, উতথ্য নিজেকে ততদূর উত্তেজিত করতে পারেনি! বরং বহুদিন পর কথাগুলো শুনে থরথরিয়ে কেঁপেছে। আপশোস জেগেছে সেদিন কমলের কথাগুলো অবিশ্বাস করার জন্য।

পরিস্থিতি বেগতিক দেখে তাড়াতাড়ি বিমল বিশ্বাস যৌনতার ঝাঁপি মেলে ধরেছেন। আর বারান্দায় বসে উতথ্য ভেবে চলেছে কমলের কথা। কোন এক চা বাগানে না কমলের ছিন্নভিন্ন লাশটা পাওয়া গিয়েছিল! কী নাম ছিল বাগানটার, গুলমোহর? লাশটা কী সত্যি কমলের ছিল! কে শনাক্ত করেছিল, পুলিশ? নাকি দীনেশদার দলের কেউ! কমলের খোঁজটা যেন খুনিদের কে দিয়েছিল?

— ও দাদা, এই যো, পড়ে পড়ে ঘুমোলে চলবে, ডিউটি দিতে হবে না! উঠুন, উঠুন।

কর্কশ হুমকিতে চোখ খুলে সকালে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া পোলিং এজেন্টকে দেখতে পায় উতথ্য। মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। পালটা ধমক দিয়ে বলে — আমাদের ডিউটি না শিখিয়ে নিজের ডিউটিটা আগে করুন।

হুমকিটাকে বিন্দুমাত্র পরোয়া না করে এজেন্ট উত্তর দেয়— ডিউটি করছিলাম না তো এতক্ষণ ছিঁড়ছিলাম! এই লোকগুলো কী তবে আকাশ থেকে পড়ল?

মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের দঙ্গলটাকে এতক্ষণে চোখে পড়ে উতথ্যর এবং হেসে ফেলে। নাটকটা জমানো হয়েছে বেশ। মিথ্যে মিথ্যে লোক অব্দি জোগাড় করা হয়েছে। লোকগুলো যে সত্যিকারের নয়, হতে পারে না সেটা উতথ্যর থেকে ভালো কে জানে? কোথায় ছিল এরা! এখানে আসার পর থেকে কেন এদের একজনকেও দেখা যায়নি? শেষ বিকেলে এতগুলো মানুষ এসে দাঁড়াল অথচ বারান্দায় বসে থেকে কিচ্ছুটি টের পেল না উতথ্য! এমন তো নয় যে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তা ছাড়া দাঁড়িয়ে থাকার ঢঙটাও তো অদ্ভুত, সম্ভব হলে যেন একে অন্যের শরীরের ভেতরে ঢুকে যাবে। মানুষ কখনো এভাবে দাঁড়ায় নাকি? এভাবে তো কসাইখানার সামনে ভেড়ার পাল দাঁড়ায়!

— কী হল, দাঁত ক্যালাবেন নাকি ভোট নেবেন? ডাকুন প্রিসাইডিংকে।

একলাফে বারান্দায় উঠে পোলিং এজেন্ট দলা পাকিয়ে থাকা লোকগুলোকে ডাক দেয়, ওপরে উঠে আয়।

এবার রুখে ওঠে উতথ্য — এখানে আসার পর থেকে অনেক মজা সহ্য করেছি। আর নয়। ঠাট্টারও একটা সীমা থাকা উচিত । আমি জানি এরা ভোটার নয়। এখানে কোনো ভোটার নেই। থাকতে পারে না।

হকচকিয়ে যায় এজেন্ট — কে বলল ভোটার নয়। অন্য দলের কেউ তো আর চ্যালেঞ্জ করেনি, তা হলে আপনার আপত্তি কীসের?

লোকটা যে এভাবে ধরা পড়ে যাবে সেটা ভাবেনি। ওর হকচকানিতে স্পষ্ট বুঝতে পারে উতথ্য। বুঝে দ্বিগুণ উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়ে — আমি চ্যালেঞ্জ করছি, প্রমাণ দিন।

— কী আপদ, ওদের কংকালের মতো চেহারা দেখেও কী বোঝা যাচ্ছে না জেনুইন কি না?

গলগল করে হাসতে হাসতে উতথ্য জবাব দেয়, হ্যাঁ — সেটাই তো প্রমাণ যে ওরা ভোটার নয়। হতে পারে না। তাই এদের নিয়ে কোনো রসিকতা করতে দেবো না।

পাঁচ

— কী দরকার ছিল মোশায় গাল বাড়িয়ে গোরুচোরের মার খাওয়ার! আমি তো ছিলাম, না কি? আমারই তো ঠিক করার কথা কে ভোট দিতে পারবে, কে পারবে না। আপনি হঠাৎ মাতব্বরি মারতে গেলেন কেন? আপনি চাকরি করেন, বাড়িতে বউ বাচ্চা আছে, এই বয়সে হঠকারিতা মানায়?

এক নাগাড়ে ধমক দিয়ে বোধহয় মায়া হয় বিমল বিশ্বাসের, — ঈস, কী অবস্থা হয়েছে আপনার চোখমুখের! বাড়িতে গিয়ে কী বলবেন? আমরা ঝাঁপিয়ে না পড়লে তো আপনার জামাকাপড়ের ছেঁড়া টুকরো দেখে বডি শনাক্ত করতে হতো। এ-যাত্রায় বেঁচে গেলেন। যাক, ভাববেন না, আমি সব ঠিকঠাক ম্যানেজ করে দিয়েছি। সেক্টর অফিসার কোনো রিপোর্ট দেবেন না কথা দিয়েছেন।

বিমল বিশ্বাসের কথায় অবাক হয়ে যায় উতথ্য। আচ্ছা, মানুষ এত বোকা হতে পারে! লোকটার কী হাওয়ায় বয়স হয়েছে? কেন ম্যানেজ করতে হল কাউকে? কোথায়, কী রিপোর্ট হতো! গট আপের ম্যাচের রিপোর্ট নিয়ে কী কর্তৃপক্ষের কোনো মাথাব্যথা থাকে? বুড়ো ভামটা এমনভাবে ভোটিং মেশিন দুটো বগলে চেপে বসে আছে ঠিক যেন একটা রকপাখি, ডিমে তা দিতে ব্যস্ত। ডিমের ভেতর যে প্রাণের চিহ্নই নেই বুঝতেই পারছে না।

কিন্তু উতথ্যর তো একটা দায়িত্ব থাকেই সব কিছু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেওয়ার। আর কতকাল দায়িত্ব এড়িয়ে থাকবে? সূত্র ধরিয়ে দিলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে। আর তাই বিমল বিশ্বাসের হাতটা টেনে বলে — বোকার মতো কথা বলছেন কেন? সবটাই পরিকল্পিত। সামনের কাচ দিয়ে ভালো করে দেখুন দৃশ্যগুলো, তারপর পেছনে তাকিয়ে দেখুন। দেখতে পাচ্ছেন কিছু? পাবেন না। কেননা সিনগুলো খুলে নেওয়া হচ্ছে। আমরা আসার আগে গুলমোহর বাগানের কোনো অস্তিত্ব ছিল না, আমরা চলে যাবার পরও থাকবে না।

জবরদস্তি হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বিমল বিশ্বাস ভয়ার্ত চোখে তাকান নিরুপমের দিকে। নিরুপম এগিয়ে এসে উতথ্যর মাথাটা কাঁধে রাখতে রাখতে বলে — একটু রেস্ট নাও। কিচ্ছু হয়নি। ইট ওয়াজ অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট ওনলি। ভুলে যাও সব।

বহুদিন পর মাথা রাখার মতো একটা কাঁধ পেয়ে তৃপ্তির গলায় উতথ্য বলে — তুই আমাকে ভুলতে বলিস না আর। এতদিন তো ভোলার চেষ্টাই করে এসেছি। ভেবেছি, মানুষ কোনোদিন শেষ কথা বলতে পারবে না। তাই আসার সময় খেয়াল করিনি ড্রাইভারের পাশে বসে থাকা হেল্পারটা নেমে গিয়ে সিনগুলো টাঙিয়ে এসেছিল। কিন্তু আর কোনো ভুল নয়। এবার আমি খেয়াল করেছি হেল্পারটার নেমে যাওয়া। এখন আমার আর কোনো অসুবিধে হচ্ছে না।

দুনিয়ার মজদুর...

দীপঙ্কর দাস

আজও ভোর সকালে লাঠি হাতে গঙ্গাস্নানে বেরুল বুড়ো শিবলাল। আগেও কলোনির বাসিন্দারা দেখত, শীত গ্রীষ্ম বারো মাস ঠিক সকাল পাঁচটায় শিবলাল বেরিয়ে যাচ্ছে। এমনই সময়নিষ্ঠ ছিল শিবলালের গঙ্গাস্নানের যাত্রা যে, তাকে দেখে কলোনির পুরুষরা ইচ্ছে করলে ঘড়ি মিলিয়ে নিতে পারত। এখন সেই কলোনি একরকম শ্মশান। কলোনিবাসীদের অধিকাংশই কে যে কোথায় গেছে, ঠিক নেই। যে দু-চার ঘর কলোনিবাসী আছে এখনো, তাদের আর শিবলালের দিকে তাকানোর মতো মন নেই। তাদের চোখে শিবলাল আর আগের মতো শ্রদ্ধার আসনে বসে নেই। অনেকদিন হল পথের ধুলোয় নেমে এসেছে। শিবলাল বেঁচে আছে কি মরে গেছে — সেইটুকু বিষয় নিয়ে কৌতূহল দেখানোর স্পৃহা নেই। তাদের পেটে চাক্কু বসিয়েছে তো ওই শিবলাল আর তার পার্টি। ফলে শিবলালের বেঁচে থাকা কিংবা মরে যাওয়া — কোনোটাই গুরুত্ব পায় না তাদের কাছে।

সবে মাঘ ফুরিয়ে ফাল্গুন এসেছে। বাতাসের দিকবদল ঘটেছে। তবে সকাল সন্ধ্যায় হিম ভাবটা রয়ে গেছে এখনো। ফলে ভোর সকালে গঙ্গার জলে নামতে এখনো শরীরটা শিরশির করে।

এই নিত্যদিনের গঙ্গাস্নানের পেছনে শিবলালের মনে কোনোরকম ধর্মীয় টান ছিল না। আজও নেই। এটা নিতান্তই একটা অভ্যাস। অভ্যাসটা যে ঠিক কবে থেকে শিবলালের জীবন-যাপনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যোগ হয়ে গেছিল, মনেও পড়ে না শৈশবেই মাতৃহারা শিবলালের। মুল্লুক ছেড়ে বাবা মাখনলালের হাত ধরে যেদিন গঙ্গার পশ্চিম পারের এই মফস্বল শহরটায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল কিশোর শিবলাল, সেদিন থেকেই যেন গঙ্গার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেছিল তার। বাবা মাখনলালের অবশ্য দেব দ্বিজে ভক্তি ছিল অটল। তুলসীদাস মহারাজজির রামচরিতমানসের কত যে শ্লোক মুখস্থ ছিল মাখনলালের হিসেব নেই। গঙ্গা মাই-এর কৃপা লাভের জন্যই রোজ সকালে গঙ্গায় স্নানে যেত মাখনলাল। সঙ্গে কিশোর শিবলাল।

কেবল গঙ্গা-মাই কেন, কোনো ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতিও ন্যূনতম আনুগত্য ছিল না শিবলালের মনে। আজও নেই। তবু প্রতিদিন আলো-আঁধারিতে ছাওয়া নবজাত সকালে শিবলাল যখন বাবা মাখনলালের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে রওনা দিত, তখন এক ধরনের আবেশ গ্রাস করে নিত শিবলালকে। আগে আগে মেঠো পথ ভেঙে এগিয়ে যাচ্ছে মাখনলাল। মুখে উচ্চারিত হচ্ছে তুলসীদাসের শ্লোক। সূর্য সবে দিকচক্র পেরিয়ে উঁকি দিয়েছে। গঙ্গার জলে ছড়িয়ে পড়ছে লাল আবির। চারপাশে ছড়ানো-ছিটানো গাছগাছালির ঘন শাখার ফাঁকে ঘর বাঁধা পাখপাখালির দল কলরব করে একটা নতুন দিনের ভূমিষ্ঠ হওয়ার শুভ মুহূর্তকে অভ্যর্থনা

জানাচ্ছে — এই এক পরিবেশে গঙ্গার ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে একবুক জলে নেমে অবগাহন স্নান সারতে বালক শিবলালের যে কি ভালো লাগত, তার খবর শিবলাল ছাড়া আর কে রাখছে!

দেশ থেকে এই শহরে এসে মাখনলালের প্রথম কাজ জুটেছিল 'দত্ত ফোর্জিং অ্যান্ড ফাউন্ড্রি' মিল-এ। দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে ঢালাই-এর কাজ করত মাখনলাল। তারপর একদিন ভাগ্য খুলে গেল। গঙ্গার পারে বিশাল এলাকা নিয়ে দাম্ভিক পুরুষের মতো দাঁড়িয়ে থাকা 'এডওয়ার্ড জুট মিল'-এ কাজ জুটে গেল মাখনলালের। ক্যাজুয়াল লেবার নয়। রীতিমতো রেগুলার লেবার, পে-স্কেল আছে। মাগ্‌গিভাতা আছে। ইনক্রিমেন্ট আছে। বোনাস তো আছেই। সেই সঙ্গে জুটে গেল লেবার কলোনিতে কোয়ার্টার। ছেলের হাত ধরে কোয়ার্টারে উঠে এল মাখনলাল। গঙ্গা আরো নিকটতর হল।

তখন এডওয়ার্ড জুট মিলের সম্প্রসারণের সময়। ফলে রোজ নতুন নতুন কর্মী নিযুক্ত হচ্ছে। মিলের চৌহদ্দি বেড়েই চলেছে। গঙ্গার পার ধরে উত্তরমুখো হেঁটে গেলে হাইওয়ের পাশে মিলের ওপরতলার কর্মীদের কোয়ার্টার্স। নাম অফিসার্স কলোনি। টেনিস কোর্ট, ব্যাডমিনটন কোর্ট, অডিটোরিয়াম — কী নেই সেখানে! শীতকালের সন্ধ্যা রাতে ওই কোর্টগুলিতে আলো জ্বলে উঠত। সাহেব অফিসার থেকে শুরু করে মেমসাহেব, মেমবেটিরা টেনিস খেলত। ব্যাডমিনটন খেলত। খেলতে খেলতে বলের পেছনে ধাওয়া করার সময় গঙ্গার বুক থেকে ছুটে আসা বাতাসের ঝাপটায় স্বল্প দৈর্ঘ্যের স্কার্ট-এর প্রান্তদেশ ফুলে উঠত। মেমসাহেব, মেমবেটিদের সুগঠিত উরুর দৃশ্য ম্লান করে দিত কোর্টের আলোগুলিকে।

মিলের যত সম্প্রসারণ ঘটছিল, লেবার কলোনির ওপর চাপ ততই বেড়ে চলেছিল। দু-সারি কোয়ার্টার্স-এর মাঝখানে তিরিশ ফুটের রাস্তা। এইভাবে কয়েকসারি কোয়ার্টার্স নিয়ে তৈরি লেবার কলোনি। লোক বাড়ছে। কোয়ার্টার্সের সংখ্যাও বাড়ছে। তবে সেই সঙ্গে বাড়েনি জল সরবরাহ। ফলে ভোর সকাল থেকেই লেবার কলোনির রাস্তার কলগুলো ঘিরে সকালের শিফ্‌ট-এর লেবারদের কাজিয়া লেগে থাকত। সেই কাজিয়ার হাত থেকে মাখনলাল আর শিবলালকে তো মুক্তি দিয়েছিল গঙ্গা-মাই।

শিবলাল যে-বছর স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিল, সেই বছর মাখনলাল কারখানার ভেতর কর্মরত অবস্থায় প্রাণ দিল। রোলিং মিলে যখন সে ব্যস্ত ছিল গ্যান্ট্রির শেকলে গার্ডার বাঁধার কাজে, ঠিক তখনই মাথার ওপর ভেঙে পড়েছিল রোলার। হাসপাতাল পর্যন্ত নিয়ে যেতে হয়নি মাখনলালকে। কারখানার ভেতরেই প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছিল তার।

সেই দিনটার কথা স্পষ্ট মনে আছে শিবলালের। পিতাজির থ্যাঁতলানো মাথা শিবলালের চোখের আড়াল করতে মাখনলালের শবদেহ আপাদমস্তক শাদা চাদরে ঢেকে রেখেছিল সহকর্মীরা। চারপাই-এর ওপর রাখা ছিল চাদরে ঢাকা মাখনলালের শবদেহ। কিছু ফুল, মালা জমেছিল শবদেহের ওপর। চারপাই-এর চারপায়ার সঙ্গে বাঁধা ছিল কয়েক গুচ্ছ জ্বলন্ত ধূপকাঠি। ধূপের ধোঁয়ায় তরুণ শিবলালের চোখ জ্বালা করছিল। শবযাত্রা শুরুর ঠিক আগে শিবলাল

বেশ কঠিন গলায় বলেছিল — পিতাজির মুখের ওপর থেকে সফেদ চাদরটা হটাও একবার। এখন আড়াল করে রাখলেও মুখাগ্নির সময় কী করবে তোমরা! পিতাজির ভয়ংকর মুখটাকে তো দেখতেই হবে আমাকে!

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ধনঞ্জয়দা এগিয়ে এসে শিবলালের কাঁধে হাত রেখে মৃদু চাপ দিয়েছিল। তারপর সঙ্গীদের উদ্দেশ করে বলেছিল — তোমরা শিবলালকে এতখানি কমজোরি ভাবলে কেমন করে। মুখের ওপর থেকে চাদর সরিয়ে দাও। শেষযাত্রায় মাখনলালের মুখে একটু রোদ পড়ুক।

গঙ্গার ধারে বাঁশতলার শ্মশানে পিতাজির সৎকার সেরে ঘরে ফিরে আসতে সেদিন মধ্যরাত পেরিয়ে গেছিল।

তিন সারি রেল লাইন। একসময় স্টেশন থেকে কাঁচামাল ভরতি মালগাড়ির ওয়াগনগুলিকে এই লাইন ধরে ইঞ্জিনে টেনে নিয়ে আসত কারখানার ভেতর। কাঁচামাল খালাস করে তৈরি মালে ওয়াগন ভরতি করে ফিরে যেত স্টেশনে। সেখান থেকে চলে যেত দেশের বিভিন্ন রাজ্যে। সারাদিন এই লাইন দিয়ে মালগাড়ির ওয়াগনের আসা-যাওয়ার কারণে একটা চাপা গুমগুম ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ত চারদিকে। বিশেষ করে লেবার কলোনির অভ্যন্তরে। কান পেতে শব্দটা শুনলে পর শিবলালের মনে হত মালগাড়ির শব্দ নয়, কেউ যেন এডওয়ার্ড জুটমিলের অহংকারী অস্তিত্বের কথা ঢাক বাজিয়ে ঘোষণা করছে।

এখন সেই লাইনগুলির গায়ে মরচে পড়েছে। কাঠের স্লিপার সব কেটে নিয়ে গেছে কাঠের চোরাকারবারিরা। স্লিপারের কাঠের নাকি বাজারদর ভালো। ফিশপ্লেট থেকে শুরু করে নাটবল্টু সব একটা একটা করে উধাও হয়ে গেছে। শিবলালের বুকের ভেতরটা ভোর সকালের বাতাসে একটু মোচড় দিয়ে উঠল। আজকে না হয় চোর ছ্যাঁচোরেরা লাইনের ফিসপ্লেট, নাটবল্টু খুলে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আর ক-দিন পরে যে কেবল রেললাইনই নয়, গোটা কারখানার ভেতর যত মেশিনপত্তর, টিনের শেড, লোহার শিটের চিমনি, ফার্নেস, বয়লার — যা যা আছে, সব স্ক্র্যাপ হিসাবে বিক্রি হয়ে যাবে। কারখানার বিশাল চত্বরের ভেতর গজিয়ে ওঠা ঝোপজঙ্গল, গাছপালা সাফ হয়ে যাবে। আর কিছুদিনের মধ্যেই মাথা তুলে দাঁড়াবে আকাশছোঁয়া ফ্ল্যাটবাড়ির এক একটি ব্লক। এরকম আঠারোটা ব্লক হবে নাকি এখানে। তখন কোথায় থাকবে এডওয়ার্ড জুট মিলের সামান্য স্মৃতি চিহ্নটুকু!

মাখনলালের ইন্তেকাল হয়ে যাওয়ার পরে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি শিবলালকে। মিলের খোদ ডেপুটি ম্যানেজার দেশমুখ সাহেব শিবলালকে ডেকে মাখনলালের মতোই পাকা চাকরি দিলেন মিলে। শিবলাল মাখনলালের মতো অক্ষরজ্ঞান নয়, স্কুল ফাইনাল পাশ। ফলে লেবারের ঠিক ওপর ধাপ — চার্জম্যানের চাকরি পেল শিবলাল। তখন শিবলাল ইচ্ছে করলেই লেবার কলোনির কোয়ার্টার্স ছেড়ে ভিন্ন কলোনিতে কোয়ার্টার নিয়ে চলে যেতে পারত। কিন্তু যায়নি শিবলাল। মাখনলালের অস্তিত্বের উত্তাপ জড়ানো একঘরের লেবার কলোনির কোয়ার্টারেই রয়ে গেল। এইভাবেই হয়তো শিবলাল পিতাজিকে ছুঁয়ে থাকতে চেয়েছে। যেমন গঙ্গা স্নানটাও।

এখনো সূর্য ওঠেনি। তবে উঠি উঠি করছে। গঙ্গার ওপারে পুব আকাশের দিকচক্র টকটকে লাল। লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে আকাশে। গঙ্গার জলে।

কাঠগুদামের মোড়টুকু পেরিয়ে এডওয়ার্ড জুট মিলের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এর সামনে দিয়ে যেতে যেতে শিবলালের মনে পড়ল এই বিল্ডিং-এর সামনের ওই লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা টানা জমিটায় একদিন দেখার মতো ফুলের বাগান ছিল। প্রতিটি মরশুমে ওই বাগান আলো করে ফুটে থাকত মরশুমি ফুল। শীতের শেষে ওই বাগানের সামনে খোলা মাঠে মরশুমি ফুলের প্রদর্শনী হত। এডওয়ার্ড জুটমিলের কর্তা ব্যক্তিদের ঘরের মেমসাহেব, মেমবেটিরা যেসব ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা ফোটাত কোয়ার্টার্সের বাগানে, তারা টবসুদ্ধ ফুলগাছ নিয়ে আসত প্রদর্শনীতে। মাইকে গান বাজত। মিউজিক্যাল চেয়ার হত, সন্ধ্যায় বসত গানের আসর।

এখন বাগান নেই। ঝোপজঙ্গলে ছেয়ে গেছে। লোহার রেলিংও জায়গায় জায়গায় উধাও হয়ে গেছে। কেবল দাঁড়িয়ে আছে একটা কাঠ-মালতী গাছ। মনে আছে, শিবলালের মিলে চাকরি পাওয়ার বছরে, দেশমুখ সাহেব পুষ্প-প্রদর্শনীর দিন শিবলালকে দিয়ে এই গাছটার চারাটিকে লাগিয়েছিলেন।

কলোনির কোয়ার্টার্স থেকে গঙ্গা স্নানে যাওয়ার রাস্তা তো এটাই। রোজই এই রাস্তা দিয়ে শিবলাল গঙ্গা স্নানে যায়। স্নান সেরে ফেরেও। কোনোদিন কাঠমালতীর গাছটার দিকে ফিরেও তাকায় না শিবলাল। আজ কেন জানি গাছটার নীচে দাঁড়াল একটু।

প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর আগের কথা। উনষাটের খাদ্য আন্দোলন সবে শেষ হয়েছে। কলকাতার ময়দানে পুলিশের লাঠি আর গুলিতে প্রাণ দিয়েছে বেশ কিছু আন্দোলনকারী। তার ঢেউও আছড়ে পড়েছে এই শিল্পকেন্দ্রিক মফস্বল শহরটায়। স্টেশনে আগুন দিয়েছে বিক্ষুব্ধ জনতা। শিবলাল তখন তো সবে সদস্য হয়েছে জুটমিলের শ্রমিক ইউনিয়নের। তাকে নিয়ে এসেছে ধনঞ্জয়দাদা। ধনঞ্জয়দাদা যেন তখন সম্মোহন করে রেখেছে শিবলালকে। শিবলালও অন্তরাত্মা দিয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্বের ওপর। বিশ্বাস করেছে একদিন শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে এই দেশও সমাজতান্ত্রিক হয়ে উঠবে। ধনঞ্জয়দাদা তখন শিবলালের মুখে একটাই মন্ত্র দিয়ে গেছে। সেই মন্ত্র উচ্চারণ করে শিবলাল — দুনিয়ার মজদুর, এক হও। দুনিয়ার মজদুর এক হও।

এক একবার উচ্চারণ করে এই মন্ত্র। আর শিবলাল অনুভব করে তার ভেতরে অদ্ভুত এক রসায়ন রচিত হচ্ছে তীব্র জ্বালা টের পাচ্ছে শিবলাল।

উনষাট গেল, ছেষট্টিও গেল। তারপর এল সাতষট্টি। বাংলায় প্রথম অ-কংগ্রেসি যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হল। অজয় মুখার্জি মুখ্যমন্ত্রী। জ্যোতিবাবু উপমুখ্যমন্ত্রী। ততদিনে উত্তরবঙ্গের পাহাড়গুলিতে জোতজমির অধিকার নিয়ে জোর লড়াই শুরু হয়ে গেছে। 'লাঙ্গল যার, জমি তার।' ধ্বনি উঠছে গাঁ-গঞ্জের মাঠে ঘাটে। মন্ত্রী হরেকৃষ্ণবাবু উত্তরবঙ্গ আর কলকাতা, কলকাতা আর উত্তরবঙ্গ — দৌড়ঝাঁপ করেও পরিস্থিতি সামাল দিতে পারছেন না। পার্টি থেকে উত্তরবঙ্গের

সক্রিয় কর্মী এবং নেতা চারু মজুমদারকে বহিষ্কার করা হয়েছিল আগেই। এবার আরো কিছু প্রথম সারির নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হল। তবু পরিস্থিতির উন্নতির চেয়ে অবনতি হয়ে চলল।

এরকম সময়, প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটেছে। রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হয়েছে রাজ্যে — একদিন মাঝরাতে শিবলালের কোয়ার্টারের দরজায় ধনঞ্জয়দাদা এসে কড়া নাড়ল। দরজা খুলে ধনঞ্জয়দাদাকে আবিষ্কার করে চমকে উঠল শিবলাল।

— দাদা, আপ! ইতনা রাত মে! শিবলালের বিস্ময় যেন কাটতে চায় না।

— ভেতরে চল্। কথা আছে। ধনঞ্জয়দাদা শিবলালকে একরকম ধাক্কা দিয়ে ঘরের ভেতরে নিয়ে এল।

চারপাই-এর ওপর বসল দু-জন। ধনঞ্জয়দাদা বলল — শিবু, একটু জল খাওয়া তো!

শিবলাল লোটা ভরে জল নিয়ে এল। ধনঞ্জয়দাদা ঢকঢক করে এক নিঃশ্বাসে অনেকখানি জল খেল। তারপর পকেট থেকে একটা খয়েরি রঙের খাম বের করে ভেতর থেকে একটা চিঠি বের করল। তারপর শিবলালের দিকে চিঠিটা এগিয়ে দিয়ে বলল — পড়্।

পার্টি থেকে একস্‌পালশন লেটার। ধনঞ্জয়দাদা আজ বেশ কিছুদিন ধরে ইউনিয়ন অফিসে আসে না। শিবলাল কিছু বলতে গেলে বলে — তোদের ওই পেরিভিশন আর মাগ্‌গি ভাতার জন্য লড়াই করে দেশে সমাজতন্ত্র আনা যাবে না। দেশের যা অবজেক্টিভ কন্ডিশন — সেখানে চাই কৃষি-বিপ্লব। যেমন হয়েছে মহান চীনে। গ্রামে গঞ্জে এখন স্ফুলিঙ্গ জ্বালাতে হবে। সেই থেকেই দাবানলের সৃষ্টি হবে।

শিবলাল বুঝে গেছিল ধনঞ্জয়দাদা পার্টির বর্ধমান প্লেনামে গৃহীত লাইন থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। এরপর পার্টি থেকে ধনঞ্জয়দাদাকে বহিষ্কার করাটা ছিল নিছকই সময়ের ব্যাপার।

— দুঃখ জানিয়ে একটা চিঠি দাও ডি.সি.কে। তা হলেই পার্টি তোমাকে ফিরিয়ে নেবে। পার্টির জন্য তোমার এতদিনকার আত্মত্যাগ তো মিথ্যে হওয়ার নয়। নিচু গলায় বলেছিল শিবলাল।

— পার্টিতে ফিরে যাব বলে তো তোর কাছে আসিনি আমি। আমি তো নিজেই আজ হোক আর কাল হোক, পার্টি ছেড়ে দিতামই। ওরা আমার কাজটাকে সহজ করে দিয়েছে মাত্র।

— তা হলে এখন কী করবে? পাকাপাকিভাবে বসে যাবে?

— কেন, চারুবাবুর পার্টিতে যোগ দেবো।

— ওদের আবার পার্টি কোথায়?

— অলরেডি পার্টি গঠিত হয়ে গেছে। আনুষ্ঠানিক ঘোষণাটুকু বাকি। এবারের পয়লা মে দিবসে ময়দানে জনসভা ডাকা হয়েছে। সেখানেই কানু সান্যাল সি.পি.আই.এম.এল. পার্টির জন্মের কথা ঘোষণা করবেন। চারুবাবুও মঞ্চে থাকবেন। ...তুই-ও চল্ আমার সঙ্গে। তোর মধ্যে একজন সাচ্চা বিপ্লবী লুকিয়ে আছে। আমাদের পার্টি একেবারে হেজে গেছে রে শিবু। খালি নির্বাচন আর নির্বাচন। শোধনবাদীরা কবজা করে নিয়েছে পার্টিকে।

— এভাবে বোলো না ধনঞ্জয়দাদা। আমি তা হলে দুর্বল হয়ে যাব। ঠিক ডিসিশন নিতে পারব না।

— বেশ, ভেবেচিন্তে ডিসিশন নিস। এখন আমি চলি। ...দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেল ধনঞ্জয়দাদা। তারপর কী মনে করে যেন থামল। শিবলালের দিকে মুখ করে ডান হাতটা মুঠো করে স্যালুট করে বলল — চেয়ারম্যান মাও সে তুঙ্, লাল সেলাম।

জীবনে সেদিন প্রথম প্রতিধ্বনি শোনাতে পারেনি শিবলাল।

গঙ্গার ঘাটে পৌঁছিয়ে হাতের ঘটিটাকে সিঁড়ির ওপর রেখে এক ধাপ এক ধাপ করে বেশ কিছুটা নীচে নেমে গেল শিবলাল। একে ফাল্গুনের সকাল, তার ওপর ভাটার টান ধরেছে এখন গঙ্গায়। ফলে জল ঘাট থেকে বেশ কিছুটা দূরে সরে গেছে। শিবলাল পা মেপে মেপে গঙ্গার এক বুক জলে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর পুবদিকে ফিরে সদ্য উদিত সূর্যের উদ্দেশে হাত দুটোকে কপালের সামনে জড়ো করে আবার নামিয়ে নিল। এই প্রক্রিয়াটাও যেন বাবা মাখনলালকে ছোঁয়ার চেষ্টা। গঙ্গার পুবপারের দৃশ্য এখন বদলে গেছে। একদিন যে-জায়গায় সারি দিয়েছিল চটকল, কাচকল, ঢালাই লোহার কারখানা, এখন সেখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে নানা বর্ণের নানা নকশার হাল ফ্যাশানের বহুতল ফ্ল্যাটবাড়ি। ফলে গঙ্গার বুকজলে দাঁড়িয়েও এখন আর সদ্য উদিত সূর্যের মুখ দেখা যায় না। বহুতল ফ্ল্যাটবাড়িগুলির সারি ডিঙিয়ে সূর্য দেখা দিতে দিতে সকাল বুড়িয়ে যায়।

গঙ্গার জলে পরপর তিনটে ডুব দিল শিবলাল। তারপর গায়ে সাবান ঘষতে ঘষতে তাকাল সামনের পারিজাত অ্যাপার্টমেন্টের দিকে। যতদূর মনে পড়ে এই বহুতল বাড়ির বিশাল কমপ্লেক্সের জায়গায় একদিন ছিল চালিহা রোলিং মিল। কর্মীসংখ্যা নেই নেই করে শ-পাঁচেক তো হবেই। তখন আশির দশকের প্রথমদিক। বামফ্রন্ট সরকার বিপুল ভোটে নির্বাচন জিতে দ্বিতীয়বারের জন্য রাজ্যের শাসনভার হাতে নিয়েছে। সেবারে পুজোর আগে চালিহা রোলিং মিলের মজদুরদের বোনাস দেওয়া হল না। ফলে বিক্ষোভ। শিবলালরা মজদুরদের কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণ করলেও বিক্ষোভ ক্ষণকালের জন্য কিঞ্চিৎ উত্তেজক হয়ে পড়েছিল। ভাঙচুরও হয়েছিল কিছু। তার পরিণতিতে পরদিন সকাল থেকে কারখানার গেটে তালা পড়ল। শিবলাল কিছুদিন মজদুরদের সংগঠিত করে কারখানার গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখাল। রাজ্য সরকারের শ্রমমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করল। মন্ত্রী বৈঠক ডাকার সময় পেলেন না। জেলা নেতৃত্ব একদিন শিবলালকে ডেকে বুঝিয়ে দিল পার্টিও শিবলালের ভূমিকাকে ভালো চোখে দেখছে না। শ্রমিকদের জঙ্গি আন্দোলনের পথ ছাড়তে হবে। এমন কিছুই করা ঠিক হবে না যা বামফ্রন্ট সরকারকে অস্বস্তিতে ফেলতে পারে।

সেদিন সেনহাটির মোড়ে জেলার পার্টির সদর দপ্তর থেকে ফেরার সময় শিবলালের প্রথম মনে পড়েছিল ধনঞ্জয়দাদার কথা। দু-চোখ দিয়ে দু-ফোঁটা জলও ঝরে পড়েছিল।

গঙ্গাপারের জমির দর তখন হু হু করে বেড়ে চলেছে। ফ্ল্যাট সংস্কৃতি কলকাতা ছেড়ে কলকাতার সংলগ্ন মফস্বল শহরগুলিতে মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি কারখানা — তা সে যে-কোনো কারখানাই হোক না কেন — এবং যেসব কারখানাগুলিতে পুরোনো দিনের মেশিনপত্র দিয়েই উৎপাদন প্রক্রিয়া চালু রেখেছে মালিকপক্ষ — সেই কারখানা

চালিয়ে বৎসরান্তে যেটুকু লাভের অঙ্ক ঘরে তুলতে পারে মালিকপক্ষ, কারখানার জমিজমা প্রোমোটারের কাছে বিক্রি করে দিয়ে বিক্রির টাকা কোনো ফিনানশিয়াল ইনস্টিটিউশনে লগ্নি করে বৎসরান্তে যে-পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা যায় সুদ, ডিভিডেন্ড ইত্যাদি খাতে, সেই অঙ্কটা যে দ্বিগুণেরও বেশি। সুতরাং কারখানা বন্ধের অজুহাত সৃষ্টি করো।

তবে একটু ঠাণ্ডা মাথায় আর ধৈর্য নিয়ে ক-টা দিন পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতে হবে। পরিকল্পনাটা একেবারে জলের মতো সহজ সরল। শিবলালও জানে। আগে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করো, যা শ্রমিকদের বিক্ষুব্ধ করতে প্ররোচিত করবে। বিক্ষোভ হলেই কারখানার অভ্যন্তরে কিছু ভাঙচুর চালাও, প্রয়োজন পড়লে দু-চারজন অফিসারের গায়ে হাত তোলো। তারপরেই কারখানা বন্ধ করে দাও। চারদিক থেকে, সংবাদপত্র থেকে দূরদর্শন, পার্টি শাখা থেকে রাজ্যের মন্ত্রীসভা — সব জায়গায় ছি-ছিক্কার পড়ে যাবে মজদুরদের জঙ্গিপনার জন্য। এটা যে একটা ষড়যন্ত্র, রাজ্যে শিল্পায়নের জন্য এগিয়ে যাওয়ার পথে মস্ত বড়ো এক প্রতিবন্ধক, তা প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লাগবে সবাই।

ব্যস, তা হলেই কারখানার সমস্ত মজদুর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। বুঝতে পারবে নিজেদের অসহায় অবস্থান। তারপর এক এক করে দেশ গাঁয়ে ফিরে যাবে শ্রমিকরা। যাদের সেই রাস্তা বন্ধ, তারা স্থানীয় শহরেই রিকশা-টিকশা চালানোর মাধ্যমে পেটের ভাত জোগাড় করবে। কিছু শ্রমিক হয়তো অনাহারের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করবে। তারপরেই শান্তিকল্যাণ হয়ে যাবে গঙ্গার পার।

মালিক প্রোমোটার আর জেলা নেতৃত্বের সব চেয়ে প্রভাবশালী দু-চার জন ব্যক্তির মধ্যে গোপন মিটিং। জমি বিক্রি করবে মালিক। ক্রেতা হবে প্রোমোটার। পার্টির নেতৃত্ব তাদের ন্যায্য কমিশন পেয়ে যাবে।

তারপরেই কারখানার জমি সমান করে দিয়ে যাবে বুলডোজার, পে-লোডার। ওই দৃশ্য দেখে শিবলালদের হয়তো মনে হবে কারখানার জমি নয়, শত শত মজদুরের বুকের ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে পে-লোডার, বুলডোজারগুলি। কিন্তু এর মধ্যেই রাজ্য সরকার এবং পার্টি খুঁজে পাবে শিল্পায়নের নতুন দিশা। তারপরেই বছর ঘোরার আগেই স্বপ্নের পরীদের মতো ডানা মেলে আকাশ ছোঁবে কোনো বহুতল আবাসন বাড়ি।

এডওয়ার্ড জুট অ্যান্ড ফাইবার মিলের ভাগ্যেও যে একই পরিণতি অপেক্ষা করে আছে, জানা ছিল শিবলালের। তবে এডওয়ার্ড জুটমিলের মতো এত বড়ো একটা মিলকে শিল্পায়নের দোহাই দিয়ে একবারে গিলে ফেলা হয়তো সহজ ছিল না। বিশেষ করে শিবলালরা যখন প্রতিটি মজদুরকে বলে দিয়েছিল, দেখে শেখো ভাই। এখন আর পার্টি আমাদের বল-ভরসা নয়। আমাদের শক্তি আমরাই। আমাদের একতা। তাই কোনো রকম প্ররোচনায় সাড়া দিও না।

মালিকপক্ষ ক্ষতির অজুহাত দেখিয়ে মজদুরদের বোনাস বন্ধ করে দিল। শিবলাল মজদুরদের উত্তেজিত হতে দিল না। কোনো বিক্ষোভ নেই কোথাও। শ্রমিকরা মুখ বুঁজে কাজ করে। শিবলাল মজদুর ইউনিয়নের অফিস ঘরে বসে থাকে। কাজের শেষে বাড়ি ফেরা হয় না

শিবলালের। ঘর সংসার করা হয়নি শিবলালের। পার্টিই তার ঘর, পার্টিই তার সংসার। বয়সকালে বিয়ে-শাদি করা হয়ে ওঠেনি শিবলালের। শ্রমিকদের নেতৃত্বে দেশে একদিন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে — এমন এক স্বপ্ন শিবলালের পুরো যৌবনকালের শয্যা-সঙ্গিনী হয়েছিল। সেই অলীক রমণসুখ উপভোগ করেই শিবলালের দিন গড়িয়ে গেছে।

একজন দু-জন করে কিছু কর্মী এসে বসে ইউনিয়ন ঘরে। কারোর মুখে কোনো কথা নেই। নিঃশব্দে চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দেয় শিবলালরা। শিবলাল, চা খাওয়া হয়ে গেলে, ঘরের কোণে স্তূপ করে রাখা দরমার ওপর কাগজ এঁটে লেখা 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' — প্ল্যাকার্ডগুলি থেকে একটা প্ল্যাকার্ড তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করে। একটা দীর্ঘশ্বাস বুকের শিরাগ্রন্থী দুমড়ে মুচড়ে শব্দ করে বেরিয়ে আসে। তারপর কখন যেন রাত দশটার ঘন্টা বাজে থানার ঘড়িতে। ঘন্টা বাজে ঢং ঢং শব্দে। শিবলাল কলোনির দিকে হাঁটা দেয়।

এডওয়ার্ড জুটমিল বন্ধ হল একদিন। একপেশে সিদ্ধান্ত। রাজ্য সরকারের মধ্যস্থতায় একটি বহুজাতিক ব্যাঙ্ক রুগ্‌ণশিল্প হিসেবে তালিকাবদ্ধ এডওয়ার্ড জুটমিলকে পুনরুজ্জীবিত করতে অর্থ সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেও শর্ত চাপাল, কারখানার কর্মী সংখ্যাকে অর্ধেকের নীচে নামিয়ে আনতে হবে। অর্থাৎ অর্ধেক কর্মী ছাঁটাই হবে। কোন কোন ডিপার্টমেন্টে কোন কোন কর্মী উদ্বৃত্ত আর কোন কোন কর্মী প্রয়োজনীয়, তার তালিকা বানাবার দায়িত্ব পড়ল জেলার পার্টি শাখার সাধারণ সম্পাদক হারাধন ব্যানার্জির ওপর।

ইউনিয়ন ঘরে সভা ডাকা হল। প্রস্তাব নেওয়া হল, অর্ধেক কেন, একটি মজদুরকেও ছাঁটাই করা চলবে না। প্রয়োজন পড়লে শ্রমিকরা জঙ্গি আন্দোলনের পথেও যেতে পিছু-পা হবে না। হয় একটি শ্রমিকও ছাঁটাই হবে না, নয় সব শ্রমিক এক সঙ্গে কাজ থেকে ছাঁটাই হবে। এর মাঝখানে আর দাঁড়ানোর কোনো জায়গা নেই।

শিবলাল আওয়াজ তুলল — দুনিয়ার মজদুর...।

— এক হও। প্রতিধ্বনিটা অত্যন্ত ক্ষীণ শোনাল।

শিবলাল বুঝল সে একা হয়ে যাচ্ছে। দুনিয়ার মজদুরদের ঐক্যকে বলশালী করার মতো গুরুদায়িত্ব কাঁধে নেওয়ার চেয়ে শ্রমিকরা নিজের নিজের অস্তিত্ব রক্ষাটাকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করল। ফলে রাত-বিরেতে সহকর্মীদের দৃষ্টি এড়িয়ে মালঞ্চ রোডে হারাধন ব্যানার্জির বাড়ির সদর দরজায় দু-একজন শ্রমিককে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেল। সকলের লক্ষ্য হারাধন ব্যানার্জির তৈরি করা অপরিহার্য শ্রমিকদের তালিকায় নিজের নামটিকে অন্তর্ভুক্ত করা।

শিবলাল জানত পুনরুজ্জীবন ধ্বনিটি একেবারেই অন্তঃসারশূন্য। ব্যাঙ্কের সাহায্যও কোনোদিন আসবে না। মালিকপক্ষ এবং পার্টি অনায়াসেই শ্রমিকদেরই অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলতে পারবে — তোমাদের জন্যই এডওয়ার্ড জুটমিল বন্ধ হল। তোমরাই উদ্বৃত্ত কর্মীদের তালিকা তৈরি করতে দিলে না। এরপরে মিল চিরকালের জন্য বন্ধ হলে সরকারের কোনো ভূমিকা থাকবে না।

বন্ধ হল মিল। কেউ কোনো নতুন ভূমিকা গ্রহণ করল না। এক মাস, দু-মাস, ব্যাস! তারপরেই এডওয়ার্ড জুটমিলের শ্রমিকরা কলোনি খালি করে কে যে কোথায় চলে গেল,

কোনো খবর নেই। কেবল শিবলাল রয়ে গেল কোয়ার্টারে। মাখনলালের শেখানো গঙ্গা স্নানটাকেও ধরে রাখল।

স্নান সেরে গঙ্গার ঘাট পেরিয়ে রেললাইন ডিঙিয়ে কেন জানি শিবলাল আজ কাঠ গুদামের রাস্তা ধরে হাঁটা দিল। একটু এগিয়ে বহু পরিচিত মেহগনি গাছটা ছাড়িয়ে প্রায় ধসে পড়া একটা বাড়ির সামনে দাঁড়াল শিবলাল। একঘরের বাড়ি। সঙ্গে বাথরুম পায়খানা। বাড়িটার মাথায় লাল টিনের বোর্ডের ওপর শাদা অক্ষরে লেখা — 'ওয়ার্কস মেন'স ইউনিয়ন। এডওয়ার্ড মিল। স্থাপিত ১৯৫৫। তবে দীর্ঘদিন রং না পড়ায় রোদে জলে সব ক-টা অক্ষর এখন পড়া যাচ্ছে না। বিবর্ণ হয়ে গেছে বোর্ডের লাল রংটাও। লাল এখন একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। বোর্ডটার গায়ে কিছু শ্যাওলাও জমেছে। ছাদে লোহার রডে লাগানো লাল পতাকাটাও বৃষ্টি বাদলা, ঝড়-ঝাপটায় ছিঁড়ে ফেটে গেছে। জড়িয়ে আছে লোহার রডের সঙ্গে।

বুকটা টনটন করে উঠল শিবলালের। সংসার করা হয়নি তার। তাই সন্তানের পিতা হওয়ার সুযোগও ঘটেনি। তবু শিবলালের কেন জানি মনে হচ্ছিল সে ইউনিয়নের অফিস ঘরের সামনে নয়, নিজেরই মৃত সন্তানের শবদেহের পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

দরজায় ঠেলা দিল শিবলাল। শিবলাল দেখল ভারী কাঠের এক-পাল্লার দরজাটা খুলে গেল। মরচে ধরা কবজায় শব্দ হল ক্যাঁচ ক্যাঁচ।

ঘরের ভেতর ঢুকল শিবলাল। ঘরের জানলা দুটো বন্ধ থাকায় ঘর একরকম অন্ধকার। খোলা দরজা দিয়ে যে একফালি চারকোনা আলো এসে পড়েছিল তাতে ঘরের অন্ধকার অনেকটা চোখে সয়ে গেল। শিবলাল দেখল দুই সারিতে চারটে করে মোট আটটা চেয়ার। স্টিলের। রং চটে গিয়ে স্টিলের গায়েও মরচে ধরেছে। চেয়ারের সারি পেরিয়ে টানা লম্বা টেবিল। টেবিলের ওপারেও এক সারি চেয়ার। টেবিল ঘিরে বসে কবে শেষ চা খাওয়া হয়েছিল, ঠিক নেই। কেবল টেবিলের ওপর দীর্ঘদিন ধরে চায়ের কাপ রাখার ফলস্বরূপ এলোমেলো কয়েকটি বৃত্ত ফুটে উঠেছে।

একটা চেয়ার টেনে বসল শিবলাল। ঘরের ছাদ থেকে নেমে এসেছে ঘন ঝুল। উইপোকারা ঘরের জানলার ফ্রেম জায়গায় জায়গায় খেয়ে নিয়েছে। দেয়ালের কোণে একটা বোলতার চাক। বন্ধ ঘরে বোলতারা বাসা বাঁধল কেমন করে? অবাক হতে যাচ্ছিল শিবলাল। ঠিক তখনই চোখে পড়ল ডানহাতের জানলার ফ্রেম আর পাল্লার মাঝখানে উইপোকাদের সৌজন্যে বেশ বড়ো মতো একটা ফাঁক তৈরি হয়েছে। ওই ফাঁকটাই বোলতাদের ঘরে প্রবেশের এবং ঘর থেকে বেরুনোর পথ।

ঘরের আর এক কোণে 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' স্লোগান লেখা দরজার প্ল্যাকার্ডগুলি স্তূপাকার হয়ে আছে। কিছু খেয়েছে ইঁদুরে, কিছু উইপোকাতে। তার মধ্যে থেকে বেছে একটা অক্ষত প্ল্যাকার্ড হাতে তুলে নিল শিবলাল। প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়াল ঘরের মেঝেয়। কানে ভেসে এল হাজার হাজার মজদুরের কণ্ঠস্বর। কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল শিবলাল।

ঠিক এমন সময় দমকা বাতাসে ঘরের এক-পাল্লার ভারী দরজাটা দড়াম শব্দ করে আছড়ে পড়ল ফ্রেমের গায়ে। সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ল নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

দরজাটাকে খোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল শিবলাল। তবু দরজা খুলল না। হঠাৎ করে বাতাসের ঝাপটায় ফ্রেমের গায়ে আছড়ে পড়ার কারণে হয়তো দরজার বাইরের দিকের ছিটকিনিটা আটকে গেছিল। তাই ধাক্কাধাক্কিতেও দরজা খুলল না।

মাকড়সার জাল ঘিরছিল শিবলালকে। ছাদের ঝুল নেমে এসে শিবলালের গোটা শরীরটাকে দড়ির মতো বেঁধে ফেলছিল। বোলতার চাক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বোলতারা বেরিয়ে এসে অবাধে দংশন করছিল শিবলালকে। শিবলাল পাগলের মতো হাতে ধরা 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' লেখা দরমার প্ল্যাকার্ডটা নাড়ছিল। কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছিল না তাতে।

দিন পাঁচেক পরে স্থানীয় থানার পুলিশের উপস্থিতিতে পরিত্যক্ত ইউনিয়ন অফিসঘরের দরজা ভাঙা হল। মানুষ দেখল ঘরের মেঝেয় পড়ে আছে পচধরা শিবলালের শবদেহ। বুকের ওপর দরমার ব্যানার। কাগজে লেখা — 'দুনিয়ার মজদুর, এক হও'।

অবশেষে রূপান্তরের চিহ্ন

শুভংকর গুহ

ঈশ্বর সত্যসাধন প্রণীত 'খড়মচরিত' নামক পুঁথিটি প্রায় মাটির মণ্ডে রূপান্তরিত। সত্যসাধনের জ্যেষ্ঠ পুত্রের অবহেলা ও উদাসীনতার জন্যই পুঁথিটির এই দশা।

স্বপ্নের মধ্যেই নিবারণ বাবার চিহ্নগুলি হাতড়াচ্ছিল — খড়ম, দোয়াত, বাঁশের চোঙা, কলম ধুয়ে তুলে রাখার আটকানি, বেঁধে রাখা দপ্তরের পাশে ফাঁদিজাল, কোনাছেঁচা, খেচজোঁতা ও নানান কৃষি-সরঞ্জাম। এতদিন ঘুম ও স্বপ্নের মধ্যে এই প্রকার বস্তুগুলি আঙুলের ডগায় আটকায়নি বলেই, সে নিশ্চিন্ত ছিল। বাবা যখন পুঁথিটি রচনা করতেন এই বস্তুগুলি তার চারপাশে ছড়িয়ে থাকত।

স্বপ্ন তখনও ভাঙেনি। তন্দ্রাচ্ছন্ন, কী যে জড়াজড়ি করে তক্তপোশের নীচে ঝুপ, গড়াল। ধড়াস। ধড়মড়-তক্তপোশের ওপর আচমকাই উঠে বসতে গিয়ে তন্দ্রাঘোর শরীরের ভারসাম্য রক্ষা হল এই যা! তক্তপোশের নীচে উবু হয়ে তাকাল — শুধুই অন্ধকার জমাট। জানালা খুলে কাকভোরের অস্পষ্ট আলোতে দেখল গোয়ালমুক্ত অসহায় এক বকনা তার দিকে তাকিয়ে আছে — আহা রে!

স্পষ্ট আলোয় নিবারণ দেখল মণ্ড। মণ্ড? বাবারই হাতে সূক্ষ্ম নিবের ছোঁয়ায় গড়ে তোলা অক্ষরগুলি একটি মত্ত হাতি ভেঙে-তুবড়ে দিয়ে গেছে। পাতাগুলির ওপর হালকা গোলাপি ও ঘি-রঙের উইপোকাগুলির নিরাপদ সংসার। হায়! হায়! হঠাৎই তার কল্পনার গভীরে বানভাসি কয়েকটি পশু জল ঠেলে ডাঙায় ফিরে আসার চেষ্টা করছিল। নিবারণ ভাবল সে ওই পশুগুলির মধ্যে একটি। কী করবে এখন মণ্ড দিয়ে? ধ্বংসের এই রূপকে কোথায় ঠাঁই দেবে? দেঁতের খালে বিসর্জন দেবে না অগ্নিদেবতাকে নিবেদন করবে? কিন্তু যাই করুক না কেন, অনুজ দিগম্বর এবং অনন্তকে জানাতেই হয়। তা হলে তো, ওদের দুইজনকে সংবাদ দিয়ে ডেকে আনতে হবে। ডেকে আনাতে গেলে পথ যে চিনতে হবে। সেই পথ নিবারণের অজানা। দিগম্বর থাকে বেইলি সাহেবের কাছে। চাষাড়ে নয়, পাকা বাবু। সাহেবের সঙ্গে মানচিত্রে আঁকাআঁকির কাজ করে, সাহেবকে সাহায্য করে। সাহেব অনুমতি দিলে, তবেই দিগম্বরের ফেরা হয়। বাবা সত্যসাধন পুঁথিটির কয়েকটি অধ্যায় দিগম্বরকে পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। দিগম্বরের পুঁথিটির প্রতি একপ্রকার দুর্বলতা আছে। দিগম্বর জানতে পারলে? তখন? নিবারণ ভিতরে ভিতরে কেমন অস্থির হয়ে উঠল। অনন্ত খামখেয়ালি। সে বৃক্ষের দাস। বিচিত্র তার চরিত্র। দুই পুরুষ আমলের চাষের কাজের মইটিকে আকারে আরো লম্বা করে, মেরামতি করে, মইটি কাঁধে নিয়ে দূরগামী কোনো এক গাঁয়ের বাদাড়ে শতাব্দী প্রাচীন উঁচু বটবৃক্ষের মাথা চড়ে বসে আছে, আর নাকি নামেইনি। ক্ষিদে ও তৃষ্ণা বলতে কিছু নেই। জনসমাজে আসে না। নিবারণের মনে হয়, অনন্ত অভিশপ্ত অশ্বত্থামা, শ্রীকৃষ্ণের অভিশাপের ফলেই জনমানবহীন বাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অদূরে জলাশয়ের পাড়ে একটি মৃত কাতল ধাতব বস্তুর মতন চকচক করছে। দলবদ্ধ কাকগুলি অনেকটা কালো বোরখার মতন ছবি হয়ে উঠেছে। কাতল মাছটিকে ঠুকরোচ্ছে এক জোড়া চিল। দখলদার। মরা কাতল মাছের দৃশ্যটি নিবারণের বোধের গভীরে মৃত্যু চেতনার জন্ম দিল। মৃত্যু কী বিনাশ? না সমাপ্তি? তা হলে ধ্বংস? মৃত্যু, বিনাশ, সমাপ্তি অন্য এক প্রাণীর ভোজনবিলাস তো অন্য আর একজনের কাছে অস্তিত্বের বিনাশ। কাতল মাছটিকে নিমেষের মধ্যে ছিঁড়ে ফালা ফালা করল ভোজনবিলাসীরা। দৃশ্যটি দেখতে দেখতে নিবারণ দাঁতন কর্মটি শেষ করে ল্যাপানো মাটির স্তূপে গাড়ুটি রেখে চলে এল মাটিপ্রায় পুঁথি মণ্ডটির কাছে। মণ্ডটি বাখারির পাশে, শুকনো মাটির অংশের মধ্যিখানে। বাখারির পাশে মাটির অংশটিতে কিছুটা বালি মেশানো আছে বলে জল শুষে নেয় তাড়াতাড়ি। গতকাল সন্ধ্যার আগেই দেঁতের খালের পশ্চিম কোণ থেকে উঠে এসেছিল কালবৈশাখী। মাঝারি মানের বৃষ্টি হল খানিক। উঠোন জুড়ে সাপের ফনার মতন জল গড়িয়ে গেল চাষের জমির কাছে। আকাশ গাঢ় নীল হলেও পূর্ব কোণে একটা কালসিটে দাগ। বিকেলে অথবা দুপুরে আবার বৃষ্টি হলে পুঁথি মণ্ডটি বৃষ্টির জলে ধুয়ে যাবে। হঠাৎই অকারণে ভোরের বাতাস। আশ্রয়হীন ভোরের শেয়াল মাঠ অতিক্রম করে ছুটে চলল পারবাসদেবপুরের জংলা ঝোপের দিকে। বৈশাখী ভোরে বাতাসটি নিবারণের সমস্ত সংশয় উড়িয়ে নিয়ে গেল প্রান্তর ছাড়িয়ে।

এখানে সব জমিই এক-ফসলি। দো-ফসলি করে কী লাভ? নষ্ট হবে। কাঁঠাল, আম, জাম ভুঁইয়ে গড়াগড়ি দিয়ে নষ্ট হচ্ছে। পাখি, শেয়াল, ভোঁদড় এসে স্পর্শ করছে না। মাঠে এখন কাজ নেই। চিঁড়ে, মুড়ি, দুধ, পাকা ফলে মজে আছে তল্লাটের মানুষের উদর। পাকা ফল আর খড়-ভাসা দুধের স্বাদই আলাদা। দুধে এখন চমৎকার ধানের গন্ধ। এ-রাস্তা, সে-রাস্তায় এখন ঠুকঠুক শব্দের ছড়াছড়ি। চাষের যন্ত্রপাতিগুলোর কাজ চলছে। বলদের কাঁধে, মুদনিতে ক্ষত শুকিয়ে চামড়া খসখসে হওয়ার ঋতু। বলদগুলিরও বিশ্রামের ঋতু। ঘরে ঘরে লাঙল, মই, আগড় বানানো অথবা মেরামতির কাজ চলছে। কয়েক পশলা বৃষ্টি হলেই মাটিকে তুলো বানানোর কাজ শুরু হবে। খলায় এসে কোন মালো কোন বাড়ির কর্তার সঙ্গে বিয়ে-শাদির বিষয়ে কথা বলে গেল, কে প্রথম এই তল্লাটে একদিন হুক্না পাখি ধরে এনেছিল অথবা কাহারদের কে একজন রাত্রে পালকিতে বসে বিষ খেল এই সবই এখন আলোচনার বিষয়। নিবারণের অনুজ অনন্তর কেউ খোঁজ পেল কি না, বা কোন গাছের ডালে কে দেখে এল অনন্তকে, সেটিও আলোচনার বিষয়।

বৈশাখী ভোরের দমকা বাতাসটি থেমে গেল। সংশয়টি নিবারণকে কাঁকড়ার মতন আঁকড়ে ধরল আবার। নিবারণ পুঁথিটিকে বুকে আগলে নিল, পরক্ষণেই আবার তা রেখে দিল। অস্থিরতা বেড়েই চলেছে। বারে বারে তার বাবার পুঁথি রচনাকালের সেই সময়টি এসে ধাক্কা মারছিল। বুঝি বা, সেই যে সময়টি কালিবাউশ হয়ে বিলের গভীর জলে ঝুপ নেমেছিল, — এতদিন পরে আবার ফিরে এল। নিবারণ কী তাই? এই জগৎ সংসারে সন্তান জাতির মতন স্বার্থপর? বাবার জীবিতকালীন উৎকৃষ্টতর সময়ের স্মৃতিগুলো সন্তানেরা মনে রাখে না। সে-দায় তাদের নেই। যেই পুঁথিটি আজ মাটির মণ্ডে রূপান্তরিত হল সে-পুঁথিটির কথা এতদিন কেন একবারও

মনে পড়েনি?

এ কী দেখছি!

দাঁতনের পরে, যে-জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে নেমে এসেছিল থুতনির গোড়ায় সেই বিন্দু বিন্দু জলগুলি সাপটে নিয়ে, চোখের পাতা পরপর ঝাপটে নিয়ে নিবারণ যা দেখছে বিশ্বাস হচ্ছে না। পুঁথির মণ্ড থেকে উঠে আসছে একজোড়া মানুষের পা। পায়ের বুড়ো আঙুলে বৃদ্ধ নখ, পাথুরে পা, তামাটে রঙের। শুধু দুই পায়ের দৃশ্য ভাসছে। বাকি মানুষটি অদৃশ্য। এ কেমন দৃশ্য? মণ্ড জুড়ে বিষ পিঁপড়ে উইপোকার চারদিকে ব্যূহ রচনা করেছে। পা দুটি ক্রমশ ডানা মেলে পাখি হয়ে উঠবে না তো! নিবারণ নিজেকে সান্ত্বনা দিল, চিমটি কাটল চোখের পাতায়, এ কী তার ভুল দেখার ফল? বাখারির ছিদ্রগুলি চুঁইয়ে ফরসা কঞ্চির মতন আলোকরেখাগুলি ওই পা দুটিকে উজ্জ্বল করল। নিবারণ আপন মনেই বিস্ময়ে থ হয়ে 'চমৎকার তো,' বলে উঠল। আজ সকালের বাস্তবতায় সে নিজেকে ফিরিয়ে আনতে মোটেই সচেষ্ট হল না। আজকে এই বৈশাখী সকাল, বাতাস, আলো, কুটির, গোয়ালমন্দির, চাষের কাজের যন্ত্রপাতি, শস্যকোঠা, রূপালি চকচকে দেঁতের খাল, পিতলের গাড়ুটির ঢ্যাপসা পিঠ বেয়ে জলের বিন্দু গড়িয়ে নামা এইসব কিছু থাকা সত্ত্বেও নিবারণের মনে হল সে নিজের মধ্যে নেই। সে অন্য এক ভুবনের মানুষ!

আমাকে অনুসরণ করো নিবারণ।

তামাটে পা দুটিতে সৌন্দর্য বিস্তার করেছে খড়ম। নিবারণ চিনতে পারল। কদম কাঠের খড়ম। নরম। ওজনে হালকা। নিবারণের সামনে, শূন্যে ভাসছে। সেই খড়মজোড়া তো! তক্তপোশের তলায় মখমলে মোড়ানো ছিল। নারায়ণ পুজোর বাসনের কাছে। এই খড়মজোড়া তার বাবা সত্যসাধন নিজে হাতে গড়েছিল। ব্যবহারে ব্যবহারে এই খড়ম জোড়াটি মসৃণ হয়েছিল। ভাসমান খড়মজোড়া পা-দুটি সমেত গতি পেল। যেভাবে বৃদ্ধ মানুষের চলার গতি হয় তেমন নয়। চঞ্চল, আবার ক্ষণেক স্থির। নিবারণ অনুসরণ করছে কী না? কিন্তু নিবারণ ঠায় দাঁড়িয়ে।

— নিবারণ, আমি তোমার পিতা, আমাকে অনুসরণ করো।

নিবারণের কোনোই সন্দেহ নেই, উক্তিটি তার বাবা সত্যসাধনের। তবুও কেন সন্দেহ? যুক্তির নিয়মে মৃত বাবার কণ্ঠস্বরকে কী করে বিশ্বাস করবে? তবুও এখন নিবারণ বাস্তব জ্ঞানহীন।

— তুমি কে? কী তোমার পরিচয়?

— আমি তোমার পিতা।

— আমার পিতা? বছর দশেক আগে তিনি স্বর্গবাস নিয়েছেন। পৌষ সংক্রান্তির দুপুরে তিনি বাস্তব সংসারের মায়া ত্যাগ করেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে যাওয়ার আগে তিনি মিষ্টান্ন রন্ধনের গন্ধ প্রাণভরে নিয়েছিলেন। দুধের মধ্যে সিদ্ধ হচ্ছিল গোবিন্দভোগ চাল। সেইদিনের মিষ্টান্নের ঘ্রাণ এবং বাবার মৃত্যুর ঘ্রাণ আজও যে ভুলিনি।

— আমার মৃত্যুর পরে মিষ্টান্নের হাঁড়িটি রাসরাণী কী করেছিল?

— মা আমাকে বলেছিল, যা কিছু রান্না হয়েছে সেই সমস্ত আয়োজনই অশৌচ হয়েছে। বলেছিল কাঁদতে কাঁদতে, পায়েসের হাঁড়িটি যেন দেঁতের খালে ভাসিয়ে দিয়ে আসি। আমি তাই করেছিলাম।

— পাচক ভীমের থেকেও তোমার মা সুস্বাদু রান্না করত। ভাগ্যিস পৌষ সংক্রান্তির দিনে গন্ধটি নিয়ে গেলাম।

— কিন্তু আমার সঙ্গে আপনি কী মায়াবী খেলা খেলতে এলেন? আপনার পিণ্ড শ্রাদ্ধে কী কোনো ত্রুটি ছিল?

— না। শ্রদ্ধার সঙ্গে অন্তরের যোগাযোগ থাকলে ত্রুটি হবে কেন নিবারণ? আমি এসেছি তোমাকে কিছু কথা বলতে। যে-কথা আমি জীবিতকালেও তোমাকে জানানোর অবকাশ পাইনি। আমাকে অনুসরণ করো, আমি তোমাকে বিস্তারিত জানাব।

— কতদূরে?

— যতদূর তোমার প্রাণ চাইবে।

— অনুসরণের উদ্দেশ্য?

— অনুসন্ধানী আত্মার অনুসন্ধান। আমি পুঁথিতে যা লিখেছিলাম তুমি কী পড়েছ?

— আপনি পুঁথি রচনা করেছিলেন, আমি তা ভুলেই গেছিলাম। যখন মনে পড়ল তখন পুঁথিটি মাটির মণ্ডে রূপান্তরিত হয়েছে।

— কী লিখেছিলাম জানতে ইচ্ছা করেনি?

— দয়া করে আমার অবহেলা, উদাসীনতা ও অশ্রদ্ধার কথা জানতে চাইবেন না। আপনার পুঁথির মণ্ড নিয়ে আমি বিভ্রান্ত ও শোকাহত। আমি ভীত, আমার দুই অনুজ ভাইকে আমি কী উত্তর দেবো? আমি পশু। আমি নরকের কীট। আমাকে ক্ষমা করুন। আমাকে আপনি আদেশ করুন আমি মণ্ডটির প্রতি কী সিদ্ধান্ত নেব?

— তোমার দুই অনুজ ভাইদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে।

— তারা আমাকে ধিক্কার দেবে। তিরস্কার করবে।

— যদি তাই করে সেটি তোমার প্রাপ্য।

— যদি নাই বা বলি। তা হলে?

— আমার জীবিতকালে, সংসার জীবনে আমি কোনোদিন কিছুই গোপন করিনি। যদি তাই করতাম তা হলে তুমি লাঙল বিদ্যা জানতে না।

— তা হলে?

— আমাকে অনুসরণ করো নিবারণ।

— কোনদিকে যাবেন?

— অনুসরণ করতে করতেই আমরা দিক নির্ণয় করে নেব।

খড়মজোড়াটি কখনো স্পষ্ট, কখনো অস্পষ্ট বা একেবারেই আবছা। খেত-আবাদি, অনাবাদি জমি অতিক্রম করে নরম মাটিতে ছাপ ফেলে যাচ্ছে। নিবারণ অবাক। পুঁথির অক্ষরগুলির এত শক্তি। মাঠে মাঠে চিহ্ন এঁকে দিয়ে যাচ্ছে। মুড়ানো ধানগাছের কাঠ-পাথুরে ফলাগুলি

পায়ে বিঁধছিল। কাঁটার মতন ফুটছে। সুঁদরি গাছের গোড়াগুলি কালস্রোতে পাথুরে রূপ নিয়েছে। বনরেখাটি আরো গভীরে বিদ্যাধরীর স্রোতের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে। হু-হু খোলা মাঠে বাতাসে ভর করে বাবা সত্যসাধনের আকুল আহ্বান — এসো নিবারণ, এসো আমাকে অনুসরণ করো।

দূরে আলপথ ধরে যারা ফিরে যাচ্ছিল পারবাসুদেবপুরের দিকে তারা সবাই নিবারণকে চেনে। উদ্‌ভ্রান্তের মতন ছুটে যাচ্ছে নিবারণ। ওদিকে কেন? কোথায় যাচ্ছে নিবারণ? নালিকুলের দিকে। নালিকুলের আদিবাসীরা ওকে পেলে যে ছিনিমিনি খেলবে। পারবাসুদেবপুরের সঙ্গে যে-সংঘর্ষটি শেষ হয়নি এখনো, মীমাংসাও হয়নি। ওদিকে যাওয়া যে নিরাপদ নয়। একজন চেঁচাল — ও নিবারণ কত্তা, ফিরে এসো গো, ফিরে এসো। নিবারণ কী শুনতে পাবে? ওদের মধ্যে একজন একটু মাতব্বর গোছের, বলল — নিবারণকে বৈশাখী ভোর ভর করেছে, ও ফিরে এসে যেদিকে চাইবে গাছ-লতা-পাতা শুকিয়ে উঠবে। ডগা নুইয়ে পড়বে। আকাশে শকুন উড়বে। মৃত পশুর মাংসে বিষ ছড়িয়ে পড়বে। তল্লাটে-গাঁয়ে সবাই বলবে 'অধিক ফলন...অধিক লাভ।' বিদ্যাধরী ধরে যে-সব বণিকেরা ভাগীরথীর দিকে বজরা নিয়ে যাবে তাঁরা সবাই গাঁয়ে-তল্লাটে নেমে সুরঙ্গ তৈরি করবে। সেই সুরঙ্গের ভিতরে সৎ ও উদ্যোগী সজ্জনদের নিয়ে প্রবেশ করবে। সে ভালো হবে না। তখন একদিন এমন আসবে, সেইদিন নারকোল গাছে গাছে ফলের ভিতরে জল থাকবে না। নারকোলগুলি বিকৃত আকার ধারণ করবে।

দলের অন্যজন বলল — নিবারণ কত্তাকে যদি বৈশাখী ভোর ভর না করে?

আরেকজন বলল — যদি নিবারণকে ওর পূর্বপুরুষ ডেকে নিয়ে যায়?

মাতব্বর তখন খুশি হয়ে উত্তর দিল — তা হলে, স্বদেশের সব মানুষ কৃষিকাজে মন দেবে। তল্লাটে এত ফসল ফলবে, তখন প্রতি পূর্ণিমাই হবে কোজাগরি পূর্ণিমা!

নিবারণ পিছু পানে চাইল, পিছনের দৃশ্যগুলিও গতিশক্তি ধারণ করেছে, সামনের দৃশ্যগুলি তাকে ডাকছে, ডাকছেই আর সরে সরে গিয়ে দূরত্ব গড়ে তুলছে। হাঁটার গতিও অস্বাভাবিক, নিজেকে ওজনহীন হালকা মনে হচ্ছে। গভীর ছায়াচ্ছন্ন গাছ-গাছালির সমাবেশ। গাছগুলি প্রকাণ্ড মূল দিয়ে নানান গলিপথ রচনা করেছে। গলিপথগুলি থেকে আরো নানা গলিপথের সৃষ্টি হয়েছে। এইভাবেই পথ অন্তহীন হয়, কোনো-না-কোনো পথ অন্য পথের সঙ্গে মিলে যায়। সব পথই অনুগামীদের জন্য প্রতীক্ষা করে।

ঝিঁঝি পোকাগুলি নালিকুলের জঙ্গলের নীরবতাকে ক্রমাগত শোষণ করছে। গাছের ফাঁক-ফোকর দিয়ে আলোর রেখাগুলি বনভূমিতে এসে পড়ে নিবারণকে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত করছে। নিবারণের এই বনভূমিতে প্রথম আসা। শ্বাপদসংকুল নালিকুলের জঙ্গলেই কী তা হলে তার অনুজ অনন্তের বসবাস। জমির কাছে নুয়ে আসা, বাঁশপাতাগুলোর সবুজ চাটছে খুদেকায় শামুক। বনভূমির এই জলাশয়গুলিতেই আছে নিবারণের স্বপ্নের মাছ কালিবাউশ। মাছগুলির পিঠে শ্যাওলা পড়েছে। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রে মাছগুলো ভেসে উঠলে জোনাকিরা স্থলপিঠ ভেবে মাছগুলোর শ্যাওলাময় পিঠে আটকে যায়। আর উড়ে যেতে পারে

না। নিবারণের মনে হয়, হাজার হাজার মৃত জোনাকির পাথর জলাশয়ের গভীরতাকে আলোকিত করে রেখেছে।

নোয়ানো একটি বেলগাছের ডালে নিবারণ আচমকা ধাক্কা খেলো। পাঁজরে দমকা আঘাতটি সহ্য করতে না পেরে উঃ বলে যন্ত্রণায় বসে পড়ল। দুই হাত দিয়ে বুক চেপে। গোঙাতে থাকল। খড়মজোড়া হেসে উঠল। নিবারণ অস্ফুট স্বরে বাবা গো...বাবা গো বলে।

— এই যন্ত্রণাটি তোমার একার। কী হল? বসেই থাকবে নাকি? এই বনভূমিতে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে কার সহানুভূতি আশা করছ? এসো, আমাকে অনুসরণ করো।

— দমবন্ধ হয়ে আসছে যে।

— সামান্য এতটুকু পথ দেখে আসতে পারলে না। আঘাত পেলে। তা হলে ভেবে দ্যাখো, তোমার অনুজ অনন্ত এই মহাপৃথিবীর কত পথ অতিক্রম করছে, গাছে গাছে বছরের পর বছর কাটিয়ে যাচ্ছে, কোনো আঘাত পায় না।

— আমাকে দয়া করুন। ক্ষমা করুন। আমি যে উঠতেই পারছিনে। হাঁটব কী করে?

— চেষ্টা করো।

— নিজের দৈহিক শক্তিকে বিশ্বাস করতে পারছিনে।

— এইভাবে ভেঙে পড়লে অনুসরণের উদ্দেশ্যই যে মাটি হবে।

— দোহাই, আমাকে দয়া করুন।

— দয়া! খড়মজোড়ার অট্টহাসি।

নিবারণ বিরক্ত হল। ভাবল, এই বৈশাখী সকালে কেন এই বিভ্রম? কেন এই আলেয়ার পিছনে পিছনে ছুটে চলা? নিবারণ অসহায়!

— আপনি আমাকে বিভ্রান্ত করছেন?

— বিভ্রান্ত?

— আজ্ঞে।

— আত্মজকে কেউ বিভ্রান্ত করে?

— আপনি মৃত।

— আমি শুধু অস্তিত্বহীন।

— আপনার পিণ্ডশ্রাদ্ধের সময় নিশ্চয়ই কোনো ত্রুটি হয়েছিল বলেই আপনি বিলীন হননি। আপনি তাই কখনো স্পষ্ট আবার কখনো অস্পষ্ট, খড়মের রূপ নিচ্ছেন, এই বিভ্রান্তির মানে কী?

— অনুসরণ।

— অনুসরণ যদি বিভ্রান্তি হয়, তা হলে বারে বারে অনুসরণের আদেশ কীসের জন্য?

— সংশয়, বিভ্রান্তি না থাকলে এই জগৎসংসার অচল। বিভ্রান্তিই অবশেষে সমস্ত সংশয় মিথ্যাকে দূর করে। অনুসরণ একটি অভ্যাস। আত্মজ, আমি তোমাকে দয়া করলাম। তুমি এখনো অনুসরণের যোগ্যতা অর্জন করোনি। কিন্তু তোমাকে যোগ্যতা অর্জন করতেই হবে।

— আদেশ করুন। কীভাবে?

— ফিরে যাও। চাঁদার বিলের মাঠ অতিক্রম করো। সেনের আড়া অঞ্চলের পশ্চিমকোণে একটি বাবলা গাছ দেখতে পাবে। কিন্তু সেই বাবলা গাছটিকে স্পর্শ করতে হলে পঞ্চাননতলায় এসে দেখবে অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় একটি গর্ত আছে। সেই গর্তের ভিতরে একটি মসৃণ পাথর আছে। এই পাথরটিকে তোমার পূর্বপুরুষরা বহু সময়ের ব্যবধানে ব্যবধানে মসৃণ করেছে। পাথরটিকে স্পর্শ করে বলবে আমি সেনের আড়া অঞ্চলের বাবলা গাছটির দখল নিতে চাই। এই গাছের কাঠ দিয়ে তুমি লাঙল বানাবে। পাথরটিকে স্পর্শ করলে তোমার পূর্বপুরুষরা তোমাকে লাঙল বানানোর অনুমতি দেবে। এই লাঙল কোনোদিন ভাঙবে না। ক্ষয়ও হবে না। চার পাঁচ পুরুষ ধরে সেই লাঙল চাষের কাজে লাগবে।

নিবারণ অবাক হয়ে বলল — তা হলে কী আমার লাঙল বিদ্যায় কোনো ত্রুটি ছিল?

— না। লাঙল তুমি ঠিকই বানিয়েছ কিন্তু সেই লাঙলগুলির প্রাণশক্তি অল্পকালের জন্য। দীর্ঘকালের জন্য লাঙল বানাতে হলে একবার সেই পূর্বপুরুষদের স্মরণ করতে হবে। যাঁরা চাষের জমিকে প্রথম লাঙল দিয়ে কর্ষণ করেছিলেন। তুমি একজন দক্ষ লাঙল কারিগর কিন্তু তোমার, ঐতিহ্যের প্রতি আরো গাঢ় শ্রদ্ধা-ভক্তির প্রয়োজন।

— কিন্তু?

— লাঙল বানাতে বানাতে একদিন অনেক বছর পরে অনুসরণের উদ্দেশ্য জানতে পারবে, তখন আমাকে স্মরণ করবে। তখন হয়তো খড়মজোড়া হয়ে নয়, পাখি হয়ে অথবা কোনো দিঘিতে, বিলে ভাসমান নৌকোরূপে আসতে পারি।

সাহিত্যের জন্য এবার নোবেল পুরস্কার পেলেন নাট্যকার হ্যারল্ড পিন্টার। ২০০২ সালে ৯ সেপ্টেম্বর, এডিনবরায় আন্তর্জাতিক পুস্তকমেলায় পিন্টারের এই অতি মূল্যবান প্রকাশ্য সাক্ষাৎকারটি বহু শ্রোতার উপস্থিতিতে নিয়েছিলেন রামোনা কোভাল আদ্যোপান্ত রাজনীতিমনস্ক ও মানবতাবাদী পিন্টার জীবনে যত সাক্ষাৎকার দিয়েছেন তার মধ্যে এই সাক্ষাৎকারটির গুরুত্ব অপরিসীম। ক্যানসার থেকে বেঁচে ওঠার সংগ্রামই শুধু নয়, আমেরিকা, বিশেষত বুশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে এমন তীব্র কঠোর সমালোচনা ও ঘৃণা বোধহয় পৃথিবীর আর কোনো লেখকই সমসময়ে করেননি।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

কবিতা
সাক্ষাৎকার
গ্রন্থপঞ্জি

Internet Link (Interview) : 15-9-2002 Harold Pinter.htm
Website & Internet Link (Bibliography) : nobel prize.org/bibliographical notes.htm

Harold Pinter has been diagnosed with cancer of the oesophagus.
Below is a poem published exclusively in the *Guardian*

Thursday March 14, 2002
The Guardian

Cancer Cells

"Cancer cells are those which have forgotten how
to die" - nurse, Royal Marsden hospital
They have forgotten how to die
And so extend their killing life.

I and my tumour dearly fight.
Let's hope a double death is out.

I need to see my tumour dead
A tumour which forgets to die
But plans to murder me instead.

But I remember how to die
Though all my witnesses are dead.
But I remember what they said
Of tumours which would render them
As blind and dumb as they had been
Before the birth of that disease
Which brought the tumour into play.

The black cells will dry up and die
Or sing with joy and have their way.
They breed so quietly night and day,
You never know, they never say.

© Harold Pinter

Legendary British writer, director and political activist **Harold Pinter** reveals his fight against cancer — and how it has influenced his work — to **Ramona Koval** at the **Edinburgh International Book Festival** on **Sunday 15/9/2002** in presence of selected audience.

Ramona Koval: And that was the legendary genius of British theatre: playwright, poet, director, actor, screenwriter, prose writer and political activist, Harold Pinter; who joins us in the second of our series from the Edinburgh International Book Festival.

Harold Pinter's plays, from the earliest, like *The Birthday Party* or *The Dumb Waiter*, to his most recent, like *Celebration* and *Ashes to Ashes*, have been so influential in theatre all over the world, that the word 'Pinteresque' has appeared in the lexicon to describe the particular menace of stripped-down language and pregnant pauses that characterise his work. The conversation you're about to hear was recorded at the David Cohen British Literature Prize event at the Festival. And Harold Pinter is one of a very small, distinguished group of British writers who have won this prestigious prize.

One aspect of the award—for a lifetime's achievement—is that the winner is given ten thousand pounds to pass on to a person or institution that they wish to support or encourage. When Harold Pinter won it, he gave it to the Citizens' Theatre of Glasgow, which championed his work at a crucial time for him.

And recently Harold Pinter has been through another crucial time. He's just recovered from major surgery for cancer of the oesophagus. In March this year he published a poem in the *Guardian* newspaper called 'Cancer Cells', which described the fight between Pinter and his cancer; his need to see the tumour dead. When I spoke to Harold Pinter in Edinburgh, I began by calling the poem 'a call to arms' against his cancer.

Harold Pinter: Yes, I wrote the poem when I was having chemotherapy. And you know in chemotherapy you sit there where the nurse just puts the thing into your arm. The chemo. And she suddenly said this, this particular nurse said, Cancer cells are those which have forgotten how to die. I was so struck by this statement that I went away and wrote that poem. Because at the time I didn't know whether I was going to die or not. And that poem, I think, represents precisely, I hope, what I felt at the time. I had no idea what was going to happen, and in fact it's been quite a year from that point of view. The stanza there says, 'I need to see my tumour dead / A tumour which forgets to die / But plans to murder me instead.' And in fact I'm happy to say that I have seen my tumour dead. [applause]

And in reference to that experience, I want to take my hat off to the surgeon who actually did it. A remarkable man, as these surgeons of course are. And my wife, who's been quite wonderful throughout the whole experience, in support of me. [applause]

I think you need two kinds of things to survive when you have a disease like this. One is, you need a brilliant surgeon; and the other is you need a brilliant wife. And I was very fortunate in having both. So the whole thing, honestly, Ramona, remains a kind of dark dream, for me. It was like being in a pretty impenetrable forest in which you literally couldn't see the wood for the trees. In other words, I had no idea what was going on half the time, during this operation, and coming out of the operation—you see I'd never been ill in my life before, really—so it was quite extraordinary at the age of seventy-one to suddenly find myself in hospital facing a very severe cancer and a major operation. And it was something I hadn't even considered. I found myself, as I say, in a very dark world which was impossible to interpret. I couldn't work it out. So for two or three weeks I was somewhere else. I was in another place altogether. Not very pleasant, I must say.

Ramona Koval: Do you mean post-operatively?

Harold Pinter: Post-operatively, yes. I didn't quite know where I was. And certainly not what I was—if I was anything at all. And it was really only very, very gradually—I don't know if anyone here has had this kind of experience, I'm sure there are one or two people who have—it's like being plunged into, well, I'll give another image, an ocean in which you can't swim. You've no idea how to get out of it and you simply float about and bob about and are hit by terrible waves and so on, and it's all very dark, really. Anyway, the thing is, here I am.

Ramona Koval: When people go through the experience that you've had, they often think about time and urgency and priorities. Even with your famed energy, have you found that there are some kinds of work that you want to do now more than other kinds of work? Politics more than writing, or poems rather than plays or prose?

Harold Pinter: I think the main bearing on my life at the moment is simply to survive. To remain. To remain here. That's been my main concern. And that comes down to very simple facts. How you use your energy, and as your energy grows, very gradually, how you actually dispose of it. And also one's diet and so on. My wife keeps a very close eye on that.

I have written one poem, by the way, since that. So occasionally it does hit me, the words on a page. And I still love doing that, as I have for the last sixty years, really. That excitement—I wrote a poem a couple of weeks ago and that excitement remains when I looked at the yellow

page, very late, midnight one night in fact—and suddenly started to write. A very short piece of work, but a short piece of work means as much to me as a long piece of work. So I hope that next year will be fuller and better because I'm feeling stronger.

Ramona Koval: Do you think you are changing through this experience, do you think the essential Harold Pinter-ness of you is changing?

Harold Pinter: I think one is changed by it, without any question. I'm more conscious of death, really. I'm also more...for many, many years, I've been very politically engaged, and quite passionately so. But now I am no less passionately engaged, but nevertheless I think I've come out of this experience with a more detached point of view, actually. I can somehow find I'm seeing the world more objectively, rather than being—I am part of it but I'm outside it, too, and can be a witness to various things—which still are as important as ever, but a witness rather than being right in the maelstrom of it all.

Because the point is, of course, one is and is not in the centre of the maelstrom of it all. In other words what I mean by that is that we are not, for example, here in Edinburgh being bombed at this moment. We don't lose our sons and our daughters and our mothers and so on. They're not blown up by some external force. Although I have to say that I was brought up in the War. I was an adolescent in the Second World War. And I did of course witness in London a great deal of the Blitz and was therefore part of that experience. I didn't actually see anybody killed, but I saw where bombs had fallen and I was part of that world of bombs dropping. But now, the last fifty years, I haven't been, nor has anybody who lives in Edinburgh or London and so on—but many other people have, in the world, as you know. And so therefore I say that one is still part of—out of one's consciousness and out of one's recognition—of other people's reality, and what happens, what death actually means to other people. And also slightly at the side of it, because it hasn't actually happened to us.

This is what of course has been extremely significant about what happened in New York last September, because suddenly those people, who didn't know they were part of it, found they were part of it. Not only part of it, but actually central to it. And those poor people who were killed in that horrifying event were undoubtedly, not only them—I ought not to speak about the dead, really, because the dead are all over the place and it always remains the same thing. They are dead. They've been murdered. But it's their relatives, for example, those people who mourn the dead. For the Americans it was obviously a very, very new experience,

whereas it is not a new experience for people in Central and South America and Asia and India and all over the damn place, really.

Ramona Koval: You spoke before about the joy you had in writing that latest poem, and obviously language has been your passion, really, all your life. And then just relating the idea of war and the use of words in war—and I know that the abuse of language and meaning is something that has incensed you over the years—you and George Orwell, actually—phrases like 'humanitarian intervention' and 'civilised world.' And I wondered about the use of the term 'axis of evil' over the last year—and one that we've all just begun to hear recently, and that's 'regime change', which I heard coming out of Washington a month ago or so, and I've heard again parroted by British politicians—almost like something that has a ring of the force of nature about it—a new concept. So I wondered if you would share your thoughts about those things.

Harold Pinter: My favourite of them all is the 'freedom-loving people'. When I hear Bush say, 'on behalf of all freedom-loving people,' you know, 'we are going to continue to fight terrorists,' and so on. I wonder what a freedom-hating people looks like. I've never actually met such a people myself, or can't even conceive of it. In other words, he's talking rubbish, and that is the kind of rhetoric which you're referring to, which is commonplace, really, in what we call the 'Western World,' isn't it? It happens every day of the damn week. And our governments spout this all the time, not really considering seriously, precisely what they're talking about.

In other words, I think that when you look at a man like our Prime Minister, who I gather is a very sincere and serious Christian, he, we understand, at the moment is considering another bombing of Iraq, which actually would be an act of murder—of pre-meditated murder. Because If you bomb Iraq, you're not just going to kill Saddam Hussein—you won't do that, anyway, he has his resources—but what you will do, is kill, as usual, thousands of totally innocent people.

And how Tony Blair can work that one out, morally, himself, as a Christian, is actually beyond me. I just wish he'd decide he was a Christian or he wasn't a Christian. If you say, 'I'm going to bomb these damn people and I don't give a shit,' then you bomb them. But that's not a Christian attitude as far as I understand. If you take a Christian posture, you cannot say that. So therefore you can't say, 'I'm going to murder thousands of innocent people,' and say, 'I remain a Christian,' because that is not a Christian stance, as I understand it. I'm not a Christian myself, so nevertheless...

But I think what we're talking about there is extraordinary, fundamental hypocrisy and a misunderstanding of language altogether—or a distortion

of language, or abuse of language—which is in itself extremely destructive, because language leads us, doesn't it, politically it leads us into all sorts of fields. It's the rhetoric which does that, and sometimes it works. It works in the sense that when Churchill in the War said, 'We will fight them on the...' you know, beaches and all that, I suppose the British public needed such a thing at the time, and it was quite useful—I suppose. I think it was.

But that's a very rare event, and what I find really dangerous and shall we say disgusting, is where the kind of language used recently—humanitarian intervention—don't forget freedom and democracy and all the rest of it—actually is justifying simply assertive acts to control power and keep power. Maintain power. And actually the question of destroying human beings while that is happening seems to be, to the powers that be, quite irrelevant. In fact it doesn't even begin to operate, or, as you know, all that happens is that the destruction of human beings—unless they're Americans—is called 'collateral damage.'

You know there's a little story, I must just tell you. It isn't really much of a story, but in the bombing of Serbia two years ago, there was an ordinary marketplace in a country village. And I'm actually reporting an eye witness to this event who was in the marketplace at the time. She saw a woman sitting with her five-year-old daughter on a bench in the marketplace having a sandwich. And out of the blue American bombs fell. The marketplace was chaos. About forty or fifty people were killed immediately. And this woman looked for her daughter, who'd been blown out of her arms, and saw the daughter's head in the gutter. Now that head of that little girl was never and would be never recognised by Prime Minister Blair or President Clinton. The death, and the cutting off of the head of the little girl would be totally irrelevant to those people. So therefore I contend that—and I really believe this to be so—that Clinton and Blair should be arraigned as war criminals, because not only did they do it illegally, illegitimately, in my view immorally, in my view criminally as a bandit act; they justified it by talking about 'humanitarian intervention.' And that kind of crap I think we've had enough of, don't you? [applause]

Ramona Koval: While we're talking about that region of the world, you have made interventions—speaking about the Milosevic trial, too—which have been misreported as 'Pinter defends Milosevic,' kind of thing. But that's actually not your position.

Harold Pinter: No, no, no. My position is that I think Milosevic should be given a fair trial. If he's to be tried, then it should be an impartial, objective trial. And clearly it cannot be the case here, because he's being tried essentially and effectively by NATO. NATO is paying for the court. Therefore it's a NATO court. It is, if you like, a victor's court and it cannot possibly be impartial.

Ramona Koval: So if he's found guilty as a war criminal by a court that you think is properly convened, you wouldn't have any bad feelings about that.

Harold Pinter: If it was a properly impartial and objective trial. But I repeat, however, I think that NATO is itself a war criminal, if you understand, as much as Milosevic is. But there's no way of NATO judging NATO. A NATO court is not going to put NATO up in the witness box. So I think there's something extremely unbalanced here and I think it really stinks, actually.

Ramona Koval: You're listening to Books and Writing on Radio National and Radio Australia, with British playwright, screenwriter, poet, actor and political activist Harold Pinter, whose interventions in the political world have tended to be treated in some areas of the press as a bit of a joke, a feeling that he takes himself too seriously; a kind of English alarm at the risk of public embarrassment from passionate belief and argument. I asked Harold Pinter how he reacted to this tendency in the press for, as we say in Australia, taking the piss.

Harold Pinter: I think it is something to do with that, but I think it's the fact that most of the press—when you come down to it—is in league with government, or with the status quo, shall we say. In a way they make their livings by being part of the status quo. Those who don't, who refuse to be part of the status quo—for example in this country John Pilger and in America Noam Chomsky—are really marginalised. And it's very easy for people to take the piss, because I think this is really fundamentally a lack of thought on their part. They're not really thinking, they're just reacting to the status quo, which they feel must be done to protect the status quo against people like me, for example. I can be a bit of a pain in the arse. And since I've come out of my cancer, I must say, I intend to be even more of a pain in the arse. [applause] Because I think it is the responsibility of a citizen of any country to actually say what he thinks. And I think what is really happening all over the world is that those millions and millions of people who have been given no chance to say what they thought at all because they are degraded, humiliated, oppressed—throughout the world—poverty-stricken with no chance of education or proper health facilities—are really the growing resistance to the way power manifests itself in the political and financial world.

Don't forget, politics—I'm sure you won't forget—that politics and finance are so inextricably involved it seems to me, and we see that now in the States, don't we, where these gigantic companies which have been proved corrupt and fraudulent and cost your ordinary person his pension and so on, are actually in league with government. Government

is part of that. And most of the people in the US Administration have been or are still businessmen. In other words you're looking at a government which is a business. And I think we're talking about big business in every respect here, at a level where when the United States talks about its 'interests' it actually means 'we will protect our interests.' What else does it mean but 'our financial interests.' Nothing more.

Ramona Koval: But Enron and these uncoverings of what actually goes on at big business, do you think it's going to actually be a body blow to economic rationalism?

Harold Pinter: Well I don't know what they're going to do about it. I think they'll probably protect themselves. I'm talking about those high executives and those people in government who are also in league will protect themselves to the ends of the earth. Whether any of those Enron people or the Worldcom people will ever actually be charged with anything is I think highly unlikely. Because they're all part of the same structure, the same enterprise; which is business.

Ramona Koval: It is huge. And maybe that's why people feel that they can't do anything about it. Why do you think that being passionate and speaking out as you do will make any kind of difference?

Harold Pinter: Well I've no idea what kind of difference it can possibly make, but I think it makes *some* difference, because I think that—I was referring just now to those millions of people who are totally forgotten. The poor, in other words. They are now saying, 'we will not be forgotten.' Well they've been trying to say that for years, but most of them have been murdered in the act of saying so. I'm convinced that one of the inspirations of the present day has been the Zapatista revolution in Mexico, which has been, on the whole, an extraordinarily peaceful revolution, but it's been an assertion which says, 'We are free and we will not obey your rules. We will not adhere to what you tell us to adhere to. We are totally poor. We have absolutely nothing, but we do have something, which is resolution and a determination to restore our dignity.'

And that is a force which is actually very strong. As I say, it'll be met, as always, by violence, which is the one way governments behave and the one way financial structures behave. Financial structures being also allied, I should say, to military structures. In other words, finance always has military at the back of it.

May I point out that the United States actually has military bases in over one hundred countries in the world. It actually also has about fifteen thousand soldiers in this country—I'm talking about Great Britain. There are at least fifteen bases in this country. They've been here for over sixty years, but nobody talks about it. We take it as read. But the fact is that

the Americans have taken a kind of power over the world—a stranglehold on the world—which is I think extraordinarily dangerous for the world.

And I must say one thing more about the United States, if not two things more. One is that while the United States—I find this very interesting—while it is the most powerful nation the world has ever seen, it is also the most detested nation that the world has ever known.

Ramona Koval: What's the evidence for that?

Harold Pinter: The evidence? Well, it's all over the world. This is what I've actually just been referring to. For example, what happened in New York was surely a representation, an expression of a profound force throughout the world. It wasn't just a group of random criminals. I find it much more significant that it was something to do with—a horrifying event and of course a very traumatic event which has called the attention of the world to it for obvious reasons, and horrifying indeed in itself—but it was not, as I say, something superficial. It wasn't something—they weren't soccer hooligans. This was a determined act of retaliation—against what? Against American power—quite obvious—and the way American power has asserted itself for many, many years. I'd like to say here though, that I do believe there are many Americans. I think most of the people I admire in America are—and some of my best friends are Americans

Ramona Koval: Who might they be?

Harold Pinter: Well Arthur Miller for example—Arthur Miller and a fellow called Donald Freed, Wallace Shawn and various other people. But they are pretty beleaguered over there. But I'd like to just quote an anecdote. I was in Nicaragua in about 1986 and I had to—this is the other side of America to the one I'm looking at at the moment—I came back from Nicaragua and I had to stay the night in Miami, to my irritation, but there was no way out of it. So I got to Miami airport and I saw the passport, immigration, and I saw a very, very big lady at the immigration desk. And I got into line and I said to myself, now she's going open my passport and say to me, 'What were you doing in Nicaragua?' And I said to myself, 'I'm really looking forward to this,' because my reply was going to be, 'It's none of your business.'

So I finally got to the desk and I opened my passport and she said, 'Are you *the* Harold Pinter?' And I said—totally thrown—'Yes.' And she said, 'Welcome to the United States.' So that's the other side of the coin, really. [laughter]

Ramona Koval: As I said, you've been a fighter all your life, from those early days confronting anti-Semitic gangs in East London as a boy to being a conscientious objector shortly afterwards, and so on

through your artistic and socio-political fight; and I'm wondering where that comes from. Do you think it comes from being from a working-class, immigrant, Jewish family?

Harold Pinter: I have no idea. I came from a pretty—I don't think so, really—because my family was pretty stable. My mother and father were born in England, by the way, in about 1902 and 1904; so they were here. They were English.

Ramona Koval: Were they really English, though?

Harold Pinter: Well they were English-Jewish. My grandparents came from a rather mysterious area which some call Odessa and others call Hungary. I have no idea. My wife is convinced that after a lot of research, and she's pretty good at research, that my family did actually come from Odessa. And she has pretty good evidence of that. However, I found that in the 1946 Olympics there was a Hungarian sprinter called Pinter. And I also know that—I've been told, anyway—one of my aunts believed that we were originally da Pinta in Portugal and that we were thrown out by the Spanish Inquisition. I wasn't quite sure whether they had a Spanish Inquisition in Portugal, but according to my aunt, they certainly did. [laughter]. And where they went from the Spanish Inquisition is rather misty, shall we say, so I'm not quite sure...Anyway, in short, my background is slightly misty. But my family, nevertheless, was a very stable and conventional Jewish family.

Ramona Koval: But that must have meant that they were always arguing and they always had a lot of opinions. Coming from one myself, I can say this.

Harold Pinter: They did, yes. They did argue a great deal, but I found myself out on my own quite early, really.

Ramona Koval: On a limb?

Harold Pinter: On a chosen limb. I decided to go out on a limb. You know, I had my Bar mitzvah when I was thirteen and I never entered a synagogue again. I've been to one or two marriages, I think, but I've never had anything to do with it.

Ramona Koval: Do you remember the part of the Torah that you had to read?

Harold Pinter: I do not. That's nearly sixty years ago.

Ramona Koval: You're with Books and Writing on Radio National and Radio Australia. One of Harold Pinter's most recent interventions in the political world was to be a signatory on a letter to the BBC about their daily program, *Thought for the Day*. This is where people of religious persuasions of all kinds get to give a little homily to the morning audience.

Pinter thought, along with others, that there should be a place for those with secular views on *Thought for the Day*. The BBC disagreed.

Why did you reject religion, then. Presumably you didn't realise that you wouldn't be able to go on *Thought for the Day* if you had. [laughter]

Harold Pinter: That is very true, yes.

Ramona Koval: But Tony Blair could, presumably.

Harold Pinter: Oh, he'd be a devil on *Thought for the Day*. [laughter] Yes. I can't wait, really.

Ramona Koval: But your father and your uncles actually sound to be a pretty manly, tough lot, sometimes. One uncle in particular a boxer. How did they understand this young man who wanted to be an artist?

Harold Pinter: Well when I was about fourteen I was writing a poem late one night in my kitchen. I was in love at the time—I was quite precocious, really—I was definitely in love with the girl down the road. Anyway, the night went on and I was tearfully writing this tearful poem and my father came in, about six o'clock in the morning ready to go to work. He was a working man. He left the house at six-thirty and came back at six-thirty—he was a tailor—and he said, 'What are you doing? Why aren't you in bed?' I tearfully looked up and said, 'I'm writing something.' And he said, 'Let me have a look,' took it and said, 'Oh well, carry on.' [laughter]

They were always actually very sweet and very supportive of my writing, my mother and father.

Ramona Koval: Were you their pride and joy?

Harold Pinter: Well I didn't have any sisters or brothers, so I must have been, really. [laughter] They were very concerned when I was a conscientious objector in 1948, because they didn't like the idea of a Jewish boy going to prison, at all. And I was prepared to do that, for what I saw—and still do see—as very good reasons. But I didn't, in fact. I had two tribunals and two trials and was fined both times by what appeared to be a civilised and sympathetic magistrate.

Ramona Koval: And your Dad paid.

Harold Pinter: My father managed to get the money to pay. He didn't have it. But I took my toothbrush along. But they didn't like that at all; they were very worried about that.

Ramona Koval: Did they give you advice? What kind of advice about life did they want to give you?

Harold Pinter: I wouldn't say they gave me advice. What they did was—they were desperate, actually, because it would have been a great

shame for them if I'd gone to prison, and they couldn't understand how a boy of eighteen, as I was, could possibly resist what you're supposed to do. At that time, in 1948, there was conscription here as you might remember, some of you, for National Service. And what my parents did was actually invite someone who became a very dear friend of mine, my school English master, to come along and try to persuade me to go into the Army. And he came to the house and said to my parents, 'I wouldn't bother to try to change Harold at all, if I were you. Just let him do exactly what he wants to do. If he wants to go to prison, he'll go whether you like it or not.' And I thanked him very much for that, actually.

Ramona Koval: So he recognised the essential you, that teacher.

Harold Pinter: Oh, he was a great fellow, yes. He was a great influence on my life. I remained very attached to him. He died a long time ago now, but he meant a great deal to me.

Ramona Koval: I read that when you were evacuated one time as a boy—you talked about the bombs dropping and being evacuated—you took your cricket bat with you. And this brings me to your love of cricket and your devotion to the game. I find it hard to actually work out—when I was thinking about you before I came here—how does the cricket and the theatre and the politics sit together?

Harold Pinter: Well, you know, one's life has many compartments and I find cricket a wonderfully civilised act of warfare, actually, if you like. And I also find it aesthetically very pleasing.

Ramona Koval: Why?

Harold Pinter: Why? Because it is. I also love the English countryside and cricket, as you know, normally takes place on a green field, with sometimes a blue sky, and trees and so on. And I find that extremely satisfying. I also actually love the game.

Ramona Koval: Aesthetically pleasing because they're all in white.

Harold Pinter: No, no, no. Not because they're all in white. Because of the shapes it takes—and makes. And the general environment of it. But I'm also fascinated by the details of the game, and I used to play myself, quite a lot. In fact I was the captain of my club for about five years. It nearly killed me, I must say.

Ramona Koval: I think you said, on your own cricketing style, 'I had little concentration, patience, or the most important thing of all: true relaxation; and my judgment was distinctly less than impeccable.'

Harold Pinter: That's being self-critical. I also said one or two other things there. I said I could also hit sixes off the back foot, which I used to

do, actually. So I could hit the ball very hard. Unfortunately fielders often got in the way and caught it.

Ramona Koval: Isn't cricket a game with a lot of rules and a lot of…

Harold Pinter: Yes, yes. Absolutely.

Ramona Koval: But for a rule-breaker, somebody who's bucking against the system all his life—that's what makes me confused about cricket. And you.

Harold Pinter: I've never been asked this question before.

Ramona Koval: Good! Excellent.

Harold Pinter: I like rules which are for the benefit of mankind. And I think there are some good rules and there are some lousy rules. And I think the cricketing rules are totally respectable. [laughter]

Ramona Koval: You accepted the Companion of Honour recently, but you did turn down John Major's offer of a knighthood. Now as a colonial, of course, I'm not familiar with the details of knighthoods and Companions, but tell me why you accepted one and rejected the other.

Harold Pinter: Well I thought they were two very, very different things. I found the offer of a knighthood something that I couldn't possibly accept. It wasn't just because it was from a conservative government, which it was at the time, but also from any government. In other words, this present government. Because firstly I found it to be somehow squalid, a knighthood. There's a relationship to government about knights. So many of them have given millions of pounds to government. I haven't done that myself and nor do I intend to if I had such a thing. But I also found being called 'Sir' rather silly.

But the main point was that I felt it was too close to government—that such an award was a 'government award'—whereas the Companion of Honour seems to me, only a few months ago, to be quite outside such considerations, and I regard it as an award from the country, if you like. After all, however critical I might or might not be about this country and what's going on here, and Tony Blair and so on and our relationship with America; nevertheless, (A), I like cricket, and (B), I do live in this country. And I've been living and working here for nearly sixty years, really—I'm talking about my earliest poems, when I say that—but actually professionally working for let's say fifty years. So I have really a very close relationship with the country in which I live. So the Companion of Honour I regarded as an award from the country for fifty years of work—which I thought was okay. I must say, I also received a letter about the Companion of Honour two days after I'd come out of hospital and I was feeling pretty awful, so it actually cheered me up. [applause]

Ramona Koval: Last year the Americans had a Pinter Festival at New York's Lincoln Centre. Nine Pinter plays and ten films for which you

wrote the screenplays, and you acted and directed and spoke at the festival. When you see a production as they did in New York of your first play, *The Room* from 1957, back-to-back with the play that you wrote in 2000, *Celebration*, what do you think about when you see those two together?

Harold Pinter: Well I was very excited by doing my new play, *Celebration*, which was only seen at the Almeida in London. It's been done in various other countries but not extensively here in England or Scotland. But *The Room* I wrote in 1957, yes, and I was really gratified to find that it stood up. I didn't have to change a word and it simply stood up. Somebody said to me—I don't know if you know it, probably not very many people do know it, but it takes place in a slum in London, and *Celebration*, my last piece of work, takes place in a very smart restaurant in London—and one of the actors said to me, 'You know, this is actually Islington then and now.' [laughter} And that's, I think, quite true.

Ramona Koval: Are you proud of that young man who decided to follow his heart and be an artist all those years ago—and do you see him as very different from the man who sits here now?

Harold Pinter: I don't think I've changed very much, really. I think I'm really still the same now. But many things have changed in my life. For the last twenty-seven years Antonia and I have been together and that has changed my life. It's a long time and it also seems to be extraordinarily short, because it seems to be only yesterday that we met. But that's made a great, great difference to my life. I think that also, interestingly, when Antonia and I were married finally in 1980, I inherited six step-children, you know. And now we have sixteen grandchildren, believe it or not, and since I was not only an only child myself but in my first marriage I have one child—one son—and that was it. Naturally, my life has been transformed from that point of view. In fact two of the grandchildren I think are here today, in this audience. So you see, that personally, domestically, my life has gone through an enormous transformation.

Ramona Koval: Do you think you're wise?

Harold Pinter: I never think of myself as wise, no. I think of myself really as possessing a critical intelligence which I intend to allow to operate. [laughter]

Ramona Koval: Now it's the audience's turn to ask some questions.

[audience member] : Do you find the messages that you're writing in your plays and the ideas that you're trying to get across to the audience are understood any better today than when you began?

Harold Pinter: I think that is so, yes. My second play, *The Birthday Party*, I wrote in 1958—or 1957, it was done in 1958, and I don't know if any of you know this, but it came off in one week at the Lyric,

Hammersmith. And it was totally destroyed by the critics of the day, who called it an absolute load of rubbish. Without any exception. One exception, a man called Harold Hobson, who wrote in the *Sunday Times* after the play had come off. And I remember going to the Wednesday matinee of the play when I knew it was going to come off, and I was a little bit late and I walked towards the dress circle and an usherette said to me, 'Where are you going?' And I said, 'Oh, I'm the author.' Because the curtain had gone up, you see. And she said, 'Oh, are you? Oh you poor darling.' [laughter] People don't call me poor darling any more.

[audience member] : We've heard, and of course it's self-evident, your love of language and words. How important do you think grammar and spelling is in modern education?

Harold Pinter: I'm all for it. [laughter]

[audience member] : Mr Pinter, to what extend did Samuel Beckett influence and inspire you, either as a friend or as a writer?

Harold Pinter: I did find him an inspiration, no question about that. And I don't think that there's been any writer like Samuel Beckett. He's unique. When I first read his works—which were novels, by the way, I read his novels in about 1949-50—I thought, these novels are quite extraordinary. That's *Molloy*, *Malone Dies* and *The Unnamable*. But I was writing myself at the time, and it was curious, I think I simply felt some kind of relationship with what he was writing. Although I wouldn't compare myself at all. As I say, I think he's out on his own, really. But later, when I got to know him and became a friend of his—this is another way of answering your question I think—we became very friendly.

He was a most charming man and I used to send him my plays. He sent me his, too, as a matter of fact. But I remember one play I sent him, *Old Times*, and he sent me one of his famous cards, saying he liked it very much—very short—indeed, loved the last line, and this that and the other, but he said, 'If I were you, I'd look at speech 5 page 6.' And I said, 'What?' I looked at speech 5, page 6, and said to myself, 'Well what the hell's wrong with speech 5, page 6? There's nothing wrong with it at all and I don't know what he's talking about, really.'

So the play went into rehearsal with Peter Hall directing and I went away for a couple of weeks and came back and asked Peter how it was going. He said, 'It's going very, very well; wonderfully. But we're having a problem with one speech.' And I said, 'Cut it.' And I knew; I said, 'Beckett you are, as always, absolutely on the nail.' And that speech has never seen the light of day. So he had an unerring light on things which I much appreciated.

Ramona Koval: Harold Pinter. His most recent poems appeared in the London *Guardian* newspaper of 28 August 2002.

Biobibliographical Notes

Harold Pinter was born on 10 October 1930 in the London borough of Hackney, son of a Jewish dressmaker. Growing up, Pinter was met with the expressions of anti-Semitism, and has indicated its importance for his becoming a dramatist. At the outbreak of the Second World War, he was evacuated from London at the age of nine, returning when twelve. He has said that the experience of wartime bombing has never lost its hold on him. Back in London, he attended Hackney Grammar School where he played Macbeth and Romeo among other characters in productions directed by Joseph Brearley. This prompted him to choose a career in acting. In 1948 he was accepted at the Royal Academy of Dramatic Art. In 1950, he published his first poems. In 1951 he was accepted at the Central School of Speech and Drama. That same year, he won a place in Anew McMaster's famous Irish repertory company, renowned for its performances of Shakespeare. Pinter toured again between 1954 and 1957, using the stage name of David Baron. Between 1956 and 1980 he was married to actor Vivien Merchant. In 1980 he married the author and historian Lady Antonia Fraser.

Pinter made his playwriting debut in 1957 with *The Room*, presented in Bristol. Other early plays were *The Birthday Party* (1957), at first a fiasco of legendary dimensions but later one of his most performed plays, and *The Dumb Waiter* (1957). His conclusive breakthrough came with *The Caretaker* (1959), followed by *The Homecoming* (1964) and other plays.

Harold Pinter is generally seen as the foremost representative of British drama in the second half of the 20th century. That he occupies a position as a modern classic is illustrated by his name entering the language as an adjective used to describe a particular atmosphere and environment in drama: "Pinteresque".

Pinter restored theatre to its basic elements: an enclosed space and unpredictable dialogue, where people are at the mercy of each other and pretence crumbles. With a minimum of plot, drama emerges from the power struggle and hide-and-seek of interlocution. Pinter's drama was first perceived as a variation of absurd theatre, but has later more aptly been characterised as "comedy of menace", a genre where the writer allows us to eavesdrop on the play of domination and submission hidden in the most mundane of conversations. In a typical Pinter play, we meet people defending

themselves against intrusion or their own impulses by entrenching themselves in a reduced and controlled existence. Another principal theme is the volatility and elusiveness of the past.

It is said of Harold Pinter that following an initial period of psychological realism he proceeded to a second, more lyrical phase with plays such as *Landscape* (1967) and *Silence* (1968) and finally to a third, political phase with *One for the Road* (1984), *Mountain Language* (1988), *The New World Order* (1991) and other plays. But this division into periods seems oversimplified and ignores some of his strongest writing, such as *No Man's Land* (1974) and *Ashes to Ashes* (1996). In fact, the continuity in his work is remarkable, and his political themes can be seen as a development of the early Pinter's analysing of threat and injustice.

Since 1973, Pinter has won recognition as a fighter for human rights, alongside his writing. He has often taken stands seen as controversial. Pinter has also written radio plays and screenplays for film and television. Among his best-known screenplays are those for *The Servant* (1963), *The Accident* (1967), *The Go-Between* (1971) and *The French Lieutenant's Woman* (1981, based on the John Fowles novel). Pinter has also made a pioneering contribution as a director.

This bibliography includes published works only.

Works in English

1. Plays (year of writing; year of publication; year of first performance)

The Room (1957) : in *The Birthday Party, and Other Plays*. – London : Methuen, 1960. – (Bristol, 1957)

The Birthday Party (1957) : in *The Birthday Party, and Other Plays*. – London : Methuen, 1960. – (Arts Theatre, Cambridge, 28 April 1958)

The Dumb Waiter (1957) : *The Birthday Party, and Other Plays*. – London : Methuen, 1960. – (Kleines Haus, Frankfurt, February 1959)

A Slight Ache (1958) : in *A Slight Ache and Other Plays*. – London : Methuen, 1961. – (Broadcast 1959)

The Hothouse (1958) : in *The Hothouse*. – London : Eyre Methuen, 1980. – (Hampstead Theatre, London, 24 April 1980)

The Caretaker (1959) : in *The Caretaker*. – London : Methuen, 1960. – (Arts Theatre, London, 27 April 1960)

A Night Out (1959) : in *Slight Ache and Other Plays*. – London : Methuen, 1961. – (Broadcast on the BBC Third Programme, 1 March 1960)

Night School (1960) : in *Tea Party and Other Plays*. – London : Methuen, 1967. – (Broadcast on Associated Rediffusion Television, 21 July 1960)

The Dwarfs (1960) : in *Slight Ache and Other Plays*. – London : Methuen, 1961. – (Broadcast 1960; New Arts Theatre, London, 18 September 1963)

The Collection (1961) : in *The Collection*. – London : French, 1963 (1962?) ; in *The Collection, and The Lover*. – London : Methuen, 1963. – (Televised 1961)

The Lover (1962) : in *The Collection, and The Lover*. – London : Methuen, 1963. – (Televised 1961)

Tea Party (1964) : in *Tea Party and Other Plays*. – London : Methuen, 1967. – (Eastside Playhouse, New York, October 1968)

The Homecoming (1964) : in *The Homecoming*. – London : Methuen, 1965. – (Aldwych Theatre, London, 3 June 1965)

The Basement (1966) : in *Tea Party and Other Plays*. – London : Methuen, 1967. – (Televised 1967)

Landscape (1967) : in *Landscape*. – London : Pendragon Press, 1968 ; in *Landscape, and Silence*. – London : Methuen, 1969. – (Broadcast 1968)

Silence (1968)	: in *Landscape, and Silence*. – London : Methuen, 1969. – (Aldwych Theatre, London, 2 July 1969)
Old Times (1970)	: in *Old Times*. – London : Methuen, 1971. – (Aldwych Theatre, London, 1 June 1971)
Monologue (1972)	: in *Monologue*. – London : Covent Garden Press, 1973. – (Televised on the BBC Television, 13 April 1973)
No Man's Land (1974)	: in *No Man's Land*. – London : Methuen, 1975. – (Old Vic, London 23 April, 1975)
Betrayal (1978)	: in *Betrayal*. – London : Eyre Methuen, 1978. – (National Theatre, London, November 1978)
Family Voices (1980)	: in *Family Voices*. – London : Next Editions, 1981. – (Broadcast on Radio 3, 22 January 1981)
Other Places (1982)	: in *Other Places : Three Plays*. – London : Methuen, 1982. – (Cottesloe Theatre, London, October 1982)
A Kind of Alaska (1982)	: in *A Kind of Alaska*. – London : French, 1982 ; in *Other Places : Three Plays*. – London : Methuen, 1982. – (Cottesloe Theatre, London, October 1982)
Victoria Station (1982)	: in *Victoria Station*. – London : French, 1982 ; in *Other Places : Three Plays*. – London : Methuen, 1982. – (Cottesloe Theatre, London, October 1982)
One for the Road (1984)	: in *One for the Road*. – London : Methuen, 1984. – (Lyric Theatre Studio, Hammersmith, March 1984)
Mountain Language (1988)	: in *Mountain Language*. – London : French, 1988 ; in *Mountain Language*. – London : Faber, 1988. – (National Theatre, London, 20 October 1988)
The New World Order (1991)	: in *Granta* (no 37), Autumn 1991. – (Royal Court Theatre Upstairs, London, 19 July 1991)
Party Time (1991)	: in *Party Time*. – London : Faber, 1991. – (Almeida Theatre, London, 31 October 1991)
Moonlight (1993)	: in *Moonlight*. – London : Faber, 1993. – (Almeida Theatre, London, 7 September 1993)
Ashes to Ashes (1996)	: in *Ashes to Ashes*. – London : Faber, 1996. – (Royal Court at the Ambassadors Theatre, London, 12 September 1996)
Celebration (1999)	: in *Celebration*. – London : Faber, 2000. – (Almeida Theatre, London, 16 March 2000)
Remembrance of Things Past (2000)	: in *Remembrance of Things Past*. – London : Faber, 2000. – (Cottesloe Theatre, London, 23 November, 2000)

Additional

The Proust Screenplay	: *À la recherche du temps perdu* / by Harold Pinter, with the collaboration of Joseph Losey and Barbara Bray. – New York : Grove Press, 1977
Poems and Prose 1949–1977	: – London : Methuen, 1978
The Dwarfs	: a novel. – London : Faber, 1990
Various Voices : Poetry, Prose, Politics, 1948–1998	: London : Faber, 1998
Collected Screenplays	: 1. – London : Faber, 2000. – Content : The Servant, The Pumpkin Eater, The Quiller Memorandum, The Accident, The Last Tycoon, Langrishe Go Down
Collected Screenplays. 2	: – London : Faber, 2000. – Content : The Go-Between ; The Proust Screenplay ; Victory ; Turtle Diary ; Reunion
Collected Screenplays. 3	: – London : Faber, 2000. – Content : The French Lieutenant's Woman ; The Heat of the Day ; The Comfort of Strangers ; The Trial ; The Dreaming Child
The Disappeared and Other Poems	: – London : Enitharmon, 2002
Press Conference	: – London : Faber, 2002
War : [*Eight Poems and One Speech*]	: – London : Faber, 2003

Works in French

C'était hier / traduit de l'anglais par Éric Kahane	: – Paris: Gallimard, 1971. – Traduction de: Old Times
No man's land ; suivi de *Le monte plat* ; *Une petite douleur* ; *Paysage* ; et de *Dix sketches* / adaptation française d'Éric Kahane	: – Paris: Gallimard, 1979
La collection ; suivi de *L'amant* ; et de *Le gardien* / trad. de l'anglais par Éric Kahane	: – Paris: Gallimard, 1984. – Traduction de: The Collection ; The Lover ; The Caretaker

L'anniversaire / trad. de l'anglais par Éric Kahane : – Paris: Gallimard, 1985. – Traduction de: The Birthday Party

Le retour / trad. de l'anglais par Éric Kahane : – Paris: Gallimard, 1985. – Traduction de: The Homecoming

Trahisons ; suivi de *Hothouse* ; *Un pour la route*: et autres pièces / adapt. française d'Éric Kahane. : – Paris: Gallimard, 1987

La lune se couche ; suivi de *Ashes to Ashes* ; *Langue de la montagne* ; *Une soirée entre amis*: et autres textes / trad. de l'anglais par Éric Kahane. : – Paris: Gallimard, 1998

Les nains : roman / trad. de l'anglais par Alain Delahaye. : – Paris: Gallimard, 2000. – Traduction de: The Dwarfs

Autres voix : prose, poésie, politique, 1948–1998 / trad. de l'anglais par Jean Pavans, Isabelle D. Philippe et Natalie Zimmermann. – Montricher: Éd. Noir sur blanc, 2001. : – Traduction de: Various Voices

La guerre / trad. de l'anglais par Jean Pavans. : – Paris: Gallimard, 2003. – Traduction de: War

Célébration ; *La chambre* / trad. de l'anglais par Jean Pavans. : – Paris: Gallimard, 2003

Le scénario Proust : À la recherche du temps perdu / by Harold Pinter avec la collaboration de Joseph Losey et Barbara Bray ; trad. de l'anglais par Jean Pavans. : – Paris : Gallimard, 2003. – Traduction de: The Proust Screenplay : À la recherche du temps perdu

Works in Swedish

Apart from anthologies no work by Harold Pinter has yet been published in book form in Swedish.

Works in German

Tiefparterre / Neu durchges. Fassung nach d. Übers. von Willy H. Thiem. : – Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1967. – Originaltitel : The Basement

Teegesellschaft / nach d. Übers. von Willy H. Thiem, d. Bühnen gegenüber Ms. : – Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1968. – Originaltitel: Tea Party

Dramen / Neu durchges. Fassung nach d. Übers. von Willy H. Thiem u.a. : – Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1970

Alte Zeiten ; *Landschaft* ; *Schweigen : 3 Theaterstücke* / Dt. von Renate u. Martin Esslin. : – Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1972

Betrogen / Dt. von H. M. Ledig-Rowohlt. : – Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1978. – Originaltitel : Betrayal

Das Treibhaus / Dt. von Heinrich Maria Ledig-Rowohlt. : – Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1980. – Originaltitel: The Hothouse

Der stumme Diener : ausgew. Dramen / Übers. aus d. Engl. von Willy H. Thiem ... Ausw. u. Nachw. von Klaus Köhler. : – Leipzig : Insel-Verlag, 1981

Familienstimmen / Dt. von Heinrich Maria Ledig-Rowohlt. : – Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Theater-Verlag, 1981. – Originaltitel: Family Voices

Einen für unterwegs / Dt. von Heinrich Maria Ledig-Rowohlt. : – Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Theater-Verlag, 1984. – Originaltitel: One For the Road

Genau / Dt. von Heinrich Maria Ledig-Rowohlt. : – Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, Theater-Verlag, 1986. – Originaltitel: Precisely

An anderen Orten : 5 neue Kurzdramen / Dt. von Heinrich Maria Ledig-Rowohlt. : – Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1988

Die Geburtstagsfeier ; *Der Hausmeister* ; *Die Heimkehr* ; *Betrogen.* : – Nach den Übers. von Willy H. Thiem. – Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1990

Die Zwerge : Roman / Dt. von Johanna Walser und Martin Walser. : – Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1994. – Originaltitel : The Dwarfs

Mondlicht und andere Stücke. : – Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2000

Krieg / Aus dem Engl. von Elisabeth Plessen und Peter Zadek. : – Hamburg : Rogner und Bernhard bei Zweitausendeins, 2003. – Originaltitel : War

Literature (a selection)

Hayman, Ronald, *Harold Pinter.* : – London : Heinemann, 1968

Esslin, Martin, *The Peopled Wound : the Plays of Harold Pinter* : – London : Methuen, 1970

Hollis, James Russell, *Harold Pinter : the Poetics of Silence.* : – Carbondale, Ill. : Southern Ill. U.P., 1970

Hinchliffe, Arnold P., *Harold Pinter.* : – Boston : Twayne, 1981

Dukore, Bernard Frank, *Harold Pinter.* : – London : Macmillan, 1982

Harold Pinter : You Never Heard Such Silence / edited by Alan Bold. : – London : Vision, 1985

Harold Pinter : Critical Approaches / edited by Steven H. Gale. : – Rutherford : Fairleigh Dickinson Univ. Press, 1986

Harold Pinter / edited and with an introduction by Harold Bloom. : – New York : Chelsea House Publishers, 1987

The Pinter Review : Annual Essays / edited by Francis Gillen and Steven H. Gale. : – Tampa, Fla : University of Tampa, 1987 –

Merritt, Susan Hollis, *Pinter in Play : Critical Strategies and the Plays of Harold Pinter.* : – Durham : Duke University Press, 1990

Esslin, Martin, *Pinter the Playwright.* : – London : Methuen, 1992

Gussow, Mel, *Conversations With Pinter.* : – New York : Limelight Editions, 1994

Knowles, Ronald, *Understanding Harold Pinter.* : – Columbia, S.C. : University of South Carolina Press, 1995

Regal, Martin S., *Harold Pinter : a Question of Timing.* : – London : Macmillan, 1995

Billington, Michael, *The Life and Work of Harold Pinter.* : – London : Faber, 1996

Jalote, Shri Ranjan, *The Plays of Harold Pinter : a Study in Neurotic Anxiety.* : – New Delhi : Harman, 1996

Peacock, D. Keith, *Harold Pinter and the New British Theatre.* : – Westport, Conn. : Greenwood Press, 1997

Harold Pinter : a Celebration / introduced by Richard Eyre. : – London : Faber, 2000

Prentice, Penelope,
The Pinter Ethic : the Erotic Aesthetic. : – New York : Garland, 2000

Pinter at 70 : a Caseboook / edited by Lois Gordon. : – New York : Routledge, 2001

Gale, Steven H.,
Sharp Cut : Harold Pinter's Screenplays and the Artistic Process. : – Lexington : University Press of Kentucky, cop. 2003

The Art of Crime : the Plays and Films of Harold Pinter and David Mamet / edited by Leslie Kane. : – New York : Routledge, 2004

Smith, Ian, *Pinter in the Theatre.* : – London : Nick Hern, 2005. – New York : Routledge, 2004

Baker, William, & Ross, John C.,
Harold Pinter : a Bibliographical History. : – London : The British Library ; New Castle, DE : Oak Knoll Press, 2005

Batty, Mark,
About Pinter : the Playwright and the Work. : – London : Faber, 2005

ক্রান্তিকাল

কাহিনী

প্রফুল্ল রায়

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

শেখর দাশ

প্রসঙ্গ : ক্রান্তিকাল

শেখর দাশ

'মহুলবনীর সেরেঞ' নামের একটি ফিল্ম। তার চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলাম। মূল অনুপ্রেরণা ছিল 'বিষয়বস্তু'ই। অনেকদিনের, অনেক দেখা চিত্ররূপের অনুপ্রেরণায় সেই ফিল্ম তৈরি হয়েছিল।

আবার যদি কোনো বিষয়বস্তু, যা নিয়ে ভেবেছি কিংবা অবচেতনে কাজ করে চলেছে, তাকে কেন্দ্র করে আখ্যান পাওয়া যায়, তখন আবার ফিল্ম করার কথা ভাবা যাবে। যতদিন না পাওয়া যাচ্ছে বরং ঘুমাই।

ইতিমধ্যে দু-একজন প্রযোজক যোগাযোগ করেন কিন্তু তাঁদের জানিয়ে দিই বিষয়বস্তুর অভাব নেই, কিন্তু যে-বিষয় বর্তমানে প্রয়োজনীয় তেমন কিছু মস্তিষ্কে নেই। সুতরাং টাকা পাচ্ছি বলেই ছবি করতে হবে, মানে নেই। সুতরাং আলসেমি ও দিবানিদ্রায় দিন কাটছিল। হঠাৎই শ্রদ্ধেয় প্রফুল্লদার 'ক্রান্তিকাল' উপন্যাসটি আমার হাতে আসে। প্রায় ঈশ্বর প্রদত্তই বলা যায়। উপন্যাসটি পড়ার কিছুদিনের মধ্যেই একটি পুরো চলচ্চিত্রের অস্পষ্ট ছবি ভেসে ওঠে। তাকে স্পষ্ট করে তোলার ইচ্ছেতেই 'ক্রান্তিকাল' ফিল্ম হয়ে ওঠে। মাত্র আড়াই মাসে চলচ্চিত্রটি সম্পূর্ণ হয়।

'মহুলবনীর সেরেঞ' উপন্যাসটি আমার সঙ্গে ছিল দশ বছরের বেশি। ফিল্ম করার সময় খুব সচেতন ছিলাম যাতে তথাকথিত চলচ্চিত্র-ব্যাকরণের ছায়া ওই ছবিতে না পড়ে। অর্থাৎ চলচ্চিত্রকারের স্বাভাবিক প্রবণতাগুলিকে বাদ দিয়েছিলাম, তাই দীর্ঘ সময় লেগেছিল।

'ক্রান্তিকাল'-এ তা হয়নি। হয়তো 'ক্রান্তিকাল'-এর বিষয়বস্তু এমনই — যা আমার মনে হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই যে-পথ নেওয়ার নিক। তাই 'ক্রান্তিকাল' আমার কাছে খুব সহজে নির্মিত ফিল্ম।

ইতিমধ্যেই ফিল্মটি দেশে-বিদেশে আদৃত ও পুরস্কৃত, কিন্তু কলকাতায় মুক্তি পাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেও মুক্তি পাচ্ছে না।

তাই রাহুল যখন 'ক্রান্তিকাল'-এর চিত্রনাট্য প্রকাশ করার কথা বলল, এক কথায় রাজি হই, কারণটা এরকম — থাক, অন্তত চিত্রনাট্যটা তো মুক্তি পাক। ফিল্মের কথা পরে ভাবা যাবে।

তবে আশা করা যায় 'ক্রান্তিকাল' নিশ্চয় দর্শকদের জন্য একদিন মুক্তি পাবেই।

প্রসঙ্গত

১) কোনো সিনেমার চিত্রগ্রহণের সময় যে-ক-টি shot নেওয়া হয় অন্তিম সম্পাদনার সময় সেগুলির নির্বাচিত অংশই ব্যবহৃত হয়। এখানে কেবলমাত্র ব্যবহৃত shot-গুলিরই ক্রমানুযায়ী নির্দেশ দেওয়া হল। দর্শক এভাবেই চলচ্চিত্রটি দেখবেন।

২) যেভাবে মুদ্রিত হল তাতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, কোন shot-এ এক বা একাধিক চরিত্র আছে। যেখানে বুঝতে অসুবিধা হতে পারে বলে আমাদের মনে হয়েছে, একমাত্র সেখানেই চরিত্র-নির্দেশ করা হল।

৩) সংক্ষিপ্তভাবে Camera movement সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যও এখানে দেওয়া হল।

৪) Off screen (O.S) -এর অর্থ, shot-এ সেই চরিত্রটি নেই, অথচ তার সংলাপ শোনা যাচ্ছে।

৫) সংলাপ বলার সময়ে দুটি শব্দ বা বাক্যের মধ্যে যে যতি দেওয়া হয়, তা বোঝাতে ত্রিবিন্দুচিহ্ন (...)-এর ব্যবহার করা হল।

৬) প্রতিক্রিয়া-সংক্রান্ত একটিই shot কখনো একাধিকবারও ব্যবহৃত হয়। একটি দীর্ঘ shot-কেও কখনো কখনো ভেঙে কয়েকটি ভাগে বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করা হয়। এইসব ক্ষেত্রে ওই টুকরোগুলিকে স্বাভাবিকভাবেই আলাদা shot-number দ্বারা চিহ্নিত করতে হয়েছে।

৭) সিনেমার সি.ডি. থেকে এই মুদ্রিত পাঠের চেহারা দিতে (প্রতিটি shot সংবলিত) আমার সময় লেগেছে প্রায় দু-মাস। এই সময়ে অসংখ্যবার নিয়েছি পরিচালক শেখরদার (শেখর দাশ) সস্নেহ পরামর্শ।

৮) চেষ্টা করা হয়েছে চিত্রনাট্য-মুদ্রণের যে আন্তর্জাতিক রীতি তার সঙ্গে যতটা পারা যায় পারম্পর্য রাখার। কতটা হল তা বিচার করার দায় পাঠকের।

রাহুল সেন

প্রধান কয়েকটি চরিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

শৌর্যেন্দ্র — প্রতাপপুরের রাজ্যপাট চলে যাওয়া বৃদ্ধ রাজা/সংগ্রাম — শৌর্যেন্দ্রর ছেলে/সুবর্ণা — সংগ্রামের পুত্রবধূ, অধ্যাপিকা/দেবী — সুবর্ণার মেয়ে/রাজীব — টেররিস্ট/বিমলেশ ও আদিনাথ — সুবর্ণার কলেজের সহকর্মী/হরেন ও মায়া — পরিচারক ও পরিচারিকা/মনোরমা — নারীবিকাশ কেন্দ্রের পরিচালিকা/মি.বসাক — পুলিশ ইন্সপেক্টর/তাপসী — নারীবিকাশ কেন্দ্রের কর্মী/ছবি, প্রতিমা ও মীনাক্ষী — উন্মাদিনী/পারুল — উন্মাদিনীর ছদ্মবেশে পুলিশকর্মী।

Scene : 1 (সময় : রাত্রিবেলা)

প্রতাপপুর রাজবাড়ি

Shot : 1/L.S.

প্রতাপপুর প্রাসাদের একটি বারান্দা।

Shot : 2/L.S.

প্রতাপপুর প্রাসাদের আরেকটি বারান্দা দিয়ে পরিচারিকা মায়া হেঁটে যাচ্ছে।

Shot : 3/M.L.S./(Camera on trolley:R/L)

ক্যামেরা আস্তে আস্তে বাঁদিকে এসে খাটে বসা শৌর্যেন্দ্র ও সুবর্ণাকে ধরে। সুবর্ণা অথর্ব বৃদ্ধ শৌর্যেন্দ্রকে খাইয়ে দিচ্ছে।

সুবর্ণা : আর একটু?

শৌর্যেন্দ্র মুখে একটা তৃপ্তিসূচক আওয়াজ করে না করেন।

Shot : 4/M.C.S./(Camera on trolley:R/L)

ক্যামেরা ডানদিক থেকে বাঁদিকে এসে সুবর্ণার মেয়ে দেবীকে ধরে। পিয়ানো বাজছে শোনা যায়। সঙ্গে সঙ্গে দেবী মাথা নাড়াচ্ছে।

Shot : 5/C.S./(Camera on trolley)

ক্যামেরা ধীরে ধীরে Tilt down হয়ে সংগ্রামের মুখ থেকে হাতে যায়। বোঝা যায় সংগ্রামই পিয়ানো বাজাচ্ছেন।

Shot : 6/M.S. to M.C.S./(Low angle)

সুবর্ণা সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে আসছে।

Scene : 2 (সময় : রাত্রিবেলা)

প্রতাপপুর প্রাসাদ সংলগ্ন জঙ্গল

Shot : 7/M.C.S./(Low angle)

কয়েকটি পুলিশ জিপ সামনের দিকে এগিয়ে আসছে।

Shot : 8/M.L.S.

একজন টেররিস্ট ডানদিক থেকে বাঁদিকে হাঁটছে।

Shot : 9/M.C.S./(Low angle)

পুলিশের জিপগুলো এগিয়ে আসছে। জিপ চলাচলের শব্দ শোনা যায়।

Shot : 10/M.L.S./(Low angle)

সেই টেররিস্ট বাঁদিক থেকে ডানদিকে হাঁটছে।

Shot : 11/M.C.S.

আস্তে আস্তে পুলিশের জিপগুলো একের পর এক থামতে শুরু করে।

Shot : 12/M.C.S./(Low angle)

পাশাপাশি এসে জিপগুলো এবার পুরোপুরি থামে।

Shot : 13/M.C.S./(Low angle)

তেরচাভাবে জিপের দরজা খুলে এবার একজন পুলিশ নামে।

Shot : 14/M.L.S.
টেররিস্ট Centre of frame-এ দাঁড়ানো।

Shot : 15/M.S./(Camera on trolley :L/R)
ক্যামেরা বাঁদিক থেকে ডানদিকে সরলে দেখা যায় পুলিশের জিপের হেডলাইট এক এক করে জ্বলে উঠছে।

Shot : 16/M.L.S./Same as Shot : 14
টেররিস্ট সতর্ক হয়ে যায়।

Shot : 17/M.S./(Camera on trolley)/Same as Shot : 15
জিপগুলোর হেডলাইট জ্বলছে।

Shot : 18/M.L.S./Same as Shot : 16
টেররিস্ট জঙ্গলের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে।

Shot : 19/M.S. /(Camera on trolley :R/L)
জিপ থেকে বন্দুকধারী পুলিশ নেমে আসে। টেররিস্টদের সঙ্গে গুলি-বিনিময় শুরু হয়।

Shot : 20/M.S. /(Camera on trolley :R/L)/(Low angle)
পুলিশেরা গুলি-বিনিময় করতে করতে এগিয়ে যায়।

Shot : 21/M.S./(Camera on trolley :T/F)
কোনাকুনিভাবে পুলিশেরা দাঁড়িয়ে আছে।

Shot : 22/M.S.
বহু পুলিশকে দলবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। গোলাগুলি চলতেই থাকে।

Shot : 23/M.C.S./(Low angle)
কয়েকজন পুলিশ মাটিতে পজিশন নেয়।

Shot : 24/M.L.S.
জঙ্গল থেকে টেররিস্টরা পুলিশের দিকে গুলি চালাচ্ছে।

Shot : 25/M.S.
গুলি বিনিময় চলতেই থাকে।

Shot : 26/M.L.S.
টেররিস্টরা একসঙ্গে পুলিশের উপর গুলি চালাচ্ছে।

Shot : 27/M.C.S./(Camera on trolley :T/F)
পুলিশেরা টেররিস্টদের সঙ্গে গুলি-বিনিময় করতে করতে এগিয়ে আসছে।

Shot : 28/M.S.
Centre of frame থেকে একজন টেররিস্ট গুলি চালাচ্ছে।

Shot : 29/M.C.S./(Camera on trolley :L/R)
পুলিশের কয়েকজন মাটিতে পজিশন নিয়ে গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছে। আস্তে আস্তে তারা উঠে দাঁড়ায়।

Shot : 30/M.S./Same as Shot : 28
আগের টেররিস্টটি Camera of frame থেকে এখনো গুলি চালিয়ে যাচ্ছে।

Shot : 31/M.S./Same as Shot : 29
এবার পুলিশেরা আবার বসে পড়ে।

Shot : 32/C.S.
স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি ছোঁড়া হচ্ছে।

Shot : 33/M.S.
গুলি খেয়ে একজন টেররিস্ট মাটিতে পড়ে যায়।

Shot : 34/M.L.S./(Camera on trolley :R/L)
পুলিশের বিরাট দল আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সামনে গুলি করতে করতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে।

Shot : 35/C.S.
গুলি-বিনিময়রত স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রের নলের মুখে আগুনের ঝলকানি।

Shot : 36/M.S./(Camera on trolley:R/L)
পুলিশের দল গুলি করতে করতে আরো এগিয়ে আসছে।

Shot : 37/M.S.
একজন টেররিস্ট Centre of frame থেকে গুলি করছে।

Shot : 38/M.S./(Camera on trolley:R/L)
পুলিশের দল আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ক্রমশ এগিয়েই আসছে।

Shot : 39/M.C.S.
বাঁদিক থেকে ডানদিকে যেতে একজন টেররিস্ট গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ে। আর একজন তার জায়গা নিয়ে পুলিশের দিকে গুলি চালাতে থাকে।

Shot : 40/M.C.S.
একজন পুলিশ গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটায়।

Shot : 41/M.S.
একজন টেররিস্ট এখনো গুলিবর্ষণ করে চলেছে।

Shot : 42/C.S.
আরেকজন পুলিশ গুলিবিদ্ধ হয়।

Shot : 43/M.S.
জঙ্গিটি এবার গুলিবর্ষণ করতে করতে Right frame out হয়।

Shot : 44/M.C.S.
গুলি-বিনিময়ের মধ্যে একজন টেররিস্ট Right of frame পালাতে থাকে। পেছনে আরো একজন টেররিস্ট।

Shot : 45/M.C.S.
টেররিস্ট গাছের আড়ালে আশ্রয় নেয়। বিস্ফোরণের তীব্র আভায় তার মুখ আলোকিত হতে দেখা যায়।

Shot : 46/M.C.S./(Camera on trolley :T/F)
ক্যামেরা দ্রুত জঙ্গলের ভেতরে এগোতে থাকে।
Shot : 47/M.S.
আরেকজন টেররিস্ট গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে যায়।
Shot : 48/M.C.S.
গাছের গুঁড়ির আড়ালে বসে থাকা টেররিস্টের মুখ আবার আলোকিত হয়।
Shot : 49/M.S.
গুলিগোলার আওয়াজের মধ্যে একজন টেররিস্ট গুঁড়ি মেরে একটু এগিয়ে গিয়ে গুলি করে।
Shot : 50/C.S.
একজন পুলিশ গুলিবিদ্ধ হয়।
Shot : 51/M.S.
গুলি এড়ানোর জন্য টেররিস্ট এবার মাটিতে গড়াতে শুরু করে।
Shot : 52/M.S.
আলোর ঝলকানিতে বোঝা যায় টেররিস্টের দু-পাশ দিয়ে গুলি বেরিয়ে যাচ্ছে।
Shot : 53/C.S.
পুলিশ মুখ দিয়ে গ্রেনেডের পিন খুলে সামনে ছুঁড়ে দেয়।
Shot : 54/M.L.S.
গ্রেনেডের বিস্ফোরণে জঙ্গলে আগুন ধরে যায়। সেই আলোতে একজন টেররিস্টকে ছুটে পালাতে দেখা যায়। এবার এক এক করে চরিত্রলিপি উঠে আসে।
Shot : 55

নবেল অ্যাসোসিয়েটের নিবেদন

Shot : 56

প্রফুল্ল রায়ের কাহিনী অবলম্বনে

Shot : 57

শেখর দাসের ছবি

Shot : 58

ক্রান্তিকাল

Shot : 59/M.C.S.
টেররিস্ট ডানদিক থেকে বাঁদিকে দৌড়ে পালাচ্ছে।
Shot : 60

রূপা গাঙ্গুলী

Shot : 61

শিলাজিৎ

Shot : 62

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

Shot : 63

হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়

Shot : 64

অলকানন্দা রায় ব্যানার্জি
ঋতা দত্ত চক্রবর্তী

Shot : 65

ছবি তালুকদার
বাসবদত্তা ঘোষ
মীনাক্ষী প্রামাণিক
রিমাশ্রী বিশ্বাস

Shot : 66

অশোক মুখোপাধ্যায়
রাজেশ শর্মা
প্রদীপ ভট্টাচার্য
শৈবাল বন্দ্যোপাধ্যায়

Shot : 67

ও নবাগতা
অর্কপ্রিয়া গঙ্গোপাধ্যায়
ঝিলম বন্দ্যোপাধ্যায়

Shot : 68

এবং
অর্জুন চক্রবর্তী

Shot : 69/M.S.
টেররিস্ট প্রাণপণে দৌড়চ্ছে।
Shot : 70

গীতরচনা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Shot : 71

নেপথ্য কণ্ঠসংগীত
ইন্দ্রনীল সেন
রাধিকা চক্রবর্তী

Shot : 72

শিল্প নির্দেশনা
সমীর কুন্ডু

Shot : 73

রূপসজ্জা

অনুপ গাঙ্গুলী

Shot : 74

প্রযোজনা নিয়ন্ত্রণ

তুষার হালদার

Shot : 75

প্রধান কর্মসচিব

স্বপন বড়ুয়া

পূর্ণেন্দু মল্লিক

Shot : 76

সহকারী চিত্রগ্রহণ

মানস গাঙ্গুলী

অরবিন্দ দলুই

Shot : 77

সহকারী শিল্প নির্দেশনা

অমিত দে

Shot : 78/M.S./Same as Shot : 69

টেররিস্ট প্রাণপণে দৌড়চ্ছে।

Shot : 79

প্রধান সহকারী পরিচালনা

ধ্রুব দত্ত

Shot : 80

শব্দ পরিকল্পনা ও শব্দ পুনর্যোজনা

অনুপ মুখার্জী

Shot : 81

সঙ্গীত

চিরদীপ দাশগুপ্ত

Shot : 82/M.L.S. to M.S.

পুলিশের জিপ সতর্কতামূলক সাইরেন বাজাতে বাজাতে বাঁদিক থেকে ডানদিকে চলে যাচ্ছে।

Shot : 83

সম্পাদনা

দেবকান্ত চক্রবর্তী

Shot : 84

চিত্রগ্রহণ

প্রেমেন্দুবিকাশ চাকী

Shot : 85

কার্যনির্বাহী প্রযোজক

চন্দন ভট্টাচার্য

Shot : 86

প্রযোজনা

সম্পা ভট্টাচার্য

Shot : 87/M.S.

জঙ্গলের মধ্যে দারুণ শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে চারিদিক আলোকিত হয়ে যায়।

Shot : 88/L.S.

পাহাড়ের গা থেকে চাঁদ উঠেছে। তার উপর শেষ টাইটেল-কার্ডটি ওঠে।

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

শেখর দাশ

Scene : 3 (সময় : রাত্রিবেলা)

প্রতাপপুর রাজবাড়ি

Shot : 89/L.S.

পাহাড়ের গা থেকে চাঁদ উঠেছে।

Shot : 90/M.S. to M.C.S./(Top angle)

টেররিস্ট , প্রতাপপুর রাজবাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে।

Shot : 91/L.S.

বারান্দা দিয়ে মায়া বাঁদিক থেকে ডানদিকে হেঁটে আসছে।

Shot : 92/L.S./(Camera on trolley :R/L)

বারান্দা দিয়ে সুবর্ণা হেঁটে আসছে।

Shot : 93/M.C.S./(Top angle)

টেররিস্টের পা-দুটো দেখা যায়। বোঝা যায় সে রাজবাড়িতে ঢুকছে।

Shot : 94/M.L.S.

সুবর্ণা বারান্দা দিয়ে হেঁটে আসছে।

Shot : 95/M.C.S. to M.S./(Low angle)

টেররিস্ট সিঁড়ি বেয়ে উঠছে।

Shot : 96/M.S. to M.L.S./(Camera on trolley :T/B & T/F)

ক্যামেরা বারান্দা দিয়ে এগোয়। এবার দরজা দিয়ে সুবর্ণা ঢোকে। ক্যামেরা পিছিয়ে থামের আড়ালে যায়। তারপর আবার সুবর্ণার সঙ্গে সঙ্গে চলে। হঠাৎ কারো পায়ের আওয়াজ পেয়ে সুবর্ণা ডাকে —

সুবর্ণা : মায়া... মায়া।

Shot : 97/M.C.S.

সুবর্ণার ঘরের দরজার সামনে হঠাৎই সেই টেররিস্ট (যাকে আমরা বাড়িতে ঢুকতে দেখলাম)

সুবর্ণার মাথায় রিভলভার ঠেকিয়ে, মুখে হাত চাপা দিয়ে দেবীর ঘরে (সুবর্ণার মেয়ে) ঠেলে ঢুকিয়ে দ্যায়।

Shot : 98/M.S. to M.C.S. to C.S./(Camera on trolley :T/F)

টেররিস্ট : Don't shout... just don't shout and answer my questions...এ-বাড়িতে কে কে থাকে... কে কে থাকে এ-বাড়িতে? (সুবর্ণা ভয়ে আতঙ্কে প্রায় বাক্‌রুদ্ধ) Just answer my question... I say... এ-বাড়িতে কে কে থাকে?

সুবর্ণা : কে আপনি? কী দরকার আপনার?

টেররিস্ট সোজা চলে যায় দেবীর কাছে। দেবীর গায়ে রিভলবার ঠেকায়। দেবী কেঁদে ফেলে। সুবর্ণা বাধা দিতে এলে তাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়।

দেবী (O.S.) : মা...

টেররিস্ট : No... আমি কিন্তু এখনো আমার উত্তর পাইনি। কে কে থাকে এ-বাড়িতে?

সুবর্ণা আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় উত্তর দেয় —

সুবর্ণা : আমার শ্বশুরমশায়, আমার দাদাশ্বশুর, আর দু-জন কাজের লোক।

টেররিস্ট : ঠিক বলছেন... Sure?

সুবর্ণা চুপ করে থাকে। টেররিস্ট রিভলভার নামিয়ে বলে —

টেররিস্ট : O.K. ... O.K. ... Fine।

Shot : 99/C.S.

টেররিস্ট : দেখুন আপনারা যদি Co-operate করেন, তা হলে আমি আপনাদের কোনো harm করব না।

Shot : 100/C.S.

সুবর্ণা চুপ করে থাকে। এইসময় হঠাৎ বাড়ির কলিংবেল বাজে।

Shot : 101/C.S.

টেররিস্ট : Who is that?

Shot : 102/C.S.

সুবর্ণা ভেবে পায় না কী বলবে।

Shot : 103/C.S.

টেররিস্ট : কে আসতে পারে?

Shot : 104/C.S.

সুবর্ণা : দেবীর মাস্টারমশায়। দরজা তো খোলাই ছিল। আপনি নিশ্চয়ই বন্ধ করে দিয়েছেন।

Shot : 105/M.C.S./(Camera on trolley :T/B)

সুবর্ণা দরজার দিকে এগিয়ে যায়। টেররিস্ট সামনে এসে দাঁড়ায়।

টেররিস্ট : কোথায় যাচ্ছেন আপনি?

সুবর্ণা : দরজা খুলে দিতে।

এইসময় ক্যামেরা অল্প Track-back করে।

টেররিস্ট : Don't try to act smart... O.K.... don't try to act smart... tell the master... listen, I don't want... I don't want any violence...ওকে বলে দিন সাতদিন আসতে হবে না... সাতদিন আসতে হবে না... because আমাকে থাকতে হবে।

সুবর্ণা : (অবাক হয়ে) কী বলছেন? ওর সামনে পরীক্ষা। মাস্টারমশায়...

টেররিস্ট : (দেবীর দিকে তাকিয়ে) She is a sweet girl... don't worry about her... please go... go... but don't take too much time... O.K. ... just one minute... just one minute.

সুবর্ণা চলে যায়। টেররিস্ট দেবীর কাছে এসে বলে —

টেররিস্ট : Can I sit?

দেবী ভয়ে কথা বলতে পারে না। টেররিস্ট দেবীর বিছানার একধারে বসে।

Shot : 106/M.C.S. to M.S.

সংগ্রাম পিয়ানো বাজানো শেষ করে, উঠে টেবিলে রাখা খোলা দাবার বোর্ডের পাশে রাখা অনেক পাইপের মধ্য থেকে একটি বেছে নেন এবং ইজিচেয়ারে বসে পাইপ কামড়াতে থাকেন।

Shot : 107/M.S.

সুবর্ণা দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে। চোখে মুখে আতঙ্কের চিহ্ন।

টেররিস্ট : কাজের লোক... Servants... ওরা কারা যেন... ওদের ছুটি দিয়ে দিন।

সুবর্ণা : আমার... আমার দাদাশ্বশুর 92... যে-কোনো সময় কিছু হয়ে যেতে পারে। শ্বশুরমশায় heart patient... মেয়ে অসুস্থ... ডাক্তার, বদ্যি... আমি কলেজে যাই... ওরাই তো দ্যাখে।

টেররিস্ট : ঠিক আছ, ঠিক আছে। On one condition। ওরা কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে না।

Shot : 108/C.S.

সুবর্ণা : কিন্তু ওরা তো এই... এ-মহলেই থাকে, আর আপনি কোথায়...

Shot : 109/C.S.

টেররিস্ট : (বাধা দিয়ে) আমি কোথায় থাকব সেটা পরে দেখছি। এ-বাড়ির বাইরে কে কে যায়?

Shot : 110/C.S. /Same as Shot : 108

সুবর্ণা : মায়া ন-মাসে ছ-মাসে দেশে যায়। আমি কলেজ...

টেররিস্ট(O.S.): আর?

সুবর্ণা : দেবী স্কুলে।

Shot : 111/C.S./Same as Shot : 109

দেবীকে দেখিয়ে টেররিস্ট বলে —

টেররিস্ট : But she is sick, let her continue for few more days.

Shot : 112/C.S.

দেবীকে দেখা যায় আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় ঘাড় ঘুরিয়ে টেররিস্টকে দ্যাখে।

টেররিস্ট(O.S.) : Sweet girl, ভয় পেয়ো না, আমি তোমার আঙ্কল, হুঁ।

Shot : 113/C.S.

টেররিস্ট : আপনি সাতদিন ছুটি নিয়ে নিন।

Shot : 114/C.S.

সুবর্ণা : আমি যদি সাতদিন কলেজে না যাই department অচল হয়ে যাবে।

টেররিস্ট(O.S.) : কেন?

সুবর্ণা : তিনজনের department-এ একজন অসুস্থ। একজন ছুটিতে।

টেররিস্ট(O.S.) : Again you are acting smart। আপনি চালাকি করছেন।

Shot : 115/C.S.

টেররিস্ট : হুঁ, সার্ভেন্টসরা কি বাড়িতেই?

Shot : 116/C.S.

সুবর্ণা বিমূঢ়ভাবে টেররিস্টের দিকে তাকিয়ে থাকে।

Shot : 117/M.C.S.

সুবর্ণা : একজন বাড়ি গেছে, কাল সকালে আসবে। একজন বোধহয় রান্নাঘরে।

টেররিস্ট : হ্যাঁ, চলুন, তা হলে ওপরে আমার...

Shot : 118/C.S.

টেররিস্ট : ...আমার থাকার একটা বন্দোবস্ত করা যাক। (একটু ভেবে) এ ফ্লোরটা তো safe নয় মনে হচ্ছে।

Shot : 119/M.C.S.

টেররিস্ট : চলুন ওপরে চলুন।

সুবর্ণা : ওপরে আমরা থাকি। এ-বাড়ির নিয়ম অনুযায়ী ও-মহলে অচেনা লোক যায় না। বাড়ির কাজের লোকেদেরও না ডাকলে তাদের আসার নিয়ম নেই।

Shot : 120/C.S.

টেররিস্ট : (রিভলভার দেখিয়ে) শুনুন, এটা ছাড়াও আমার ব্যাগে যা আছে, সেটা এই গোটা বাড়িটাকে উড়িয়ে দেবার পক্ষে Good enough।

Shot : 121/C.S.

সুবর্ণাকে টেররিস্ট বলে —

টেররিস্ট (O.S.) : আর এগুলো হ্যান্ডেল করতে করতে আমাদের human feelings-গুলো নষ্ট হয়ে গেছে।

Shot : 122/C.S.

টেররিস্ট : (সুবর্ণার দিকে রিভলভার তাক করে) শরীরের যে-সব গ্ল্যান্ডগুলো আমাদের excite করে সে-গুলো শুকিয়ে গেছে। চলুন...

Shot : 123/C.S.

দেবী বিমূঢ়ভাবে এইসব কথোপকথন শুনছে।

Shot : 124/C.S.

সুবর্ণা দরজার দিকে হাঁটতে থাকে।

টেররিস্ট (O.S.) : চলুন... চলুন... Come on move. Come on...

Shot : 125/M.C.S.

সুবর্ণা দরজা খোলে। এবার টেররিস্ট সুবর্ণার কাছে এসে দাঁড়ায়।

টেররিস্ট : কী হল?

সুবর্ণা : কী বলব... আপনার পরিচয়?

টেররিস্ট : বলবেন, আপনার আত্মীয়। কাজিন... ভাই। চেচনিয়া, বসনিয়া, বেলুচিস্তান, প্যালেস্তাইন, বসরা কোথাও একটা থাকতাম... লস্ট কন্ট্যাক্ট। চলুন... চলুন... চলুন... চলুন... চলুন... চলুন... Come on.

সুবর্ণা কয়েক সেকেন্ড ভাবে। তারপর দেবীকে 'আসছি' বলে টেররিস্টকে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

Shot : 126/M.C.S.

দেবী কান্নায় ভেঙে পড়ে দু-হাতে মুখ ঢাকে।

Scene : 4 (সময়: রাত্রিবেলা)

রাজবাড়ির বারান্দা ও শৌর্যেন্দ্রর ঘর

Shot : 127/M.S. to M.C.S.

বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে সুবর্ণা শৌর্যেন্দ্রনারায়ণের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বলে —

সুবর্ণা : ইনিই আমার দাদাশ্বশুর। স্মৃতি হারিয়েছেন। কখনো কখনো কিছু মনে পড়ে। ওর শব্দ একমাত্র আমিই বুঝি।

এবার দুজনে বারান্দা ধরে সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

Shot : 128/M.S. (Camera on trolley:T/B)

সুবর্ণা বারান্দা ধরে এগোতে এগোতে অন্য একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়।

সুবর্ণা : এই ঘরটাতে... এটাতে আমি... আমার মেয়ে নিয়ে থাকি।

Shot : 129/M.S. (Camera on trolley :T/B)/(Subarna & Terrorist)

সুবর্ণা এসে এবার তার শ্বশুরমশায়ের ঘরের সামনে দাঁড়ায়।

সুবর্ণা : এটা আমার শ্বশুরমশায়ের ঘর।

সংগ্রাম(O.S.): বউমা, দেবী দিদি এখন কেমন?

সুবর্ণা : (সংগ্রামের কণ্ঠস্বরে দেবী চমকে গিয়ে বলে —) ভালো বাবা।

সংগ্রাম (O.S.): আর কে? মায়ার পায়ের শব্দ তো নয়।

সুবর্ণা : আমার এক আত্মীয়...

Shot : 130/M.C.S.

সংগ্রাম : (ইজিচেয়ারে শুয়ে বলেন —) তোমার আত্মীয়? এ-বাড়িতে!

Shot : 131/M.C.S./(Subarna & Terrorist)

সুবর্ণা : অনেকদিন যোগাযোগ ছিল না। না জেনেই এসে পড়েছেন।

Shot : 132/M.C.S./Same as Shot : 130

সংগ্রাম : তিনি কোথায়?

Shot : 133/C.S./(Subarna & Terrorist)

সুবর্ণা : নীচে চলে গেছে।

Shot : 134/M.S.

সংগ্রাম : এসেই যখন পড়েছেন, তখন যত্ন নিয়ো। কাল আলাপ করিয়ো।

Shot : 135/C.S./Same as Shot : 133

সুবর্ণা : আচ্ছা।

Shot : 136/M.S./Same as Shot : 134

সংগ্রাম : এসো।

Shot : 137/C.S. to M.C.S.

দু-জনে আস্তে আস্তে চলে যায়।

Shot : 138/M.S./(Camera on trolley :R/L)

বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে টেররিস্ট হঠাৎ শৌর্যেন্দ্রনারায়ণের ঘরে ঢুকে পড়ে। পিছন পিছন বিহ্বল সুবর্ণাও ঢোকে। সুবর্ণা আতঙ্কিত হয়ে বলে —

সুবর্ণা : একী আপনি... আমাদের বাড়িতে তো অনেকগুলো খালি ঘর আছে।

টেররিস্ট : (শৌর্যেন্দ্র-র দিকে তাকিয়ে) না, ফ্যামিলির Most valuable person... আমি এ-ঘরেই থাকব। আচ্ছা আপনি ফোন লাইনটা কেটে দিন।

সুবর্ণা : (আঁতকে উঠে) সে কী! এই অসুস্থ মানুষদের নিয়ে... বিপদে... আপদে!

টেররিস্ট : আচ্ছা, অন্য কোনো ঘরে কোনো ফোন নেই তো?

সুবর্ণা না-সূচক ঘাড় নাড়ে।

টেররিস্ট : আর এ-ঘরেও ফোনের প্লাগ আছে নিশ্চয়ই?

সুবর্ণা : হ্যাঁ।

টেররিস্ট : তা হলে এ-ঘরে এনে ফোনটা লাগিয়ে দিন। আর আমি একটু হাংরি... যদি খাবার কোনো বন্দোবস্ত হয়... ভালো হয়।

সুবর্ণা মুখে হ্যাঁ-সূচক অস্ফুট শব্দ করে। টেররিস্ট ঘরের মধ্যে অন্য একটা দরজার দিকে তাকিয়ে বলে —

টেররিস্ট : ওটা বাথরুম? ক্লিন হওয়া দরকার।...আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আপনি যান।

Scene : 5 (সময়: রাত্রিবেলা)

প্রতাপপুরের রাস্তা

Shot : 139/L.S.

রাত্রির অন্ধকারে হেডলাইট জ্বালিয়ে একটা পুলিশ জিপ যাচ্ছে।

Scene : 6 (সময়: রাত্রিবেলা)

শৌর্যেন্দ্রর ঘর

Shot : 140/M.C.S. to C.S.

সুবর্ণা এবার ফোনটা এনে এ-ঘরের প্লাগে লাগিয়ে দেয়।

Shot : 141/C.S.

টেররিস্ট : By the way... আমি রাজীব।

Shot : 142/C.S.

সুবর্ণা রাজীবকে দ্যাখে। তারপর শৌর্যেন্দ্রর দিকে তাকায়।

Shot : 143/C.S.

শৌর্যেন্দ্র সুবর্ণাকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞেস করে অপরিচিত ব্যক্তিটি কে?

Shot : 144/M.C.S./(Camera on trolley : R/L)

সুবর্ণা শৌর্যেন্দ্রর কাছে গিয়ে বলে —

সুবর্ণা : আমার আত্মীয়। ক-দিনের জন্য এখানে... এ-ঘরে থাকবে... আপনার সঙ্গে।

শৌর্যেন্দ্র সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে। সুবর্ণা তারপর রাজীবের উদ্দেশে বলে —

সুবর্ণা : আপনাকে দু-একটা কথা বলার আছে। রাতে দরজাটা বন্ধ রাখবেন। ওঁর স্লিপ ওয়াকিং-এর সমস্যা আছে। ...আর আমি মায়াকে বলে দিচ্ছি... ডিভানে বিছানাটা করে দেবো।

এইসময় বাইরে বেল বাজার শব্দ হয়। আমরা ইতিমধ্যে জেনে গেছি টেররিস্টের নাম রাজীব।

রাজীব : বাইরে বোধহয় বেল বাজল?

মায়া দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। রাজীবকে দেখে একটু ঘাবড়ায়।

মায়া : বউদি, থানা থেকে লোক এসেছে।

সুবর্ণা ঘাবড়ে যায়। রাজীবের মুখ আরো কঠিন হয়

সুবর্ণা : (মায়াকে) বলো আমি আসছি। বলো...

মায়া চলে যায়। সুবর্ণা ঘর ছেড়ে বেরোবার আগে রাজীব বলে —

রাজীব : আপনি নিশ্চয় এতক্ষণে বুঝে গেছেন, পুলিশকে কী বলতে হবে?

সুবর্ণা একটু থামে। অসহায়ভাবে একবার শৌর্যেন্দ্রর দিকে তাকায়। তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

Shot : 145/C.S.

শৌর্যেন্দ্র সন্দিগ্ধভাবে একদৃষ্টে রাজীবের দিকে তাকিয়ে আছে।

Scene : 7 (সময়: রাত্রিবেলা)

রাজবাড়ির একতলার একটি ঘর

Shot : 146/M.C.S./(Camera on trolley : L/R)

সুবর্ণা আগমনবার্তাসূচক মৃদু গলা খাঁকরানি দিয়ে ঘরে ঢুকতেই ইন্সপেক্টর বসাক টুপিটা খুলে হাতে নিয়ে ঈষৎ হেসে বলেন —

বসাক : Good evening Madam.

সুবর্ণা : (Back to camera) Good evening। কী ব্যাপার, এত রাতে হঠাৎ?

বসাক : ভীষণ urgent, তাই আসতে হল।

সুবর্ণা : বসুন।

ইন্সপেক্টর বসাক 'Thank you' বলে আগে সুবর্ণাকে বসবার জন্য ইঙ্গিত করেন। তারপর দু-জনেই বসেন।

Shot : 147/M.C.S./Preference Subarna/(Subarna & Basak)

সুবর্ণা এবং ইন্সপেক্টর বসাক বসে আছেন।

সুবর্ণা : বলুন।

Shot : 148/M.C.S./Preference Basak /(Subarna & Basak)

বসাক : কিছুক্ষণ আগেই একটা ছোটোখাটো অপারেশন হয়ে গেল। কয়েকটা মরেছে।

Shot : 149/M.C.S./Same as Shot : 147

সুবর্ণা : ওঃ।

Shot : 150/M.S. to M.C.S.

রাজীব একটু দূর থেকে হেঁটে এসে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর বসাকের কথা শুনতে থাকে।

বসাক (O.S.): ম্যাডাম, আমাদের কাছে খবর আছে, North East-এর একজন টেররিস্ট আমাদের অঞ্চলে ঢুকে পড়েছে। জানেন তো, আমাদের ডিস্ট্রিক্টে এসব ঝঞ্ঝাট ছিল না।

Shot : 151/M.C.S./Same as Shot : 148

বসাক : কিন্তু বর্ডার তো, কিছুদিন ধরে এইসব ঝামেলা শুরু হয়েছে।

Shot : 152/M.C.S./Same as Shot : 149

সুবর্ণা : কিন্তু আমরা কী করতে পারি?

Shot : 153/M.C.S./Same as Shot : 151

বসাক : আপনাদেরই প্যালেস-এর দিকে এসেছে মনে হচ্ছে।

Shot : 154/M.S.

বারান্দা দিয়ে যেতে গিয়ে মায়া, রাজীবকে গোপনে সুবর্ণা ও বসাকের কথোপকথন শুনতে দ্যাখে।

বসাক (O.S.): আর প্যালেস-এর Back side-টা তো Ruins and jungle connected. ...

Shot : 155/M.C.S./Same as Shot : 153

বসাক : ... তো search করতে করতে এদিকে চলে এসেছি।

Shot : 156/C.S.

সুবর্ণা : আমি তো সর্বক্ষণ নীচেই ছিলাম। সে-রকম কিছু হলে তো... আমি জানতে পারতাম।

Shot : 157/C.S.

বসাক : তবুও সাবধানের তো মার নেই ম্যাডাম। আমি বাড়ির বাইরেটা দেখেছি।

Shot : 158/C.S./Same as Shot : 156/(Subarna)

বসাক (O.S.): আপনি ভালো করে ভিতরটা দেখে নেবেন।

Shot : 159/C.S./Same as Shot : 157

বসাক : Any problem, আমাকে জানাবেন।

Shot : 160/C.S./Same as Shot : 158

বসাক (O.S.): Be careful।

Shot : 161/M.C.S.to M.S./(Camera on trolley : R/L)

সুবর্ণা : Thank you।

বসাক : O.K., good night ...আসি।

বসাক চলে যায়। সুবর্ণা দরজা বন্ধ করে দেয়। গলার অস্ফুট আওয়াজে এতক্ষণের চেপে রাখা উদ্বেগ ধরা পড়ে।

Scene : 8 (সময়: রাত্রিবেলা)

রাজবাড়ির দোতলার বারান্দা

Shot : 162/M.S.

দেবী এগিয়ে আসে। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। সুবর্ণা দেখতে পেয়ে ছুটে আসে।

সুবর্ণা : একী... দেবী! এত শরীর খারাপ নিয়ে... তোমাকে বারণ করেছি না... (কিছুটা অসহায়ভাবে) তোমাকে বারণ করেছি না চেয়ার ছেড়ে উঠতে।

দেবী মাকে জড়িয়ে ধরে। মুখে 'মা গো' বলে অস্ফুট আওয়াজ করে।

Scene : 9 (সময়: রাত্রিবেলা)

সুবর্ণা ও দেবীর ঘর

Shot : 163/L.S.

চাঁদের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

Shot : 164/L.S.

বারান্দা থেকে বাড়ির বাইরের বড়ো বড়ো গাছগুলো দেখা যাচ্ছে। ভেসে আসছে মৃদু কান্নার আওয়াজ। এই কান্নার আওয়াজ এবার আমরা অনেকক্ষণ ধরে শুনতে পাব।

Shot : 165/M.C.S./(Camera on trolley : R/L)
সুবর্ণাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে দেবী। দুজনেই বিছানায় শুয়ে। সুবর্ণা জেগে আছে।

Scene : 10 (সময়: রাত্রিবেলা)
শৌর্যেন্দ্রর ঘর

Shot : 166/M.C.S.
প্যাঁচার কর্কশ শব্দ ও ডানা ঝাপটানোর আওয়াজে ঘর্মাক্ত রাজীবের ঘুম ভেঙে যায়। হঠাৎ ঘুরে তাকিয়ে দ্যাখে...

Shot : 167/C.S.
... শৌর্যেন্দ্র মশারির মধ্যে বসে সোজা তাকিয়ে আছে রাজীবের দিকে।

Shot : 168/C.S.
রাজীব যেন শক খায়। সঙ্গে সঙ্গে বালিশের তলা থেকে হাতে রিভলভার তুলে নেয় এবং শৌর্যেন্দ্রর দিকে এগিয়ে যায়।

Shot : 169/B.C.U.
শৌর্যেন্দ্রর চোখের ক্লোজ আপ।

Shot : 170/C.S./Same as Shot : 168
রাজীব শৌর্যেন্দ্রর কাছাকাছি চলে যায়।

Shot : 171/M.S.

রাজীব : (হিসহিসে গলায়) এই, You old fool. You are getting to be smart. (শৌর্যেন্দ্রর মাথায় রিভলভার ঠেকিয়ে) একদম গুলি করে খুলি উড়িয়ে দেবো তোমার আমি।

বৃদ্ধের কোনো প্রতিক্রিয়া নেই দেখে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় রাজীব।

Scene : 11 (সময়: রাত্রিবেলা)
সুবর্ণা ও দেবীর ঘর

Shot : 172/M.C.S./Same as Shot : 165/(Camera on trolley : R/L)
বিছানায় দেবী ঘুমাচ্ছে। সুবর্ণা উঠে বসে। বুঝতে পারে রাজীব ঘর থেকে বেরিয়েছে।

Shot : 173/M.C.S.
বাইরে থেকে দেখা যায়, জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে পরিস্থিতি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছে দেবী।

Scene : 12 (সময়: রাত্রিবেলা)
প্রাসাদের বাইরে উন্মাদিনীদের ঘর

Shot : 174/M.C.S. to M.S.
ছোটো টর্চ জেলে এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে কান্নার শব্দ অনুসরণ করে রাজীব একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। কিছুটা আলোর রশ্মি বাইরে এসে পড়েছে।

Shot : 175/M.C.S.
রাজীব কৌতূহলবশত ভেজানো দরজাটা ফাঁক করে একটু খুলে উঁকি দেয়। এবার কান্নার আওয়াজ আরো বাড়ে। বোঝা যায় ঘরের ভেতর থেকেই কান্নার আওয়াজটা আসছে।

Shot : 176/M.S. to M.C.S./(Camera on trolley : T/F)
দেখা যায় চার-পাঁচজন বিভিন্ন বয়সের মহিলা, কেউ বসে, কেউ শুয়ে) ক্যামেরা Tilt down করলে দেখা যায় একজন বসে বসে কাঁদছে।

Scene : 13 (সময়: রাত্রিবেলা)
শৌর্যেন্দ্রর ঘর ও দোতলার বারান্দা

Shot : 177/M.C.S./(Camera on trolley : R/L)
সুবর্ণা শৌর্যেন্দ্রর ঘরে ঢোকে। শৌর্যেন্দ্র এখনো তেমনিভাবেই বসে। সুবর্ণা শৌর্যেন্দ্রকে জল খাইয়ে দেয়।

Shot : 178/M.C.S.
রাজীব এখনো দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

Shot : 179/M.C.S.
সুবর্ণা শৌর্যেন্দ্রকে শুইয়ে দিয়ে মশারি ফেলে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

Shot : 180/L.S. to M.C.S./(Camera on trolley : T/F)
সুবর্ণা বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে (দোতলায়) রাজীবকে খুঁজছে। ক্যামেরা Trolley forward হলে দেখা যায় (Ground level) নীচে দাঁড়ানো রাজীব ডানদিক দিয়ে Frame-in করে।

Shot : 181/L.S.
রাজীব বারান্দা দিয়ে হাঁটছে।

Shot : 182/M.S.
সুবর্ণা (Back to Camera) রাজীবের খোঁজে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ রাজীব পিছন থেকে এসে সুবর্ণাকে চমকে দিয়ে বলে —

রাজীব : শুনুন আপনি আমাকে মিথ্যে কথা বলেছেন। এ-বাড়িতে আরো অন্য লোকজন থাকে... ওই মেয়েগুলো কারা? হ্যাঁ...

সুবর্ণা : Unimportant বলে বলিনি। ওদের এদিকে আসবার কোনো সম্ভাবনাও নেই। আপনাকে একটা request করেছিলাম, রাতে দরজাটা বন্ধ রাখতে বলেছিলাম। কারণটাও বলেছিলাম।

Shot : 183/C.S.

রাজীব : But he is acting. That old man. I'll shoot him.

Shot : 184/C.S.

সুবর্ণা : মি. রাজীব, আপনি একটা অস্ত্র দিয়ে ক-জনকে shoot করবেন। (সুবর্ণা এবার straight রাজীবের সামনে দাঁড়ায়) Shoot! Shoot me! আপনি আমাকে মারতে পারেন... আপনি আমাদের সবাইকে মারতে পারেন...

Shot : 185/C.S./Same as Shot : 183

সুবর্ণা (O.S.): ... কিন্তু নিজেও পালাতে পারবেন না।

রাজীব : (নিজেকে সংযত করে) আমি আপনাকে বলেছি, আপনাদের কোনো

harm করব না। I just want shelter for few days. আমার পাঁচ বন্ধু ... Died this evening.

Shot : 186/C.S./Same as Shot : 184

সুবর্ণা : তার জন্য আমরা দায়ী নই। একজন 92 years old... invalid man, acting করছেন?

Shot : 187/M.C.S.

রাজীব সুবর্ণাকে বলে —

রাজীব : যেভাবেই হোক আমাকে বাঁচতেই হবে। And I mean it.

বলে রাজীব Frame-out হয়। সুবর্ণা দাঁড়িয়ে থাকে।

Shot : 188/C.S.

সুবিশাল বারান্দায় সুবর্ণা একা দাঁড়িয়ে থাকে। Fade out

Scene : 14 (সময়: ভোরবেলা)

রাজবাড়ির ছাদ

Shot : 189/L.S./(Camera on trolley : R/L)

রাজবাড়ির বাইরে প্রকৃতিকে দেখা যায়।

সংগ্রাম (O.S.): (গান) আব মোহে কিঁউ করেত বা

Shot : 190/L.S./(Camera on trolley : L/R)

ক্যামেরা এগোলে দেখা যায় সংগ্রাম গান গাইছেন।

Shot : 191/L.S./(Camera on trolley : R/L)

নুড়ি পাথরের উপর দিয়ে পাহাড়ি নদী বয়ে চলেছে।

Shot : 192/L.S.

Right of Frame ঘেঁষে গান গাইতে গাইতে সংগ্রাম সামনে এগিয়ে এসে ধীরে ধীরে Frame out হয়ে যান।

Scene : 15 (সময়: ভোরবেলা)

রাজবাড়ির বারান্দা ও সুবর্ণার ঘর

Shot : 193/L.S. to M.C.S.

মায়া দুধের গ্লাস নিয়ে বারান্দা দিয়ে আসছেন। শেষে সুবর্ণার ঘরের দিকে চলে যায়।

Shot : 194/C.M.S./(Camera on trolley : T/F)

দেবী শুয়ে আছে। মায়া দুধের গ্লাস হাতে নিয়ে ঢোকে।

মায়া : ওঠো সোনা... দুধ খেয়ে নাও।

দেবী : না... খাব না।

মায়া : ওঠো... ওঠো... দুধ খেয়ে নাও... ওঠো বলছি।

দেবী : দুধ ভাল্লাগে না।

মায়া : দুধ খাওয়ার সময় যত বায়না... উফ্‌ফ... ওঠো, ওঠো... (এইসময় বাথরুম থেকে বেরিয়ে সুবর্ণা Fame in করে) উঠে খেয়ে নাও।

দেবী : না, না, না... খাব না।

মায়া : (সুবর্ণাকে) এই দ্যাখো বউদি... কথা শুনছে না।

দেবী : না... খাব না... ভাল্লাগে না দুধ।

সুবর্ণা : খেয়ে নাও। ...আজ ভাত খাবে। মায়া একটু ভালো করে মাছের ঝোল কোরো তো।

মায়া : হ্যাঁ।

মায়া এবার বাইরে যেতে গিয়ে আবার ফিরে এসে জিজ্ঞেস করে —

মায়া : বউদি। তেনার খাবার কি খাবারের টেবিলে দিয়ে দেবো?

Shot : 195/C.S.

সুবর্ণা : না, দাদাভাইয়ের ঘরেই দাও। বাবার খাবারটা আমি নিয়ে যাব।

মায়া (O.S.): ও বউদি, তোমাকে তো বলা হয়নি... তুমি যখন পুলিশের সঙ্গে কথা বলছিলে...

Shot : 196/C.S.

মায়া : ...তখন না, লোকটা সব লুকিয়ে লুকিয়ে শুনছিল।

Shot : 197/C.S./Same as Shot : 195

মায়া (O.S.) : কী জানি বাপু, আমার একদম ভাল্লাগছে না লোকটাকে।

সুবর্ণা : তুমি কাউকে কিছু বোলো না।

মায়া (O.S.) : ও, ঠিক আছে।

সুবর্ণা : হরেনদা এসেছে?

Shot : 198/M.C.S.

মায়া : হ্যাঁ। সক্কাল সক্কালই এসেছে। বাজারেও পাঠিয়ে দিয়েছি।

সুবর্ণা : যাও।

মায়া চলে যায়। সুবর্ণা এবার দেবীর হাতে দুধের গেলাস তুলে দিয়ে বলে —

সুবর্ণা : খেয়ে নাও।

দেবী বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে দুধের গ্লাসে চুমুক দেয়। সুবর্ণা ড্রেসিং টেবিলের কাছে গিয়ে চেয়ারটা টেনে বসে।

Shot : 199/M.C.S./Style shot through mirror

আয়নাতে দেবী ও সুবর্ণাকে দেখা যায়। সুবর্ণা তোয়ালে দিয়ে চুল শুকাতে শুকাতে বলে —

সুবর্ণা : মাস্টারমশায় ক-দিন আসবেন না... হ্যাঁ। আমায় দেখিয়ে নিয়ো।

দেবী : কী হবে মা?

সুবর্ণা : কী আবার হবে। তুমি চিন্তা কোরো না। তোমাকে তো Sweet girl বলেছে। খেয়ে নাও।

বলে সুবর্ণা উঠে পড়ে দেবীর দিকে যায়।

Shot : 200/M.C.S.

সুবর্ণা : খেয়ে নাও... হ্যাঁ।

বলে সুবর্ণা বেরিয়ে যায়। Camera pan করে এবার দেবীর ওপর যায়। দেবী প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রিমোটে টিভি চালু করে দেয়।

Scene : 16 (সময়: সকালবেলা)

শৌর্যেন্দ্রর ঘর সংলগ্ন বাথরুম

Shot : 201/C.S.

রাজীব বাথরুমে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ব্রাশ দিয়ে দাড়ি কামানোর সাবানো ফেনা করছে। একটু ইতস্তত করে ব্রাশটা রেখে অবিন্যস্ত চুলে হাত বোলায়। তার কাঁচিটা দিয়ে চুল কাটবার উপক্রম করেও রেখে দেয়। Camera tilt down করলে দেখা যায় আবার সে ব্রাশ দিয়ে দাড়ি কাটবার সাবানে ফেনা করছে।

Scene : 17 (সময়: সকালবেলা)

সংগ্রামের ঘর

Shot : 202/M.L.S. to M.S.

সংগ্রাম শুয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন। সুবর্ণা জলখাবার নিয়ে ঢোকে। সুবর্ণাকে দেখে সংগ্রাম বলেন —

সংগ্রাম : কাগজ পড়েছ?

সুবর্ণা : না।

সংগ্রাম এবার খাট থেকে নেমে মাটিতে দাঁড়িয়ে বলেন —

সংগ্রাম : কাল রাত্তিরে পুলিশ এসেছিল বাড়িতে আমাকে বলোনি তো?

সুবর্ণা : (নার্ভাস হয়ে) রাত হয়ে গিয়েছিল... অযথা আপনাকে... tension...

সংগ্রাম এবার সুবর্ণার কাছে এসে দাঁড়িয়ে উত্তেজিতভাবে বলেন —

সংগ্রাম : Do you realise the seriousness of the situation... এই দ্যাখো...

Shot : 203/C.S./(High Speed : 48 Frames)

সংগ্রামের হাত কাগজটা সুবর্ণাকে এগিয়ে দেয়। সুবর্ণার হাত কাগজটি নেয়। কাগজে দেখা যায় টেররিস্ট রাজীবের ছবি ছাপা আছে।

Shot : 204/M.S.

সুবর্ণা কাগজটি নিয়ে শুধু রাজীবের (টেররিস্ট) ছবিটা দ্যাখে এবং হেডলাইনে চোখ বুলিয়ে নেয়।

সংগ্রাম : সাংঘাতিক ব্যাপার! এসব কী হচ্ছে কি? প্রতাপপুরে টেররিস্ট। এখানে তো এসব ছিল না। তাকে নাকি আবার জঙ্গলের দিক থেকে প্যালেসের দিকে আসতে দেখা গিয়েছে। Government পাঁচ লাখ টাকার Award declare করেছে।

Shot : 205/M.C.S.

সংগ্রাম : পুলিশ কী বলল কি?

Shot : 206/M.C.S.

সুবর্ণা Back to Camera থেকে ঘুরে ক্যামেরার মুখোমুখি হয়ে বলে —

সুবর্ণা : হ্যাঁ... বলল, সাবধানে থাকতে।

Shot : 207/M.C.S./Same as Shot : 205

সংগ্রাম : হুঁ... হরেন কোথায়?

Shot : 208/M.C.S./Same as Shot : 206

সুবর্ণা : বাজারে গেছে।

Shot : 209/C.S.

সংগ্রাম : ও ফিরলে...

Shot : 210/M.C.S./Same as Shot : 208

সংগ্রাম (O.S.): দরজা বন্ধ করে দিতে বোলো।

সুবর্ণা : হ্যাঁ।

Shot : 211/C.S./Same as Shot : 209

হঠাৎ সংগ্রাম সুবর্ণার পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত চেহারা দেখে বলে —

সংগ্রাম : তোমার কি শরীর খারাপ নাকি? এত শুকনো শুকনো লাগছে। দেবী দিদি এখন কেমন?

Shot : 212/C.S.

সুবর্ণা : ভালো আছে, ভাত খাবে আজ।

Shot : 213/C.S./Same as Shot : 211

সংগ্রাম : ক-দিন একটু রেস্ট নাও না। কলেজ থেকে...

Shot : 214/C.S./Same as Shot : 212/(Subarna)

সংগ্রাম (O.S.): ক-দিন ছুটি নিতে পারো তো।

Shot : 215/M.C.S./Same as Shot : 210

সুবর্ণা : দেখি... খেয়ে নিন।

বলে সুবর্ণা খাবারটা নিয়ে সংগ্রামের কাছে আসে। Camera সুবর্ণাকে follow করে। এবার সংগ্রাম Frame-in করেন।

সংগ্রাম : দেশটা একেবারে উচ্ছন্নে গেল। ওহো...

বলতে বলতে সংগ্রাম বসেন।

Shot : 216/M.C.S.

সংগ্রাম : ...তোমার সেই আত্মীয়টি কি ব্রেকফাস্ট করেছে?

Shot : 217/C.S.

সুবর্ণা : না, দেবো।

Shot : 218/M.C.S./Same as Shot : 216

সংগ্রাম : ওর যত্ন নিয়ো। রাজবাড়ির অতিথি বলে কথা।

Shot : 219/M.C.S. to C.S./(Camera on trolley : T/F)

সংগ্রাম : বউমা, একদিন তোমার আত্মীয়দের এ-বাড়িতে ঢোকা নিষেধ ছিল ঠিকই...

ক্যামেরা এবার সংগ্রাম-এর কাছ থেকে সরে সুবর্ণাকে ধরে

সংগ্রাম (O.S.): ...ওসব ভুলে যাও, মনে রেখো না বউমা।

সুবর্ণা : আমি মনে রাখিনি বাবা, ষোলোটা বছর তো কেটে গেল এ-বাড়িতে।

সুবর্ণা এবার ঘর ছেড়ে চলে যায়।

Shot : 220/C.S.

সুবর্ণার চলে যাওয়ার দিকে সংগ্রাম ব্যথিত অভিব্যক্তিতে তাকিয়ে থাকেন।

Scene : 18 (সময়: সকালবেলা)

পুলিশ স্টেশন/শৌর্যেন্দ্রর ঘর

Shot : 221/M.S.

সুবর্ণা শৌর্যেন্দ্রর ঘরে ঢোকে। ঠিক তখনই টেলিফোন বেজে ওঠে। সুবর্ণা ফোনের কাছে এসে ফোন ধরে। Camera সুবর্ণাকে follow করে।

সুবর্ণা : হ্যালো!

Shot : 222/C.S.

পুলিশ স্টেশনের অভ্যন্তর। Camera pan করে এবার ইন্সপেক্টর বসাককে ধরে। বসাক ফোনে কথা বলছেন—

বসাক : কে বলছেন?

সুবর্ণা (O.S.): মিসেস সিংহ।

বসাক : Good Morning ম্যাডাম, বসাক বলছি।

Shot : 223/C.S.

শৌর্যেন্দ্রর ঘর থেকে সুবর্ণা ফোনে কথা বলছে।

সুবর্ণা : Good Morning, বলুন।

বসাক (O.S.): আপনাদের Exterior-টা দেখেছি। কিন্তু অন্দরমহলটা তো বিশাল, সেটাও একবার দেখা দরকার।

সুবর্ণা : আমি দেখেছি ভালো করে।

Shot : 224/C.S./Same as Shot : 222

বসাক : ছাদ-টাদগুলো?

সুবর্ণা (O.S.): হ্যাঁ।

বসাক : আপনাদের পিছনের দরজাটা...

Shot : 225/C.S./Same as Shot : 223

বসাক (O.S.): It was open but...

সুবর্ণা : বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

Shot : 226/C.S./Same as Shot : 224

বসাক : Very nice... by the way, আজকের খবরের কাগজটা...

Shot : 227/C.S./Same as Shot : 225

বসাক (O.S.): একটু দেখে নেবেন। ওর ছবি বেরিয়েছে। হ্যাঁ... চিনতে সুবিধা হতে পারে।

Shot : 228/C.S./Same as Shot : 226

বসাক : কোনো রকম সন্দেহ হলে আপনি আমাকে খবর দেবেন। আমরা Security Force-কেও খবর দিয়েছি।

Shot : 229/C.S./Same as Shot : 227

সুবর্ণা : ঠিক আছে। Thank you।

Shot : 230/C.S./Same as Shot : 228

বসাক : Good day Madam.

Shot : 231/C.S./Same as Shot : 229

সুবর্ণা রিসিভার ক্রেডেলে নামিয়ে রাখে। তারপর শৌর্যেন্দ্রর দিকে তাকায়।

Shot : 232/M.S./(Camera on trolley : T/F)

শৌর্যেন্দ্র আঙুল বাড়িয়ে কিছু বলতে চেষ্টা করে। সুবর্ণা শৌর্যেন্দ্রর দিকে এগিয়ে যায়। শৌর্যেন্দ্র ইশারায় সুবর্ণাকে দেবী সম্পর্কে প্রশ্ন করে।

সুবর্ণা : ভালো আছে... ভালো আছে... আজ ভাত খাবে। ভাত খাবে আজ... (শৌর্যেন্দ্র ইশারায় পিয়ানো বাজানোর ভঙ্গি করে দেবীর কথা জিজ্ঞেস করেন) ...হ্যাঁ, বাজাবে তো... বাজাবে। বাজাবে... গান গাইবে... ভালো আছে...

এইসময় রাজীব ঘরে ঢোকে। শৌর্যেন্দ্র রাজীবকে দেখিয়ে ইশারা করে। ক্যামেরা এইসময় Trolley forward হয়।

সুবর্ণা : কাল রাতে বললাম যে, আমার আত্মীয়... আত্মীয়।

Shot : 233/M.C.S.

রাজীব : এরকম কতদিন?

Shot : 234/M.C.S./(Camera on trolley : L/R)

বিছানায় আধশোয়া শৌর্যেন্দ্রর কাছ থেকে উঠে সুবর্ণা এবার দেওয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। Camera সুবর্ণাকে follow করে।

সুবর্ণা : অনেক বছর।

Shot : 235/M.C.S./Same as Shot : 233

রাজীব : স্ট্রোক?

Shot : 236/M.C.S./Last position of Subarna as Shot : 234

সুবর্ণা : হুঁ।

Shot : 237/M.C.S./Same as Shot : 235

রাজীব একমনে সুবর্ণার কথা শুনছে।

Shot : 238/M.C.S.

সুবর্ণা শৌর্যেন্দ্রর বিছানায় বসে বসে বলে —

সুবর্ণা : হুঁ, ব্রেনের Spelling Centre... যে Cell-গুলো শব্দ বানায়... নষ্ট হয়ে গেছে।

বলে সুবর্ণা বিছানা থেকে উঠে বাঁ-দিক দিয়ে Frame-out হয়।

Shot : 239/M.C.S./Same as Shot : 237

সুবর্ণার কথা শুনে রাজীবের প্রতিক্রিয়া হয়।

Shot : 240/M.C.S.

সুবর্ণা : বাঁ-দিকটা একটু better...

কথা বলতে বলতে সুবর্ণা আবার শৌর্যেন্দ্রর খাটে এসে বসে। Camera অনুসরণ করে।

সুবর্ণা : ... আগে এঁকে বোঝাতেন, এখন আর তাও পারেন না।

চুল আঁচড়ে দিতে দিতে শৌর্যেন্দ্রর উদ্দেশে সুবর্ণা বলে —

সুবর্ণা : আজকে মায়া চান করিয়ে দেবে... হ্যাঁ।

সুবর্ণা বিছানা থেকে উঠে দেওয়ালের কাছে রাখা টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে হাতির দাঁতের কাজ করা জিনিসগুলো দেখিয়ে রাজীবকে বলে —

সুবর্ণা : শিল্পী মানুষ। শুধু গানবাজনাই নয়। একসময় এগুলোও নিজের হাতে বানিয়েছেন।

Shot : 241/M.C.S.

রাজীব : এইভাবে বেঁচে থাকা...

Shot : 242/M.C.S./(Pref: Subarna)

রাজীব : Too much.

অল্প দূরে দাঁড়ানো সুবর্ণা এবার রাজীবের দিকে তাকায় এবং পরিচ্ছন্নভাবে দাঁড়িগোঁফ কামানো রাজীবকে দেখে অবাক হয়।

Shot : 243/M.C.S./Same as Shot : 241

রাজীব : চিনতে অসুবিধা হচ্ছে?...

Shot : 244/M.C.S./Same as Shot : 242/(Pref: Subarna)

রাজীব : ...ভাবলাম আপনার আত্মীয় after all...

Shot : 245/M.C.S./Same as Shot : 243

রাজীব : আপনার শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে Introduced হতে হবে...

সুবর্ণা সংলাপের শেষদিকে Frame-in করে।

Shot : 246/M.C.S./Same as Shot : 244/(Pref: Subarna)

রাজীব : একটু... (বাক্য অসমাপ্ত রাখে)

সুবর্ণা : Local newspaper-এ আপনার ছবি দিয়ে আপনার সম্পর্কে খবর বেরিয়েছে। সরকার পাঁচ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে। বাবা কাগজটা দেখেছেন।

Shot : 247/M.C.S./(Pref: Rajib)

রাজীব : তা হলে তো না যাওয়াই ভালো!

Shot : 248/M.C.S./Same as Shot : 246/(Pref: Subarna)

সুবর্ণা : না... সে সম্ভাবনা আর নেই... যেতেই হবে... চলুন।

সুবর্ণা ও রাজীব এবার ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

Scene : 19 (সময়: সকালবেলা)

রাজবাড়ির দোতলার বারান্দা

Shot : 249/M.L.S. to M.S.

রাজীব আর সুবর্ণা দু-জন বারান্দা দিয়ে কথা বলতে বলতে হেঁটে আসছে।

রাজীব : একটা কথার উত্তর কিন্তু এখনো আমি পেলাম না। ওই Ladies-রা কারা?

সুবর্ণা : ওরা পাগলা-গারদ থেকে ছাড়া পেয়েছে। Relatively সুস্থ। একজন একটু অসুস্থ। মাঝে মাঝে বাড়াবাড়ি করে।

রাজীব : But why? ওরা এখানে কেন? এ-বাড়িতে।

Shot : 250/M.C.S.

বারান্দার দুটো থামের মাঝখানে সুবর্ণা ও রাজীবকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। সুবর্ণা বলে—

সুবর্ণা : ওদের কেউ নেই বা থাকলেও ফেরত নেবার নেই। আমার শ্বশুরমশায় ওদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। In fact এই দু-একদিনের মধ্যে আরো কয়েকজন আসবেন। আমাদের 'নারী বিকাশ কেন্দ্র' ওদের জন্য থাকার ব্যবস্থা করছে। নতুন বাড়ি হলে ওরা চলে যাবে।

Scene : 20 (সময়: সকালবেলা)

সংগ্রামের ঘর

Shot : 251/M.S./(Camera on trolley : R/L)

সংগ্রাম (O.S.): আসুন... কী নাম আপনার?

রাজীব ও সুবর্ণা এগিয়ে আসে। এবার সংগ্রাম Frame-in করেন। সংগ্রাম দাবায় মগ্ন। বোঝা যায় এতক্ষণ একা একাই দাবা খেলছিলেন।

রাজীব : আমার নাম রাজীব... আপনি আমাকে তুমি বলতে পারেন।

সংগ্রাম : (সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে) রাজীব?

রাজীব : (পদবি জানতে চাইছেন বুঝে) রয়।

দাবার চাল দিয়ে সংগ্রাম এবার মাথা তুলে রাজীবকে দেখেন।

Shot : 252/M.S.

সংগ্রাম : দাঁড়িয়ে কেন, বোসো।

রাজীব বসে। সুবর্ণা দাঁড়িয়ে থাকে।

সংগ্রাম : তুমি বউমার কীরকম relative?

Shot : 253/M.S.

সুবর্ণা : (কোনো রকমে) আমার বউদির মাসতুতো ভাই।

সংগ্রাম : (রাজীবকে) কোথায় থাকো?

রাজীব : দিল্লি।

সংগ্রাম : কী করো?

রাজীব : এখন কিছুই না। পড়াতাম... ছেড়ে দিয়েছি। একটা কাজে আসাম যাচ্ছিলাম। বোনের কাছ থেকে address-টা পেলাম... তাই...

Shot : 254/M.C.S.

সংগ্রাম : কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো? (আবার দাবার দিকে মন দেন) দ্যাখো, রয়েলটি চলে গেছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর স্বাধীন সরকার...

Shot : 255/M.C.S.

রাজীব ও সুবর্ণা, সংগ্রামের কথা শুনছে।

সংগ্রাম (O.S.): ...প্রতাপপুর এস্টেট, জোর করে কেড়ে নিয়ে...

Shot : 256/M.C.S./Same as Shot : 254

সংগ্রাম : আমাদের ভিখিরি করে দিল। রাজত্ব চলে যাওয়ার আগে যদি আসতে... অবশ্য তখন আর তুমি কী করে আসবে... তখন তো তোমার জন্মই হয়নি।

Shot : 257/M.C.S./Same as Shot : 255

সুবর্ণা : আপনারা কথা বলুন, আমাকে একটু কলেজে বেরোতে হবে।

Shot : 258/M.C.S.

সংগ্রাম : এক মিনিট বউমা...

Shot : 259/M.C.S./Same as Shot : 257

সুবর্ণা যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। রাজীব বলে —

রাজীব : আপনি খুব ভালো পিয়ানো বাজান।

Shot : 260/M.C.S./Same as Shot : 258

সংগ্রাম : ভালো আর কোথায়? আমার বাবা, ঠাকুরদার তুলনায় কিছুই নয়। আমার বাবা সংগীতের নেশায় বিলেতে পালিয়ে গিয়ে একটা ফিলহারমনিক-এও বাজিয়েছিলেন। এটা আমাদের বংশে আছে জানো। আমার নাতনিরও অসাধারণ হাত। আর গানের গলাও চমৎকার। যাক, অনেকটা পথ এসেছ... যাও গিয়ে রেস্ট নাও।

রাজীব (O.S.) : আসি।

Shot : 261/M.C.S.

সুবর্ণা উৎকণ্ঠিত হয়ে সংগ্রামের দিকে তাকায়।

Shot : 262/C.S.

সংগ্রাম হাতে পাইপ তুলে নিয়ে কৌতূহলবশত জিজ্ঞেস করেন —

সংগ্রাম : বউমা, তুমি ওকে...

Shot : 263/M.C.S./Same as Shot : 261

সংগ্রাম (O.S.): ... আগে দেখেছ?

সুবর্ণা : না।

Shot : 264/C.S./Same as Shot : 262

সংগ্রাম : তা হলে জানলে কী করে, ও-ই তোমার বউদির ভাই?

Shot : 265/M.C.S./Same as Shot : 263

সুবর্ণা : (মরিয়া হয়ে) চিঠি এনেছে।

Shot : 266/C.S./Same as Shot : 264

সংগ্রাম : ও... আচ্ছা, আচ্ছা... ঠিক আছে... এসো।

Shot : 267/M.C.S./Same as Shot : 265

সুবর্ণা এবার আস্তে আস্তে (Out of Frame) ঘর ছেড়ে চলে যায়।

Shot : 268/C.S./Same as Shot : 266

ক্যামেরা আস্তে আস্তে Tilt down হয়ে সংগ্রামের মুখ থেকে হাতে আসে। সংগ্রাম আবার দাবাখেলায় মন দেন।

Scene : 21 (সময়: ভোরবেলা)

শৌর্যেন্দ্রর ঘর/'নারী বিকাশ কেন্দ্র' অফিস

Shot : 269/M.C.S.

রাজীব বইয়ের আলমারির কাছে এগিয়ে যায়। আলমারি থেকে প্রথমে একটা ক্যান্ডেলস্ট্যান্ড বের করি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে আবার রেখে দেয়। এবার একটা বই বের করে। উলটে পালটে দেখে সেটা ঢুকিয়ে রেখে অন্য একটা বই বের করে। তারপর বইটা নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। এখন Centre-of-frame-এ শৌর্যেন্দ্র একা।

Shot : 270/M.C.S.

দেবী টিভি দেখছে। তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

Shot : 271/M.C.S./(Camera on trolley : T/F)

রাজীব left of frame চেয়ারে বসে একটা কাঁচি নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। এমন সময় ফোন বেজে ওঠে। রাজীব উঠে দাঁড়িয়ে Right of frame-এ গিয়ে ফোন ধরে বলে —

রাজীব : হ্যাঁ।

Shot : 272/M.C.S.

নারী-বিকাশ কেন্দ্র-র অফিস থেকে মনোরমা অধিকারী কথা বলছেন।

মনোরমা : হ্যালো, সুবর্ণা কোথায়?

Shot : 273/M.C.S./(Camera on trolley : T/F)/Same as Shot : 271

রাজীব : উনি কলেজে।

Shot : 274/M.C.S./Same as Shot : 272

মনোরমা : ও, কলেজে... ও যে বলেছিল আজ দেরি করে বেরোবে।...আচ্ছা...

Shot : 275/M.C.S./(Camera on trolley : T/F) Same as Shot : 273

মনোরমা (O.S.) : ...ঠিক আছে। আপনি কে বলছেন?

রাজীব : আমি ওর Relative।

Shot : 276/M.C.S./Same as Shot : 274

মনোরমা : Relative! (একটু ভেবে) আচ্ছা ও যদি ফোন করে তা হলে ওকে বলবেন যে...

Shot : 277/M.C.S./Same as Shot : 275

মনোরমা(O.S.):...ও যেন একবার নারী-বিকাশ কেন্দ্র ঘুরে যা। আমার খুব দরকার। আরো দু-জন মহিলা ছাড়া পাবে, তাই। আমার নাম মনোরমা অধিকারী।

রাজীব : O.K. .

রাজীব রিসিভার রেখে দেয়। Camera Tilt down করলে দেখা যায় রাজীব টেবিল থেকে কাঁচি আর একটা খবরের কাগজ নিয়ে আবার নিজের চেয়ারের দিকে এগিয়ে যায়।

Shot : 278/M.S.

রাজীব Out of frame থেকে Frame-in করে চেয়ারে বসে। দূরে দেখা যায় শৌর্যেন্দ্র বিছানায় বালিশে ভর দিয়ে বসে আছেন।

Scene : 22 (সময়: দুপুরবেলা)

প্রতাপপুরে সুবর্ণার কলেজ-সংলগ্ন অঞ্চল

Shot : 279/M.S.

জানলা দিয়ে দেখা যায় নারকেলের মালায় টপটপ করে জল পড়ছে।

Shot : 280/M.S.

জানলার শিকের ফাঁক দিয়ে দেখা যায়, অন্য একটা বাড়ির গায়ে ছায়া পড়েছে। ছায়া থেকে বোঝা যায় বেলা প্রায় পড়ে এসেছে।

Scene : 23 (সময়: দুপুরবেলা)

সুবর্ণার কলেজ/পুলিশ স্টেশন

Shot : 281/M.L.S. to M.C.S.

সুবর্ণার কলেজ। সুবর্ণা বাঁদিক থেকে Frame-in করে। সুবর্ণাকে আসতে দেখে কয়েকজন ছাত্রছাত্রী সুবর্ণার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটে। একজন ছাত্র জিজ্ঞাসা করে —

ছাত্র : ম্যাডাম।

সুবর্ণা : হুঁ।

ছাত্র : আজ Comperative Government ক্লাসটা কি নেবেন?

সুবর্ণা : আজকে... আজকে থাক। Theory-টা করিয়ে দিই ... হ্যাঁ। আমি আর একদিন নিয়ে নেব।

সুবর্ণা স্টাফরুমের দিকে পা বাড়ায়। ছাত্রছাত্রীদের, নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন আলোচনায় ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়।

Shot : 282/C.S.

Close Shot-এ দেখা যায়, আদিনাথের হাত রুটি ছিঁড়তে ব্যস্ত।

Shot : 283/C.S.

বাংলার অধ্যাপক আদিনাথ টিফিনের সময়ে খাবার খেতে খেতে বলেন —

আদিনাথ : আগামী জন্মে দুটি জিনিস ঠিক করেছি বুঝলে... এই টিপিনের বাক্সটি আর বইব না, আর দুই... আর বাংলার মাস্টার হব না।

Shot : 284/M.C.S./(Adinath & Bimalesh)

আদিনাথ ও বিমলেশ হেসে ওঠে।

Shot : 285/C.S.

বিমলেশ : কেন, আপনি তো অনার্সে সাতজনকে পেয়েছেন।

Shot : 286/C.S./Same as Shot : 283

আদিনাথ : কোথায় সাতজন? সুবর্ণার পলিটিক্যাল সায়েন্স... দু-জনকে ফুঁসলে নিয়ে চলে গেছে... হ্যাঁ। হারাধনের এখন কুল্লে পড়ে আছে পাঁচজন...

Shot : 287/C.S./Same as Shot : 285

আদিনাথ(O.S.):... বুঝেছ, ডিপার্টমেন্ট তুলে দিতে হবে। আচ্ছা... আমাদের এই পোড়া দেশে...

আদিনাথ বলে চলেন। বিমলেশ অবাক হয়ে আদিনাথের কথা শোনে।

Shot : 288/C.S./Same as Shot : 286

আদিনাথ : ...বুঝলাম না হয় বাংলা পড়ে কিছু হয় না... কিন্তু পলিটিক্যাল সায়েন্স...

Shot : 289/M.C.S. to C.S./Same as Shot : 284

আদিনাথ : ...পড়েই বা কী হয়। কী হয়।

এইসময় টেলিফোন বাজে। টেলিফোন ধরতে যেতে যেতে বিমলেশ বলে —

বিমলেশ : আজকাল কোনোটা পড়েই কিচ্ছু হচ্ছে না। শেষ কথা কমপিউটার।

বিমলেশ এবার ফোনের রিসিভার তুলে বলে 'হ্যালো'। আদিনাথ এখন Out of frame-এ।

Shot : 290/M.S.

পুলিশ স্টেশন থেকে ইন্সপেক্টর বসাক ফোনে কথা বলছেন।

বসাক : হ্যালো... সুবর্ণাদেবী কি ক্লাসে আছেন... না রেস্টে?

Shot : 291/C.S./like end-part of Shot : 289/(Bimalesh)

বসাক (O.S.): জরুরি দরকার ছিল।

বিমলেশ : ক্লাসে।

Shot : 292/M.S./Same as Shot : 290

বসাক : অ।

Shot : 293/C.S./Same as Shot : 291

বিমলেশ : আপনার বিশেষ কোনো জরুরি দরকার থাকলে আমায় বলতে পারেন, আমি ওর কলিগ।

বসাক (O.S.): না... আমি থানা থেকে বলছি। ইন্সপেক্টর বসাক।

Shot : 294/M.S./Same as Shot : 292

বসাক : ওনার বাড়িতে ফোন করেছিলাম। উনি আজকে কলেজে না এলেই পারতেন।

Shot : 295/C.S./Same as Shot : 293

বসাক (O.S.): যাক, যখন এসেই গেছেন কাইন্ডলি বলবেন...

Shot : 296/M.S./Same as Shot : 294

বসাক : ...একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যেতে... যদিও আমরা নজর রাখছি।

Shot : 297/C.S./Same as Shot : 295

বসাকের কথা শুনে বিমলেশের মুখ চিন্তাক্লিষ্ট হয়। Out of frame-এ এ-সময় সুবর্ণা ঘরে ঢোকে। দেখতে পেয়ে Out of frame-এ থাকা আদিনাথের গলা শোনা যায়।

আদিনাথ (O.S.) : অ্যাই যে...

Shot : 298/M.S.

বিমলেশ : হ্যালো... হ্যালো...

ইন্সপেক্টর বসাক ততক্ষণে ফোন রেখে দিয়েছেন। বিমলেশ কোনো সাড়া না-পেয়ে রিসিভার রেখে দেয়। সুবর্ণা Frame-in করে। এখন বিমলেশ, সুবর্ণা, আদিনাথ তিনজনেই in frame।

আদিনাথ : ...বলতে না বলতেই এসে পড়েছে।

সুবর্ণা স্টাফরুমে তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে এসে বসে। বিমলেশও তার পাশে এসে বসে।

আদিনাথ : কী তোমাদের Royal Palace-তো একেবারে আজকের খবর, হ্যাঁ... সুবর্ণা রাজবধূ? এই সাংবাদিকগুলো কী... না? তিলকে একেবারে তাল বানিয়ে ছাড়ে। কোথাকার এক নর্থ-ইস্ট-এর জঙ্গি... সে নাকি বাংলার এক রাজপ্রসাদের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে... কে জানে হয়তো ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ। (জল খেয়ে একটু সময় নিয়ে) পারেও বাবা।

এবার ঘণ্টা পড়ার আওয়াজ শোনা যায়।

Shot : 299/M.S. to M.C.S./(Camera on trolley : L/R)

আদিনাথ : (ঢেকুর তুলে) যাই, হাতটা একটু ধুয়ে আসি।

আদিনাথ হাত ধুতে চলে যায়। বিমলেশ সুবর্ণাকে অতীব চিন্তাক্লিষ্ট দেখে বলে —

বিমলেশ : কী ব্যাপার বলো তো? তুমিও খুলে কিছু বলছ না! এদিকে থানা থেকে ফোন করেছিল। তোমাকে প্যালেসে যেতে বলেছে।

সুবর্ণা : ক্লাসে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যেত। মাথাটা suddenly started spinning।

বিমলেশ : (চাপা স্বরে) কাগজ পড়ে এবং তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যে, পুলিশ যা suspect করেছে সেটা ঠিক। কী... ঠিক বলছি?

সুবর্ণা : (চাপা স্বরে) এখানে... এখানে বলা যাবে না... প্লিজ।

বিমলেশ : (এদিক-ওদিক তাকিয়ে) তোমার ক্লাস নেই?

সুবর্ণা : (প্রায় ভেঙে পড়া গলায়) আছে। অফ দিয়ে দিয়েছি।

বিমলেশ এবার সুবর্ণার হাতের ওপর হাত রেখে মৃদু চাপ দেয়। বলে —

বিমলেশ : চলো... এসো।

সুবর্ণা : চলো।

দু-জনে যাওয়ার উদ্দেশ্যে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

Scene : 24 (সময়: দুপুরবেলা)

শৌর্যেন্দ্রর ঘর

Shot : 300/C.S.

ক্যামেরা রাজীবের মুখ থেকে Tilt down হয়ে হাতে এসে পৌঁছায়। আবার Tilt up হয়ে রাজীবের মুখে পৌঁছায়। দেখা যায় রাজীব চেয়ারে বসে কাঁচি দিয়ে কাগজ কেটে নকশা তৈরি করছে। কাগজ কাটা থামিয়ে এবার সে দূরে Soft focus-এ বসে থাকা ঝিমুনিরত শৌর্যেন্দ্রর দিকে তাকায়।

Scene : 25 (সময়: প্রায় বিকেল)

বিমলেশের ঘর/শৌর্যেন্দ্রর ঘর

Shot : 301/C.S./(Bimalesh)

বিমলেশের হাত সিগারেটের শেষাংশ অ্যাসট্রেতে গুঁজে দেয়। Camera tilt up হয়ে বিমলেশের মুখে আসে। বিমলেশ বেশ উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে।

বিমলেশ : O.K., I understand ! ...বুঝলাম, কিন্তু এটা তো হতে পারে না, তোমার বিপদে আমি হাত গুটিয়ে বসে থাকব, ... impossible ! এটা হয় কখনো? কী করবে ও...

Shot : 302/C.S./(Subarna)

বিমলেশ (O.S.): বড়োজোর আমাকে গুলি করবে।

সুবর্ণা : কী যা তা বলো না তুমি... আমি তোমাকে হারাতে চাই না বিমলেশ...

Shot : 303/C.S./Same as Shot : 301

বিমলেশ : But সুবর্ণা... আমি তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারছি না। O.K., O.K. Fine।

Shot : 304/C.S./Same as Shot : 302

বিমলেশ (O.S.):তুমি ওকে অন্তত বলো যে, আমি ওর কোনো ক্ষতি করব না।

Shot : 305/C.S./Same as Shot : 303

বিমলেশ : ক্ষতি করার কোনো প্রশ্নই উঠছে না। অন্তত আমি ওকে... আমি ওর সঙ্গে কথা তো বলতে পারি... বুঝতে তো পারি ও কতটা Dangerous!

Shot : 306/C.S./Same as Shot : 304

সুবর্ণা : Allow করবে বলে মনে হয় না। তবু চেষ্টা করব। সকালে তো বেশ ভদ্র ভদ্র মনে হচ্ছিল।

Shot : 307/C.S./(Camera on trolley : R/L)

বিমলেশ : অভদ্র কেন হবে? আরে আমরাও যখন রাজনীতি করতাম আমাদেরও উগ্রপন্থী অমুক তমুক বলা হত।

Shot : 308/M.C.S./(Camera on trolley : L/R)

সুবর্ণা : পুলিশ তো বলছে Notorius.

Shot : 309/M.C.S./(Camera on trolley : R/L)

বিমলেশ : পুলিশ সবসময় ঠিক কথা বলে না। কী জানো, Apart from তোমাদের Security আমার একটা Personal curiosity আছে?

Shot : 310/M.C.S./(Camera on trolley : R/L)/Same as Shot : 308

বিমলেশ (O.S.): আমার ওর কাছ থেকে জানতে ইচ্ছা করছে, ওদের এই 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' দর্শনটা কেন?

Shot : 311/M.C.S./(Camera on trolley : R/L)/Same as Shot : 309

বিমলেশ : আমরাও একদিন সশস্ত্র রাজনীতি করেছি। এখন হয়তো আমি নেই, কিন্তু সেই রাজনীতি এখনো আছে। আমরা সমাজব্যবস্থাকে বদলাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু দেশটাকে ভাঙতে চাইনি।

Shot : 312/M.C.S./(Camera on trolley : L/R)/Same as Shot : 310

বিমলেশ (O.S.): ...কী ঠিক কি না?

সুবর্ণা : আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। একটা বাড়িতে ফোন করি তো।

সুবর্ণা এবার বাড়িতে ডায়াল করে।

Shot : 313/C.S.

টেলিফোনের ক্লোজ শট।

Shot : 314/C.S.

রাজীব টেলিফোনের রিসিভার তুলে কানে লাগিয়ে বলে —

রাজীব : হুঁ?

Shot : 315/M.C.S.

সুবর্ণা : আমি মিসেস সিংহ বলছিলাম।

Shot : 316/C.S./Same as Shot : 314

রাজীব : ও হ্যাঁ... few calls এসেছিল। ওই একটা Womens' association থেকে...

Shot : 317/M.C.S./Same as Shot : 315

রাজীব (O.S.): ...One lady.

সুবর্ণা : মনোরমাদি? মনোরমা অধিকারী?

Shot : 318/C.S./Same as Shot : 316

রাজীব : You are right, অধিকারী। উনি বললেন যে...

Shot : 319/M.C.S./Same as Shot : 317/(Subarna)

রাজীব (O.S.): ...আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

Shot : 320/C.S./Same as Shot : 318

রাজীব : Its urgent. দু-জন লেডিজ আসার কথা আছে কাল।

Shot : 321/C.S./(Subarna)

রাজীব (O.S.): Something like that, তো উনি আসতে পারবেন না...

Shot : 322/C.S./Same as Shot : 320

রাজীব : ...আর একটা call from thana again.

Shot : 323/C.S./Same as Shot : 321

সুবর্ণা : (নার্ভাস হয়ে) কী বলেছে?

Shot : 324/C.S./Same as Shot : 322

রাজীব : আপনাকে চাইছিল।

Shot : 325/C.S./Same as Shot : 323

সুবর্ণা : আমার মেয়ে কোথায়?

Shot : 326/C.S./Same as Shot : 324

রাজীব : She is fine.

Shot : 327/C.S./Same as Shot : 325

সুবর্ণা ফোনটা আস্তে আস্তে নামিয়ে রাখে।

Shot : 328/C.S./Same as Shot : 326

রাজীবও আস্তে আস্তে ফোনটা রেখে দেয়।

Shot : 329/C.S.

বিমলেশ : মনোরমাদিকে ফোন করে দাও। শরীর খারাপ লাগছে বলছ...

Shot : 330/C.S.

বিমলেশ(O.S.): ... সেদিনই তো বললে যে ডাক্তার বলেছে pressure low।

সুবর্ণা : মনোরমাদি কী ভাববে... দু-জন মেয়ে ছাড়া পাচ্ছে কালকে... তার জন্যেই হয়তো...

Shot : 331/C.S./Same as Shot : 329

বিমলেশ : ঠিক আছে, আমি রাতের দিকে ওদিকে যাব... যদি মনে হয়...

Shot : 332/C.S./Same as Shot : 330

সুবর্ণা : (মুখের কথা কেড়ে নিয়ে) না... না... একদম না। আমি রাতে তোমায় ফোন করব।

Scene : 26 (সময়: বিকেলবেলা)

শৌর্যেন্দ্রর ঘর/'নারী বিকাশ কেন্দ্র অফিস'

Shot : 333/M.C.S./(Camera an trolley : L/R)

খাটে চুপ করে শুয়ে শৌর্যেন্দ্র। সংগ্রাম ঘরে ঢোকেন। ঘরের ডিভানে বিছানা পাতা দেখে অবাক হন। শৌর্যেন্দ্রর পাশে এসে বসেন। শৌর্যেন্দ্র আস্তে আস্তে ওঠেন।

সংগ্রাম : বাবা... আবার... আবার উঠছ কেন? ...না, না... উঠতে হবে না... একী, শোও... শোও, শুয়ে পড়ো... শুয়ে থাকো... শুয়ে থাকো (শৌর্যেন্দ্র শুয়ে পড়েন)... শরীর কেমন?

শৌর্যেন্দ্র ইশারা-ইঙ্গিতে জানান শরীর ঠিক আছে। এইসময় দরজা দিয়ে রাজীবকে ঢুকতে দেখেন সংগ্রাম। বাবাকে বলেন —

সংগ্রাম : ঠিক আছে... তুমি বিশ্রাম করো।

সংগ্রাম এবার উঠে রাজীবের দিকে এগোতে থাকেন।

Shot : 334/M.C.S.

সংগ্রাম : (রাজীবের কাছে এসে) কী ব্যাপার, আমাদের বাড়িতে এত খালি ঘর পড়ে রয়েছে... তুমি এখানে ডিভানে শুয়ে থাকছ কেন?

রাজীব : না, না, Its all right.

সংগ্রাম : না... না... all right কীসের... আমার মনে হয় বউমার তাড়াহুড়োয় মাথার ঠিক নেই। কিছু মনে কোরো না। আমি এখুনি মায়াকে বলে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

রাজীব : না, না, আপনি একদম ব্যস্ত হবেন না। I am absolutely fine...কয়েকটা দিনের তো ব্যাপার।

সংগ্রাম : Are you sure?

রাজীব : আমি একদম ঠিক আছি।

এইসময় হঠাৎ ফোন বেজে ওঠে।

Shot : 335/C.S.

টেলিফোনের ক্লোজ আপ। টেলিফোন বাজছে।

Shot : 336/M.C.S./Same as Shot : 334

রাজীব এগিয়ে গিয়ে ফোন ধরে।

রাজীব : হ্যাঁ... হ্যাঁ একটু ধরুন।

সংগ্রাম এবার ফোনের কাছে এগিয়ে যান।

Shot : 337/C.S.

মনোরমার কানে টেলিফোন রিসিভার।

Shot : 338/M.C.S.

সংগ্রাম : হ্যালো...

Shot : 339/C.S./Same as Shot : 337

'নারী-বিকাশ' কেন্দ্রের অফিসে বসে মনোরমা ফোনে কথা বলছে।

মনোরমা : মেসোমশায়, আপনাকে যে কী বলে কৃতজ্ঞতা জানাব।

Shot : 340/M.C.S.

সংগ্রাম : ঠিক আছে... ঠিক আছে।

Shot : 341/C.S./(Sidewise left : Manoroma)

মনোরমা : কাল তো আরো দু-জন ছাড়া পাচ্ছে, তাই বলছিলাম...

দূরে দেখা যায় সুবর্ণা soft focus-এ পেছনে শুয়ে আছে।

Shot : 342/C.S.

সংগ্রাম : হ্যাঁ, সেই রকমই তো কথা ছিল... এতে এত দ্বিধা করে বলছ কেন? ক-জন অসহায় মহিলা ক-দিন থাকবেন... এতে তো ভাববার কিছু নেই। পাঠিয়ে দিয়ো।

Shot : 343/C.S./Same as Shot : 341

মনোরমা : সুবর্ণা এখানেই আছে। ফিরতে একটু দেরি হবে।

Shot : 344/C.S./Same as Shot : 342

সংগ্রাম : ও, ঠিক আছে।

Shot : 345/M.S.

ক্যামেরার কাছাকাছি থাকা মনোরমা রিসিভার রাখে। পিছনে দেখা যায় soft focus-এ, সুবর্ণা দূরের একটা টেবিলের ওপরে শুয়ে।

মনোরমা : (সুবর্ণাকে) বলে দিয়েছি তো... চিন্তা করিস না।

সুবর্ণা এবার ধীরে ধীরে ওঠে।

মনোরমা : আরেকটু শুয়ে থাক। উঠছিস কেন?

সুবর্ণা : ঠিক আছে। মাথাটা একটু ঘুরে গিয়েছিল।

Shot : 346/C.S.

মনোরমা : নে, দুধটুকু খেয়ে নে।

Shot : 347/M.S. to M.C.S./(Camera on trolley : L/R)

সুবর্ণা ধীরে ধীরে কথা বলতে বলতে হাঁটতে থাকে।

সুবর্ণা : ক-দিন আগেও না, মাথাটা এরকম হয়েছিল। (এবার মনোরমা Frame-in করে) প্রেশার-টেশার লো বলে... ডাক্তার তো ওষুধও দিল।

সুবর্ণা এসে মনোরমার সামনে চেয়ারে বসে।

মনোরমা : নে, খেয়ে নে।

সুবর্ণা এবার দুধের কাপে চুমুক দেয়।

Shot : 348/M.C.S.

সুবর্ণা, Camera-র কাছাকাছি পিছনে ফিরে আছে। তার উলটোদিকে ক্যামেরার মুখোমুখি বসে আছে মনোরমা।

মনোরমা : মাথার আর দোষ কী... একটাই তো মাথা...

Shot : 349/C.S./(Subarna)

মনোরমা(O.S.):...তার ওপর প্রতাপপুর রাজবাড়ির দায়।

সুবর্ণা অল্প একটু দুধ খেয়ে কাপটা নামিয়ে রাখে।

Shot : 350/M.C.S./Same as Shot : 348

মনোরমা : খেয়ে নে...

Shot : 351/C.S./Same as Shot : 349

মনোরমা(O.S.): ...সবটা।

সুবর্ণা : ঠিক আছে।

Scene : 27 (সময়: বিকেলবেলা)

সুবর্ণা ও দেবীর ঘর/রাজবাড়ির ছাদ

Shot : 352/M.S. to M.C.S./(Camera on trolley : T/B)

সুবর্ণার ঘরে দেবী হুইলচেয়ারে বসে টিভি দেখছে। রাজীব এসে দাঁড়ায় দরজার সামনে। হাত দুটো তার পিছনে লুকোনো। দেবী রাজীবকে দেখে ভীষণ ভয় পায়। রাজীব ভরসা দিয়ে বলে—

রাজীব : তোমায় বলেছি না, আমি তোমার Uncle। (হাত দুটো পিছনদিক থেকে সামনে এনে) দ্যাখো, তোমার জন্য কী নিয়ে এসেছি। ...হুঁ... ভয় পাচ্ছ কেন... (রাজীব কাগজের মুকুটটা খুলে দেবীর মাথায় পরিয়ে দেয়) You are my little princess... you are a sweet girl...আমি তোমার Uncle তো... চলো, তোমাকে Emperor-কে দেখাব। চলো... চলো... চলো... চলো...

রাজীব হঠাৎ দেবীর পিছনে গিয়ে হুইল চেয়ারটি ঠেলতে ঠেলতে ঘরের বাইরে নিয়ে যায়।

Shot : 353/L.S./(Top angle)

রাজীব হুইলচেয়ারে বসা দেবীকে ঘর থেকে ছাদে নিয়ে এসে হুড়োহুড়ি করে পাক খেতে থাকে। দেবীও মজা পেয়ে আনন্দে হাসতে থাকে।

Scene : 28 (সময়: বিকেলবেলা)

'নারী বিকাশ কেন্দ্র' অফিস

Shot : 354/C.S.

'নারী-বিকাশ কেন্দ্র'-এর অফিসে বসে মনোরমা সুবর্ণাকে বোঝাতে চেষ্টা করছে।

মনোরমা : সব ঘা সারে না সুবর্ণা। তোকে দেখেই বুঝি। এইজন্যই বলেছিলাম, বিমলেশকে বিয়ে কর্, আবার সংসার কর্।

Shot : 355/C.S.

মনোরমা(O.S.): বিমলেশটাও তো বিয়ে থা করল না।

সুবর্ণা : সে-সংসার করেও কি সুখী হতাম। বিক্রম তো অন্যায় করেইছে। কিন্তু, ওই বিরানব্বই বছরের বৃদ্ধ...

Shot : 356/C.S./(Monorama)

সুবর্ণা (O.S.): ... আমার হাতে ছাড়া খায় না।

Shot : 357/C.S./Same as Shot : 355

সুবর্ণা করুণভাবে মনোরমার দিকে তাকিয়ে বলে চলে —

সুবর্ণা : আমার শ্বশুরমশায়ের যখন প্রথম attack-টা হল... আমার ওপর কী অসম্ভব Dependence... ... এদের ছেড়ে কোথায় যাব। নিজের সুখটাই কী বড়ো?

Scene : 29 (সময়: বিকেলবেলা)

শৌর্যেন্দ্রর ঘর

Shot : 358/M.S.

দেবীকে হুইলচেয়ারে বসিয়ে রাজীব শৌর্যেন্দ্রর ঘরে ঢোকে। রাজীব হাত দিয়ে দেখায় শৌর্যেন্দ্রকে। দেখা যায় শৌর্যেন্দ্রর মাথায় রাজীবের বানানো কাগজের মুকুট। তিনি Emperor সেজে বসে আছেন।

রাজীব : চলো... দেখেছ?

Shot : 359/C.S.

মাথায় মুকুট পরে শৌর্যেন্দ্র বসে বসে হাসছেন।

Shot : 360/C.S.

দেবী শৌর্যেন্দ্রকে দেখে খুব মজা পায়। মজা পেয়ে হেসে ফেলে বলে —

দেবী : How funny.

Shot : 361/M.S. to M.C.S.

রাজীব এবার দেবীর হুইলচেয়ারটাকে খাটের থেকে একটু দূরে দাঁড় করায়।

রাজীব : তোমার জন্য আমি কী বানিয়েছি দ্যাখো!...

রাজীব এবার মাটিতে বসে। বসে খবরের কাগজে কাটা ডিজাইনটা দেবীর হাতে দেয়।

রাজীব : ...দ্যাখো। See it. You like it?

দেবী : Yes... but I am not a kid.

রাজীব : Oh! তাহলে ম্যাজিক দেখাই।

দেবী : হুঁ।

রাজীব মুখে একটা শব্দ করে দেবীকে হাতটা খুলে দেখায় তালুতে একটা কয়েন। সেটা নিয়ে সে দেবীকে ম্যাজিক দেখায়।

রাজীব : এটা দেখতে পাচ্ছ... একটা কয়েন... O.K. ...এবার আমি এটা আমার এলবোর মধ্যে ঢুকিয়ে দেবো। Watch...

কিন্তু রাজীব ম্যাজিক দেখাতে ব্যর্থ হয়। হাতের ভাঁজ খুললে দেখা যায় কয়েনটা অদৃশ্য হয়নি। রাজীব বলে —

রাজীব : যাঃ, ঢুকল না। মন্ত্রটা ঠিক হয়নি...

Shot : 362/M.C.S./(Debi)

মাথার মুকুটটা খুলতে খুলতে দেবী রাজীবের কাণ্ড দেখে হেসে ওঠে।

রাজীব(O.S.): এবার ঠিক হবে। হোকাস পোকাস... গিলি গিলি... ভ্যানিশ... শম্ভু লালা...

Shot : 363/M.C.S./ Same as last part of Shot : 361

রাজীব : নেই ?

দেখা যায় এবার কয়েনটা অদৃশ্য। এমন সময় Out of frame সংগ্রামের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। তিনি বারবার ডাকতে থাকেন —

সংগ্রাম(O.S.): দেবী দিদি...

দেবী : যাই দাদু।

রাজীব : এক মিনিট।

'এক মিনিট' বলে শৌর্যেন্দ্রর মাথায় পরানো কাগজের মুকুটটা খুলে নিয়ে আসে। এবার সংগ্রাম অধৈর্যস্বরে, 'দেবী দিদি , একবার এসো না দিদি ' বলে ডাক দেন। দেবী আবার বলে 'যাই'। এবার রাজীব দেবীকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

Scene : 30 (সময়: শেষ বিকেল)

সংগ্রামের ঘর/শৌর্যেন্দ্রর ঘর

Shot : 364/M.S.

সংগ্রাম ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন। দেবী হুইচেয়ার চালিয়ে ঘরে আসে।

দেবী : দাদু...

সংগ্রাম : (দেবীকে হুইলচেয়ারে দেখে) একেবারেই হাঁটতে পারছিস না?

দেবী : না ... পারছি , কিন্তু মাঝে মাঝে Cramp হয়ে যাচ্ছে।

সংগ্রাম : ঠিক হয়ে যাবে ... সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু, এ-দিকে ক-দিন তোর গান না শুনে আমার যে শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে দিদি।

Fade Out

Shot : 365/L.S./(Camera on trolley : R/L)

'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে' গানটির Prelude-এর কাজ শুরু হয়। ক্যামেরা একটু উঁচু থেকে রাজীবকে ধরে। গোধূলি আলোয় রাজীব ছাদের কার্নিশে দু-হাতের ওপর মাথা রেখে শুয়ে আছে। পিয়ানোর আওয়াজ কানে গেলে এবার সে উঠে বসে।

Shot : 366 /M.C.S./(Camera on trolley : R/L)

দেবী : (গান) আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর ...

Shot : 367/M.C.S. / (Camera on trolley : L/R)

দেবী : (গান) আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর ...

দেখা যায় দেবী গাইছে। দূরে সংগ্রাম বসে আছেন। ক্যামেরা ট্রলিতে ধীরে ধীরে ডানদিক থেকে বাঁদিকে সরলে এবার শুধু সংগ্রামকে দেখা যায়।

Shot : 368 /L.S./(Camera on trolley : L/R)

গানের Interlude-এর সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরা উঁচুনিচু পাহাড়-সহ উন্মুক্ত প্রকৃতিকে ধরে।

Shot : 369/M.C.S./(Camera on trolley : L/R)

Camera, tilt up-হয়ে দেবীর হাত থেকে মুখে আসে।

দেবী : (গান) মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগনমাঝে ...

Shot : 370 /L.S. /(Camera on trolley : L/R)

ক্যামেরা এবার উদার আকাশকে ধরে।

দেবী (O.S.) : (গান) মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগনমাঝে ...

Shot : 371/M.L.S./(Camera on trolley : R/L)

ক্যামেরা এবার নুড়ি পাথরের মধ্য দিয়ে বয়ে-যাওয়া পাহাড়ি নদীকে ধরে।

দেবী (O.S.) : (গান) বিশ্বজগত মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে...

Shot : 372 /M.C.S. to C.S. /(Camera on trolley : R/L)

ক্যামেরা tilt up হয়ে দেবীর হাত থেকে মুখে পৌঁছয়।

দেবী : (গান) আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর ...

গানের Interlude-এর সময় ক্যামেরা tilt down হয়ে দেবীর মুখ থেকে আবার পিয়ানো-বাদনরত হাতে পৌঁছয়।

Shot : 373/M.C.S.

ক্যামেরা এবার শৌর্যেন্দ্রর মুখ থেকে tilt down হয়ে তার হাতে পৌঁছয়। মনে হয় কোনো অদৃশ্য পিয়ানোয় শৌর্যেন্দ্র অঙ্গুলি সঞ্চালনের প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। নিথর হাতে লক্ষ করা যাচ্ছে মৃদু কম্পন।

Shot : 374/C.S./Same as last part of shot : 372

পিয়ানো-বাদনরত দেবীর হাত দুটো হাত দেখা যায়।

Shot : 375/M.C.S./(Camera on trolley : R/L.)/Same as shot : 367

সংগ্রাম এবার গাইতে থাকেন, দেবী থেমে যায়।

সংগ্রাম : (গান) বহে জীবন রজনীদিন চিরনূতন ধারা ...
বহে জীবন রজনীদিন চিরনূতন ধারা
করুণা তব ...

Shot : 376 /M.S.

রাজীব ছাদের পাঁচিলে হাত দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে।

সংগ্রাম(O.S.): (গান) ... অবিশ্রাম জনমে মরণে ...

Shot : 377/M.C.S.

সংগ্রাম : (গান) ... আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর ...

Shot : 378/M.L.S./(Camera on trolley : L/R)

ক্যামেরা এবার প্রকৃতিকে ধরে।

Shot : 379/M.C.S./(Camera on trolley : T/B)

সংগ্রাম এবার ওঠেন। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে আসেন। দেবীর কাছে যান। দেবী এবার Frame-in করে। এখন একসঙ্গে দু-জনকেই Frame-এ দেখা যায়। সংগ্রাম দাঁড়িয়ে এবং দেবী বসে একসঙ্গে গাইতে থাকেন।

দেবী ও সংগ্রাম : (গান) স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তি কোমল করে প্রাণ
স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তি কোমল করে প্রাণ
কত সান্ত্বন করো বর্ষণ ...

Shot : 380/L.S. to M.L.S./(Camera on trolley : R/L)

ক্যামেরা Right of Frame একটা গাছকে ধরে আস্তে আস্তে বাঁদিকে এলে রাজীব Frame in করে। দেখা যায় রাজীব বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

দেবী ও সংগ্রাম (O.S.) : (গান) ... সন্তাপহরণে ...

এখানে সংগ্রাম চুপ করে যান। আবার দেবী একাই গাইতে থাকে —

দেবী (O.S.): (গান) আনন্দলোকে ...

Shot : 381/M.C.S./(Camera on trolley : T/F)

দেখা যায় সংগ্রাম বসে বসে পিয়ানো বাজাচ্ছেন। তার পাশে বসে দেবী গাইছে।

দেবী : (গান) ... মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর
আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর।

এবার ধীরে ধীরে গান থেমে যায়।

Shot : 382/L.S.

ক্যামেরা ডানদিক থেকে বাঁদিকে Pan করলে বোঝা যায় পাহাড়ের কোলে সন্ধ্যা নেমেছে।

Scene : 31 (সময়: সন্ধ্যাবেলা)

রাজবাড়ির বাইরের দিকে উন্মাদিনীদের ঘর

Shot : 383/M.C.S./(Camera on trolley : T/B)

উন্মাদিনীদের ঘর। রাজীব দরজা খুলে ভেতরে ঢোকে । প্রথমে রাজীবের পা-দুটো শুধু দেখা যায়। সকলেই চুপ করে বসে। ক্যামেরা এবার প্রতিমার মুখে পৌঁছয়। গত রাত্রে যার কান্নার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল, আজকেও সে সমানে কেঁদে চলেছে। প্রতিমার কাছে তার না-খাওয়া খাবার পড়ে আছে। বেসিনের খোলা কল থেকে জল পড়ার টুপটাপ আওয়াজ আসছে।

Shot : 384/C.S.

রাজীব একবার ঘাড় ঘুরিয়ে চারদিক দ্যাখে । তারপর প্রতিমার কাছে এগিয়ে যায়।

Shot : 385/M.S.

রাজীব এবার বেসিনের কলটা বন্ধ করে। তারপর রাজীব প্রতিমার কাছে এসে বসে। প্রতিমার পাশে মীনাক্ষী নামে অন্য একজন উন্মাদিনী মুখে নানারকম আওয়াজ করে ক্রমাগত 'পাঁচ ছয়' বলে চলেছে। এবার ক্যামেরা Tilt down করে। রাজীব প্রতিমাকে বলে—

রাজীব : নিন । (খাবারের থালাটা প্রতিমার দিকে এগিয়ে দ্যায়। বলে) এবার তো বাড়ি যাবেন। আপনাদের নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে ... নিন।

Shot : 386/M.C.S.

রাজীব দেখা যায় প্রতিমার খাবারের থালাটা এখনো ধরে আছে।

রাজীব : (প্রতিমাকে) নিন।

Shot : 387/M.S./Same as last part of Shot : 385

রাজীব বসে বসে দরজার দিকে তাকায়। খাবারের থালাটা এখনো তার হাতে ধরা।

Shot : 388/M.C.S.

সুবর্ণা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ভেতরে রাজীবকে দেখে বিস্মিত হয়ে বলে—

সুবর্ণা : একী, আপনি ...

Shot : 389/M.C.S.

সুবর্ণার কথা শুনে রাজীব তার দিকে তাকায়।

Shot : 390/M.C.S./Same as Shot: 388

সুবর্ণা একটু এগিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢোকে।

সুবর্ণা : ... এখানে? এ-সময়ে?

Shot : 391/M.C.S./ Same as Shot : 389

রাজীব আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় । ক্যামেরা tilt up হয়ে রাজীবকে Follow করে।

রাজীব : এই এলাম আর কি...

Shot : 392/M.C.S./ Same as Shot : 390/(Subarna)

রাজীব(O.S.): ... কাল, She was crying...

Shot : 393/M.C.S./ Same as Sho : 391

রাজীব : এ তো খায়নি এখনো ... I am trying to ...

Shot : 394/M.C.S./ Same as Shot : 392

রাজীব(O.S.): ... help her .

দেখা যায় সুবর্ণাকে সামনের দিকে এগিয়ে আসতে।

Shot : 395/M.S/(Camera on trolley : T/F)

সুবর্ণা প্রতিমার কাছে এসে বসে।

সুবর্ণা : প্রতিমা ... এখনো খাওনি।

সুবর্ণা বেসিনে হাতটা ধুয়ে তারপর রাজীবের হাত থেকে খাবারের থালাটা নেয়।

সুবর্ণা : খেয়ে নাও ... রাগ করে কী হবে, হুঁ ... খেয়ে নাও ... নাও ... ধরো, ধরো ... খাও।

সুবর্ণা প্রতিমাকে খাইয়ে দেয়। প্রতিমা খায়। পাশে বসা অন্য এক উন্মাদিনী মীনাক্ষী মুখে ক্রমাগত অর্থহীন আওয়াজ করতে থাকে। সুবর্ণা এবার খাবারের থালাটা প্রতিমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে রাজীবকে বলে —

সুবর্ণা : বড়ো বাড়িতেই বিয়ে হয়েছিল ... বছর তিনেকের মধ্যেই বর তাড়িয়ে দেয় ... বাচ্চাটাও রহস্যজনকভাবে মারা যায় ... তারপর থেকেই জেলের জীবন।

সুবর্ণা এবার বেসিনে হাত ধোয়।

Shot : 396/C.S.

মীনাক্ষী হি হি করে হেসে ওঠে।

Shot : 397/C.S./(Sidewise)

প্রতিমা এবার নিজের হাতে খাবার খেতে শুরু করে।

Shot : 398/M.S./(Camera on trollley : T/F)/Same as Shot : 395

মীনাক্ষীর হাসি শুনে সুবর্ণা রেগে গিয়ে বলে —

সুবর্ণা : চুপ, হাসতে বারণ করেছি না।

মীনাক্ষীর হাসি থেমে যায়। সুবর্ণার হাত ধোয়া শেষ হয়।

রাজীব : আপনি যে বললেন ওরা সুস্থ ।

সুবর্ণা : সম্পূর্ণ সুস্থ নয়।

রাজীব : Strange! ওদের কেউ Claim করছে না?

সুবর্ণা : তা হলে কী আর এখানে থাকতে হত। এদের কেউ দশ বছর, কেউ বারো বছর, জেলে ছিল ... কেউ স্বামী পরিত্যক্তা ... কারো ছেলে-বউ ঘরে নেয় না। সবারই জীবনে একটা করুণ ইতিহাস আছে। অভাবে অনটনে জেরবার। আপনার এখানে থাকাটা risky হয়ে যাচ্ছে ... আসুন...

রাজীব : আপনি যান। আমি আসছি। ওদের সঙ্গে একটু ...

সুবর্ণা চলে যায়। ক্যামেরা এবার বাঁদিকে অল্প Pan করে রাজীবকে ধরে।

Shot : 399/C.S.

জলভরা চোখে ছবি নামে একজন উন্মাদিনী উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

Shot : 400/C.S./(Sidewise)

প্রতিমা খাবার খাচ্ছে।

Shot : 401/M.C.S.

একজন বৃদ্ধা উন্মাদিনী অসহায়ভাবে তাকিয়ে আছে।

Scene : 32 (সময়: রাত্রিবেলা)

সংগ্রামের ঘর/সুবর্ণার ঘর ও সংলগ্ন বাথরুম

Shot : 402/C.S. to M.C.S.

সংগ্রাম চিন্তান্বিতভাবে টেবিলের কাছে গিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত টেররিস্ট-এর ছবিটা ভালো করে দেখছেন। বোঝা যায়, তার মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে। সংগ্রাম এবার কাগজটা টেবিলের ওপর রেখে দেন।

Shot : 403/C.S.

বাথরুমে সুবর্ণা শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে স্নান করছে। শুধুমাত্র সুবর্ণার মাথা দেখা যাচ্ছে।

Shot : 404/C.S.

শুধুমাত্র ঝরে পড়া (শাওয়ার থেকে) জলধারা দেখা যাচ্ছে।

Shot : 405/C.S./ Same as Shot : 403

সুবর্ণা এখনো স্নান করছে।

Shot : 406/M.C.S.

টিভি চলছে। টিভির পরদায় নানারকম দৃশ্য আসছে।

Shot : 407/M.S. to M.C.S./(Camera on trolley : L/R)

উপুড় হয়ে শুয়ে দেবী অবিরাম টিভি দেখে চলেছে। সুবর্ণা শাড়ি পরে বাথরুমের ভিতর থেকে বেরিয়ে ঘরে আসে। এখন তাকে বেশ Fresh লাগছে। দেবীকে অবিশ্রান্ত টিভি দেখে যেতে দেখে বলে —

সুবর্ণা : টিভি দেখে দেখে চোখটা এবার যাবে।

সুবর্ণা এবার সামনে রাখা টেবিল থেকে ওষুধটা বার করে দেবীকে দিয়ে বলে—

সুবর্ণা : এই নাও ... ওষুধটা খেয়ে নাও।

দেবী উঠে বসে ওষুধটা খায়।

সুবর্ণা : দুপুরে খেয়েছ তো ঠিক করে?

দেবী : হুঁ।

সুবর্ণা এবার দেবীর গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। তারপর পাশ ফিরতে হঠাৎই নজর পড়ে খবরের কাগজে কাটা কিছু ডিজাইনের ওপর।

সুবর্ণা : এইসব পড়াশনো না করে করা হয়েছে, না?

দেবী : না, আমি করিনি। ওগুলো ওই Gun-man। (বন্দুকের Gesture করে) ঠাঁই ... ঠাঁই ... ঠাঁই ... he is quite good.

সুবর্ণা এবার ডানদিকে হেঁটে Out of frame হয়ে ডাকে —

সুবর্ণা (O.S.): মায়া ...

মায়া (O.S.): (উত্তর দেয়) যাই ... বউদি।

আবার হেঁটে এসে সুবর্ণা Frame-in করে। দেবী বলে —

দেবী : ওমা, জানো তো, আমাকে না ও খুব Adventure-এর গল্প বলেছে। আর দাঁড়াও ... (ক্যামেরা দেবীর কাছে আসে) তোমাকে একটা দেখাই ... উঁ ... (একটা কাগজের মুকুট তুলে ধরে) এই দ্যাখো, এটা দাদাভাইয়ের। এটা দাদাভাইকে না ...(নিজের মাথায় পরে) এমনি করে মাথায় পরিয়ে ছিল। আমারও একটা এমনি আছে।

মায়া ঘরে ঢুকে Frame-in করে।

মায়া : ও বউদি, দাদাভাইকে খেতে দিয়ে দিয়েছি ... আমি কি খাইয়ে দেবো?

সুবর্ণা : না, আমি খাইয়ে দিচ্ছি। তুমি ওর খাবারটা দিয়ে দাও।

মায়া চলে যায়। সুবর্ণা এবার খাটে শুয়ে থাকা দেবীর কাছে আসে।

সুবর্ণা : (রেগে, বিরক্ত হয়ে) এটা দাদাভাইকে পরিয়ে ছিল? (মুকুটটা দেবীর হাত থেকে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে বলে) Nonsense.

সুবর্ণা এবার দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

Scene : 33 (সময়: রাত্রিবেলা)

শৌর্যেন্দ্রর ঘর

Shot :408 /M.S.to M.C.S./ (Camera on trolley : R/L)

শৌর্যেন্দ্র বসে আছেন। পাশে খাবার রাখা । সুবর্ণা ঘরে ঢোকে। ঢুকে লক্ষ করে ফোনের রিসিভারটা পাশে নামানো । একবার কানে লাগিয়ে শোনে। কোনো শব্দ বা কথা না-শোনায়, রিসিভারটি যথাস্থানে রাখে। এরপর শৌর্যেন্দ্রর কাছে যায়। ক্যামেরা এবার ডানদিক থেকে বাঁদিকে সরে দু-জনকে ধরে। সুবর্ণা শৌর্যেন্দ্রর গায়ে একটা টাওয়েল পাততে পাততে বলে—

সুবর্ণা : আপনার Favourite chicken আছে ... Favourite chicken stew.

সুবর্ণা এবার খাবারের পাত্রটা তার হাতে নেয়। শৌর্যেন্দ্র রাজীবের বিছানার দিকে তাকিয়ে ইশারা করে।

সুবর্ণা : উনি ... নীচে।

সুবর্ণা শৌর্যেন্দ্রকে খাওয়াতে থাকে, এমন সময় রাজীব ঘরে ঢোকে। সুবর্ণা লক্ষ করে । শৌর্যেন্দ্র রাজীবকে দেখে মুখে অব্যক্ত শব্দ করেন।

সুবর্ণা : (রাজীবের উদ্দেশে) আপনি ঠিক করেননি।

রাজীব : আপনি আমায় কিছু বলছেন?

সুবর্ণা : (খাওয়াতে খাওয়াতে) আপনি Shelter চেয়েছেন ... Fine ... দিয়েছি বা দিতে বাধ্য হয়েছি। আমি আপনার কাজ এবং আপনার Mission-কে অসম্মান করিনি কিন্তু ।

Shot : 409/M.C.S.

রাজীব : (অবাক হয়ে) মানে! আপনি কী বলছেন?

Shot : 410/M.C.S.

সুবর্ণা : আপনি বা আপনারা যা করেছেন, এইসব সন্ত্রাস ...Terrorism ...Seperatism...

Shot : 411/M.C.S./Same as Shot : 409/(Rajib)

সুবর্ণা (O.S.): ...খুন ...

Shot : 412/M.C.S./ Same as Shot : 410

সুবর্ণা : হেনা... তেনা ... তার সঙ্গে আমি একমত নাও হতে পারি। (শৌর্যেন্দ্রর মুখ মোছাতে মোছাতে) আপনি বিশ্বাস করেন ... করুন। তা বলে এই মানুষটি যে 'রাজা' হয়ে জন্মেছেন তার জন্য তাঁর দোষ কোথায়? ...

Shot : 413/M.C.S./ Same as Shot : 411

আমরা রাজীবের প্রতিক্রিয়া দেখতে পাই।

Shot : 414/M.C.S./ Same as Shot : 412

সুবর্ণা : আজ হয়ত সে অথর্ব ... ভিখিরি ... তার মানে এই নয় যে আপনি তার মাথায় একটা কাগজের মুকুট বসিয়ে মজা করবেন!

Shot : 415/M.S./Same as last part of Shot : 408

সুবর্ণার চোখে অশ্রু চিকচিক করে ওঠে। এই নীরব মুহূর্তে বাড়ির কলিংবেল বেজে ওঠে।

রাজীব : I am sorry ... it was just a joke.

সুবর্ণা : A very cruel one but.

ঘরের দরজায় মায়া আসে। সুবর্ণাকে বলে—

মায়া : বউদি, কলেজের দাদাবাবু এসেছেন।

সুবর্ণা বিমলেশের আসার খবর শুনে আতঙ্কিত হয়।

Shot : 416/M.C.S./ Same as Shot : 413

রাজীব সন্দিগ্ধ । কোনো কথা বলে না। সোজাসুজি সুবর্ণার দিকে তাকায়।

Shot : 417/M.S./ Same as Shot : 415

সুবর্ণা রাজীবের দিকে তাকায়। মায়া ঘর ছেড়ে চলে যায়।

Shot : 418/M.C.S.

সুবর্ণা : বিমলেশ ... আমার colleague ...

Shot : 419/C.S./(Rajib)

সুবর্ণা (O.S.): ... আমাদের ...

Shot : 420/M.C.S./ Same as Shot : 418

সুবর্ণা : ...Wellwisher, ভীষণ সৎ, বুদ্ধিমান, ভালোমানুষ। আপনার সম্বন্ধে কৌতূহল ছাড়া আর কোনো Interest নেই। কারণ একসময় ও সশস্ত্র রাজনীতি করত।

Shot : 421/C.S./ Same as Shot : 419

রাজীব : উনি জানলেন কী করে?

Shot : 422/M.C.S./ Same as Shot : 420

সুবর্ণা : আন্দাজ করেছে। খবরের কাগজ পড়ে বা আমাকে দেখে।

Shot : 423/C.S./ Same as Shot : 421

রাজীব : আপনি ওনাকে এখানে আসতে বলেছেন?

Shot : 424/C.S./ (Subarna)

সুবর্ণা : না।In fact আপনার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে ও আগেই প্রকাশ করেছিল ... আমি না বলি। ওর যদি আপনাকে arrest করানোর ইচ্ছে থাকত এতক্ষণে ও পারত ... আর পাঁচ লাখ টাকাটাও ও দাবি করতে পারত।

Shot : 425/C.S./ Same as Shot : 423

রাজীব : আমার সঙ্গে কথা বলতে চান কেন? হুঁ।

Shot : 426/C.S./ Same as Shot : 424

সুবর্ণা : হয়তো আপনাদের activities সম্বন্ধে কিছু জানার আগ্রহ আছে ... নিশ্চয়।

Shot : 427/C.S./ Same as Shot : 425

রাজীব এবার কিছু বলে না।

Shot : 428/C.S./ Same as Shot : 426

সুবর্ণা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

Shot : 429/C.S./ Same as Shot : 427

রাজীব একবার শৌর্যেন্দ্রর দিকে তাকিয়ে তারপরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

Scene : 34 (সময়: রাত্রিবেলা)

রাজবাড়ির একতলায় ড্রয়িংরুম

Shot : 430/M.S./(Top angle)

বিমলেশ রাজবাড়ির বিশাল ড্রইংরুমে দাঁড়িয়ে। সুবর্ণা ঘরে ঢুকলে Camera অল্প Tilt down হয়। বিমলেশকে কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখায়। বিমলেশকে দেখে সুবর্ণা বলে—

সুবর্ণা : কী ব্যাপার, তুমি!

বিমলেশ : Panicked হোয়ো না।

Shot : 431/M.C.S.

বিমলেশ : আমি আসতে বাধ্য হলাম। তোমার প্যালেসের চারপাশে প্রচুর পুলিশ শাদা পোশাকেঘোরাফেরা করছে। আমি থানায় খবর নিয়েছিলাম। ওদের ধারণা যে লোকটা এখানেই লুকিয়ে আছে। স্রেফ রাজবাড়ি বলে ... ওরা ...

সুবর্ণা : তুমি তো একটা ফোন করলেই পারতে।

বিমলেশ : তোমার ফোনটা বোধহয় কাজ করছে না। আমি অনেকবার ট্রাই করেছিলাম...একটু দেখো তো।... তো লোকটা কোথায়? বলেছিলে?

সুবর্ণা : ভুলে গিয়েছি। এক্ষুনি বললাম। মনে হয় ও দেখা করতে Interested নয়। তুমি চলে যাও ... প্লিজ ...

হঠাৎ কারো উপস্থিতিতে ওরা দুজনেই তাকায়।

Shot : 432/M.C.S./(Rajib)

দরজায় রাজীব দাঁড়িয়ে। সে এবার একটু এগিয়ে এসে দাঁড়ায়।

রাজীব : মিসেস সিংহ ...

Shot : 433/M.C.S. / (Subarna & Bimalesh)

রাজীব (O.S.): ... আর তার Father in law আমায় Shelter দিয়েছেন।

Shot : 434/M.C.S./ Same as Shot : 432

রাজীব : আমি মিসেস সিংহকে বিশ্বাস করতে পারি। আপনি বলুন, আপনি আমার সম্বন্ধে Curious কেন?

Shot : 435/M.C.S./ Same as Shot : 433

সুবর্ণা : আপনারা বসুন না।

Shot : 436/M.C.S./ Same as Shot : 434

রাজীব : না আপনি বসুন না।

Shot : 437/M.C.S./ Same as Shot : 435

বিমলেশ : আপনি হয়তো আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। আপনার চোখমুখ তাই বলে।

Shot : 438/M.C.S./ Same as Shot : 436

রাজীব : সবার চোখ মুখের Language একরকম হয় না। আপনি বলুন ...

Shot : 439/M.C.S./ Same as Shot : 437

বিমলেশ : তা হলে সরাসরিই বলি। আপনারা নিজেদের India থেকেবিচ্ছিন্ন করতে চান কেন? অদ্ভুত খবর-টবর পড়ে যেটুকু জানতে পারি আর কি?

Shot : 440/M.C.S./ (Rajib)

রাজীব : আপনাদের Source of information একমাত্র টিভি আর news paper...very sad...খুব দুঃখের। Anyway...India নামে word-টা ... এটা কী বস্তু আমাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন।

Shot : 441/M.C.S./ Same as Shot : 439

বিমলেশ : সেটা আপনি আমার চেয়ে Better জানেন।

Shot : 442/M.C.S./ Same as Shot : 440

রাজীব : না ... না, আপনি আমাকে একটু বলুন না ...আমি একটু বোঝার চেষ্টা করি, আমি at all বুঝি কি না?

Shot : 443/M.C.S./ Same as Shot : 441

সুবর্ণা : আপনারা কথা বলুন, আমি আসছি।

বিমলেশ : হুঁ।

সুবর্ণা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। এখন শুধু বিমলেশকে দেখা যায়।

Shot : 444/C.S. to M.C.S.

সংগ্রাম চিন্তিত হয়ে তার ঘরে পায়চারি করছেন। তাঁর ভ্রূ-কুঞ্চিত।

Shot : 445/ M.S.

রাজীব : Unity in Diversity. নানা ভাষা, নানা পরিধান। পচা, বস্তাপচা stinking ...আপনারা আপনাদের স্টুডেন্টদেরকে ভুল শেখাচ্ছেন।

Shot : 446/M.C.S./ Same as Shot : 443

বিমলেশ স-প্রশ্ন দৃষ্টিতে রাজীবের দিকে তাকিয়ে আছে।

Shot : 447/M.S.toM.C.S./ Same as begining of Shot : 445

রাজীব : ইংরেজরা আসার আগে India ছিল একটা Geographical area ... যেখানে ছিল হাজারখানেক রাজ্য আর তার হাজারখানেক রাজা। একজনের সঙ্গে একজনের কোনোরকম কোনো মিল নেই। Different food habits, different languages, different cultures,ঝগড়া, ঝামেলা, যুদ্ধ লেগেই রয়েছে।

বলতে বলতে রাজীব বিমলেশের দিকে এগিয়ে আসে। ক্যামেরা অল্প Pan করে এবার দু-জনকেই ধরে।

রাজীব : ... ইংরেজরা রেল-লাইন টেললাইন পেতে রাজ্যগুলোকে বান্ডিল বাঁধার চেষ্টা করেছে। তাও তার থেকে নর্থ-ইস্ট বাদ ... প্রায় বাদ। ... হ্যাঁ ... দেশকে স্বাধীন করার জন্য হিন্দু, মুসলিম, শিখ, কিছুদিনের জন্য এক হয়েছিল।

Shot : 448/ C.S.

বিমলেশ : আপনিও তো নতুন কিছু বলছেন না। এবার আমি জানি আপনি বলবেন যে স্বাধীনতার পরে কী হল?

Shot : 449/ C.S.

রাজীব : Precisely.

Shot : 450/C.S./ Same as Shot : 448

বিমলেশ : সেটা তো সবাই দেখতে পাচ্ছে।

Shot : 451/C.S.

রাজীব : না, পাচ্ছেন না। India নামে যে গল্পটা, সেটা আগেও ছিল না,

এখনো নেই। হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিশ্চান, বিহারি, বাঙালি, তামিল, গুজরাটি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, রাজপুত ... এদের মধ্যে Indianness-টা কোথায় বলুন তো? কোথায়?... বোম্বাই প্রেসিডেন্সি ভেঙে মহারাষ্ট্র, গুজরাট। ম্যাড্রাস ভেঙে অন্ধ্র, তামিলনাড়ু। নর্থ-ইস্ট ভেঙে সাত টুকরো ...

Shot : 452/C.S./ Same as Shot : 450

বিমলেশ মনোযোগ দিয়ে রাজীবের কথা শুনছে।

রাজীব (O.S.): ... তাকে আবার Seven sisters বলা হচ্ছে।

Shot : 453/C.S./ Same as Shot : 451

রাজীব : জাতপাত, Provincialism, Religious fundamentalism ... এটাই সত্যি। আর সব থেকে বড়ো কথা কি জানেন... দেশের একদিকে রাত্রি হয় না, আর অন্যদিকে অন্ধকার। ... লক্ষ লক্ষ Refugee ঢুকে যাচ্ছে ... লক্ষ লক্ষ Refugee ... আমরা আমাদের ... আমাদের existence হারাচ্ছি। We are loosing our identity. Son of the soil বলে কিছু থাকছে না। We are loosing our mother tongue.

Shot : 454/ C.S./Same as Shot : 452

বিমলেশ : সেগুলো তো আলোচনা করে Settle করা যায়।

Shot : 455/ C.S./Same as Shot : 453

রাজীব : (তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে) আলোচনা ! পঞ্চাশ বছর ধরে আলোচনা চলছে।

Shot : 456/ C.S./Same as Shot : 454

বিমলেশ : বুঝলাম। কিন্তু দেশ থেকে বেরিয়ে টিকে থাকা সম্ভব?

Shot : 457/ C.S./Same as Shot : 455

রাজীব : হ্যাঁ ...yes, সম্ভব। ইউরোপে কী করে টিকে আছে? সব তো ভেঙে চুরমার ... বেশ তো চলছে।

Shot : 458/M.C.S.

বিমলেশ : (মুখ ফসকে বলে ফেলে) কিন্তু দেশগুলো তো একও হচ্ছে, জার্মানিকেই ধরুন না।

রাজীব : Culture, Religion, Language, ভাষা, ধর্ম, এগুলো যদি এক হয় ... সে-রকম কোনো Problem হয় না। দেশভাগ নিয়ে অত চিন্তা করবেন না। ধরুন জয়েন্ট ফ্যামিলি ভাঙছে।প্রয়োজনে ভাঙছে।

বিমলেশ : হ্যাঁ ... কিন্তু একটা জরুরি প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে ... অবশ্য যদি রাগ না করেন ...

রাজীব : প্রশ্নটা করুন। (বিমলেশকে নিরুত্তর দেখে বলে)...বলুন?

বিমলেশ : আপনাদের বিরুদ্ধে বিরাট একটা অভিযোগ আছে। আপনাদের

এইসব Seperatist আন্দোলনে বিদেশিদের হাত আছে। তারা India-কে দুর্বল করার জন্য আপনাদের হাতে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, টাকা-পয়সা তুলে দিয়ে ট্রেনিং দিচ্ছে।

Shot : 459/M.C.S./(Top angle)

হলঘরে দাঁড়ানো রাজীব ও বিমলেশের মাঝে সুবর্ণা ফিরে আসে।

রাজীব : গভীর জঙ্গলে...হাতির পায়ের নীচে ... বিষাক্ত পোকামাকড়ের কামড়ে ...poisonous সাপের কামড়ে...বর্ষায় ভিজে ... নিওমোনিয়ায় মারা যাচ্ছে শ-য়ে শ-য়ে কমরেড। আপনার কী মনে হয় কেবলমাত্র পয়সার জন্য ?

বিমলেশ ও সুবর্ণা চুপ করে থাকে। রাজীব আবার বলে চলে—

রাজীব : টিভি News আর খবরের কাগজের ওপর base না করে ... আমাদের সমস্যাগুলো যদি একটু গভীরভাবে দ্যাখেন ... ভাল্লাগবে। ... Thanks.

রাজীব ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সুবর্ণা এসে বিমলেশের কাছাকাছি দাঁড়ায়।

বিমলেশ : (সুবর্ণাকে) মনে হয় কোনো ক্ষতি করবে না।

দেবীর জন্য আনা Gift packet-টা সুবর্ণার হাতে দিয়ে বলে —

বিমলেশ : আর শোনো ... এটা দেবীকে দিয়ে দিয়ো।

Scene : 35 (সময়: রাত্রিবেলা)

সংগ্রামের ঘর/রাজবাড়ির দোতলার বারান্দা

Shot : 460/ C.S.

প্রথমে সংবাদপত্রটি (যেখানে রাজীবের ছবি ছাপা হয়েছে সেই জায়গাটা) আমরা Close-up -এ দেখতে পাই। Camera tilt up করে সংগ্রামের মুখে আসে। ছবিতে White-ink লাগানোর ফলে দাড়ি-গোঁফ উধাও হয়ে রাজীবের বর্তমান Clean shaven চেহারাটা বেরিয়ে পড়েছে। সংগ্রাম পায়চারি করতে করতে ছবির সঙ্গে কোনো মুখের যেন সাদৃশ্য খুঁজে পাচ্ছেন। তার মুখে গভীর সন্দেহের অভিব্যক্তি।

Shot : 461/M.S.

লম্বা বারান্দায় দেবী খুবই কষ্ট করে হাঁটার চেষ্টা করছে। কিছু দূরে হুইলচেয়ারটি। কিন্তু হুইল চেয়ারে পৌঁছবার আগেই দেবী মাটিতে পড়ে যায়। রাজীব আর সুবর্ণা বারান্দায় পৌঁছেই পড়ে-থাকা দেবীকে দেখতে পায়। রাজীব দৌড়ে এসে দেবীকে ধরে হুইলচেয়ারে বসিয়ে দেয়।

রাজীব : আরে, কী হল! ওঠো...ওঠো...ওঠো...সুবর্ণাও দেবীর কাছে ছুটে আসে।

সুবর্ণা : দেবী... তুমি আবার উঠতে চেষ্টা করেছ? দেখি...দেখি... দেখি...দেখি... এমনি শরীরটা ভালো নেই। পায়ে লেগেছে?

দেবী : না ... একটু হাঁটুতে ... হাঁটুতে ...

সুবর্ণা : চলো ... চলো ... চলো ... চলো (হুইল চেয়ার ঠেলতে থাকে)।

দেবী : পারব , তুমি ছেড়ে দাও ... ছেড়ে দাও ... আমি পারব।

সুবর্ণা : পারবে?

এইসময় সুবর্ণার হঠাৎ দেবীকে দেওয়া বিমলেশের Gift-টার কথা মনে পড়ে।

সুবর্ণা : ও ... এই নাও, বিমলেশ Uncle দিয়েছে।

দেবী একহাতে Gift-টা নেয়, অন্য হাতে হুইলচেয়ারটা ধরে।

সুবর্ণা : পারবে তো?

দেবী : হুঁ , পারব।

দেবী হুইলচেয়ার চালিয়ে চলে যায়। দেবী চলে গেলে রাজীব সুবর্ণাকে জিজ্ঞেস করে—

রাজীব : ও কী জন্ম থেকেই ... মানে By birth paraphlegic.

সুবর্ণা রেলিঙে হেলান দিয়ে বলে—

সুবর্ণা : না।

Shot : 462/ M.C.S.

সুবর্ণা : (আনমনা, উদাস হয়ে দীর্ঘশ্বাস নেয়) ওর বাবা এ-বাড়ি থেকে চলে যাবার পর, ভীষণ Shock পায় ... A kind of nervous break-down...পায়ের মুভমেন্টগুলো মোটামুটি ঠিক হয়ে গেছে...কিন্তু হাঁটার Strength-টা পায় না। ডাক্তাররা বলছেন ঠিক হয়ে যাবে ... কিন্তু হচ্ছে না।

রাজীব : ওর বাবা ওর সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগ করেন না?

Shot : 463/ L.S.

দেখা যায় দিগন্তবিস্তৃত পূর্ণচন্দ্র উঠেছে। এর মধ্যেই দু-জনের কথা ভেসে আসে।

সুবর্ণা (O.S.): (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) নাঃ।

রাজীব (O.S.): আচ্ছা, আপনারা তো আমাকে অনেক প্রশ্ন করলেন ...

Shot : 464/M.C.S./ Same as Shot : 462

রাজীব : ... যদিও Personal ... তা হলেও একটা প্রশ্ন করতে পারি?

হঠাৎ উত্তেজিত অবস্থায় সংগ্রামের গলা শোনা যায়।

সংগ্রাম (O.S.): বউমা ...বউমা, শিগগির এসো একবার।

সংগ্রামের ডাক শুনে সুবর্ণা এক দৌড়ে Frame out হয়। Frame-এ এখন কেবলমাত্র রাজীব দাঁড়িয়ে।

Shot : 465/M.C.S./ (Camera on trolley:T/B)

সংগ্রাম উত্তেজিতভাবে পায়চারি করছেন। সুবর্ণা ঘরে ঢোকে অজানা সংশয় নিয়ে।

সুবর্ণা : বাবা...ডাকছেন?

সংগ্রাম : (খবরের কাগজটা দেখিয়ে) একে চিনতে পারো?

দেখা যায় খবরের কাগজে প্রকাশিত রাজীবের ছবিতে White-ink লাগানোর ফলে দাড়ি-গোঁফ উধাও হয়ে রাজীবের বর্তমান Clean shaven চেহারাটা বেরিয়ে এসেছে।।

সংগ্রাম : শুধু দাড়িতে শাদা রং লাগাতেই আসল মুখটা বেরিয়ে পড়েছে। ... এই তোমাদের আত্মীয় ! বউদির মাসতুতো ভাই ?

সুবর্ণা বোবার মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

সংগ্রাম : আমার প্রথম থেকেই সন্দেহ হয়েছিল যে এর সঙ্গে আসলে তোমাদের কোনো সম্পর্কই নেই। ও জোর করে ঢুকেছে। তোমাকে ভয় দেখিয়ে hostage করে রেখেছে। রাস্কেলের এত বড়ো সাহস। ওকে আমি এক্ষুনি ঘাড় ধরে বের করে দেবো।

সংগ্রাম রাগে দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান। সুবর্ণা পিছনে যেতে যেতে বলতে থাকে—

সুবর্ণা : বাবা...বাবা... ও dangerous... আপনি যাবেন না...বাবা...আপনি যাবেন না...

বলতে বলতে সুবর্ণাও সংগ্রামের পিছন পিছন যেতে থাকে।

Scene : 36 (সময়: রাত্রিবেলা)

শৌর্যেন্দ্রর ঘর

Shot : 466/M.S.

রাজীব দাঁড়িয়ে টেবিলের উপর কী একটা নাড়ছিল। এবার Right of frame একটা চেয়ারে বসে। এইসময় সংগ্রাম উত্তেজিত অবস্থায় ঘরে ঢোকেন। পিছনে আকুতি নিয়ে সুবর্ণা।

সংগ্রাম : You rascal !

Shot : 467/M.C.S./ (Sangram, Subarna & Rajib)

সংগ্রাম : তোমার এতদূর স্পর্ধা ... তুমি ভেবেছ , তোমার বন্দুককে আমরা ভয় পাই ... No ... you are wrong !

Shot : 468/M.C.S./(Rajib)

রাজীব : Don't shout ... just shut up ...

Shot : 469/M.C.S./ Same as Shot : 467

রাজীব : ... Mr. Singha.

সংগ্রাম : (ভীষণ রেগে গিয়ে) What ! আমার বাড়িতে আমাকেই হুঙ্কার ...

Shot : 470/M.C.S./ Same as Shot : 468

সংগ্রাম(O.S.): ... দিচ্ছ, you ...

Shot : 471/M.C.S./ Same as Shot : 466

সংগ্রাম : Scoundrel ! bloody killer !

Shot : 472/M.S./ Same as Shot : 468

রাজীব : (পিস্তল বার করে) Just shut up ... I say.

এইসময় দেখা যায় চিৎকার চেঁচামেচিতে দরজায় হরেন ও মায়া এসে দাঁড়িয়ে আছে।

Shot : 473/M.C.S./ Same as Shot : 471

সংগ্রাম : শোনো, তুমি খুনি হও, ডাকু হও — আমাদের এই রাজবাড়িতে...

Shot : 474/M.C.S./(Sourjendra)

বিছানায় বসা শৌর্যেন্দ্রর চোখেমুখে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

সংগ্রাম (O.S.): ... যে shelter নেয় , তার কোনো ক্ষতি আমরা করি না..

Shot : 475/M.C.S./ Same as Shot : 468

সংগ্রাম (O.S.): ... আর তোমারও করব না ...

Shot : 476/M.C.S./ Same as Shot : 473

সংগ্রাম : ... you just get out ... get out.

Shot : 477/M.C.S./(Rajib)

রাজীব এবার সংগ্রামের দিকে পিস্তল তাক করে।

Shot : 478/M.S./ Same as Shot : 472

রাজীব এবার পিস্তলটি সংগ্রামের গলায় ঠেকায়।

রাজীব : Shut up ... otherwise...

Shot : 479/M.C.S./(Maya & Haren)

রাজীব (O.S.): ... I will kill you .

মায়া ও হরেন ভয়ে পরস্পরের দিকে তাকায়। কী করবে এই মুহূর্তে বুঝে পায় না।

Shot : 480/M.S. to M.C. S./ (Camera on trolley:T/F)

রাজীব : একদম চুপ করে থাকবেন।

সংগ্রাম ভীষণ উত্তেজিত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। রাজীব দ্রুত এগিয়ে এসে সংগ্রামকে ধরে ফেলে। সুবর্ণা চিৎকার করে ওঠে—

সুবর্ণা : বাবা, বাবা ! (রাজীবকে) এটা আপনি কী করলেন!

রাজীব : এটা করা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না।

সুবর্ণা : (চিৎকার করে) মায়া।

Shot : 481/M.C.S.

সংগ্রামের Out of frame অবস্থা দেখে শৌর্যেন্দ্র অস্থির হয়ে উঠে সংগ্রামের কাছে আসবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন।

Shot : 482/M.C.S./ Same as last part of Shot : 480

মায়া : (ঘরের ভেতর দৌড়ে ঢুকে বলে) বউদি !

সুবর্ণা : (মায়াকে) ডাক্তার ডাকো শিগগির।

মায়া ছুটে যেতে চায়। রাজীব তাকে বারণ করে বলে—

রাজীব : (কর্তৃত্ব নিয়ে) কোনো ডাক্তার ডাকতে হবে না ... একটু জল নিয়ে আসুন ব্যস।

Shot : 483/C.S.

শৌর্যেন্দ্র ভীষণ চেষ্টা করছেন বিছানা থেকে নামতে। শেষে প্রবল চেষ্টায় নেমেও পড়েন। মুখে সেই অদ্ভুত অব্যক্ত এক ধ্বনি।

Shot : 484/M.C.S./ Same as Shot : 482

সুবর্ণা : (অস্ফুটে ডাকে) বাবা...

সংগ্রাম অনেকটা সামলে নিয়ে হাত দিয়ে সুবর্ণাকে আশ্বস্ত করেন।

Shot : 485/C.S./ Same as Shot : 483

খাট থেকে নেমে পড়েছেন শৌর্যেন্দ্র। তারপর একটু একটু করে এগোবার চেষ্টা করছেন।

Shot : 486/M.C.S./ Same as Shot : 484

রাজীব : (সুবর্ণার উদ্দেশে) ওনাকে ও-ঘরে নিয়ে চলুন।

সংগ্রামকে নিয়ে সুবর্ণা ও রাজীব ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

Scene : 37 (সময়: রাত্রিবেলা)

শৌর্যেন্দ্রর ঘর/সংগ্রামের ঘর

Shot : 487/C.S./Same as Shot : 485

শৌর্যেন্দ্র প্রাণপণ চেষ্টায় হাঁটছেন। এবার আস্তে আস্তে Right frame out হন।

Shot : 488/M.S. to M.C.S./(Camera on trolley:T/F)

সংগ্রাম খাটে শুয়ে আছেন। ডানপাশে সুবর্ণা, বাঁপাশে রাজীব বসে। মাথার কাছে হরেন ও মায়া দাঁড়িয়ে। রাজীব ছোটো ভেজা তোয়ালে দিয়ে সংগ্রামের মুখ, মাথা মুছিয়ে দিচ্ছে।

মায়া : ডাক্তারবাবুকে খবর দিই ?

সুবর্ণা : হ্যাঁ, দে।

সংগ্রাম : (দুর্বল কণ্ঠে) না, না ...ব্যস্ত হতে হবে না। আমি ঠিক আছি।

এইসময় ক্যামেরা ট্রলিতে একটু Track forward হয়।

রাজীব : (নরম গলায়) স্যর, আপনারা আমাকে Shelter দিয়েছেন ... আমি আপনাদের কোনো harm করব না। Just help me for few days ...আমি চলে যাব।

সংগ্রাম এইসময় বুকের বাঁদিকে হাত দেন।

সুবর্ণা : (সংগ্রামের বুকের বাঁদিকে হাত দিয়ে) বুকে ব্যথা করছে বাবা?

সংগ্রাম ইশারায় বলেন না।

রাজীব : Any other problems?

রাজীব সংগ্রামকে প্রশ্নটা করতে করতে তাঁর পালস দ্যাখে।

সংগ্রাম : No.

রাজীব : (সুবর্ণাকে, সংগ্রামের পাল্‌স দেখার পরে) আপনি যেটা নিয়ে worried...

Shot : 489/C.S./(Subarna)

রাজীব (O.S.): ... সেটা নয়। He is O.K. ...আমি এ-ঘরেই আছি। Whole night থাকব।

সুবর্ণা : কিন্তু ...

Shot : 490/C.S./(Rajib)

রাজীব : মিসেস সিংহ ...

Shot : 491/C.S./ Same as Shot : 489

সুবর্ণা হঠাৎ দরজার দিকে তাকিয়ে দেখে শৌর্যেন্দ্র (Out of frame) ঘরে ঢুকছেন। সুবর্ণা

বিস্মিত, আতঙ্কিত হয়ে প্রায় চিৎকার করে ওঠে —

সুবর্ণা : দাদাভাই।

Shot : 492/M.C.S./(Camera on trolley:T/F)

দেখা যায়, টলতে টলতে শৌর্যেন্দ্র ঘরে ঢুকছেন। সুবর্ণা দৌড়ে এগিয়ে যায়।

সুবর্ণা : একী! দাদাভাই ...আপনি উঠে ...

সুবর্ণা ও হরেন উঠে দ্রুত শৌর্যেন্দ্রর কাছে যায়। দু-জনের কাঁধে ভর রেখে শৌর্যেন্দ্র এসে সংগ্রামের কাঁধে হাত রেখে মুখে অব্যক্ত শব্দ করেন।

সংগ্রাম : (সংগ্রাম প্রায় সুস্থ এমনই ভাব দেখান) একী! তুমি কেন এলে ... তুমিউঠে এলে কেন ... আমি ঠিক আছি... আমি ঠিক আছি... চিন্তা কোরো না, আমি ঠিক আছি।

এবার রাজীব ঘর থেকে বেরিয়ে জানলার বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। তার কাছেই দেবী হুইলচেয়ারে বসা। ঘরের ভেতর থেকে জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা দু-জনকে দেখা যায়। রাজীব এবার বাঁদিকে হেঁটে বেরিয়ে যায়।

Scene : 38 (সময়: রাত্রিবেলা)

রাজবাড়ির দোতলার বারান্দা/সুবর্ণার ঘর/সংগ্রামের ঘর

Shot : 493/ L.S.

রাজীব বারান্দায় এসে Paper crown-টা বের করে ছিঁড়ে ফেলে দেয়।

Shot : 494/ L.S.

শূন্য বারান্দা। বড়ো ঘড়িতে রাত দশটা বাজে।

Shot : 495/M.C.S./(Camera on trolley :T/B)

সুবর্ণা টেবিলের ওপর পরীক্ষার খাতা দেখতে দেখতে ঝিমোচ্ছে। টেবিলে তার একটা আগের ফোটোগ্রাফ ফ্রেমে বাঁধানো। হঠাৎ পরপর গুলির আওয়াজ হয়। Camera এবার Track back করলে, সুবর্ণা তন্দ্রা ভেঙে উঠে দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

Shot : 496/ L.S.

জানলার গরাদের মধ্য দিয়ে দেখা যায় , বারান্দা দিয়ে সুবর্ণা দ্রুত সংগ্রাম ও শৌর্যেন্দ্রর ঘরের দিকে দৌড়ে গেল।

Shot : 497/M.C.S. to C.S.

সংগ্রাম (Out of frame) ঘুমাচ্ছেন। সুবর্ণা (সংগ্রামের ঘরের ভেতর থেকে আমরা দেখি) ঘরের বাইরে থেকে, জানলা দিয়ে দেখে নিশ্চিন্ত হয়। Camera tilt down হলে আমরা Close-এ ঘুমন্ত সংগ্রামকে দেখতে পাই।

Shot : 498/M.L.S. to M.S.

বারান্দায় ইজিচেয়ারে রাজীব বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছে। সুবর্ণা খুঁজতে খুঁজতে এসে রাজীবকে ঘুমন্ত অবস্থায় দ্যাখে, তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যায়। Fade Out

Scene : 39 (সময়: ভোরবেলা)

প্রতাপপুরের পাহাড়ি রাস্তা/নদী/দোতলার বারান্দা

Shot : 499/L.S./(Top angle)

ভোরের আলোয় দু-জন লামা, পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে একে অপরের বিপরীত দিক থেকে এসে অতিক্রম করে যায়।

Shot : 500/L.S.

পাহাড়ি নদী বয়ে চলেছে।

Shot : 501/M.L.S.

সুবর্ণাদের রাজবাড়ির বারান্দা। দূরে পাখির খাঁচা ঝুলছে।

Scene : 40 (সময়: ভোরবেলা)

শৌর্যেন্দ্রর ঘর/'নারী বিকাশ কেন্দ্র' অফিস

Shot : 502/M.C.S.

শৌর্যেন্দ্রর ঘরে এসে সুবর্ণা বেজে যাওয়া ফোনের রিসিভার তোলে।

সুবর্ণা : হ্যালো।

Shot : 503/M.C.S.

নারীবিকাশ কেন্দ্রের অফিস থেকে মনোরমা ফোনে কথা বলছে।

মনোরমা : শোন্, ওরা পৌঁছে গেছে তো?

Shot : 504/M.C.S./Same as Shot : 502

সুবর্ণা : হ্যাঁ, পৌঁছে গেছে। কিন্তু মনোরমাদি, তুমি যে বললে দু-জন আসবে... তিনজন এসেছে।

Shot : 505/M.C.S./Same as Shot : 503

মনোরমা : হ্যাঁ, হয়তো ... Last minute decision। তাপসী এসেছে?

Shot : 506/M.C.S./Same as Shot : 504

সুবর্ণা : হ্যাঁ ... এসেছে। জানো, তিনজনের মধ্যে একজন একটু বেশি wild বলে মনে হচ্ছে। সামলানো মুশকিল হতে পারে। এদিকে আমার শ্বশুরমশায়ের শরীরটা আবার ...

সুবর্ণা দুম করে হঠাৎ এই বেফাঁস কথাটা বলে ফেলে।

মনোরমা (O.S.): কেন, কী হয়েছে?

সুবর্ণা : (বুঝতে পারে ভুল হয়ে গেছে) না মানে...ওই একটু প্রেশার-ট্রেশারের গণ্ডগোল তো ... আর ওই প্রতিমা না একটু বেশি কান্নাকাটি করছে। হ্যাঁ ... অন্যরাও affected হয়ে যাচ্ছে।

মনোরমা (O.S.): আমি আসছি।

Shot : 507/M.C.S./Same as Shot : 505

মনোরমা (O.S.): একটু আটকে গেছি রে ... আসছি ... আমি আসছি।

Shot : 508/M.C.S./Same as Shot : 506

সুবর্ণা : (ব্যস্ত হয়ে বলতে যায়) না...

Shot : 509/M.C.S./Same as Shot : 507

সুবর্ণা আর কিছু বলবার আগেই মনোরমা রিসিভার নামিয়ে রাখেন।

Shot : 510/M.C.S./Same as Shot : 508

সুবর্ণা রিসিভার রেখে ঘুরতেই আবার রিং হয়। সুবর্ণা ফিরে এসে আবার রিসিভার ধরে বলে—

সুবর্ণা : হ্যালো!

Scene : 41 (সময়: সকালবেলা)

সংগ্রামের ঘর

Shot : 511/M.S./ (Top angle)

ইজিচেয়ারে আধশোয়া সংগ্রামকে দেখে তেমন অসুস্থ মনে হয় না। রাজীব এবার Frame in করে সংগ্রামের কাছে এসে তাঁকে ওষুধ বাড়িয়ে দেয়।

রাজীব : নিন।

সংগ্রাম : একী ... তুমি আবার ব্যস্ত হলে কেন?

এবার সংগ্রাম ওষুধ খেয়ে নেন। Camera সামান্য Tilt up হয়।

রাজীব : আমার ডাক্তারি বলে, Morning walk-টা must ... আপনি এখন বেরোন না কেন বাড়ি থেকে?

সংগ্রাম : বেরোতে ইচ্ছাই করে না।

রাজীব : Why?

Shot : 512/M.C.S.

সংগ্রাম ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বলে চলেন —

সংগ্রাম : বাইরেটা দেখতে ইচ্ছে করে না তাই। এই প্রতাপপুর ... তিরিশ, চল্লিশবছর আগেও কী ছিল, তা যে না দেখেছে, সে বিশ্বাস করতে পারবে না। আমার ঠাকুরদাদার ঠাকুরদাদা, নিজে প্ল্যান করে ... একটা গ্রাম থেকে ছোট্ট শহর বানিয়েছিলেন। ঝলমল করত গ্যাসের আলো। মাঝখানে লেক ... তার দু-দিকে ইশকুল-কলেজ। সে-সব এখন টিমটিম করছে এখানে...

Shot : 513/M.C.S.(Rajib & Sangram)

রাজীব চেয়ারে হেলান দিয়ে সংগ্রামের কথা শুনছে।

সংগ্রাম : ... কারো কোনো মায়া মমতাই নেই।

রাজীব : স্বাধীনতার পর আপনাদের মতো এস্টেটগুলো Indian Union-এর ভেতর ঢুকে গেছে অনেককাল আগে ...এখনো ভুলতে পারেননি।

Shot : 514/M.C.S.

এবার ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসা সংগ্রামের শুধুমাত্র মুখটুকু দেখা যায়।

সংগ্রাম : (কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হয়ে) তোমার হৃৎপিণ্ডটা যদি কেউ উপড়ে নেয়, পারবে সেটা মেনে নিতে? ছিলাম স্বাধীন রাজা, আলাদা রাজত্ব, আর এখন ...এখন আমাদের স্টেটাসটা কী? রাস্তার একজন হকারের থেকে আমার পার্থক্যটা কোথায় বলতে পারো ... কোনো পার্থক্য নেই। ... হুঁ ... এখন তাদেরই সঙ্গে এক লাইনে দাঁড়িয়ে, ভোট দিয়ে আজকের সম্রাট আমাকে নির্বাচন করতে হবে। হুঁ! ... যতদিন বাঁচব, এ-রাগ আমার যাবে না।

Shot : 515/M.C.S./Same as Shot: 513

রাজীব : (মৃদুভাবে হেসে) কিন্তু, এটা তো বিজ্ঞান...Feudalism,... Capitalism...Socialism ...সব একের পর এক আসবেই... কম-বেশি দেরি হতে পারে। Democracy-ও তো একটা inevitable state.

Shot : 516/C.S.

সংগ্রাম কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে ইজিচেয়ারে সোজা হয়ে বসে বলে চলেন—

সংগ্রাম : আরে, কাগজে যা পড়ি তাতে তো দেখি, তোমরাই গণতন্ত্র মানো না। তা হলে এখন তার হয়ে ওকালতি করছ কেন? গণতন্ত্র! গরিব লোকগুলোকে দিয়ে ঠেলা, রিকশা, এমনকী মলমূত্র বয়াচ্ছ। কিন্তু পারবে... তাদের দিয়ে একটা তাজমহল তৈরি করতে?

Shot : 517/C.S./(Rajib)

সংগ্রাম (O.S.): আর একটা লালকেল্লা হবে?

Shot : 518/M.C.S./(Sangram)

সংগ্রাম : পিরামিড...পিরামিড বানাতে পারবে? পিরামিড? ... বাস্তিলের প্রাসাদের কথা ছেড়ে দাও, আমাদের এই প্রতাপপুরের প্যালেসে যা ছিল তাই তাদের দিয়ে বানাতে পারবে না ... হাঃ! গণতন্ত্র!

Shot : 519/C.S./Same as Shot : 517

রাজীব : কিন্তু তারাও তো এরোপ্লেন ওড়াতে পারেনি, রেল চালাতে পারেনি, টেলিফোন বাজাতে পারেনি।

Shot : 520/C.S./(Sangram)

সংগ্রাম : হ্যাঁ ... এমন বোমাও বানাতে পারেনি, যা দিয়ে নাকি কয়েক ঘন্টার মধ্যে হাজার হাজার বছরের সভ্যতার ইতিহাস ধ্বংস করে দেওয়া যেতে পারে।

Shot : 521/C.S./Same as Shot : 519

রাজীব অবাক হয়ে সংগ্রামের (Out of frame) কথা শুনছে।

Shot : 522/C.S./Same as Shot : 520

সংগ্রাম : ছাড়ো ওসব কথা ...

Shot : 523/M.S./(Camera on trolley :L/R)

সংগ্রাম : ... কী যেন বলছিলাম তোমায়?

এই সময়ে মায়া সংগ্রামের জন্য দুধ নিয়ে এসে বলে—

মায়া : খেয়ে নিন।

সংগ্রাম মায়ার হাত থেকে দুধের গ্লাসটা নেন।

সংগ্রাম : নাও, নাও ... বোসো। আমার বউমা বড়ো লক্ষ্মী মেয়ে... একদম ঘড়ির কাঁটা ধরে সংসার চালায়। (সংগ্রাম দুধ খাওয়া শেষ করে গ্লাসটা মায়ার হাতে ফেরত দেন। Camera trolley-তে left to right চলতে শুরু করে)। হ্যাঁ ... আমার হতভাগা পুত্রটি তার প্রতি বড়োই অবিচার করেছে।

রাজীব : কোথায় থাকেন তিনি? If you don't mind.

সংগ্রাম : আমার ছেলে?

রাজীব : হুঁ।

সংগ্রাম : কে জানে! ... লম্পট , বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে হয়েছে। ... যাক গে, তুমি বলো তো ... তুমি এ-সমস্ত militant activities-এর সঙ্গে involved হলে কী করে? তোমার এমন মুখখানা দেখলে তো সে-কথা বিশ্বাস হয় না!

Shot : 524/M.S./(Sangram & Rajib)

রাজীব : যেভাবে সবাই involved হয় আর কি। আমার বাবার বদলির চাকরি ছিল। বাবা is from Orissa...কিন্তু মা is from north-east । এখন তো উপজাতি বলা হয়। Fairy tale-এ আমাদের দেশকে বলা হয় 'মায়ানি দেশ'।

সংগ্রাম : বলো কী হে, সে-তো 'চিত্রাঙ্গদা'র কাছে অর্জুনের হারিয়ে যাওয়ার দেশ।

Shot : 525/C.S.

রাজীবের হাত মজা করে একটা বোড়ে সরিয়ে নেয়।

Shot : 526/M.S./Same as Shot:524

সংগ্রাম : আচ্ছা, ওখানকার স্থানীয় ভাষা-টাষা কিছু মনে আছে তোমার ?

Shot : 527/C.S./(Rajib)

রাজীব : (হেসে) বাঃ, মনে থাকবে না। আমাদের একটা প্রবাদ শুনবেন। 'হ্যাচুক বা মইরনবান মনথুন...

Shot : 528/C.S./(Sangram)

সংগ্রাম গভীর মনোযোগ সহকারে শুনছেন।

সংগ্রাম(O.S.): '... নখাশাখ খুলপালি মনথুন
দুখ বা থানথুন
সুখী বা ফাইথুন।'

Shot : 529/C.S./Same as Shot : 527

রাজীব : পৃথিবীর সর্বোচ্চ hills-গুলো শস্যপূর্ণ হয়ে উঠুক। শস্যের ভাণ্ডার আকাশচুম্বী হয়ে যাক। সব দুঃখের শেষে মানুষ সুখী হোক।

Shot : 530/C.S./Same as Shot : 528

সংগ্রাম : বাঃ। ... কিন্তু তুমি তো ইতিমধ্যে একটা vital বোড়ে সরিয়েছ।

রাজীব(O.S.): আমি আপনাকে টেস্ট করছিলাম।

এবার Camera tilt down হয়ে সংগ্রামের হাতে পৌঁছয়। তিনি এবার দাবার বোর্ডে চাল দেন।

সংগ্রাম : বেশ করেছ। (দানটা দিয়ে) এবার নাও ... check and mate।

রাজীব(O.S.): ওঃ।

এবার দুজনেই একসঙ্গে হেসে ওঠে।

Scene : 42 (সময়: সকালবেলা)

রাজবাড়ির বাইরের দিক/সংগ্রামের ঘর

Shot : 531/M.C.S.to M.L.S.

পারুল ঘর থেকে বেরিয়ে সন্দেহজনকভাবে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে বাড়ির ভিতরের উঠোনের দিকে এগিয়ে যায়।

Shot : 532/C.S.

সংগ্রাম এবং রাজীবের দুটো হাত দাবার বোর্ডে চাল দিয়ে যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে খেলা জমে উঠেছে। এই অবস্থায় দু-জনের কথোপকথন চলছে।

সংগ্রাম(O.S.): তারপর?

রাজীব(O.S.): আমি এই অঞ্চলের বেশ কিছু ভাষা জানি। পরে প্রায় 14 -15 years, প্রথমে গৌহাটি শিলং , পরে কলকাতার হস্টেলে প্রায় দশ বছর। ... যখন বাড়ি ফিরতাম ... মনে হত এক jump-এ 20th century থেকে 15th century-তে চলে গেলাম। ডাক্তারি পড়া শেষ হল না। ফিরলাম। বন্ধুবান্ধব, পলিটিকস ... বুঝতে পারলাম, আমাদের যথেষ্ট natural resources থাকা সত্ত্বেও, for years আমাদের অঞ্চল...পৃথিবীর one of the beautiful places, exploited, ignored.

Shot : 533 /M.C.S./(Sangram & Rajib)

রাজীব : আর সব থেকে বড়ো কথা ... we are loosing our identity.

সংগ্রাম : তা এখন তো শুনছি, অনেক সুযোগ-সুবিধা বাড়ছে।

রাজীব : বাধ্য হয়ে বাড়িয়েছে।

সংগ্রাম : বুঝলাম। তা , তোমাদের এইসব কর্মকাণ্ডের নেতা কে? Who is your Supremo?

রাজীব : I receive orders। আবার কখনো আমিও order করি।

সংগ্রাম : Strange ! তোমাদের নেতা কে তুমি জানো না?

রাজীব : মিস্টার সিংহ...

Shot : 534/C.S./(Rajib)

রাজীব : ... আপনারা আপনাদের পরিচয়, identity হারিয়েছেন। আমরা হারাতে চাই না।

Shot : 535 /M.S./(Rajib & Sangram)

রাজীব : কতগুলো Bullets already এই শরীরে লেগেছে। ... আরো কয়েকটা লাগুক।

হঠাৎ নীচ থেকে গণ্ডগোলের আওয়াজ ভেসে আসে। রাজীব চমকে তাকায়।

Shot : 536/C.S./(Sangram)

সংগ্রাম : কী হল?

Shot : 537/M.S./Same as Shot : 535/(Use of Handcrane)

রাজীব : আমি দেখছি, দাঁড়ান।

রাজীব দৌড়ে বেরিয়ে যায় চেঁচামেচির শব্দকে অনুসরণ করে। ক্যামেরা Handcrane-এ রাজীবকে অনুসরণ করে।

Shot : 538/C.S./Same as Shot : 536

সংগ্রাম রাজীবের গমনপথের দিকে তাকিয়ে আছেন।

Shot : 539/M.S./Same as last part of Shot : 537

সংগ্রামের ঘরের ভেতর থেকে জানলার কাচ দিয়ে দেখা যায় রাজীব দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

Scene : 43 (সময়: সকালবেলা)

বারান্দা

Shot : 540/L.S./(Camera on trolley : T/F)

রাজবাড়ির প্রশস্ত বারান্দা। মায়া আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় চিৎকার করে আসে দৌড়ে আসে বারান্দায়। সুবর্ণা চিৎকার শুনে বেরিয়ে আসে।

মায়া : ও বউদি গো, ও বউদি...ও বউদি...শিগ্‌গির চলো ...শিগ্‌গির চলো ... যে নতুন মেয়েটা এসেছে না ... হরেনদাকে কামড়ে দিয়েছে।

সুবর্ণা : সেকী! ওমা!

এখান থেকে সংলাপ বলতে বলতে দু-জনে সিঁড়ির দিকে এগোলে Camera trolley forward হতে থাকে।

মায়া : আর, ওই যো ...ও দৌড়ে উপরে উঠে আসছিল ... হরেনদা তখন ওকে আটকায় ... ও হরেনদাকে তখন কামড়ে আঁচড়ে একাকার কাণ্ড ... ওরে বাপ রে, তুমি শিগ্‌গির চলো বউদি, তাড়াতাড়ি চলো।

মায়ার সঙ্গে সুবর্ণা , নীচে নামার জন্য সিঁড়ির দিকে যায়।

Scene : 44 (সময়: সকালবেলা)

রাজবাড়ির উঠোন

Shot : 541/M.L.S./Same as Shot : 535/(Camera on trolley:R/L)

রাজবাড়ির উঠোনে, নতুন-আসা মেয়ে পারুলকে টানতে টানতে রাজীব নিয়ে যাচ্ছে। পারুল হঠাৎ হ্যাঁচকা টান মেরে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। রাজীব বিদ্যুৎগতিতে পারুলকে আবার ধরে। তাপসী নামে আর একটি মেয়ে রাজীবকে সাহায্য করছে। হরেন একপাশে ব্যথায় কাতর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পারুল রাজীবের কাছ থেকে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে মুখে জান্তব শব্দ করছে।

রাজীব : (পারুলকে টানতে টানতে) এইদিকে...(ভীষণ রেগে) কেন তখন থেকে অযথা গণ্ডগোল করছেন...(গায়ের জোরে পারুলকে বাড়ির বাইরের চাতালে টেনে আনতে আনতে) আবার...আবার ...অ্যাই এদিকে...এদিকে এসো...চুপ করে দাঁড়া ... চুপ...

পারুলের চিৎকার শুনে সুবর্ণা ও মায়া ঘটনাস্থলে দৌড়ে আসে।

Shot : 542/C.S./ (Parul)

রাজীব(O.S.): ... দাঁড়াবে এখানে ...

পারুল জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাচ্ছে । বোঝা যাচ্ছে তাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

Shot : 543//M.L.S./Same as Shot : 541

রাজীব : ... একদম এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে, নইলে কিন্তু বেঁধে রেখে দেবো। বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

সুবর্ণা : (হরেনের কাছে গিয়ে ক্ষতস্থান দেখতে চায়) দেখি?

Shot : 544/C.S.

পারুল : বান্ধিস না।

Shot : 545/C.S.

রাজীব : বাঁধবে না। (তাপসীকে) খেয়েছে কিছু?

Shot : 546/C.S.

তাপসী : খাবার দেওয়া হয়েছিল, ফেলে দিয়েছে।

Shot : 547/M.L.S.

রাজবাড়ির উঠোনে; রাজীব, পারুল, সুবর্ণা, তাপসী, হরেন ও মায়া দাঁড়িয়ে আছে। এবার মনোরমা এসে যোগ দেন।

রাজীব : (পারুলকে) যান , কাউকে বিরক্ত করবেন না।

পারুল ঘরের দিকে হাঁটতে শুরু করে।

মনোরমা : কী হয়েছে! কী ব্যাপার ?

Shot : 548/M.C.S./(Subarna & Manoroma)

সুবর্ণা : ওর কথাই বলছিলাম, ভীষণ violent হয়ে উঠছে।

তাপসী(O.S.): উনি না থাকলে ...

Shot : 549/M.C.S./(Rajib &Tapasi)

তাপসী : ... (রাজীবকে দেখিয়ে) বিপদ হত। হরেনবাবুকে কামড়ে দিয়েছে।

Shot : 550/M.C.S./Same as Shot : 548

মনোরমা : উ, সেকী! (হরেনকে দেখে) দেখি!

এবার মনোরমা ক্ষতস্থান দেখবার জন্য হরেনের দিকে এগিয়ে যান।

Shot : 551/C.S./Same as Shot : 545

রাজীব ভ্রূ কুঁচকে ব্যাপারটা শুনছে এবং দেখছে ।

Shot : 552/M.L.S.

মনোরমা হরেনের কাছে এসে তার হাতের ক্ষতস্থান দেখে বলে —

মনোরমা : ইস্ ... কী কাণ্ড! (মায়াকে) এই যে তুমি, একটু ডেটল লাগিয়ে দাও। আর ডা. চৌধুরীকে দিয়ে একবার দেখিয়ে নিয়ো।

সুবর্ণা : (মায়াকে) যাও, সঙ্গে যাও।

মায়া : চলো।

মায়া হরেনকে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

মনোরমা : (রাজীবের কাছে এসে) অনেক ধন্যবাদ ভাই।

সুবর্ণা এবার মনোরমার সঙ্গে রাজীবের পরিচয় করিয়ে দেয়।

সুবর্ণা : রাজীব । আমার আত্মীয়।

রাজীব : আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন, আমি এখানে থাকছি । একটু strongly handle করা দরকার। দরকার পড়লে রাত্রেও থাকব।

মনোরমা : বাঃ। এরকম support-ই চাই আমাদের । Thank you ভাই। (সুবর্ণাকে) আগে মেসোমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে আসি... তারপর না হয় ওদের ঘরে যাব।

Scene : 45 (সময়: সকালবেলা)

উন্মাদিনীদের ঘর

Shot : 553/L.S./(Top angle)

রাজীব উন্মাদিনীদের ঘরে ঢোকে। পারুলের কাছে যায়। পারুল আড়চোখে ভয়ে ভয়ে তাকায়। এবার ক্যামেরা অল্প Tilt up হয়।

রাজীব : (পারুলকে) খাননি কেন? (পারুলকে নিরুত্তর দেখে আবার প্রশ্ন করে) কী হল... খাননি কেন?

পারুল এতক্ষণ বিড়ি খাচ্ছিল । বিড়িটা ফেলে পারুল খাবারের থালায় লাথি মেরে সেটাকে দূরে ছিটকে দেয়।

Shot : 554/M.C.S.

পারুল হিংস্রভাবে রাজীবের দিকে তাকায়।

Shot : 555/L.S. to M.S./Same as last part of Shot : 553

রাজীব একটু দূর থেকে পারুলের লাথি মেরে ছিটকে-ফেলা থালাটা তুলে নিয়ে এসে আবার

পারুলের কাছে নামিয়ে রাখে।

রাজীব : খেয়ে নিন। না খেয়ে থাকলে হবে?

রাজীব এবার পারুলের কাছ থেকে উঠে প্রতিমার কাছে যায়। এই সময় Camera অল্প Tilt down হয়। রাজীব প্রতিমার কাছে এসে বসে। রাজীবের শরীর Frame out থাকে, শুধুমাত্র পা Frame-এ থাকে। প্রতিমা এখনো ফোঁপাচ্ছে।

রাজীব : (প্রতিমাকে) কী হল? মন খারাপ। কাঁদবেন না।

বলে রাজীব পকেট থেকে রুমাল বের করে।

Shot : 556/M.C.S./(Top angle)/ (Rajib & Pratima)

সান্ত্বনাবাক্য শুনে প্রতিমা এবার কান্নায় ভেঙে পড়ে। রাজীব তবুও তাকে বলে-

রাজীব : কাঁদবেন না। কী হবে কেঁদে? আমরা কী কাঁদার জন্য জন্মেছি।

Frame-in-এ থাকা রাজীবের হাত এবার প্রতিমাকে রুমালটা এগিয়ে দেয়।

রাজীব : নিন।

প্রতিমা এবার আরো জোরে জোরে কাঁদতে থাকে।

Scene : 46 (সময়: সন্ধ্যাবেলা)

সংগ্রামের ঘর / শৌর্যেন্দ্রর ঘর

Shot : 557/L.S.

সন্ধ্যাবেলার আকাশে ক্যামেরা Pan করে। সংগ্রামের বাজানো পিয়ানোর আওয়াজ এখানে Overlap করে।

Shot : 558/ M.C.S.

সংগ্রাম একাগ্রচিত্তে পিয়ানো বাজাচ্ছেন।

Shot : 559/C.S.

শৌর্যেন্দ্র খাটে হেলান দিয়ে বসে আছেন। দু-চোখ বোঁজা। তার ঘাড়টা মৃদু নড়ছে। মনে হচ্ছে, তিনি যেন পিয়ানোর বাজনা উপভোগ করছেন।

Shot : 560/M.C.S.

ক্লোজ শটে খালি ডিভানটাকে দেখা যায়। রাজীবের কোনো জিনিসপত্তর সেখানে নেই।

Scene : 47 (সময়: সন্ধ্যাবেলা)

সংগ্রামের ঘর

Shot : 561/M.S. to M.C.S/(Camera on trolley: L/R)

সংগ্রাম বসে বসে বই পড়ছেন। বারান্দা দিয়ে সুবর্ণা যাচ্ছে বুঝতে পেরে সংগ্রাম তাকে ডাকেন।

সংগ্রাম : বউমা

সংগ্রামের ডাক শুনে সুবর্ণা ঘরে ঢোকে।

সুবর্ণা : হ্যাঁ বাবা!

সংগ্রাম : ছেলেটিকে দেখছি না?

সুবর্ণা : নীচের ঘরে ওদের সঙ্গে আছে।

সংগ্রাম : খেয়েছে?

সুবর্ণা : না।

সংগ্রাম : নীচের ঘরে থাকাটা কী ওর পক্ষে ঠিক হবে?

সুবর্ণা : আমি বলেছি। Risk হয়ে যাচ্ছে। ... বলছে তো রাতে উলটোদিকের ঘরে শোবে আর বলছে ... যে কোনো সময় চলেও যেতে পারে।

Scene : 48 (সময়: সন্ধ্যাবেলা)

উন্মাদিনীদের ঘর

Shot : 562/C.S./(ludo)

Close up-এ দেখা যায় দু-জন উন্মাদিনী, পারুল ও মীনাক্ষী লুডো খেলছে। লুডো এবং দু-জনের চাল-দেওয়া হাতদুটো শুধু দেখা যায় । এর মধ্যে Off voice-এ, আমরা রাজীব ও একজন উন্মাদিনী ছবিদেবীর সংলাপ শুনি।

ছবিদেবী (O.S.) : আমার নাতিটাকে ... দেখতেই পাই না। ওরাও আর আসে না।

লুডোর দানে ছয় পড়ে। মীনাক্ষী কথোপকথনের মাঝখানে হঠাৎ ছক্কা বলে চেঁচিয়ে ওঠে।

রাজীব(O.S.): কবে দেখেছেন শেষ?

ছবিদেবী (O.S.) : কী জানি ... কবে...

Shot : 563/M.C.S.

রাজীব ছবিদেবীর কাছে বসে আছে। ছবিদেবী তার অতীত জীবনের কথা রাজীবকে বলে চলেছেন।

ছবিদেবী(O.S.): হ্যাঁ, ওই তো...হ্যাঁ , ওই তো...

Shot : 564/C.S.

পারুলকে দেখে এখন মোটেই অপ্রকৃতিস্থ বলে মনে হয় না। সে সন্দিগ্ধভাবে দু-জনের কথা শুনছে। বোঝা যায় তার অন্য কোনো গূঢ় অভিসন্ধি আছে।

ছবিদেবী(O.S.): ... মনে পড়ছে না।

Shot : 565/M.C.S./Same as Shot : 563

ছবিদেবী : জানো, ওকে না ঠিক ওর বাপের মতো দেখতে ... যেবার এসেছিল, আমার আঁচলটা ছাড়তেই চাইছিল না।...আচ্ছা ওরা আমাকে বাড়িতে নিয়ে যায় না কেন?

রাজীব : নিয়ে যাবে?

ছবিদেবী : যাবে?

এইসময় পুলিশের জিপের সতর্কধ্বনি শোনা যায়। রাজীব সতর্ক হয়ে ওঠে। কথোপকথন চলতেই থাকে।

রাজীব : হু।

ছবিদেবী : যাবে? নিয়ে যাবে। আমি মরে গেলে তারপরে নিয়ে যাবে?

Shot : 566/ L.S.

পুলিশের জিপ দূর থেকে ক্যামেরার কাছে এসে আবার দূরে চলে যায়।

Shot : 567/C.S./ Same as Shot : 564

পারুল দু-জনের কথোপকথন (রাজীব ও ছবিদেবী) শুনছে । পুলিশ জিপের সতর্কধ্বনি শুনে সে চমকে ওঠে।

Shot : 568/M.C.S./ Same as Shot : 565

পুলিশের জিপ বাড়ির কাছে চলে আসায় সতর্কধ্বনির আওয়াজ বাড়ে। রাজীব এবার দ্রুত ছবিদেবীর কাছ থেকে উঠে ঘরের বাইরে যায়।

Shot : 569/M.L.S./ (Camera on trolley: R/L)

সুবর্ণা বাড়ির ভেতরে বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

Shot : 570/C.S./Same as shot : 567

পারুল একবার ঘাড় ঘুরিয়ে রাজীবের গমন পথের দিকে তাকায়।

Scene : 49 (সময়: রাত্রিবেলা)

রাজবাড়ির উঠোন

Shot : 571/M.L.S./(Subarna & Rajib)

রাজীব ও সুবর্ণা কথা বলতে বলতে বাড়ির ভিতর থেকে উঠোনে বেরিয়ে আসে।

সুবর্ণা : আপনি তো কিছু খেলেন না?

রাজীব : ঠিক আছে ... আমি ওদের সঙ্গে খেয়ে নিয়েছি। No problem মিসেস সিংহ ...

Shot : 572/M.S./(Subarna & Rajib)

রাজীব : ...I must say, you are a great soul. আপনাকে যত দেখছি, ততই অবাক হচ্ছি। ...

Shot : 573/M.S./(Subarna & Rajib) / Different Angle

রাজীব ও সুবর্ণার কথোপকথন চলছে। তার মাঝখানে এক নির্বাক মুহূর্ত ।

Shot : 574/M.S./ Same as Shot: 572

রাজীব : ... এত কষ্ট পেয়েছেন, এত দুঃখ পেয়েছেন ... তবুও আপনার মধ্যে এত মায়া ... এত passion...

বলতে বলতে রাজীব সুবর্ণার দিকে অল্প এগিয়ে আসে।

Shot : 575/M.S./ Same as Shot: 573

সুবর্ণা : সেটা তো আপনাকেও বলতে পারি।

Shot : 576/M.S./ Same as Shot : 574

সুবর্ণা এবার ডানদিক থেকে বাঁদিকে হেঁটে রাজীবকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যায়।

Shot : 577/M.S./(Rajib & Subarna)/Different angle

রাজীব : না, আমার সঙ্গে আপনার কোনো তুলনাই হয় না। No Comparison.

সুবর্ণা ধীরে ধীরে এগোতে এগোতে কথা বলতে থাকে।

সুবর্ণা : হয়। আমরা এমন একটা ট্র্যাডিশনের মানুষ, এমন দেশে থাকি, যতই ঘৃণা বা ক্ষোভ থাকুক না কেন, কেউ বোধহয় কাউকে ফেলে

দিতে পারি না বা ফেলে চলেও যেতে পারি না। একটা অদ্ভুত অদৃশ্য বন্ধন আমাদের জড়িয়ে রাখে।... মায়া, মমতা, উদারতা, tolerence, patience, এটাই বোধহয় ভারতবর্ষের আসল দিক।

রাজীব : হ্যাঁ, হয়তো ... হয়তো আপনার বা আপনাদের কাছে এসে দেশের সেই মনটাকে খুঁজে পাচ্ছি।

Shot : 578/L.S.

নির্জন পথ দিয়ে পুলিশের জিপ চলে যায় । রাজীবের গলা জিপের শব্দে overlap করে ।

রাজীব(O.S.): দেখুন নিজেকে বাঁচিয়ে রাখাটা আমার দায়। আমার অপরাধের ...

Shot : 579/M.S to M.C.S./(Camera on trolley: T/F)

রাজীব : ... maximum শাস্তি কী? Death... মৃত্যু তো? আপনি... আপনি Indian Philosophy-র কথা বলছিলেন না... আমরা তো বিশ্বাস করি মৃত্যু মানে life-এর external form-টাকে... এই শরীরটাকে ...তার মৃত্যু। তাই সেটাকে পুড়িয়ে ফেলি। But the soul remains...আত্মা ...আত্মা ...কী যেন একটা বলে...

সুবর্ণা : অবিনশ্বর ...

রাজীব : Right... আমি হয়তো থাকব না, কিন্তু অন্যরা থাকবে। অন্যদের মধ্যে বেঁচে থাকব।

সুবর্ণা এগিয়ে এসে রাজীবের কাঁধে হাত রেখে বলে —

Shot : 580/M.C.S.

সুবর্ণা : আপনার মধ্যে এখনো অনেক মায়া, মমতা, ভালবাসা রয়েছে । আবার নতুন করে শুরু করতে পারেন না? জীবনের অনেকখানি পড়ে রয়েছে আপনার। পৃথিবীটাকে অন্যভাবে জয় করতে পারেন।

রাজীব : হয়তো... next life-এ।

সুবর্ণা : জানেন, যেদিন এ-বাড়িতে প্রথম আসি, আমায় দোতলায় উঠতে দেওয়া হয়নি। কারণ আমার শরীরে রাজ-রক্ত নেই। আমি মধ্যবিত্ত সংসারের মেয়ে। দেবীর জন্মের পরেও একই।...অনেকদিন।...কিন্তু আজ... ষোলোটা বছর কেটে গেছে। আমার জীবনটাও পালটে গেছে। প্রতিহিংসা নয় ধৈর্যই জীবনের ...

Shot : 581/M.L.S.

সুবর্ণা : ... আসল তপস্যা।

সুবর্ণা চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে হাঁটতে থাকে।

Shot : 582/M.C.S.

রাজীব : মিসেস সিংহ!

Shot : 583/M.C.S./(Subarna)

সুবর্ণা এবার ঘুরে দাঁড়ায়।

Shot : 584/M.C.S./ Same as Shot : 582

রাজীব : এক মিনিট ... ওই যে মহিলা পাগলামি করছে না ... পারুল ... আমি Sure পুলিশই ওকে পাঠিয়েছে।

Shot : 585/M.C.S./Same as Shot : 583

রাজীব(O.S.): ও পুলিশেরই লোক ।

সুবর্ণা : সেকী! কী হবে?

রাজীব(O.S.): কিচ্ছু হবে না।...

Shot : 586/M.C.S./ Same as Shot : 584

রাজীব : ...আমি তো আপনাকে বলেছি আপনাদের কোনো ক্ষতি হবে না...

Shot : 587/M.C.S./ Same as Shot : 585

রাজীব(O.S.): যান, শুয়ে পড়ুন।

'সুবর্ণা : কিন্তু!...

Shot : 588/M.C.S./ Same as Shot : 586/(Rajib)

রাজীব ও সুবর্ণার কথোপকথনের মাঝখানে এক নির্বাক মুহূর্তে রাজীব তাকিয়ে থাকে।

Shot : 589/M.C.S./Same as Shot : 587

সুবর্ণাও রাজীবের দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকে।

Shot : 590/L.S./(Top angle/Handcrane)

দোতলার বারান্দার রেলিঙের ভেতর দিয়ে দেখা যায়, সুবর্ণা ঘুরে বাড়ির ভিতর দিকে যাচ্ছে। ক্যামেরা tilt down করে। রাজীব সুবর্ণার গমনপথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।

Scene : 50 (সময়: রাত্রিবেলা)

উন্মাদিনীদের ঘর / রাজবাড়ির উঠোন

Shot : 591/M.C.S./(Parul)

জানলার গরাদের মধ্য দিয়ে পারুল, রাজীব ও সুবর্ণার গতিবিধির ওপর লক্ষ রাখে। তারপর ডানদিক দিয়ে Frame out হয়। এবার আমরা বুঝতে পারি পারুল বিষয়ে রাজীবের অনুমান সত্যি।

Shot : 592/L.S./Same as last part of Shot : 590

রাজীবও উঠোন থেকে বাড়ির ভিতরে চলে যায়। আমরা এখন ফাঁকা উঠোনটা দেখতে পাই।

Shot : 593/M.L.S.

রাজীব বাড়ির ভিতরে ঢুকে পারুলের ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়ায়। খড়খড়ি দিয়ে রাজীবের মুখে আলো এসে পড়ে।

Shot : 594/C.S.

মীনাক্ষী (একজন উন্মাদিনী) উদাস হয়ে তাকিয়ে আছে।

Shot : 595/M.S./Same as last part of Shot : 593

রাজীব এবার পারুলের ঘরের দরজায় বাইরে থেকে তালা দিয়ে দেয়।

Shot : 596/C.S.
Close shot-এ দেখা যায় টিভির পরদায় সন্ত্রাসবাদীদের কিছু Clippings চলছে।
Shot : 597/M.C.S.
দেবীর ঘর। Camera আস্তে আস্তে pan করে দেবীকে ধরে। দেবী টিভি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার মুখে টিভি থেকে বিচ্ছুরিত আলো পড়ছে।
Shot : 598/L.S./(Top angle/Handcrane)
রাজবাড়ির ফাঁকা উঠোন দেখা যাচ্ছে।

Scene : 51 (সময়: রাত্রিবেলা)
শৌর্যেন্দ্রর ঘর / সংগ্রামের ঘর / রাজবাড়ির চারদিক

Shot : 599/M.C.S. to C.S./(Camera on trolley:T/F)
সংগ্রাম ঘুমোচ্ছেন। ঘর চাঁদের আলোয় পরিপূর্ণ।
Shot : 600/M.C.S.
শৌর্যেন্দ্র অঘোরে ঘুমাচ্ছেন।
Shot : 601/M.S.
খাটের ছত্রিতে হেলান দিয়ে, সুবর্ণা নিদ্রাহীন চোখে বসে আছে। মুখ দিয়ে ক্লান্তিসূচক আওয়াজ করে।
Shot : 602/M.L.S.
পুলিশবাহিনী রাজবাড়ি ঘিরে ফেলে পজিশন নিচ্ছে। ইতস্তত তাদের টর্চের আলো ঘুরে বেড়াচ্ছে।
Shot : 603/M.S.
রাজীব প্রথমে তার পিস্তলে গুলি ভরা আছে কি না দেখে নেয়। তারপর বসে তার ব্যাগ থেকে কারবাইন বের করে দাঁড়ায়। তারপর ছুটে Right frame out হয়ে ঘর থেকে বেরোয়।
Shot : 604/M.L.S./Same as Shot : 602
পুলিশের দলবল রাজবাড়ি ঘিরে ফেলছে।

Scene : 52 (সময়: রাত্রিবেলা)
উন্মাদিনীদের ঘর / পুলিশের জিপ

Shot : 605/M.C.S.
পারুল তার ঘরে মোবাইল বের করে পুলিশ অফিসারকে ফোন করে।
Shot : 606/M.C.S./(Police officer)
পুলিশ জিপে পুলিশ অফিসারের মোবাইল বাজে । তিনি মোবাইল বার করে কানে লাগান।
অফিসার : Yes.
Shot : 607/M.C.S./Same as Shot : 605
পারুল মোবাইলে অফিসারকে বলে —
পারুল : স্যর, দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে গেছে স্যর।
Shot : 608/M.C.S./Same as Shot : 606
অফিসার : I See.

Shot : 609/M.C.S./Same as Shot : 607
পারুল : (আশঙ্কিত কণ্ঠে) স্যর, দরজাটা খোলার ব্যবস্থা করুন। আমি বেরোতে চাই।
Shot : 610/M.C.S./Same as Shot : 608
অফিসার : Don't worry , আমরা এসে গেছি।
Shot : 611/M.C.S./Same as Shot : 609
পারুল : Ok.
Shot : 612/M.C.S./Same as Shot : 610
কথা শেষ করে জিপ থেকে নেমে যান পুলিশ অফিসার।

Scene : 53 (সময়: রাত্রিবেলা)
রাজবাড়ির
দোতলায় উঠবার সিঁড়ি/দোতলা/উঠোন

Shot : 613/M.L.S./(Low angle)
কারবাইন হাতে রাজীব সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে যায়।
Shot : 614/M.L.S.
জঙ্গলের (রাজবাড়ির চারপাশে) মধ্য দিয়ে পুলিশবাহিনী ক্রমশ রাজবাড়ির চারদিক ঘিরে ফেলে। অফিসারের হাতে উদ্যত পিস্তল।
Shot : 615/M.S.
বাহিনী নিয়ে পুলিশ অফিসার রাজবাড়ির ভেতরে দিকে ঢুকে পড়েন।
Shot : 616/L.S./(Top angle)
পুলিশরা বাড়ির উঠোনে ঢুকে পড়েছে।
Shot : 617 /M.S.
বাইরে থেকে আমরা জানলার গরাদের মধ্য দিয়ে দেখতে পাই, রাজীব কারবাইন হাতে দাঁড়িয়ে আছে।
Shot : 618/L.S./(Low Russian angle)
উঠোনে থাকা পুলিশদের সঙ্গে ঘরের ভেতরে থাকা রাজীবের গুলি-বিনিময় শুরু হয়।

Scene : 54 (সময়: রাত্রিবেলা)
সুবর্ণার ঘর / সংগ্রামের ঘর / উন্মাদিনীদের ঘর

Shot : 619/C.S.
সুবর্ণার চোখের Close-up। গুলি বিনিময়ের শব্দ শুনে সুবর্ণা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে।
Shot : 620/M.C.S.
সংগ্রাম তাঁর ঘরে ঘুমাচ্ছেন। গুলির আওয়াজে তার ঘুম ভেঙে যায়।
Shot : 621/M.C.S.
প্রতিমা শুয়ে আছে। গুলির শব্দে ধড়মড় করে উঠে পড়ে।
Shot : 622/L.S./(Low Russian angle)/Same as Shot : 618
রাজীব ও পুলিশদের মধ্যে গুলি-বিনিময় চলতেই থাকে।

Shot : 623/M.C.S.
দেবী চমকে উঠে সুবর্ণাকে জড়িয়ে ধরে।
Shot : 624/M.C.S.
সুবর্ণা দেবীর দিকে তাকায়।
Shot : 625/M.C.S./Same as Shot : 623
এবার সুবর্ণা দেবীর গালে হাত রেখে তাকে আশ্বস্ত করে।

Scene : 55 (সময়: রাত্রিবেলা)
দোতলার বারান্দা / উঠোন / সংগ্রামের ঘর / শৌর্যেন্দ্রর ঘর

Shot : 626/M.C.S.
রাজীব ঘরের ভিতরদিক থেকে দ্রুত বারান্দার (দোতলা) দিকে দৌড়ে আসছে।
Shot : 627/L.S./(Low angle/verendah)
রাজীব দোতলার বারান্দার থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ে।
Shot : 628/L.S./(Low Russian angle)/Same as shot : 622
রাজীব ও পুলিশবাহিনীর মধ্যে অবিশ্রান্ত গুলি-বিনিময় চলতেই থাকে।
Shot : 629/C.S.
শৌর্যেন্দ্র গুলি-বিনিময়ের আওয়াজে চমকে ওঠেন। তারপর ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভেঙে অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকেন।
Shot : 630/C.S.
সংগ্রামও ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসে আছেন। নিজের চশমা খোঁজেন। খুঁজে পেয়ে চোখে পরেন। বাইরে থেকে প্রচণ্ড গুলি চলার আওয়াজ আসে।

Scene : 56 (সময়: রাত্রিবেলা)
রাজবাড়ির উঠোন / উন্মাদিনীদের ঘর / উঠোন সংলগ্ন চত্বর

Shot : 631/M.L.S./(Camera on trolley : R/L)
রাজীব পুলিশের গুলি এড়িয়ে পালাচ্ছে। গুলির বিস্ফোরণের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে।
Shot : 632/M.C.S.
গুলির আওয়াজে উন্মাদিনী ছবিদেবীর প্রতিক্রিয়া।
Shot : 633/M.C.S./Same as Shot : 621
প্রতিমা ভীষণ ভয় পায়।
Shot : 634/M.L.S.
পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে, গুলি-বিনিময়ে রাজীবের হাত থেকে কারবাইন ছিটকে যায়।
Shot : 635/M.C.S./(Police)
একজন পুলিশকে রাজীবের দিকে গুলি চালাতে দেখা যায়।
Shot : 636/M.L.S.
রাজীব গুলিবিদ্ধ হয়ে ছিটকে পড়ছে।
Shot : 637/M.L.S.
রাজীব গুলিবিদ্ধ হয়ে রাজবাড়ির চত্বর-সংলগ্ন ঘাসে লুটিয়ে পড়ে।

Scene : 57 (সময়: রাত্রিবেলা)
উঠোন সংলগ্ন চত্বর / সুবর্ণার ঘর

Shot : 638/M.C.S.
সুবর্ণা আতঙ্কে, ভীত হয়ে তার ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। চিৎকার করতে যায় কিন্তু পারে না। দেবী এবার পিছন থেকে মায়ের কাছে এগিয়ে আসে।
Shot : 639/M.L.S.
রাজীব উপুড় হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। পুলিশ চারপাশ থেকে ঘিরে দাঁড়ায়। পুলিশ অফিসার এগিয়ে এসে রাজীবের দেহটা সোজা করে দ্যাখেন। ক্যামেরা Tilt up হলে তিনি বলেন —

অফিসার : মনে হচ্ছে এখনো পালস আছে।

Shot : 640/M.C.S./ Same as Shot : 638
জানলায় সুবর্ণা ও দেবী দাঁড়িয়ে আছে। সুবর্ণার চোখ ছলছল করে।
Shot : 641/M.C.S:
রাজীবের রক্তাক্ত দেহ ঘাসের উপর পড়ে আছে।
Shot : 642/C.U.
রাজীবের রক্তাক্ত মুখের Close-up।
Shot : 643/M.L.S./Same as Shot : 639
পুলিশ রাজীবের দেহ জিপে তোলবার উপক্রম করে। পুলিশ অফিসার বলেন —

অফিসার : তাড়াতাড়ি তোলো। Quick...Quick...Quick.

এবার পুলিশেরা রাজীবের দেহ হাত দিয়ে ঝুলিয়ে তুলে নিয়ে বাঁদিক দিয়ে Frame out হয়।
Shot : 644/M.C.S./Same as Shot : 640
সুবর্ণা জানলার কাছে একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। পিছনে দেবী। শূন্য দৃষ্টি নিয়ে দূরে পাহাড়ের কোলে তাকিয়ে থাকে সুবর্ণা। সুবর্ণার চোখ ছলছল করে। Dissolve
Shot : 645/D.L.S./(Top Angle)
ক্রমশ ভোরের আলো ফুটছে। দূর থেকে দেখা যায়, পাহাড়ের কোল বেয়ে, পুলিশের জিপটি চলে যাচ্ছে। ক্যামেরা tilt up হয়ে ক্রমশ পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছয়, যেখানে পাহাড় দিগন্তে মিশে গেছে।
Shot : 646/C.S.
রাজবাড়ির খোলা জানলায়, মাধবীলতায় সবুজের মৃদু স্পন্দন-এর আভাস।
Shot : 647/C.S.
ঘরের ভেতর থেকে খোলা দরজার ভিতর দিয়ে ছাদের খানিকটা অংশ দেখা যায়। রাজবাড়ির ছাদের ঐতিহ্যময় একপাল্লার ভাঙা দরজাটা, বাতাসের আঘাতে যেন বারবার আগামীর সঙ্গে বিদ্রোহ করে চলেছে।

এরপর Title card এর End-scroll উঠতে থাকে।

কয়েকটি প্রধান চরিত্রের অভিনেতা, অভিনেত্রী

শৌর্যেন্দ্র — হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়
সংগ্রাম — সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
সুবর্ণা — রূপা গঙ্গোপাধ্যায়
রাজীব — শিলাজিৎ মজুমদার
মনোরমা — অলকানন্দা রায় বন্দ্যোপাধ্যায়
দেবী — অর্কপ্রিয়া গঙ্গোপাধ্যায়
বিমলেশ — অর্জুন চক্রবর্তী
আদিনাথ — অশোক মুখোপাধ্যায়
পারুল — ঋতা দত্ত চক্রবর্তী
মায়া — রিমাশ্রী বিশ্বাস

Scene বিভাজনের কোনো সর্বজনগ্রাহ্য নীতি নেই। আমরা আমাদের সুবিধা অনুযায়ী করলাম। এ-বিষয়ে আগ্রহী পাঠকের মতভেদ থাকতেই পারে। কিন্তু চিত্রনাট্যটির সর্বাঙ্গীণ অনুধাবনে তা কোন বাধার সৃষ্টি করবে না।

যে-কটি ইংরেজি Technical term-এর সংক্ষেপিত রূপ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে তার পূর্ণ বিস্তার আগ্রহী পাঠকের জন্য দেওয়া হল।

B.C.U.	Big Close Up
C.S.	Close Shot
C.U.	Close Up
L.S.	Long Shot
M.C.S.	Mid Close Shot
M.L.S.	Mid Long Shot
M.S.	Mid Shot
O.S.	Off Screen
D.L.S.	Deep Long Shot

উত্তর দমদম পৌর-হাসপাতাল

এম.বি.রোড, বিরাটি, ফোন ঃ ২৫১৪ -৫৪১৮

মাতৃসদন ও সকল প্রকার শল্য চিকিৎসা হয়

- এখানে E.C.G. /U. S. G. করা হয়।
- সকল বিভাগের বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ সর্বসময়ে জরুরি ভিত্তিতে কাজ করেন।
- জেনারেটর সহ সবসময়ে আলোর ব্যবস্থা আছে।
- স্বল্পমূল্যে I.O.L. ও Laparoscopic সার্জারি (চোখ/গলব্লাডার) করা হয়।
- আধুনিক যন্ত্রাদি সহ আরও দুটি নতুন অপারেশন থিয়েটার চলু হয়েছে। (Cardiac Monitor / Pulse Oximeter সহ)
- কেবিন সহ ৩৫টি বেডের পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল।
- সর্বসময়ের জন্য ডাক্তার ও নার্স থাকেন।
- হাসপাতালের জন্য প্রতিষ্ঠিত প্যানেল অ্যানাস্থেসিস্ট্ আছে।
- ন্যূনতম ব্যয়ে সাধারণের জন্য চিকিৎসার সুযোগ আছে।
- বর্তমানে মেরুদণ্ডের শল্যচিকিৎসা (Spinal cord Surgery) করা হচ্ছে।
- সুলভে X-Ray ব্যবস্থা চালু আছে।

শ্রীমতী গায়ত্রী চক্রবর্তী
উপ-পৌরপ্রধান
উত্তর দমদম পৌরসভা

শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার
পৌরপ্রধান
উত্তর দমদম পৌরসভা

Price : Rs. 60
Vol. : 26 No. : 4

BIVAV
Special Autumn Issue
Oct 2005 - Dec 2005
ISSN 0970-1885

Reg. No. : 30017/76
95th Issue

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল

(একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান)

পার্সিয়ান পাণ্ডুলিপি

- সচিত্র পার্সিয়ান পাণ্ডুলিপি
- আবুল ফজলকৃত 'নল দময়ন্তী' উপাখ্যানের সচিত্র পার্সিয়ান অনুবাদ
- দারাশুকো কৃত অ্যারিস্টটলের অনুবাদ

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সংগ্রহশালা

- পুরোনো কলকাতার সচিত্র ইতিবৃত্ত
- ইউরোপের অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্পীদের পেইন্টিং ও জলরঙের দুর্লভ কাজ
- উড ক্রাফট ও লিথোগ্রাফ
- ভাস্কর্য
- অস্ত্রশস্ত্র ও ব্যবহৃত যুদ্ধাস্ত্র সামগ্রী
- পাণ্ডুলিপি, সচিত্র প্রতিলিপি, বই,দলিল, মানচিত্র, মুদ্রা ও মেডেল
- ডাকটিকিট
- কালীঘাটের পট
- আধুনিক ভারতীয় শিল্পের নিদর্শন

ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন

- টিপু সুলতানের নোটবই
- টিপু সুলতানের তরবারিসহ মোগলযুগের সম্রাটদের ব্যবহৃত নানা সামগ্রী

এ ছাড়া ঐতিহাসিক অজস্র নিদর্শন রয়েছে বিভিন্ন গ্যালারিতে।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল প্রাঙ্গণে ধ্বনি ও আলোকসহ প্রদর্শনী

কলকাতার কাহিনী প্রদর্শনীর সময় অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৬.১৫টা থেকে ৭টা (বাংলা)। ৭.১৫টা থেকে ৮টা (ইংরাজী)। মার্চ থেকে জুন সন্ধ্যা ৬.৪৫ টা থেকে ৭.৩০টা (বাংলা) ৭.৪৫টা থেকে ৮.৩০টা (ইংরাজী)।

১, কুইন্স ওয়ে, কলকাতা - ৭০০ ০৭১, ফোন ঃ ২২২৩-১৮৯০-৯১/৫১৪২
ফ্যাক্স ঃ ৯১-৩৩-২২২৩-৫১৪২
E-mail : victomem@cal2.vsnl.net.in
Website : www.victoriamemorial-cal.org